সুভাষ-রচনাবলী

১৯২৯

সুভাষ-রচনাবলী

২

উপদেষ্টামণ্ডলী

সভাপতি
ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার

সদস্যগণ
শ্রীসত্যরঞ্জন বক্সী শ্রীহরিবিষ্ণু কামাথ
ড. অশোকনাথ বসু শ্রীসমর গুহ
ড. নিমাইসাধন বসু

প্রধান সম্পাদক
শ্রীসুনীল দাস

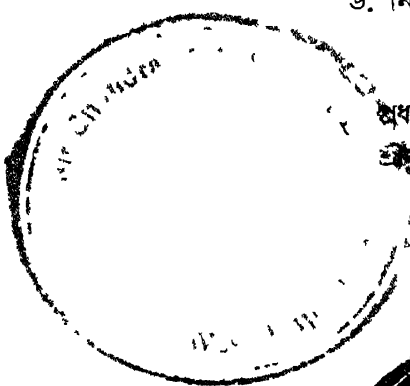

জয়শ্রী প্রকাশন। কলিকাতা ২৬

SUBHAS-RACHANAVALI— Vol. II

দ্বিতীয় খণ্ড

প্রচ্ছদ : শ্রীখালেদ চৌধুরী

প্রকাশক : শ্রীবিজয় নাগ
জয়শ্রী প্রকাশন
২০এ প্রিন্স গোলাম মহম্মদ রোড। কলিকাতা ১২

মুদ্রক : শ্রীদুলাল দাশগুপ্ত
ভারতী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্। ১৫ মহেন্দ্র সরকার স্ট্রীট
কলিকাতা ১২

গ্রন্থক : সেঞ্চুরি বাইন্ডিং কোম্পানি
কলিকাতা ৯

ভূমিকা

বর্তমান সংগ্রহ বলতে গেলে নেতাজীর জীবন-বাণী। এই বাণী প্রকটিত হয়েছে প্রায় সকল লেখায়— তাঁর বক্তৃতায়, তাঁর প্রবন্ধ রচনায়। তাঁর লেখা, তাঁর কথা, সবই যেন এক সূত্রে গাঁথা। সমস্ত লেখা ও কথার মধ্যে ফুটে উঠেছে বক্তার অন্তস্তল এবং যার সম্বন্ধে বলা কি লেখা সেই তাঁর না-বোঝা-মনুষ্যত্ব। তাঁর দেশ সেবা এক হিসেবে মানুষের মনুষ্যত্বের বিচার।

স্বামী বিবেকানন্দ ও দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন— উভয়েই আত্মভোলা সন্ন্যাসী। স্বামী বিবেকানন্দ সাধক, কর্মী। দেশবন্ধু প্রেমিক কবি। উভয়েই দেশসেবায় সাধক, কর্মী। নেতাজী শৈশবে, যৌবনে, প্রৌঢ়ে, বার্ধক্যে দেশসেবার মাধ্যমে অনন্তের পূজারী, মানুষের, নরনারায়ণের সাধক। প্রাত্যহিক ঘটনায়, প্রতি পদ-ক্ষেপে কর্মী অবশ্য পেয়েছেন স্বাদেশিকতার উন্মত্ততা, কর্মের, চিন্তার উদ্বেগ, চঞ্চলতা। নেতাজী পেয়েছেন আরও কিছু, অনেক কিছু— ভয়-ভীতি, শ্রীকৃষ্ণের চোখে বিশ্বের অনন্ত রূপ। ঐতিহাসিক ঘটনাবলী এই অনন্তের ছায়া, বিচিত্র-রূপ। বড় ঘটনা, ছোট ঘটনা,— কিছুই নিরর্থক নয়। কোন কিছুই প্রাণহীন বা উদ্বেলহীন নয়। নেতাজী তাঁর পাঠে, তাঁর চিন্তায়, তাঁর কর্মে এক চোখ রেখেছেন এই অকথিত বাণীতে, অপ্রকাশিত ভঙ্গীতে। তাঁর আদর্শ বিবেকানন্দ চিত্তরঞ্জন। রূপ রস গন্ধ তাঁকে চঞ্চল করেছে। কিন্তু সবকিছুর মধ্যে আছেন রসাতীত। নেতাজী উভয়ের পূজারী।

আদর্শ বাদ দিলে লেখার ভিতরে, কথার ভিতরে আছে প্রকাশভঙ্গি। নেতাজী কি লেখায়, কি কথায় খুঁজতেন বিশুদ্ধতাকে— মাজা-ঘষা নয়, শুধু মিষ্টতাকে নয়। কিন্তু তাই বলে তাঁর প্রকাশভঙ্গির বিশুদ্ধতা ও মিষ্টত্ব ও মাজা-ঘষা চকমকে বিরুদ্ধধর্মী নয়। তিনি কেবল দূরের পানে আঁখ মেলে আছেন এ কথা নয়, দূরকে নিকট, বন্ধু করেছেন, পরকে আপন করেছেন। বিবিধের মাঝে আছে মিলন মহান। মিলনের মিল অনেকের চোখে আসে না। নেতাজীর চোখে, মনে ছিল, আছে। সকল ধর্মের স্বাধীনতা, সকল মানুষের সমান অধিকার, নেতাজীর পক্ষে মানা অতি সহজ।

শ্রীশরৎচন্দ্র বসু

মুখবন্ধ

১৯২৮ সালে কলকাতা-কংগ্রেসে ভারতবর্ষ স্বাধীনতা সংগ্রামের এক নূতন দিগন্তে উপনীত হল। তার কিছুকাল পূর্বেই ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ সংবিধানের কাঠামো নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। এই কাঠামোটির প্রকৃতি কী হবে—'ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাস' বা ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত শাসন, না পূর্ণ স্বাধীনতা, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে সকল সম্পর্কের পূর্ণচ্ছেদের স্বাধীনতা? ১৯২৮-এর ফেব্রুয়ারিতে সাইমন কমিশন ভারতে পৌঁছবার অল্পকালের মধ্যেই ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ সংবিধানের রূপরেখা নির্ণয়ের জন্য ভারতীয় নেতাদের সর্বদলীয় সম্মেলন দিল্লীতে সে-বছর ফেব্রুয়ারি ও মার্চ অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। তারপর মে মাসে এই সর্বদলীয় সম্মেলনের বোম্বাই বৈঠকে মহাত্মা গান্ধীর পরামর্শক্রমে পণ্ডিত মতিলাল নেহরুর সভাপতিত্বে খসড়া সংবিধান রচনার জন্য একটি কমিটি গঠিত হল। কমিটির সংখ্যাগরিষ্ঠরা চাইলেন 'ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাস'-ই হোক ভবিষ্যৎ ভারতের সংবিধানের বনিয়াদ, আর সংখ্যালঘিষ্ঠরা চাইলেন 'পূর্ণ স্বাধীনতা'। সুভাষচন্দ্র এই সংখ্যালঘিষ্ঠদের অন্যতম। এঁরা আরো বললেন: যাঁদের লক্ষ্য পূর্ণ স্বাধীনতা, তাদের সেই লক্ষ্য সাধনের অবাধ অধিকারও থাকবে। অর্থাৎ, সর্বদলীয় সম্মেলনকে বিভক্ত না করেও এঁদের সংখ্যাগরিষ্ঠের গৃহীত সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সর্বদলীয় সম্মেলনের অন্তর্ভুক্ত সংখ্যালঘিষ্ঠদের 'পূর্ণ স্বাধীনতা'র লক্ষ্য সাধনের অবাধ অধিকার থাকবে।

কিন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠদের এই সিদ্ধান্ত একটু বেসুরো বাঁধলো। ১৯২৭-এর মাদ্রাজ-কংগ্রেস অধিবেশনে সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত ঘোষিত হয়েছে: ভারতের জনসাধারণের অন্তিম লক্ষ্য 'পূর্ণ স্বাধীনতা'—'Complete Independence'। জওহরলাল, কুড়েশী ও সুভাষচন্দ্র পরবর্তী বছরের জন্য কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক নিযুক্ত হয়ে কংগ্রেসের এই অন্তিম লক্ষ্য ঘোষণার পশ্চাতে শক্তি সংযোজনের প্রতিশ্রুতি নিয়ে দাঁড়িয়েছেন।

কিন্তু প্রতিকূল হাওয়াও বইছে। মাদ্রাজ-কংগ্রেসে সর্বসম্মতিক্রমে পূর্ণ-স্বাধীনতার আদর্শ গৃহীত হলেও,, এই কংগ্রেসের সমাপ্তির অব্যবহিত পরেই মহাত্মা গান্ধী জানালেন যে 'ভালোভাবে ভাবনা-চিন্তা না করেই' প্রস্তাবটি গৃহীত হয়েছে—"hastily conceived and thoughtlessly

passed।" ১৯২৭-এর ডিসেম্বরে ভারতীয় জনসাধারণের অন্তিম আদর্শরূপে 'পূর্ণস্বাধীনতা' ঘোষিত হবার পর, ১৯২৮-এর সর্বদলীয় সম্মেলনে পণ্ডিত মতিলাল নেহরুর সংবিধান সংক্রান্ত রিপোর্টে 'ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাস'কে ভবিষ্যৎ সংবিধানের কাঠামোরূপে বিবৃত করে ভারতীয় জাতীয় সংগ্রামে সেদিনকার নরমপন্থীরা ঘড়ির কাঁটা পিছিয়ে দেবার উদ্যোগ করেছিলেন। সুভাষচন্দ্র ও তাঁর সংগ্রামী সহযোগীদের সম্মুখে উভয়সংকট দেখা দিল। সর্বদলীয় সম্মেলনের সংখ্যাগরিষ্ঠদের সিদ্ধান্ত' ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাসের তাঁরা বিরোধী। অথচ সে-সময় প্রকাশ্যে সেই সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করলে ভারতে সফররত সাইমন কমিশন এবং জাতীয় সংগ্রামের আভ্যন্তরীণ শত্রুরা উল্লসিত হবেন। অপরপক্ষে 'ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাস'-এর সরাসরি বিরোধিতা না করলে সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে সকল সম্পর্ক-রহিত 'পূর্ণ স্বাধীনতা'র আদর্শ ঢাকা পড়ে যাবে। এই সংকট সমাধানের জন্য সুভাষচন্দ্র, জওহরলাল প্রমুখ যাঁরা সেদিন কংগ্রেসের বামপন্থী রূপে পরিচিত, তাঁরা স্থির করলেন, 'ইন্ডিপেন্ডেন্স্ লীগ' গঠন করে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে সর্বপ্রকার বিচ্ছিন্ন-সম্পর্ক স্বাধীনতার আদর্শ প্রচার করবেন, আর সর্বদলীয় সম্মেলনকে দ্বিধাবিভক্ত না করে ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাসে'র বিরুদ্ধে সুস্পষ্টভাবে তাঁদের মত প্রকাশ করবেন। একটি ঘরোয়া বৈঠকে কংগ্রেসের বামপন্থীরা এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন লক্ষ্ণৌতে সর্বদলীয় সম্মেলনের সমসময়ে— ১৯২৮-এর আগস্টে।

কিন্তু শেষরক্ষা হল না। ১৯২৮-এর ডিসেম্বরে কলকাতা-কংগ্রেসের অধিবেশনে মহাত্মা গান্ধী কংগ্রেসের বামপন্থীদের সমবেত বিরোধিতা সত্ত্বেও মূল প্রস্তাব উত্থাপন করে বললেন, "…১৯২৯-এর ৩১শে ডিসেম্বরের পূর্বে ব্রিটিশ পার্লামেন্ট নেহরু-সংবিধান গ্রহণ করলে, কংগ্রেস এই সংবিধানকে পুরোপুরি গ্রহণ করবে…।" সুভাষচন্দ্র এই প্রস্তাবের সংশোধনী নিয়ে এগিয়ে এলেন। সুভাষচন্দ্রের সংশোধনীর তাৎপর্য হল 'পূর্ণ স্বাধীনতা' ছাড়া আর কোনো অবস্থায়ই কংগ্রেস সন্তুষ্ট হবে না, অর্থাৎ তার অর্থই হল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে সকল সম্পর্কচ্ছেদ। সুভাষচন্দ্রের সংশোধনী ৯৭৩/১৩৫০ ভোটে পরাজিত হল। সুভাষচন্দ্রের সংশোধনী জয়ী হলে গান্ধীজী কংগ্রেস থেকে অবসর গ্রহণ করবেন— এক প্রচ্ছন্ন হুমকি সত্ত্বেও ভোটের ব্যবধান ছিল মাত্র ৩৭৭। গান্ধীজী উত্থাপন করলেন ১৯২৯-এর ৩১ ডিসেম্বরের পূর্বে 'ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাস' চাই আর সুভাষচন্দ্র তাঁর

বিরোধী প্রস্তাব নিয়ে দাঁড়ালেন : ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে সকলপ্রকার সম্পর্ক ছিন্ন ক'রে অবিলম্বে পূর্ণ স্বাধীনতা চাই। গান্ধীজী চাইলেন আপস—'ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাস'—সুভাষচন্দ্র চাইলেন জাতীয় সংগ্রামের বৈপ্লবিক পরিণতি ব্রিটিশ সম্পর্কছিন্ন 'পূর্ণ স্বাধীনতা'। জাতীয় সংগ্রামের বৈপ্লবিক রূপান্তরের বেগবান দাবি উত্থাপন ক'রে সুভাষচন্দ্র সেদিন গান্ধীজীর বিকল্প নূতন নেতৃত্ব নিয়ে জাতীয় সংগ্রামের পটভূমিকায় আবির্ভূত হলেন : 'ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাস', না 'সকলপ্রকার ব্রিটিশ সম্পর্কচ্ছিন্ন পূর্ণ স্বাধীনতা', আপস না বৈপ্লবিক সংগ্রাম— সেদিন থেকে পরিখার দুই পাশে পরস্পর দুই প্রতিদ্বন্দ্বী শিবির ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছে।

ভারতবর্ষের আভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি সে-সময় সংগ্রামের অনুকূল। আর ঠিক সেই মুহূর্তে ব্রিটিশ সরকারের শুভবুদ্ধির উপর ভরসা করতে ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাসের সাংবিধানিক কাঠামো স্বীকার করে নেবার জন্য নেতৃত্বের উন্মুখতা হতাশাব্যঞ্জক। গান্ধী-নেতৃত্ব শুধু যে পিছু হটলেন, তাই নয়, সংগ্রামের জন্য কোনো সক্রিয় কর্মসূচীও গ্রহণ করলেন না। নৈষ্কর্ম্যের কর্মসূচীর মধ্যে এই নেতৃত্ব নিজেকে সীমিত রাখলেন। অথচ এই সময়টাই ছিল জাতীয় জাগরণের মাহেন্দ্রক্ষণ। সারা দেশব্যাপী ছাত্র-যুব সম্মেলনের মধ্য দিয়ে জাতীয় সংগ্রামে নূতন শক্তি, নূতন চেতনা সঞ্চারিত হয়ে চলেছে। সুভাষচন্দ্র জওহরলালকে কলকাতায় আহ্বান করে নিয়ে এলেন নিখিলবঙ্গ ছাত্র-সম্মেলনে সভাপতিত্ব করবার জন্য। তারপরই দ্রুতগতিতে বাংলাদেশে ছাত্রসংগঠন ও আন্দোলন গড়ে উঠল। অতঃপর, সুভাষচন্দ্র ভারতের সর্বত্র ছাত্র ও যুব-সম্মেলনে সংগ্রাম ও সংগঠনের দৃপ্ত আহ্বান জানিয়ে যৌবনের যুবরাজরূপে অভিষিক্ত হলেন। সে-সময় ছাত্র-আন্দোলনের পাশাপাশি দুর্বার শ্রমিক-আন্দোলন আত্মপ্রকাশ করে। ১৯২৮-এর স্মরণীয় টাটা আয়রন অ্যান্ড স্টীল ওয়ার্কস-এর কয়েক মাসব্যাপী ধর্মঘটের সফল পরিচালনার মধ্য দিয়ে সুভাষচন্দ্র দক্ষ শ্রমিকনেতারূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন।

কিন্তু সংগ্রামের বেগবান প্রবাহ কই ? জাতীয় বিপ্লবের পূর্ণায়নের কাল অবসিত হয়ে চলেছে। গান্ধীজী এ-সময় কী করছেন ? তিনি কোনো আলো দেখতে পাচ্ছেন না, তাই তাঁর পক্ষে কালহরণ ছাড়া আর উপায়ই বা কী ? কিন্তু কী আশ্চর্য, কোনো সংগ্রাম ছাড়া ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদীরা যে ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাসও দেবে না, এই সহজ-উপলব্ধিও কি গান্ধীজীর নেই ; না, ঠিক তা

নয়। গান্ধীজীর সংগ্রাম-কৌশল পৃথক, তাঁর সংগ্রামের ক্ষেত্রও তাই পৃথক। গান্ধীজীর সংগ্রামের শেষ অস্ত্র অহিংস সত্যাগ্রহ বা সংগ্রাম। কিন্তু সেই সংগ্রামেরও সীমানা নির্দিষ্ট রয়েছে। নির্দিষ্ট সীমানাই বটে। কারণ গান্ধীজীর সংগ্রামের অন্যতম কৌশল 'আপস'—'Compromise'। তাঁর নিজেরই ভাষায় : 'Compromise is inherent in Satyagraha'— সত্যাগ্রহের মধ্যে আপস নিহিত রয়েছে।

১৯২৯ সালের ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে ভারতের ভবিষ্যৎ সাংবিধানিক কাঠামোরূপে ব্রিটিশ কর্তৃক ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাসের স্বীকৃতিদানের সময়সীমা বেঁধে দেওয়া হয়। ১৯২৮-এর কলকাতা-কংগ্রেসের এই সিদ্ধান্তের এই শর্ত ব্রিটিশ সরকার অস্বীকার করলে, গান্ধীজীর নির্দেশ অনুযায়ী পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। গান্ধীজী সহজেই বুঝেছিলেন কলকাতা-কংগ্রেসে ডোমিনিয়ান স্ট্যাটাসের বিরুদ্ধে ব্রিটিশ সম্পর্কচ্ছিন্ন পূর্ণ স্বাধীনতার বিকল্প প্রস্তাব যে ৩৭৭ ভোটের বাঁধ দিয়ে ঠেকিয়ে রাখা হয়েছিল, সে-বাঁধ অনতি-বিলম্বে পূর্ণ স্বাধীনতার জোয়ারে ভেঙে খান্ খান্ হয়ে যাবে। এ-জোয়ার প্রতিরোধ করা যাবে না। কিন্তু এ-জোয়ারের বৈপ্লবিক গতিবেগ কি হ্রাস করা যাবে না? যদি কংগ্রেসের বামপন্থী শক্তিজোটকে দুর্বল করা যায়, পূর্ণ-স্বাধীনতার বৈপ্লবিক গতিবেগও সেই অনুপাতে দুর্বল হবেই। ভারতীয় জাতীয় সংগ্রামে সুভাষচন্দ্র অসংশয়িতভাবে প্রতিষ্ঠা পেয়ে গেছেন গান্ধীজীর বিকল্প আপসহীন সংগ্রামী নেতারূপে; তাঁর সংগ্রামের কৌশল কলকাতা-কংগ্রেসেই অবয়ব নিয়েছে— এই কৌশলের গতি-প্রকৃতিও নির্ণীত হয়ে গেছে— ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে সকল সম্পর্কচ্ছেদের পর পূর্ণ স্বাধীনতার লক্ষ্যসাধন, যার মূল মর্ম।

কলকাতা-কংগ্রেসে পূর্ণ স্বাধীনতার লক্ষ্য প্রতিহত ক'রে গান্ধীজী না-হয় সংগ্রাম এড়িয়ে গেলেন কিন্তু এই লক্ষ্যকে তো আর পিছিয়ে দেওয়া যাবে না! ১৯২৯-এর ডিসেম্বরে লাহোর-কংগ্রেসে এই লক্ষ্য মেনে না নেওয়া ছাড়া উপায়ান্তর ছিল না। কিন্তু এরই মধ্যে যেটুকু পথ খোলা আছে, সেই পথে অগ্রসর হয়ে কংগ্রেস-নেতৃত্বে বামপন্থীদের প্রভাব যাতে বৃদ্ধি না পায়, সেটুকু প্রভাব তাঁরা বিস্তার করেছেন, তা থেকেও কংগ্রেসকে যাতে মুক্ত করা যায়, গান্ধীজী সেদিকে কৌশল প্রয়োগে মন দিলেন। কলকাতা-কংগ্রেসে গান্ধীজীর অবলম্বিত কৌশলকে সুভাষচন্দ্র নিজেই বলেছেন : 'অপূর্ব'—

"The tactics employed by the Mahatma during the next twelve months were indeed superb". (*The Indian Struggle :* Thacker, Spink & Co. Ltd. Calcutta, 1948 pp. 223) কলকাতা-কংগ্রেসে সুভাষচন্দ্রের সংশোধনী প্রস্তাবে সংগ্রামের যে প্রচ্ছন্ন আহ্বান ছিল, সেটাই ছিল অপর শিবিরের চাঞ্চল্যের কারণ। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সংগে সকল সম্পর্করহিত পূর্ণ স্বাধীনতার অপর নামই দুর্বার সংগ্রাম— আপসহীন নিরবচ্ছিন্ন বৈপ্লবিক সংগ্রাম। এই সংগ্রামের প্রকৃতি গান্ধীপন্থার সত্যাগ্রহ-সংগ্রাম নয়— যে সংগ্রামকে পর্যায়ক্রমিক সংগ্রামরূপে চিহ্নিত করা যেতে পারে। অর্থাৎ সত্যাগ্রহের পর আপস, আবার আপসের পর সত্যাগ্রহ— এই পর্যায়-ক্রমিক ধারায় যে সংগ্রাম সঞ্চালিত হয়। সুতরাং একটি শিবিরে এই পর্যায়-ক্রমিক সংগ্রামীদের সমবেত করে অপর শিবিরে আপসহীন নিরবচ্ছিন্ন বৈপ্লবিক সংগ্রামীদের সংহত করে কলকাতা-কংগ্রেসে এই দুই প্রতিদ্বন্দ্বী শিবির রচিত হল। অসহযোগ আন্দোলনের পর পরস্পরবিরোধী দুই প্রতিপক্ষের শিবির রচিত হয়েছিল। পরিখার এক পারে ছিলেন গান্ধীপন্থী 'পরিবর্তন বিরোধী'রা, যাদের সে-সময় নামকরণ ছিল 'No-Changer', তাঁরা। আর অপর পারে ছিলেন যাঁরা স্বরাজপন্থী 'Swarajist'—কাউন্সিল প্রবেশের সমর্থক। এঁদের অপর নাম ছিল 'পরিবর্তন-পোষক' বা 'Pro-Changer'। অসহযোগ আন্দোলন-পূর্ব দুই বিপরীত শিবিরভুক্ত নেতৃবর্গের অনেকেই ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাস নাম পূর্ণস্বাধীনতার সংগ্রামে ১৯২৯-এর গোড়ায় একই শিবিরভুক্ত হয়ে পড়েন। তাই সে-সময় পরিখার একই দিকে দেখা গেল 'নো-চেঞ্জার' গান্ধীজীর পাশে স্বরাজপন্থী বা 'প্রো-চেঞ্জার' মতিলাল নেহরুকে।

কিন্তু জওহরলাল কী করছেন সেই সংকট মুহূর্তে? সদ্য ইউরোপ-প্রত্যাগত ১৯২৭-এ মাদ্রাজ-কংগ্রেসে যোগ দিয়ে নিজের পরিচয় দিলেন সমাজবাদীরূপে। জওহরলাল ইউরোপের বিভিন্ন দেশ এবং সোভিয়েত রাশিয়া পরিভ্রমণ ক'রে ভারতবর্ষে সমাজবাদী আদর্শের প্রচারকরূপে মাদ্রাজ-কংগ্রেসে আত্মপ্রকাশ করলেন। ফলে কংগ্রেসের অভ্যন্তরে বামপন্থীরা যেমন নূতন শক্তির সন্ধান পেলেন, তেমনি ভারতবর্ষের যুবশক্তি এক নূতন প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হলেন। সুভাষ-জওহরের দ্বৈত আপসহীন নেতৃত্ব ১৯২৭-এর মাদ্রাজ-কংগ্রেস থেকে ১৯২৯-এর আগস্টে লাহোর-কংগ্রেসের সভাপতিরূপে

জওহরলালের নির্বাচন পর্যন্ত, ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামকে এক নূতন পর্যায়ে উন্নীত করেছিল। কংগ্রেস আন্দোলন এই সময় অনেকটা দিগভ্রান্ত। কারণ গান্ধীজী কংগ্রেস পরিচালনায় উদ্যোগহীন, সংগ্রামের কোনো কর্মসূচী উপস্থাপনে তিনি নিষ্ক্রিয়। অথচ ১৯২৮ ও ১৯২৯ সালে বৈপ্লবিক শক্তি দেশে অশান্তির ঢেউ তুলেছে। এই সময় বিপ্লবের আরো সংকেত দেখা দিয়েছে। উত্তর ও পূর্বভারতে বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ডের স্ফুরণ, সমগ্র দেশব্যাপী শ্রমিক-বিক্ষোভ— এবং শিক্ষিত যুবসম্প্রদায়ের জাতীয়তাবোধে বৈপ্লবিক উদ্বোধন— এই সময় কয়েকটি ঘটনার মধ্য দিয়ে গভীরভাবে রেখাপাত করেছে।

১৯২৯ সালে সাইমন কমিশন-বিরোধী বিক্ষোভে লালা লাজপত রায় গুরুতররূপে আহত হয়ে অল্পকাল পরেই লোকান্তরিত হন। লাহোরের ইংরেজ পুলিশ স্যাণ্ডার্সকে এই হত্যার জন্য দায়ী করে বিপ্লবীরা তাকে গুলিবিদ্ধ করে। সর্দার ভগৎ সিং ও বটুকেশ্বর দত্ত দিল্লীর কেন্দ্রীয় অ্যাসেম্বলীর দর্শক-গ্যালারি থেকে বোমা নিক্ষেপ ক'রে গ্রেপ্তার হন। পরে ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে বহু বিপ্লবীকে গ্রেপ্তার ক'রে ১৯২৯-এর মাঝা-মাঝি সরকার লাহোরে একটি ষড়যন্ত্র মামলা দায়ের করে। লাহোর-ষড়যন্ত্র মামলার অভিযুক্ত বিপ্লবীরা বিচারাধীন রাজনৈতিক বন্দীদের প্রতি মানবীয় ব্যবহারের দাবিতে অনশন আরম্ভ করেন। লাহোর জেলে অন্যতম বিচারাধীন বিপ্লবী যতীন দাস অনশনে যোগদান করেন, এই শর্তে যে অনশনকারীদের দাবি পূরণ না হওয়া পর্যন্ত তিনি অনশন ভঙ্গ করবেন না। লাহোর জেলে অনশনকারী বিচারাধীনদের দাবির সমর্থনে দেশব্যাপী তুমুল আলোড়ন হয়। সংবাদপত্রে, সভা-সমিতিতে সরকারের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড বিক্ষোভ মূর্ত হয়ে ওঠে, কিন্তু সরকারের অনমনীয়তার মুখে ১৯২৯-এর ১৩ সেপ্টেম্বর যতীন দাস শহীদের মৃত্যুবরণ ক'রে অমরত্বে উত্তীর্ণ হন। সেপ্টেম্বরের গোড়ায় সরকারী নীতির প্রতিবাদে এবং লাহোর জেলে অনশনকারীদের সমর্থনে কলকাতার একটি বিক্ষোভ-মিছিল পরিচালনাকালে সুভাষচন্দ্র অন্যান্য সহকর্মীদের সঙ্গে গ্রেপ্তার হলে রাজদ্রোহের অপরাধে বিচারের জন্য প্রেরিত হন। যতীন দাসের শহীদের মৃত্যুবরণ সমগ্র দেশে অভূতপূর্ব জাগরণের শিহরণ দিয়ে যায়। দেশপ্রেমের, ত্যাগের ও সেবার উদ্দীপনায় উদ্দীপিত ছাত্র ও যুবশক্তি নবরূপে সংগ্রামী শক্তি নিয়ে সংগঠিত হয়ে ওঠে। কিন্তু গান্ধীজীর কণ্ঠ 'ইয়ং ইণ্ডিয়া'

—(*Young India*)— শহীদের আত্মদান সম্পর্কে সম্পূর্ণ নীরব রয়ে গেল। এই স্তব্ধতা কেন, জানতে চাইলে গান্ধীজী প্রশ্নকর্তাকে বলেছিলেন, এই ঐতিহাসিক ঘটনা সম্পর্কে কিছু লিখলে তাঁকে অপ্রীতিকর কিছু লিখতে হত। এই কারণেই কিছু লেখা থেকে তিনি একেবারে নিরস্ত ছিলেন।

শহীদ যতীন দাসের অমরত্বে উদ্দীপিত হয়ে শুধুমাত্র সমগ্র বাংলাদেশে প্রাদেশিক যুব-সমিতি ও প্রাদেশিক ছাত্র সমিতির শাখা-প্রশাখা ছড়িয়ে গেল তাই নয়, অন্যান্য প্রদেশেও সেই একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটে। পুনা, আহমেদাবাদ, বোম্বাই, লাহোর, নাগপুর, অমরাবতী, মাদ্রাজে যুব ও ছাত্র সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সেপ্টেম্বরে লাহোরে অনুষ্ঠিত পাঞ্জাব ছাত্র-সম্মেলনে, নভেম্বরে নাগপুরে অনুষ্ঠিত মধ্যপ্রদেশ যুব-সম্মেলনে এবং ডিসেম্বরে অমরাবতীতে অনুষ্ঠিত বেরার ছাত্র-সম্মেলনে সুভাষচন্দ্র সভাপতিত্ব করেন। এই সময়কার তীব্র শ্রমিক অসন্তোষের ঘটনাও পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। বোম্বাই এর সুতীকল ধর্মঘট সরকারের পক্ষে সব চাইতে বিপজ্জনক হয়ে পড়ে। কয়েকমাসব্যাপী এই ধর্মঘট অবসন্ন হয়ে পড়লে ইংরেজ সরকার ১৯২৯ এর মার্চ মাসে সারা ভারতবর্ষব্যাপী তল্লাস ও গ্রেপ্তার পরিচালনা ক'রে ৩১ জন ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনকারীকে মীরাট এ এনে তাঁদের বিরুদ্ধে ইংরেজশাসন উচ্ছেদের ষড়যন্ত্রের মামলা আনে। এই মামলাই মীরাট ষড়যন্ত্র মামলা নামে খ্যাত।

১৯২৯-এর জুন মাসে ইংলণ্ডে শ্রমিক দল ক্ষমতায় এলে ভারতীয় শ্রমিকদের সম্পর্কে তথ্যানুসন্ধান ও তাদের অবস্থার উন্নতির জন্য হুইট্‌লির সভাপতিত্বে একটি 'Royal Commission on Labour' গঠন করেন। শাসন-সংস্কারের ক্ষেত্রে যেমন সাইমন কমিশন, শ্রমিক-সংস্কারের ক্ষেত্রে তেমনি হুইট্‌লি কমিশন গঠন করা হয়। এই কমিশনে ভারতীয় ট্রেড ইউনিয়ন কর্মীদের জন্য দুইটি আসনের ব্যবস্থা হওয়ায়, দক্ষিণপন্থী শ্রমিকনেতারা এই সুযোগ গ্রহণে এগিয়ে গেলে নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসে ফাটল ধরে। ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস হুইট্‌লি কমিশন বয়কটের সিদ্ধান্ত নেয়। আর দুই শ্রমিক নেতা এন. এম. যোশী ও দেওয়ান চমনলালের নেতৃত্বে নরমপন্থীরা 'অল ইণ্ডিয়া ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশন'-এর নাম গ্রহণ করে হুইট্‌লি কমিশনের সমর্থনে মূল সংগঠন থেকে পৃথক হয়ে যায়।

১৯২৯-এ সংগ্রামের মাহেন্দ্রক্ষণ অতিক্রান্ত হয়ে গেল। বাংলাদেশের ব্যবস্থাপক সভায় কংগ্রেস পার্টি বার বার মন্ত্রীসভার পতন ঘটালে গভর্নর

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভা ভেঙে দিয়ে নূতন নির্বাচনের নির্দেশ দিলেন। নির্বাচনে জয়ী কংগ্রেস পার্টি মে মাসে সংখ্যাগরিষ্ঠ শক্তি নিয়ে ব্যবস্থাপক সভায় ফিরে এল, জাতীয়তাবাদী মুসলমানরাও তাদের কয়েকটি হারানো আসন ফিরে পেল। নির্বাচনের ঠিক পূর্বে কলকাতার নিকটে ট্রেন দুর্ঘটনা সম্পর্কিত একটি মানহানির মামলায়— যে মামলা ইস্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে দেশবন্ধু-প্রতিষ্ঠিত সুভাষচন্দ্র-পরিচালিত 'ফরওয়ার্ড' পত্রিকার বিরুদ্ধে দায়ের করেছিল— ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে 'ফরোয়ার্ড' পত্রিকার কাছে দেড়লক্ষ টাকার ক্ষতিপূরণ আদায়ের জন্য আদালতের নির্দেশ পায়। এই ক্ষতিপূরণ এড়াবার জন্য রাতারাতি 'ফরোয়ার্ড' পত্রিকার স্থলবর্তী 'লিবার্টি' পত্রিকা প্রকাশের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। ১৯২৯ সালের এই ঘটনা সুভাষচন্দ্রের দীপ্ত-প্রতিভার স্বাক্ষর বহন করছে।

ইংলণ্ডে শ্রমিক দল ক্ষমতায় এলে বড়োলাট লর্ড আরউইনের বিলেতে ডাক পড়ে। এদিকে অকস্মাৎ জুলাই মাসে, পূর্ব ঘোষণা ছাড়াই, ওয়ার্কিং কমিটি সভা ডেকে বিভিন্ন ব্যবস্থাপক সভা থেকে কংগ্রেসী সদস্যদের পদত্যাগের নির্দেশ দিলে কংগ্রেস সংগঠনে অসন্তোষ দেখা দেয়। মাত্র মে মাসে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার নির্বাচন, কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভায় কংগ্রেস দলের নেতা পণ্ডিত মতিলাল নেহরুর উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয়েছে। আর সেই মতিলালই দুই মাসের মধ্যে মত পরিবর্তন করে জুলাই-এর ওয়ার্কিং কমিটিতে গান্ধীজীর ব্যবস্থাপক সভা বর্জন সিদ্ধান্তে কেন সায় দিলেন, তা এক পরম বিস্ময়কর বিষয়। এলাহাবাদের এ. আই. সি. সি. বৈঠকে জে. এম. সেনগুপ্ত এবং সুভাষচন্দ্র এই প্রস্তাবের ঘোর বিরোধিতা করেন। অন্যান্য ব্যবস্থাপক সভায়ও কংগ্রেস পার্টির পক্ষ থেকে এই সিদ্ধান্তের তীব্র প্রতিবাদ ধ্বনিত হয় এবং ডিসেম্বরে লাহোর-কংগ্রেস পর্যন্ত ব্যবস্থাপক সভা বর্জনের বিষয়টি মুলতুবী রাখা হয়। কিন্তু পরবর্তী সময়ে মহাত্মা গান্ধী, পণ্ডিত মতিলাল ও জে. এম. সেনগুপ্তর সমর্থনে কাউন্সিল বয়কট প্রস্তাবটি কংগ্রেসে গ্রহণ করিয়ে নেন।

আগস্টে এ. আই. সি. সি,-র বিশেষ সভায় মহাত্মা গান্ধীর কৌশল বাম-পন্থীদের আরো দুর্বল ও বিভক্ত করে দেয়। লাহোর-কংগ্রেসে সভাপতিত্বের জন্য, কংগ্রেসের গঠনতন্ত্র অনুযায়ী অধিকসংখ্যক প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি মহাত্মা গান্ধীর নাম ঐ পদের জন্য প্রস্তাব ক'রে পাঠায়। কিন্তু গান্ধীজী

সভাপতির পদ গ্রহণে অসম্মত হন। কংগ্রেস নেতৃত্বের অন্যান্যদের প্রবল ইচ্ছা ছিল সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলকে এই সম্মানিত আসনে মনোনীত করা হোক। কিন্তু গান্ধীজীর কৌশল রয়েছে কংগ্রেসের বামপন্থীদের দুর্বল করতে হবে। তাই জওহরলালকে বামপন্থী পরিবেশ থেকে বিচ্ছিন্ন করবার জন্য লাহোর-কংগ্রেসের সভাপতি পদের জন্য জওহরলালের নাম প্রস্তাব করলেন। জওহরলাল গান্ধীজীর অনুসারী হলেও, এ যাবৎ নীতিগতভাবে গান্ধীজীর মতের বিরুদ্ধে মত প্রকাশে দ্বিধা করেন নি। ১৯২৭এ ইউরোপ-প্রত্যাগত জওহরলালের গান্ধী-বিরোধিতা আরো তীব্র এবং ধারালো ছিল। কিন্তু জওহরলালকে লাহোর-কংগ্রেসের সভাপতির পদে মনোনীত করে গান্ধীজী যে কুটচাল দিলেন তার ফলে জওহরলাল একদিকে যেমন একান্তভাবে গান্ধী-আশ্রিত হয়ে উঠলেন অপরদিকে তাঁকে কংগ্রেসের বামপন্থীদের নিকট থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেললেন। বামপন্থীদের মধ্যে প্রবল প্রতিক্রিয়া দেখা দিল। তাঁরা ভাবতেও পারেন নি, তাঁদেরই কোনো নেতা গান্ধীজীর অনুগ্রহপুষ্ট হয়ে কংগ্রেসের কোনো সম্মানিত পদে আসীন হবেন। বামপন্থী কর্মপন্থা কংগ্রেসের সম্মুখে উত্থাপনের অধিকার অর্জন করবার পর নিজেদের শক্তিতে বামপন্থীরা ক্ষমতায় আরোহণ করবেন— এটাই ছিল বামপন্থীদের দৃঢ় মনোভাব।

১৯২৯-এর ৩১ মে বড়োলাট লর্ড আরউইন বিলেত থেকে ফিরে এসে ঘোষণা করলেন যে ১৯১৭-র রাজকীয় ঘোষণার স্বাভাবিক সাংবিধানিক পরিণতিই 'ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাস'। সেদিনকার কেন্দ্রীয় অ্যাসেম্বলীর স্বনামখ্যাত প্রেসিডেন্ট বিঠলভাই প্যাটেলের মধ্যস্থতায় লর্ড আরউইন ডিসেম্বরে গান্ধীজী, পণ্ডিত জওহরলালের সঙ্গে সাক্ষাতে সম্মত হন। তার পূর্বে দিল্লীতে সর্ব-দলীয় নেতাদের সম্মেলনে বড়োলাটের ঘোষণার এবং তার সততার স্বীকৃতিরূপে এই নেতৃসম্মেলনের পক্ষ থেকে 'ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাস'-এর ভিত্তিতে সংবিধান রচনার জন্য বড়োলাটের প্রতি সহযোগিতার হস্ত প্রসারিত ক'রে একটি বিবৃতি দেবার সিদ্ধান্ত হয়। এই বিবৃতিতে, প্রথমটায় জওহরলাল স্বাক্ষর দিতে সম্মত হন নি। তিনি সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে এই বিবৃতির বিরোধী একটি যুগ্ম বিবৃতি দিতে আগ্রহী হন। কিন্তু গান্ধীজী জওহরলালকে নেতৃসম্মেলনের বিবৃতিতে স্বাক্ষর দানে সম্মত করান এই যুক্তিতে যে, জওহরলাল লাহোর-কংগ্রেসের প্রস্তাবিত সভাপতি। তাঁর স্বাক্ষর ছাড়া নেতৃসম্মেলনের প্রস্তাবিত বিবৃতিটির গুরুত্ব হ্রাস পেয়ে যাবে। জওহরলাল গান্ধীজীর পক্ষপুটে আশ্রয় নেবার পর

ড. এস. কিচ্‌লু এবং আবদুল বারির সংগে একত্রিত হয়ে সুভাষচন্দ্র বিবৃতি দিয়ে ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাসের এবং কংগ্রেসের গোল টেবিল বৈঠকে অংশগ্রহণের বিরোধিতা করলেন।

কংগ্রেসের উচ্চস্তরের মতভেদ থেকে বংগীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসও রেহাই পেল না। নভেম্বরের নির্বাচনে জে. এম. সেনগুপ্ত ও সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে দুই প্রতিপক্ষের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্ব সামান্য ভোটের ব্যবধানে জয়ী হয়। কংগ্রেসের এই বিভেদ, যুব ও ছাত্রদের মধ্যে বিভেদ ডেকে নিয়ে এল। আসলে কলকাতা-কংগ্রেসেই বিরোধের মূল নিহিত ছিল। সে-সময় সেনগুপ্ত মহাত্মার নীতি সমর্থন করেন এবং সুভাষচন্দ্রকেও সে পথের পথিক করতে চেয়ে ব্যর্থ হন। বাংলাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ দল গান্ধী-নীতিকে সমর্থন করেন নি, তাঁরা সমবেত হয়েছিলেন সুভাষচন্দ্রের সংগামী বামপন্থী নীতির পশ্চাতে।

লাহোর-কংগ্রেসে যা হবার তাই হল। গান্ধীজীই সেখানে মুখ্য, জওহরলালের ভূমিকা, সভাপতি হয়েও গৌণ। গান্ধীজী পরিস্থিতি বিবেচনায় পূর্বেই ঘোষণা করেছেন, ১৯২৯ এর ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে ব্রিটিশ সরকার ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাস মঞ্জুর না করলে ১৯৩০-এর ১ জানুয়ারি থেকে তিনি স্বাধীনতাওয়ালা হয়ে যাবেন··· **independencewallah**। লাহোর কংগ্রেসে তাঁর ইন্ডিপেন্ডেন্সওয়ালা না হয়ে গত্যন্তর ছিল না। তা ছাড়া এই কংগ্রেসে স্বাধীনতার প্রস্তাব করিয়ে নিয়ে কিছু বামপন্থীদেরও দলে টেনে নিলেন।

বড়োলাটের ট্রেনে বোমা নিক্ষেপ সত্ত্বেও লাটসাহেব নিরাপদ ও অক্ষত রয়েছেন সেজন্য প্রবল বিরোধিতা সত্ত্বেও মাত্র সামান্য ভোটে গান্ধীজী লাহোর-কংগ্রেসে বড়োলাটকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করে প্রস্তাব পাস করালেন। কিন্তু স্বাধীনতা-লাভের জন্য সংগ্রামী অভিযানের কোনো পরিকল্পনাও তিনি ভাবেন নি। সেজন্য কোনো কর্মসূচী নিয়েও তিনি প্রস্তুত ছিলেন না। কর্মসূচীর মধ্যে ছিল ব্যবস্থাপক সভাগুলি থেকে কংগ্রেস সদস্যদের পদত্যাগ, আর ছিল অস্পৃশ্যতা-দূরীকরণ, মাদক দ্রব্য বর্জন ইত্যাদি সামাজিক কর্মসূচী। আর-একটি প্রস্তাব ছিল সামাজিক, অর্থনৈতিক প্রভৃতি কর্মসূচী অনুসরণের জন্য প্রয়োজন স্বয়ংসম্পূর্ণ বোর্ড গঠন। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় যেমন **All India Spinner's Association** ইত্যাদি।

এ. আই. সি. সি.-র সভায় কংগ্রেসীরা প্রশ্ন তোলেন স্বয়ংসম্পূর্ণ বোর্ড

গঠন করে দিয়ে কংগ্রেসীদের সেই কাজে যুক্ত করে দিলে কংগ্রেস সদস্যদের করণীয় কি অবশিষ্ট রইল? লাহোরের বিষয়-নির্বাচনী কমিটিতে স্বয়ং-সম্পূর্ণ বোর্ড গঠনের প্রস্তাব অগ্রাহ্য হয়ে গেল।

কিন্তু সুভাষচন্দ্র লাহোর-কংগ্রেসে এক বৈপ্লবিক কর্মসূচী নিয়েএলেন। তিনি দৃঢ়মত-সহকারে প্রস্তাব উত্থাপন করলেন যে কংগ্রেস সংগঠনকে দেশে প্রতি-সরকার বা parallel গভর্মেণ্ট গঠন করতে হবে এবং সেই উদ্দেশ্যে অবিলম্বে শ্রমিক, কৃষক, যুবক ও অন্যান্য নিপীড়িত ভারতীয়দের সংগঠিত করতে হবে। সুভাষচন্দ্র ভারতবর্ষ থেকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের উৎসাদন চেয়ে আসছেন এবং এই উৎসাদন-সংগ্রামের মুখে Parallel Govt. বা প্রতি-সরকার গঠনের অনিবার্যতা বোধ করছেন। ৩১ ডিসেম্বর ১৯২৯ লাহোর-কংগ্রেসে স্বাধীনতার দাবি নিয়ে গান্ধীজী যে প্রস্তাব উত্থাপন করেছিলেন তারই সংশোধনী প্রস্তাবে স্ব্যর্থহীন ভাষায় সুভাষচন্দ্র বললেন: "This Congress resolves on the one hand to carry on a ceaseless campaign in favour of Independence with a view to establishing a parallel Government in India, and on the other hand, launch a campaign of civil disobedience including non-payment of taxes and General Strikes wherever and whenever possible." স্বাধীনতার জন্য অবিরাম অভিযানের মুখে প্রতি-সরকার গঠিত না হলে কী উপায়ে স্বাধীনতা করায়ত্ত হবে সুভাষচন্দ্রের নিকট তা একেবারেই বোধগম্য নয়। লাহোর-কংগ্রেসে দাঁড়িয়ে তাই সুভাষচন্দ্র তাঁর সংশোধনী উত্থাপন করে বলেছেন: 'I do not see how we can arrive at our goal of independence except by setting up in the first instance a parallel Government in this country."

সুভাষচন্দ্রের এই সংশোধনী প্রস্তাবটি ১৯২৯-এর লাহোর-কংগ্রেসে ভোটের জোরে পরাজিত হল বটে কিন্তু সেই সঙ্গে এই প্রস্তাব ভারতীয় বৈপ্লবিক সংগ্রামের এক নূতন পর্যায়ে উত্তরণের পথ দেখিয়ে দিয়ে গেল। কংগ্রেস লাহোরে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাধীনতার প্রস্তাব গ্রহণ করেই নিরস্ত হল। স্বাধীনতার লক্ষ্যপূরণে আগামী বছরের জন্য তাদের কোনো পরিকল্পনা গ্রহণ করতে দেখা গেল না। গান্ধীজী সংগ্রামের কর্মসূচী দিলেন ১৯৩০-এর মার্চে লবণ-সত্যাগ্রহের আহ্বান জানিয়ে। ১৯২৮ সালে কলকাতা-কংগ্রেসে জাতীয় বিপ্লবের যে প্রথম পর্যায় শুরু হয়েছে, অবিসম্বাদিতভাবে

১৯২৯-এর ডিসেম্বরে লাহোর-কংগ্রেসে সুভাষচন্দ্র তাকে জাতীয় বিপ্লবের দ্বিতীয় পর্যায়ে উত্তীর্ণ করে দিয়ে গেলেন।

'Independence and complete severance of the British connection'—'ব্রিটিশের সহিত সকল প্রকার বিচ্ছিন্ন-সম্পর্ক' দাবিতে স্বাধীনতা'র যে বৈপ্লবিক তূর্যধ্বনি কলকাতা-কংগ্রেসের মূলে প্রস্তাবের সংশোধনীরূপে সুভাষচন্দ্র করেছিলেন, লাহোর-কংগ্রেসে সেই বৈপ্লবিক তূর্যধ্বনি তীব্রতর হয়ে উঠল প্রতি-সরকার গঠনের বৈপ্লবিক ঘোষণায়। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে সকল সম্পর্ক ছিন্ন করে পূর্ণ স্বাধীনতার সংগ্রাম ব্রিটিশ সরকারকে কত আতঙ্কগ্রস্ত করে তুলেছিল ১৯২৯ এর সরকারী গোপন দলিলে তার স্বাক্ষর রয়ে গেছে। জাতীয় বিপ্লবকে ত্বরান্বিত করবার জন্য ব্রিটিশসম্পর্ক-ছিন্ন পূর্ণ স্বাধীনতার লক্ষ্য উপস্থাপনে সুভাষচন্দ্র যে বৈপ্লবিক স্পর্ধা দেখিয়েছেন তার মূল্য আদায়ের জন্য সুভাষচন্দ্রকে বন্দী করবার পরিকল্পনা সেদিন থেকেই ব্রিটিশ সরকার রচনা করে চলেছেন। ১৯২৯-এর একটি গোপন দলিলে সে-সময়কার ভারত সরকার বাংলা সরকারকে এ-বিষয়ে নির্দেশ দিয়ে বলেছেন সুভাষচন্দ্র প্রমুখ যাঁরা সকল প্রকার ব্রিটিশসম্পর্কছিন্ন পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি জানাচ্ছেন তাঁদের গ্রেপ্তার করে আদালতে অভিযুক্ত করবার প্রশ্নটি বাংলা সরকার ভেবে দেখছেন কিনা এবং অভিযুক্তদের কঠোরতর শাস্তিবিধানের জন্য ১২৪-ক ধারার পরিবর্তে ১২১-ক ধারায় অভিযুক্ত করবার যৌক্তিকতাও বাংলা সরকারকে বিবেচনা করতে বলেছেন। ভারত সরকারের স্বরাষ্ট্র বিভাগের File No. 179/29-Political ফাইলে দেখা যায় ১৯২৯-এর ৯ জানুয়ারি কেন্দ্রীয় সরকারের স্বরাষ্ট্র দপ্তর বাংলা সরকারের কাছে Express টেলিগ্রাম পাঠিয়ে (Telegram P. To Bengal, Calcutta, No. 109-S, dated 9th January, 1929) জানতে চাইছে ঃ

"Kindly report whether question of prosecuting Subhas Chandra Bose or any other political leader in Bengal in connection with speeches or statements advocating independence and severance of British connection as an immediate objective has been considered by the Bengal Govt.. Govt. of India had not yet reached any conclusion as to the desirabillity of such prosecution if feasible, but as the question raises All-India Issues, they would be glad to have full mate-

rial for considering it, inciuding opinion of Advocate General on any particular speech or statement that might be selected and views of Bengal Govt.. In vew of tendency of courts in Bengal to impose light sentence under Section 124-A, importance of proceeding if possible under Section 121-A will no doubt be borne in mind. .,..

Government of India are inclined to view that if action is taken against one or two active leaders it should, if possible, be in respect of quite individual utterances such as statement to press of Subhas Chandra Bose published in 'Forward' on 30th December, 1928."

ভারত সরকার ১৯২৮ সালেই চিনে নিয়েছেন, ভারতীয় জাতীয় বিপ্লবের বিকল্প নেতা কে? তাই তাঁকে বন্দী করে বিপ্লবের গতিবেগ অবরুদ্ধ করবার সমারোহ শুরু হয়ে যায় সেই ১৯২৮-১৯২৯ সাল থেকে।

সুভাষ-রচনাবলীর দ্বিতীয় খন্ড প্রকাশিত হল। এই খন্ডে ১৯২৯-এ প্রদত্ত সুভাষচন্দ্রের অভিভাষণ, ভাষণ, বিবৃতি ইত্যাদি সন্নিবেশিত করা হয়েছে। প্রথম খন্ড সংকলনে যাঁরা আন্তরিক সাহায্য ও সহযোগিতা করেছেন দ্বিতীয় খন্ড প্রকাশের সময়ও সমভাবে তাঁদের আনুকূল্য পাওয়া গেছে। এবারকার সংকলনে এঁরা ছাড়াও শ্রীদেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় নিরলসভাবে আমাদের সাহায্য করেছেন। বর্তমান খন্ড প্রকাশেও শ্রীপবিত্রকুমার ঘোষ, শ্রীসুবিমল লাহিড়ী, শ্রীবিজয় নাগ ও শ্রীশেখর দাশগুপ্তর ঐকান্তিকতার উল্লেখ না করলে কর্তব্যসম্পাদন অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। এঁদের সকলের কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। এ ছাড়াও যে-সকল শুভানুধ্যায়ী বন্ধু অন্তরাল থেকে আমাদের সহায়তা করেছেন তাঁরাও আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন। দীর্ঘকাল প্রেস-ধর্মঘটের দরুন মুদ্রণের কাজ বন্ধ থাকায় গ্রন্থপ্রকাশে বিলম্ব হওয়ার জন্য আমরা দুঃখিত। তা সত্ত্বেও আমাদের গ্রাহকবৃন্দ যে সহৃদয়তার সংগে অধীর আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করেছেন সেজন্য তাঁদের অভিনন্দন ও কৃতজ্ঞতা জানাই। ইতি

সুনীল দাস

বিষয়-সূচী

ভূমিকা	৫
মুখবন্ধ	৭-১৯]
নিখিল বঙ্গীয় যুব-সম্মেলন	১
ছাত্রসমাজের কর্তব্য	৯
স্বাধীনতা পতাকার গৌরব হানি	১০
স্বরাজের জন্য আত্মত্যাগ করুন	১১
রাষ্ট্র-চেতনার জাগরণ	১৪
দণ্ডিত সম্পাদকের সম্বর্ধনা	১৬
কংগ্রেসের কার্যপদ্ধতি	১৭
ভারতের রাষ্ট্রীয় ভাষা	২৫
প্রতিবাদ	২৬
শ্রমিক-আন্দোলনের আশু প্রয়োজন : দৃঢ় সংঘবদ্ধতা	২৭
পাবনা জেলা যুব-সম্মিলনী	২৮
ছাত্র ও রাজনীতি	৩৭
মহাত্মা গান্ধীর মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখুন	৪০
কর্তব্য পালনে অবহিত হউন	৪১
বিদেশী বস্ত্রযজ্ঞ : একটি বিবরণ	৪১
অন্তরে ও বাহিরে অগ্নি	৪৩
বর্জন আন্দোলন ও বিদেশী বস্ত্রের বহ্নুৎসব	৪৬
বিলাতী বস্ত্র বর্জন	৪৭
বিলাতী বস্ত্র বর্জন ও স্বদেশী গ্রহণ	৪৯
এই অপমান সহিব না	৫১
প্রাণের লক্ষণ	৫৩
স্বাধীনতা সংগ্রামে দেশ গঠন	৫৪
প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সমন্বয়	৫৬
এবারের হোলি রঙের নয়, আগুনের	৬০
একমাত্র অস্ত্র বিলাতী বস্ত্র বর্জন	৬১
একতাবদ্ধ শ্রমিক-আন্দোলন	৬৩

সমিতির লক্ষ্য	৬৫
অভিভাষণ	৭৭
রংপুর সম্মিলনের সাফল্য	১৩৩
জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকান্ডের স্মৃতি	১০৪
বীর পূজা	১০৫
নবনির্বাচিত মেয়র	১০৬
জালিয়ানওয়ালাবাগের স্মৃতি	১০৮
কাজের কৈফিয়ত	১০৯
শ্রীহট্ট জেলা ছাত্র-সম্মিলনী	১২৩
বাংলার সাধারণ নির্বাচন	১৩৪
স্বাধীন হওয়াই প্রথম ও প্রধান কর্তব্য	১৩৫
আদর্শবাদই যুব-আন্দোলনের প্রাণ	১৩৮
স্বরাজ-সাধনায় সর্বত্যাগী দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন	১৪৪
বৈদ্যশাস্ত্রপীঠে উৎসব	১৪৫
শ্রমিক-ধর্মঘট	১৪৫
সতীন সেনের অনশনব্রত ভঙ্গের জন্য অনুরোধ	১৪৬
আগামী বৎসরের জন্য প্রস্তুত হও	১৪৭
বরিশাল জেলা রাষ্ট্রীয় সম্মেলন	১৫৫
হুগলী জেলা ছাত্র-সম্মেলন	১৬৬
জামশেদপুর টিনপ্লেট কারখানায় ধর্মঘট	১৭৫
একগুঁয়ে বর্মা অয়েল কোম্পানি	১৭৬
আবেদন : কর্মীদের পক্ষে মামলা চালানো	১৭৭
রেল শ্রমিকদের আন্দোলন	১৭৮
প্রকৃত আদর্শ কী	১৮১
শ্রমিকদের অভিযোগ	১৮৬
গোলমুড়িতে সম্পূর্ণ অচলাবস্থা ১-২	১৮৮-৮৯
মালিকপক্ষের ঔদাসীন্য	১৯০
জাতীয় শোক-দিবস	১৯২
আবেদন : ভারতের শ্রেষ্ঠ শহীদ	১৯২
সতীন্দ্রনাথ সেন : ভারতের প্রিয় বীর	১৯৩

বিবৃতি : সতীন্দ্রনাথ সেন	১৯৪
অনশনব্রতিনীর নিকট পত্র	১৯৫
যৌবনের উচ্ছ্বাসই সৃষ্টির তরঙ্গ	১৯৬
মুক্তি : সকল প্রকার বন্ধন হইতে মুক্তি	২০৫
জাতীয় পতাকা উত্তোলন	২১৭
বাংলায় অশান্তি	২১৭
নিখিল বঙ্গ সতীন সেন দিবস ১-২	২১৯-২০
অস্পষ্ট অভিযোগ	২২২
শর্তসাপেক্ষ অনশন ধর্মঘট ভঙ্গ করা	২২৬
একজন বীর	২২৮
বিদ্রোহের ঝড়	২২৯
স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করো	২৪১
তরুণ পাঞ্জাবের প্রতি	২৪১
হিন্দুস্থানী সেবাদল	২৪২
পাঞ্জাব	২৪৩
ভারত চায় স্বাধীন হইতে	২৪৬
স্বাধীনতার উষালগ্ন সমাগত	২৪৮
শ্রমিক-আন্দোলন	২৪৮
যতীন্দ্রনাথ দাস : জীবন ও মৃত্যু	২৫১
ওয়ার্কিং কমিটি হইতে পদত্যাগ	২৫৪
পূর্ণ স্বাধীনতা	২৫৪
শ্রমিক-আন্দোলন	২৫৬
মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী	২৫৭
মধ্যপ্রদেশ যুব-সম্মেলন	২৫৮
মধ্যপ্রদেশ ও বেরার ছাত্র-সম্মেলন	২৬৬
ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস : দক্ষিণপন্থীদের প্রতি আবেদন	২৭৬
ছাত্র-আন্দোলন : রাজনীতির শিকার	২৮০
মেদিনীপুর জেলা যুব-সম্মেলন	২৮৮
লাহোর-কংগ্রেসে ভাষণ : প্রতি-সরকার গঠনের প্রস্তাব	৩০১

সংযোজন : বরস্টাল স্কুল বিল ৩১৩
তথ্য ও উল্লেখ-পঞ্জী ৩২২
নির্দেশিকা ৩৩৭

চিত্র-সূচী

১. ১৯২৯। শ্রীসোমেন্দ্রনাথ বসুর সৌজন্যে তাঁর ব্যক্তিগত সংগ্রহ থেকে প্রাপ্ত।

২. শহীদ সুখেন্দু বিকাশ দত্ত-র মরদেহের পাশে। সুভাষচন্দ্রের (দাঁড়ানো প্রথম সারি, বাঁ দিক থেকে চতুর্থ) সঙ্গে আছেন, নলিনীরঞ্জন সরকার, কিরণশঙ্কর রায়, অম্বিকা চক্রবর্তী, ভূপেন্দ্রকুমার দত্ত, শৈলেন ঘোষাল, হরিকুমার চক্রবর্তী, ভূপতি মজুমদার, সুরেন্দ্রমোহন ঘোষ, সতীশ চক্রবর্তী প্রমুখ। উপবিষ্টদের মধ্যে বাঁদিক থেকে প্রথম ও তৃতীয়—পরবর্তীকালের চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের সংগ্রামে নিহত শহীদ টেগ্‌রা ও অর্ধেন্দু দস্তিদার। কারমাইকেল মেডিকেল কলেজে গৃহীত আলোক-চিত্র ২৮ অক্টোবর ১৯২৯। শ্রীশিবব্রত ঘোষের সৌজন্যে।

৩. প্রতিলিপি। মুর্শিদাবাদ জেলা কংগ্রেসের সভাপতি ব্রজভূষণ গুপ্তকে লিখিত। শ্রীশশাঙ্কশেখর সান্যালের সৌজন্যে।

সুভাষ-রচনাবলী

ডিসেম্বর ১৯২৮-১৯২৯

নিখিল বঙ্গীয় যুব-সম্মেলন

১৭ ডিসেম্বর ১৯২৮ কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট হল-এ নিখিলবঙ্গীয় যুব-সম্মেলনে সভাপতির অভিভাষণ।

হে আমার তরুণ ভাই ও ভগিনী সকল! আপনারা আমাকে এই তরুণ পরিষদের সভাপতি পদে বরণ করিয়া যে প্রীতির নিদর্শন দেখাইয়াছেন তাহার জন্য আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। আজ পৃথিবীর একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত তরুণ সম্প্রদায়ের মধ্যে জাগরণের সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। এই বিশ্বব্যাপী জাগরণের প্রভাবে আমরাও আজ এখানে সমবেত হইয়া জীবনের সমস্যা সমাধানে ব্রতী হইয়াছি।

প্রায় আড়াই বৎসর পরে কারাপ্রাচীরের বাহিরে যখন পদার্পণ করি, তখন দেশের অবস্থা নিরীক্ষণ করিয়া সর্বপ্রথমে এই কথাই মনে হইয়াছিল যে কতকগুলি দুর্ঘটনা ও দুর্দৈববশত আমরা যেন আপাতত বড়ো কথা ভাবিবার এবং দূরের বস্তু দেখিবার ক্ষমতা হারাইয়াছি। ইহার ফলে আমাদের সমাজে নীচ চিন্তা, ক্ষুদ্র স্বার্থ ও পরস্পরের মধ্যে দলাদলি দেখা দিয়াছে, আমরা অসত্যকে সত্য মনে করিয়া, আসলকে ছাড়িয়া ছায়ার পশ্চাতে ছুটিয়াছি। কিন্তু সুখের বিষয়, আমাদের এই সাময়িক মোহ ভাঙিতেছে; আমরা আমাদের সহজ দৃষ্টি ফিরিয়া পাইতেছি। তরুণের হৃদয়ে আবার আত্মপ্রত্যয় জন্মিতেছে। সে বুঝিতেছে— জীবনে তাহার উপর কত বড়ো দায়িত্ব ন্যস্ত হইয়াছে, সে উপলব্ধি করিতেছে যে ভবিষ্যৎ সমাজ গড়িয়া তোলার ভার তাহাকেই গ্রহণ করিতে হইবে। শুধু তাহাই নয়, আমাদের তরুণ সমাজ আজ নিজের অন্তরে অনন্ত শক্তির সন্ধান পাইতেছে। সর্বদেশে সর্বকালে যে মৃত্যুঞ্জয় তরুণ শক্তি মুক্তির ইতিহাস রচনা করিয়াছে, আমাদের দেশে আজ সেই তরুণ-শক্তিই নিজের অস্থিদান করিয়া বজ্র নির্মাণের সাধনায় প্রবৃত্ত হইতেছে।

আমাদের জাতীয় সমস্যা বিষয়ে আমার বক্তব্য অনেক আছে। একটি অভিভাষণে বা বক্তৃতায় তাহা ব্যক্ত করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়— তাই আমি সে চেষ্টাও করিব না। বিস্তৃত আলোচনায় প্রবৃত্ত না হইয়া আমি মূল সমস্যা সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলিয়া ক্ষান্ত হইব।

পৃথিবীর ইতিহাসে অনেক সভ্যতার অভ্যুত্থান, ক্রমোন্নতি ও পতন হইয়াছে। আমরাও একদিন স্বাধীন ছিলাম। ধর্মে কর্মে, কাব্যে সাহিত্যে, শিল্পে বাণিজ্যে,

যুদ্ধবিগ্রহে—ভারতবাসীও একদিন পৃথিবীর মধ্যে শীর্ষস্থান অধিকার করিত। কালের চক্রবৎ পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে আমরা সে প্রাচীন গৌরব হারাইয়াছি। আজ আমরা শুধু পরাধীন তাহা নয়— বিদেশী সভ্যতার সম্মোহন-বাণের আঘাতে আমরা আমাদের প্রাণধর্ম হারাইতে বসিয়াছি। তবে আনন্দের বিষয় এই যে অজ্ঞান-নিশা প্রায় কাটিয়া গিয়াছে, আমরা জাতীয় চৈতন্য ফিরিয়া পাইতেছি।

সকল জাতি বা সকল সভ্যতার যে পতনের পর পুনরভ্যুত্থান ঘটিয়া থাকে— এ কথা বলা যায় না। ভগবানের আশীর্বাদে আমাদের দেশে কিন্তু পতনের পর পুনরভ্যুত্থান আরম্ভ হইয়াছে। আমাদের এই জাতীয় আন্দোলন বাহ্যিক চাঞ্চল্য-মাত্র নয়— ইহা জাতীয় আত্মার জাগরণেরও অভিব্যক্তি। আমার কথা যে সত্য তার প্রমাণ এই যে আমাদের দেশে নব জাগরণের সঙ্গে সঙ্গে জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে নূতন সৃষ্টি আরম্ভ হইয়াছে। সৃষ্টিই জীবনের লক্ষণ ; কাব্যে, সাহিত্যে, শিল্পে বাণিজ্যে, ধর্মে কর্মে, কলা বিজ্ঞানে— নূতন সৃষ্টির যে পরিচয় ভারতবাসী দিতেছে— তাহা হইতে সপ্রমাণ হইতেছে যে ভারতের আত্মা জাগিয়াছে, ভারতীয় সভ্যতার নূতন অধ্যায় আমাদের চোখের সামনেই রচিত হইতেছে।

বৈজ্ঞানিকেরা বলেন যে কোনো সভ্যতার পতন হইলে সেই জাতির সৃষ্টি-শক্তি লোপ পায়, জাতির চিন্তাশক্তি ও কর্মপ্রচেষ্টা গতানুগতিক পন্থা অনুসরণ করিতে থাকে, ব্যক্তি ও জাতির জীবনে adventure ও enterprise-এর স্পৃহা হ্রাস পায়, কতকগুলি বাঁধা বুলির রোমন্থনের দ্বারা জাতি আত্মপ্রসাদ লাভ করে। এই অবস্থার পরিবর্তন ঘটাইতে হইলে চিন্তা-রাজ্যে বড়ো রকমের ওলট-পালটের প্রয়োজন এবং জৈব-রাজ্যে (biological plane) রক্ত-মিশ্রণ আবশ্যক। আমি বৈজ্ঞানিক নহি, সুতরাং আমার পক্ষে জোর করিয়া কিছু বলা সম্ভব নয়। তবুও আমার মনে হয় যে নূতন সভ্যতা-সৃষ্টির মূলে খানিকটা রক্ত-সংমিশ্রণের আবশ্যকতা আছে। তবে ভারতের বাহিরের জাতির সহিত ভারত-বাসীর রক্ত-সংমিশ্রণে প্রয়োজনীয়তা নাই। এরূপ সংমিশ্রণ যদি বেশি হয় তবে তার ফল অহিতকর হওয়ার আশঙ্কাই অধিক। ইহার দৃষ্টান্ত ব্রহ্মদেশ। কিন্তু ভারতবর্ষের মধ্যে— বিশেষত হিন্দু সমাজের মধ্যে— যে-সব জাতি আছে— তাহাদের মধ্যে খানিকটা রক্ত-সংমিশ্রণ হইলে ফল যে ভালো হইতে পারে তাহা মনে করিবার যথেষ্ট কারণ আছে।

আমাদের জাতীয় অধঃপাতের অনেক কারণ আছে, তন্মধ্যে একটা প্রধান কারণ এই যে, আমাদের দেশে ব্যক্তির ও জাতির জীবনে প্রেরণা বা initiative হ্রাস পাইয়াছে। আমরা বাধ্য না হইলে এবং কশাঘাত না খাইলে সহজে কিছু করিতে চাই না। বর্তমানকে উপেক্ষা করিয়া ভবিষ্যতের পানে তাকাইয়া যে অনেক সময়ে অনেক কাজ করা দরকার এবং বাস্তবের দৈন্যকে অগ্রাহ্য করিয়া আদর্শের প্রেরণায় জীবনটাকে অনেক সময়ে যে হাসিতে হাসিতে বিলাইয়া দেওয়া প্রয়োজন— এ কথা আমরা কার্যত স্বীকার করিতে চাই না। এইজন্য প্রেরণা বা initiative-এর অভাবের দরুন, ব্যক্তি ও জাতির ইচ্ছাশক্তি ক্রমশ ক্ষীণ ও নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছে। ব্যক্তির ও জাতির জীবনে ইচ্ছাশক্তি পুনরায় জাগাইতে না পারিলে মহৎ কিছু করা আমাদের পক্ষে সম্ভব হইবে না। শুধু আদর্শের প্রেরণাতেই ইচ্ছাশক্তি জাগরিত হয়। আমরা আদর্শ ভুলিয়াছি বলিয়াই আমাদের ইচ্ছাশক্তি আজ এত ক্ষীণ। বর্তমানের ভাব-দৈন্য বিদূরিত করিয়া নিজ নিজ জীবনে আদর্শের প্রতিষ্ঠা না করিতে পারিলে আমাদের প্রেরণাশক্তি জাগিবে না— এবং প্রেরণাশক্তি না জাগিলে চিন্তাশক্তি ও কর্মপ্রচেষ্টা পুনরুজ্জীবিত হইবে না।

সমাজের পুনর্গঠনের জন্য আজকাল পাশ্চাত্যদেশে নানা প্রকার মত ও কর্মপ্রণালীর প্রচলন দেখিতে পাওয়া যায়, যথা— Socialism, State Socialism, Guild Socialism, Syndicalism, Philosophical Anarchism, Bolshevism, Fascism. Parliamentary Democracy, Aristocracy. Absolute Monarchy, Limited Monarchy, Dictatorship ইত্যাদি। এই-সব মতবাদের বিষয়ে আমি সাধারণভাবে দুই-একটি কথা বলিতে চাই। প্রথমত, সকল মতের ভিতর অল্পবিস্তর সত্য আছে, কিন্তু এই ক্রমোন্নতিশীল জগতে কোনো কোনো মতকে চরম সত্য বা চরম সিদ্ধান্ত বলিয়া গ্রহণ করা বোধ হয় যুক্তিসংগত কাজ নয়; দ্বিতীয়ত, এ কথা ভুলিলে চলিবে না যে কোনো দেশের কোনো প্রতিষ্ঠানকে সমূলে উৎপাটন করিয়া আনিয়া বলপূর্বক অন্যদেশে রোপণ করিলে সুফল না ফলিতেও পারে। প্রত্যেক জাতীয় প্রতিষ্ঠানের উৎপত্তি হয় সেই দেশের ইতিহাসের ধারা, ভাব ও আদর্শ এবং নিত্যনৈমিত্তিক জীবনের প্রয়োজন হইতে। সুতরাং আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে, কোনো প্রতিষ্ঠান গড়িতে হইলে ইতিহাসের ধারা, পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও বর্তমানের আবহাওয়া অগ্রাহ্য করা সম্ভব বা সমীচীন নয়।

আপনারা জানেন যে, Marxism-এর তরঙ্গ এ দেশে আসিয়া পৌঁছিয়াছে; এই তরঙ্গের আঘাতে কেহ কেহ চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছেন। Karl Marx-এর মতবাদ পূর্ণরূপে গ্রহণ করিলে আমাদের দেশ যে সুখসমৃদ্ধিতে ভরিয়া উঠিবে এ কথা অনেকে বিশ্বাস করেন এবং দৃষ্টান্ত স্বরূপ তাঁহারা রাশিয়ার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করেন। কিন্তু আপনারা হয়তো জানেন যে রাশিয়াতে যে Bolshevism প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে— তাহার সহিত Marxian Socialism-এর মিল যতটা আছে— পার্থক্য তদপেক্ষা কম নয়। রাশিয়া Marxian মতবাদ গ্রহণ করিবার সময়ে প্রাচীন ইতিহাসের ধারা, জাতীয় আদর্শ, বর্তমানের আবহাওয়া এবং নিত্যনৈমিত্তিক জীবনের প্রয়োজনের কথা ভুলিয়া যায় নাই। আজ যদি Karl Marx জীবিত থাকিতেন, তাহা হইলে তিনি রাশিয়ার বর্তমান অবস্থা দেখিয়া কতটা সুখী হইতেন সে বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে— কারণ আমার মনে হয় যে Karl Marx বিশ্বাস করিতেন যে তাঁহার সামাজিক আদর্শ একই ভাবে, রূপান্তরিত না হইয়া, সকল দেশে প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত। এ-সব কথার অবতারণা করিবার উদ্দেশ্য এই যে, আমি স্পষ্ট করিয়া বলিতে চাই, আমি অন্য দেশের আদর্শ বা প্রতিষ্ঠান অন্ধভাবে অনুকরণ করার বিরোধী।

আর-একটি কথার উল্লেখ না করিলে আসল কথাই বলা হইবে না। পরাধীন দেশে যদি কোনো 'ism'— সর্বান্তঃকরণে গ্রহণ করিতে হয়, তবে তাহা nationalism। যতদিন আমরা স্বাধীন না হইতেছি ততদিন আমরা সামাজিক ও অর্থনৈতিক (Social and Economic) পুনর্গঠনের অবসর ও সুযোগ পাইব না, এ কথা ধ্রুব সত্য। সুতরাং সর্বাগ্রে আমাদের সমবেত চেষ্টায় স্বাধীনতালাভ করিতে হইবে। দেশ, ব্যক্তিবিশেষ বা সম্প্রদায় বিশেষের সম্পত্তি নয়— এবং কী হিন্দু, কী মুসলমান, কী শ্রমিক, কী ধনিক— কোনো সম্প্রদায় বিশেষের পক্ষে, সকলের সহযোগ ব্যতীত, স্বরাজলাভ করা সম্ভব নয়। কিন্তু তাহা হইলেও, সকল ব্যক্তির ও সকল সম্প্রদায়ের ন্যায্য দাবি আমাদিগকে স্বীকার করিতেই হইবে; কারণ সত্য ও ন্যায়ের উপর আমাদের জাতীয়তা যদি প্রতিষ্ঠিত না হয় তবে সে জাতীয়তা একদিনও টিকিতে পারে না। এইজন্য আমি সংঘবদ্ধ শ্রমিক বা কৃষক সম্প্রদায়কে স্বরাজ আন্দোলনের পরিপন্থী তো মনে করিই না— বরং আমি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিব যে, তাহাদের সহযোগ ব্যতীত স্বরাজ-লাভের আশা দুরাশা মাত্র— এবং তাহারা

যে পর্যন্ত সংঘবদ্ধ না হইতেছে ততদিন তাহাদিগের পক্ষে স্বরাজ আন্দোলনে অথবা সামাজিক ও অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের কাজে যোগদান করা সম্ভবপর হইবে না। এ কথা স্বীকার করিবার উপায় নাই যে সকল দেশে, বিশেষত আমাদের এই অভাগা দেশে, মধ্যবিত্ত শিক্ষিত সম্প্রদায়ই দেশের মেরুদন্ড-স্বরূপ। তাহারা যে শুধু মুক্তিপথের অগ্রদূত তাহা নয়— গণ-আন্দোলনের অগ্রদূত। যতদিন পর্যন্ত জনসাধারণের মধ্যে প্রকৃত জাগরণ না আসিতেছে, ততদিন পর্যন্ত শিক্ষিত সম্প্রদায়কেই গণ-আন্দোলনের অগ্রদূত হইতে হইবে। এতদ্ব্যতীত যাবতীয় গঠন-মূলক কাজে এই শিক্ষিত সম্প্রদায়কে অগ্রণী হইয়া পথপ্রদর্শকের কাজ করিতে হইবে। এই সকল কারণে আমি মধ্যবিত্ত শিক্ষিত-সম্প্রদায়ের অভাব-অভিযোগের বিষয়ে দুই-একটি কথা বলিতে ইচ্ছা করি।

প্রথমত তাহাদের ভাবের অভাবের কথা। আমাদের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে যে আদর্শপ্রেম ও আদর্শনিষ্ঠার অভাব আছে সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই। এই ভাব-দৈন্যের কারণ কি? কারণ এই যে, যাঁহারা আমাদিগকে শিক্ষা দেন তাঁহারা শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে আদর্শের বীজ আমাদের হৃদয়ে বপন করেন না। আমাদের ভাব-দৈন্যের জন্য আমি আমাদের শিক্ষিত সম্প্রদায় ও বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষদিগকে প্রধানত দায়ী করি। আমি জিজ্ঞাসা করি— আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের আঙিনায় কি মুক্তির বায়ু খেলিতে পায়? যাহারা ঐ আঙিনায় জ্ঞানাহরণের জন্য বিচরণ করে তাহারা কি মুক্তির আদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়? আপনারা সকলে জানেন যে অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীতে যে পূত আন্দোলন ফরাসী দেশের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত জাগরণের বন্যা আনিয়াছিল সেই আন্দোলনের অধিনায়ক ছিলেন— ফরাসী দেশের অধ্যাপক সম্প্রদায়। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের দিকে তাকাইলেই বুঝিতে পারা যায় আমাদের জাতীয় দুর্দশা কতদূর পৌঁছিয়াছে। কিন্তু আমাদের হতাশ হইলে চলিবে না। অধ্যাপক সম্প্রদায় যদি নিজেদের কর্তব্য না করেন— তাঁহারা যদি নিজ নিজ জীবনের আদর্শ ও শিক্ষার প্রভাবে মানুষ সৃষ্টি করিতে অক্ষম হন— তাহা হইলে ছাত্রদিগকে নিজের চেষ্টা ও সাধনার দ্বারা মানুষ হইতে হইবে।

ভাবের দৈন্যের পরই অভাবের কথা মনে পড়ে। শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে বেকার সমস্যা যে কিরূপ গুরুতর হইয়া দাঁড়াইয়াছে তাহা নানা কারণে

আমার জানিবার সুযোগ হইয়াছে। এ কথা বোধ হয় অনেকে জানেন না যে আমাদের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের আর্থিক অবস্থা আমাদের কৃষক সম্প্রদায়ের আর্থিক অবস্থার চেয়ে অনেক বিষয়ে খারাপ। চাকুরির দ্বারা যে তাহাদের অভাব মিটিতে পারে এ আশা নাই, কারণ শিক্ষিত যুবকের সংখ্যা অপেক্ষা চাকুরির সংখ্যা অনেক কম। সুতরাং ইহা অনিবার্য যে আগামী ত্রিশ-চল্লিশ বৎসরে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেককেই অনাহারে মরিতে হইবে। কিন্তু আজ হইতে আমরা যদি চাকুরির আশা পরিত্যাগ করিয়া ব্যবসা-বাণিজ্যে মন দিই, তাহা হইলে আমরা মরিয়াও আমাদের সন্তান-সন্ততিদের বাঁচিবার উপায় করিয়া যাইতে পারিব। কিন্তু এখনো যদি আমরা চাকুরির আশায় ঘুরিতে থাকি তাহা হইলে আমরা তো মরিবই— সঙ্গে সঙ্গে আমরা আমাদের সন্তান-সন্ততিদের মরণের আয়োজন করিয়া যাইব। আমাদের মারোয়াড়ী ভাইরা চল্লিশ-পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে যেরূপ নিঃসম্বল ও কপর্দকহীন অবস্থায় ব্যবসায়-ক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়াছিলেন আমাদিগকেও ঠিক সেইভাবে ও সেই অবস্থায় ব্যবসায়-ক্ষেত্রে প্রবেশ করিতে হইবে এবং নিজেদের অধ্যবসায়, চরিত্রবল ও কষ্টসহিষ্ণুতার দ্বারা ব্যবসায়-ক্ষেত্রে কৃতিত্ব লাভ করিতে হইবে। 'নান্য পন্থা বিদ্যতে অয়নায়।'

আমাদের বর্তমান কর্মপদ্ধতি সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা না করিয়া আমি মাত্র কয়েকটি কথা বলিব। আমাদের এখন দুই দিকে কাজ করিতে হইবে। প্রথমত, ভাবের দৈন্য ঘুচাইবার জন্য নূতন ভাবের ধারা প্রবাহিত করিতে হইবে। দ্বিতীয়ত, দেশের মধ্যে যতগুলি যুবক-সমিতি ও যুবকদের আন্দোলন আছে বা ভবিষ্যতে হইতে পারে সে সকলের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করিতে হইবে।

যাঁহারা বিভিন্ন ক্ষেত্রে সৃষ্টির কার্যে ব্যাপৃত আছেন তাঁহাদের মধ্যে ভাবের আদান-প্রদান যাহাতে হয় তাহার জন্য একটা League of Young Intellectuals গঠন করা আবশ্যক। কবি, সাহিত্যিক, শিল্পী, বণিক, বৈজ্ঞানিক এবং সকল ক্ষেত্রের কর্মী এই League-এর সভ্য হইবেন। এক কথায় বলিতে গেলে, যাহারা 'best brain of the entire nation' তাঁহাদের একত্র করিতে হইবে— তাঁহাদের মধ্যে ভাবের আদান-প্রদানের সুযোগ করিয়া দিতে হইবে এবং তাঁহারা সকলে যাহাতে একই লক্ষ্য সম্মুখে রাখিয়া জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সৃষ্টিকর্মে আত্মনিয়োগ করিয়া সমগ্র জাতিকে সবল, সুস্থ ও কৃতী করিয়া তোলেন তাহার আয়োজন করিতে হইবে।

দ্বিতীয়ত, যুবকদের কর্মপ্রচেষ্টা যাহাতে ভিন্নমুখী ও পরস্পর-বিরোধী না হয় এবং যাহাতে সকল চেষ্টা সংহত ও সংঘবদ্ধ হইয়া একই আদর্শের দিকে পরিচালিত হয়, তাহার জন্য কেন্দ্রীয় সমিতির আবশ্যকতা। এই উদ্দেশ্য লইয়া কয়েক বৎসর পূর্বে নিখিল বঙ্গীয় যুবক সমিতি গঠিত হইয়াছিল। নানা কারণে ঐ সমিতির কার্যকলাপ আশানুরূপ ফল প্রদান করে নাই। কিন্তু আমাদের মনে হয় যে, আজ ঐ নিখিল বঙ্গীয় যুবক সমিতিকে পুনরুজ্জীবিত করিবার সময় আসিয়াছে। কোনো নূতন কেন্দ্রীয় সমিতি গঠন না করিয়া আপনারা যদি ঐ পুরাতন নিখিল বঙ্গীয় যুবক সমিতির মধ্যে প্রবেশ করিয়া আবার প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করিতে পারেন তাহা হইলে শীঘ্রই সুফল ফলিবে, এ কথা আমি বিশ্বাস করি।

আমি পূর্বেই বলিয়াছি যে বিস্তৃত কর্মতালিকা দিবার চেষ্টা আমি করিব না। কি আদর্শ লইয়া এবং কি প্রণালীতে কাজ করা আবশ্যক সে বিষয়ে কিছু বলিলেই আমার কর্তব্য সম্পাদিত হইবে। বাস্তবের দিক হইতে দেখিলে আমাদের অভাব প্রধানত তিন প্রকার— ১. অন্নাদির অভাব, ২. বস্ত্রাদির অভাব ও ৩. শিক্ষাদির অভাব। আমরা অন্ন চাই, বস্ত্র চাই, শিক্ষা চাই। কিন্তু মূল সমস্যার দিকে দেখিলে প্রতীয়মান হইবে যে আমাদের জাতীয় দৈন্যের প্রধান কারণ— ইচ্ছাশক্তি ও প্রেরণার অভাব। সুতরাং যদি আমাদের National Will বা ইচ্ছাশক্তি জাগরিত না হয় তাহা হইলে শুধু অন্ন, বস্ত্র ও শিক্ষার ব্যবস্থা করিলেই জাতীয় সমস্যার সমাধান হইবে না। Benevolent Despot-এর মতে সরকার বাহাদুর অথবা Local Body-রা যদি জনসাধারণের অন্ন, বস্ত্র ও শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়া দেন তাহা হইলেও আমরা মানুষ হইতে পারিব না। সকলের সাহায্য গ্রহণ করিতে দোষ নাই কিন্তু প্রধানত নিজেদের সমবেত চেষ্টায় আমাদিগকে অন্ন, বস্ত্র ও শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে। যদি আমরা সমবায় প্রণালীতে এই কাজ করিয়া যাইতে পারি তাহা হইলে আমাদের জাতীয় ইচ্ছাশক্তি ফিরিয়া আসিবে— এবং স্বরাজ-স্বাধীনতা অনায়াসে লভ্য হইয়া পড়িবে।

পল্লী-সংস্কারের কথা চিন্তা করিলে এই কথাই মনে হয়। আমাদের সর্বদা লক্ষ্য রাখা-উচিত যাহাতে গ্রামবাসীরা প্রধানত নিজেদের চেষ্টায় অন্ন, বস্ত্র, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যোন্নতির ব্যবস্থা করেন। প্রথম অবস্থায় গ্রামের বাহির হইতে সাহায্য পাঠানো দরকার হইতে পারে কিন্তু শেষ পর্যন্ত যদি পল্লী-

বাসীরা স্বাবলম্বী ও আত্মনির্ভরশীল হইতে না পারেন তাহা হইলে সে পল্লী-সংস্কারের কোনো সার্থকতা হইবে না। আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে সাধারণ গ্রামবাসীর মধ্যে পরমুখাপেক্ষিতার ভাবই প্রবল সুতরাং স্বাবলম্বনের ভাব জাগাইতে হইলে বহুদিন ধরিয়া অক্লান্ত পরিশ্রম করিতে হইবে।

আজকাল বন্যা ও দুর্ভিক্ষ নিত্য ঘটনায় পরিণত হইয়াছে। বন্যা ও দুর্ভিক্ষের সময়ে অনেক সমিতি সাধ্যমতো এই সকল অভাব মোচনের চেষ্টা করেন এবং ধনিক সম্প্রদায়ও অনেক ভাবে সাহায্য করিয়া থাকেন। এ সকল সৎপ্রচেষ্টাকে উৎসাহিত করা উচিত কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বন্যা ও দুর্ভিক্ষের মূল কারণ কি, সে বিষয়ে গবেষণা আরম্ভ করা প্রয়োজন। গবেষণা আরম্ভ করিলে একদিনেই যে আমরা একটা মীমাংসায় উপনীত হইব সে আশা আমি রাখি না। কিন্তু তথাপি অবিলম্বে এ বিষয়ে গবেষণা শুরু করা দরকার। আমি সকল চিন্তাশীল যুবককে এবং আমাদের বৈজ্ঞানিক সম্প্রদায়কে এ বিষয়ে মনোনিবেশ করিতে অনুরোধ করি।

আমাদের সমাজের মধ্যে যে-সব অত্যাচার ও অনাচার ধর্ম ও লোকাচারের নামে চলিতেছে সে বিষয়েও যুবকদের একটা কর্তব্য আছে। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয় অনেক সময় বলেন যে, আমাদের যুবকেরা বিবাহের সময়ে হঠাৎ বাপ-মার বাধ্য হইয়া পড়ে। আমার নিজের মনে হয় যে শুধু বিবাহ কেন— আমরা অনেক সময়ে সুবিধামত বাপ-মার বাধ্য হইয়া পড়ি। যুবকেরা যে বাপ-মা বা গুরুজনের নামে মধ্যে মধ্যে অন্যায় কাজ করিয়া থাকেন— এক কথা অস্বীকার করিলে সত্যের অপলাপ করা হইবে। আমি বিশ্বাস করি যে আমাদের যুবকেরা যদি সংঘবদ্ধ হইয়া সামাজিক অত্যাচার ও দেশের অনাচার নিবারণের জন্য বদ্ধপরিকর হন, তাহা হইলে অনতিবিলম্বে আমাদের সমাজে যুগান্তর উপস্থিত হইবে।

আমার ভাই ও ভগিনী সকল! আজিকার মতো আমার বক্তব্য শেষ করিতে চাই। মনে রাখিবেন যে আমাদিগকে সমবেত চেষ্টায় ভারতবর্ষে নূতন জাতি সৃষ্টি করিতে হইবে। পাশ্চাত্য সভ্যতা আমাদের সমাজে ওতপ্রোতভাবে প্রবেশ করিয়া আমাদিগকে ধনে প্রাণে মারিতে চেষ্টা করিতেছে। আমাদের ব্যবসায়-বাণিজ্য, ধর্ম-কর্ম ও শিল্প-কলা মরিতে বসিয়াছে। তাই জীবনের সকল ক্ষেত্রে আবার মৃতসঞ্জীবনী সুধা ঢালিতে হইবে। এ সুধা কে আহরণ করিয়া আনিবে, জীবন না দিলে জীবন পাওয়া যায় না। আদর্শের নিকট যে ব্যক্তি

সম্পূর্ণভাবে নিজেকে বলিদান দিয়াছে— শুধু সেই ব্যক্তিই অমৃতের সন্ধান পাইতে পারে। আমরা সকলেই অমৃতের পুত্র, কিন্তু, আমরা ক্ষুদ্র অহমিকার দ্বারা পরিবৃত বলিয়া অন্তর্নিহিত অমৃত-সিন্ধুর সন্ধান পাই না। আমি আপনাদিগকে আহ্বান করিতেছি, আসুন— আপনারা আসুন— মায়ের মন্দিরে গিয়া আমরা সকলে দীক্ষিত হই। আসুন, আমরা সকলে এক বাক্যে এই প্রতিজ্ঞা করি যে, দেশ সেবাই আমাদের জীবনের একমাত্র ব্রত হইবে— দেশমাতৃকার চরণে আমরা আমাদের সর্বস্ব বলি দিব এবং মরণের ভিতর দিয়া অমৃত লাভ করিব। তাহা যদি আমরা করিতে পারি তবে নিশ্চয়ই জানিবেন—

"ভারত আবার জগৎ-সভায়
শ্রেষ্ঠ আসন লবে।"

ছাত্রসমাজের কর্তব্য

৩ জানুয়ারি ১৯২৯ আর্য সমাজ হলে যুব-ছাত্রসভায় প্রদত্ত ভাষণ।

যুবকদের বিশেষত ছাত্রদিগের এমন তীব্র আন্দোলন করা প্রয়োজন যাহাতে দেশের লোকের মানসিক ধারণা সমূহের পরিবর্তন হয় এবং তাহারা পরাধীনতার জ্বালা মর্মে মর্মে অনুভব করিতে পারে। ভাবে ও আদর্শে স্বাধীন ভারত এক নূতন দর্শনের সৃষ্টি করিবে। লোকের ধারণাকে বদলাইতে গেলে যে প্রচেষ্টার প্রয়োজন, তাহাতে প্রতিষ্ঠিত মতের সহিত বিবাদ তো বাধিবেই। কিন্তু সর্বাগ্রে সমাজকে পুনরায় গড়িয়া তুলিতে হইবে। যাঁহারা দেশের মুক্তির জন্য লড়িতেছেন, তাঁহাদিগকে এই সমস্যার সম্মুখীন হইবার জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে। বর্তমানে সমাজে যে নৈরাশ্যবাদের আব-হাওয়া রহিয়াছে, তাহার পরিবর্তন করিয়া কর্মবাদের প্রবর্তন করিতে হইবে। সমাজের দুর্নীতি দূর করিয়া স্বরাজ প্রতিষ্ঠাই যুবকদিগের ব্রত হইবে।

স্বাধীনতা পতাকার গৌরব হানি

৫ জানুয়ারি ১৯২৯ অ্যাসোসিয়েটেড প্রেসের প্রতিনিধির সহিত সাক্ষাৎকারে প্রদত্ত বিবৃতি।

এবার কংগ্রেসের যে প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে তাহা মাদ্রাজ কংগ্রেসে সগর্ব-উত্তোলিত পতাকাকে নত করিয়াছে বলিয়া আমার বিশ্বাস। দুঃখের বিষয় এবারকার ভোট স্বাধীনতা বনাম ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত শাসনের উপর হয় নাই। মূল প্রস্তাবের পক্ষে যাঁহারা ভোট দিয়াছিলেন তাঁহাদের অধিকাংশই যত না দিয়াছেন প্রস্তাবের উদ্দেশ্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া ততোধিক দিয়াছেন মহাত্মা গান্ধী ও পণ্ডিত মতিলালের ব্যক্তিত্বের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া। বাস্তবিক মহাত্মা গান্ধীর আবির্ভাবই বিষয়টিকে জটিল করিয়া তুলিয়াছিল।

যাঁহারা সংশোধক প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ভোট দিয়াছিলেন, তাঁহারাই বয়োবৃদ্ধ নেতৃবৃন্দকে কংগ্রেস হইতে দূরে সরাইয়া দিবার ভয়ে তাঁহাদের পক্ষে ভোট দিয়াছিলেন। নেতৃবৃন্দের বিপক্ষে গিলে তাঁহাদের দূরে সরিয়া যাইবার সম্ভাবনা যথেষ্ট ছিল, এই প্রকার আশংকার সম্মুখীন হইতে তাঁহারা রাজী হন নাই।

নৈতিক জয়

সকল নেতাই সংশোধন প্রস্তাবের সম্পূর্ণ বিরোধী ছিলেন। তাহা সত্ত্বেও আমি যখন দেখি যে আমার পক্ষে ৯৭৩ জন ভোট দিয়াছেন তখন আমার মনে হয় আমাদের নৈতিক জয়লাভ হইয়াছে।

আমরা কার্যকরী সমিতিতে নির্দিষ্ট সংখ্যক প্রতিনিধির পদ প্রাপ্ত হইয়াছি। আমরা যে উদ্দেশ্যের জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছি তাহা ক্ষুণ্ন না হইলে আমরা কার্যকরী সমিতির সহিত কাজ করিতে প্রস্তুত আছি। কার্যকরী সমিতির অধিকাংশই যদি একটা সংগ্রামমূলক কর্মপদ্ধতি গ্রহণ করেন তাহা হইলে তাঁহারা তরুণদের পূর্ণ সমর্থন লাভ করিবেন।

ইহা ছাড়া আমরা পূর্ণ উদ্যমে পূর্ণ স্বাধীনতার প্রচারকার্য চালাইব। আমরা সর্বপ্রযত্নে এমন একটি কার্যপদ্ধতি নির্ধারণ করিব যাহা দ্বারা আমরা আমাদের জাতীয় দাবি পূরণ করিয়া লইব। যাঁহারা মূল প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দিয়াছেন তাঁহারা যে কী ভুল করিয়াছেন এবং তাহাতে তাঁহাদের কোনো লাভই যে হয় নাই তাহা তাঁহারা অনতিবিলম্বে হৃদয়ংগম করিতে পারিবেন। তরুণদের মতে এই প্রস্তাব স্বাধীনতা পতাকার গৌরবহানি করিয়াছে।

স্বরাজের জন্য আত্মত্যাগ করুন

১৬ জানুয়ারি ১৯২৯ সাইমন কমিশন বর্জন ও দেশবাসীর কর্তব্য সম্বন্ধে আলোচনা করিবার জন্য দক্ষিণ কলিকাতা মহীশূর পার্কে আহূত জনসভায় প্রদত্ত ভাষণ।

আপনারা হয়তো কাগজে দেখিয়াছেন, কয়েকজন খয়ের খাঁ রায়বাহাদুর এবং খানবাহাদুর সাইমন-চরণে উপস্থিত হইয়াছে। ইহাতে অনেকের হয়তো মনে হইতে পারে, কই বয়কট তো সফল হইল না। কিন্তু সাইমন কমিশন কি এই সমস্ত লোকের সাক্ষ্য নিতেই আসিয়াছেন? যদি তাহাই হয় তবে তাঁহারা নিজেদের দেশ হইতেই ইঁহাদের সাক্ষ্য পাইতে পারিতেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাঁহারা ইঁহাদের সাক্ষ্য লইতে আসেন নাই। গবর্নমেণ্ট জানেন, কাহার পিছনে কত লোক, কত শক্তি। এই-সব লোকের দেশে যে কোনো প্রতিষ্ঠা নাই তাহা গবর্নমেণ্ট বেশ ভালোভাবেই জানেন। বাস্তবিক যাঁহারা দেশের স্বাধীনতা-পন্থী তাঁহাদের সহিত মিটমাট করাই গবর্নমেণ্টের প্রকৃত উদ্দেশ্য। তাঁহাদের সঙ্গে মিটমাট না হওয়া পর্যন্ত কিছুই হইল না— ইহাই গবর্নমেণ্ট বেশ জানেন। এই-সব লোক কমিশনের সহিত সহযোগিতা করিতে বিরত হইয়াছেন। কাজেই বয়কট সফল হইয়াছে। অবশ্য খয়ের খাঁদের জন্য আমরা ষোলো-আনা সফল হইতে পারি নাই।

দেশে শক্তি সঞ্চার

এখন স্বরাজ প্রতিষ্ঠার জন্য দেশে শক্তি সঞ্চার করিতে হইবে, এইজন্য জাতীয় মহাসভা দেশের সম্মুখে এক কর্মতালিকা উপস্থাপন করিয়াছেন। স্বরাজ-লাভের জন্য দুইটি পথ আছে— একটি ইংরেজের গলায় হাত দেওয়া আর-একটি তাহার পকেটে হাত দেওয়া।

বিলাতী বর্জন

কংগ্রেস প্রথম পন্থা বাদ দিয়া দ্বিতীয় পন্থা অর্থাৎ অর্থনৈতিক বর্জনের পথ গ্রহণ করিয়াছেন। প্রতি বৎসর ভারতবর্ষ বিলাত হইতে ১১১ কোটি টাকার মাল খরিদ করে। ইহাতে কোটি কোটি ইংরেজ প্রতিপালিত হয়। সুতরাং তাহাদের জীবন আমাদের মুঠোর মধ্যে। প্রশ্ন হইতে পারে তাহাদিগকে ভাতে কেন মারিব! তাহার উত্তরে বলা যায়— আমরা বিলাতী বর্জন করিতেছি

আমাদের উন্নতির জন্য। কেননা আমাদের অন্য সমস্ত পন্থা— আবেদন-নিবেদন, তোষামোদ— সমস্তই ব্যর্থ হইয়াছে। সুতরাং দুই পন্থা বজায় আছে— এক, সশস্ত্র সংগ্রাম, দ্বিতীয় অহিংস-অসহযোগ। সুতরাং ইহাতে যদি ইংরেজের অনিষ্ট হয় তবে তাহার জন্য দায়ী হইবে ইংরেজই।

বিলাতী বর্জনের সুফল

শুধু বাংলায় বিলাতী বর্জনে যে আন্দোলন হইয়াছে তাহাতেই ম্যাঞ্চেস্টার ও ল্যাংকাশায়ারের কি দুর্দশা উপস্থিত হইয়াছে তাহা সরকারী রিপোর্ট হইতেই জানা গিয়াছে। যদি সকল প্রদেশ এক মন হইয়া এই বর্জন নীতি গ্রহণ করে তবে তাহার ফল যেকী রূপ হইবে তাহা সহজেই অনুমেয়।

স্বাধীনতার মূল্য

স্বাধীনতার মূল্য না দিলে স্বাধীনতা পাওয়া যায় না। আমি জানি শতকরা নিরানব্বই জন লোকই স্বাধীনতার পক্ষে। কিন্তু নিরানব্বই জন প্রকৃত প্রস্তাবে এই আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করেন নাই। মি. সাকলাতওয়ালা কলিকাতায় বলিয়াছিলেন, রাশিয়ায় জারের রাজ্য বিলোপের সময় লেনিনের পিছনে যত লোক ছিলেন মহাত্মা গান্ধীর পিছনে তাহা অপেক্ষা বেশি লোক থাকা সত্ত্বেও তিনি ব্যর্থ হইলেন কেন? ইহার উত্তরে এই কথা বলা যায় যে, আমাদের মধ্যে সেইরূপ আন্তরিকতা সেইরূপ যথার্থ কর্মপ্রবণতা ছিল না, কাজেই আমরা সেবার ব্যর্থ হইয়াছিলাম।

আত্মত্যাগী দলের প্রয়োজন

আমাদের মধ্যে এমন একদল লোকের প্রয়োজন যাঁহারা বাস্তবিক দেশের জন্য আত্মত্যাগ করিতে প্রস্তুত। তাঁহাদের পিছনে থাকিবে সমগ্র সমাজ। রাষ্ট্র-শক্তি আমাদের হাতে নাই। আমাদের আছে একমাত্র সমাজ-শক্তি; সমস্ত সমাজ যদি স্বাধীনতার জন্য পাগল না হয় তবে স্বাধীনতার আশা সুদূর-পরাহত। যখন বাস্তবিক শ্রমিক কৃষক, যুবক, ছাত্র, নারী, পুরুষ প্রভৃতি সমাজের সকল স্তরের মধ্যে স্বাধীনতার তীব্র আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠিবে তখন আর কেহই সেই আকাঙ্ক্ষা দাবাইয়া রাখিতে পারিবে না।

এই-সব লোককে জাগাইবার জন্য একদল লোকের প্রয়োজন। ইহাদিগকে গবর্নমেণ্ট 'উত্তেজনা-সৃষ্টিকারী' বলিয়া অভিহিত করেন।

স্বরাজের সুখস্বপ্ন

আমি স্বীকার করি, আমরা 'উত্তেজনা-সৃষ্টিকারী'। আমরা কিছুই গ্রাহ্য করি না। সমাজের সমস্ত অংগকে আমরা ক্ষেপাইব। আমাদের কাছে দেশের মুক্তি একটা সত্য, একটা অনুভূতির বিষয়। আমরা স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখিয়া থাকি। একদিন ইতালির ম্যাটসিনি এমনই স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন। মুক্তির আনন্দ ও আস্বাদ তিনি পাইয়াছিলেন, তাহা পাইয়াছিলেন বলিয়াই তিনি তাঁহার স্বপ্ন সফল করিবার জন্য প্রাণপণ করিয়াছিলেন। আমরাও অল্পবিস্তর এই আস্বাদ পাইয়াছি। সমগ্র যুবক সমাজও ইহা পায় তাহাই আমরা চাই।

আমি চাই দেশের অধিকাংশ লোক স্বাধীনতার আন্দোলনে লিপ্ত হউক। তবেই দেশের শাসনতন্ত্র অধিকাংশের হাতে আসিবে, তবেই দেশে প্রকৃত প্রজা-তন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইবে।

রাষ্ট্র-চেতনার জাগরণ

১৮ জানুয়ারি ১৯২৯ হৃষিকেশ পার্কে জনসভায় প্রদত্ত ভাষণ।

আমি আজ আপনাদিগকে একটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে চাই— অন্যান্য যে-সব দেশের লোকেরা নিজেদের দেশে স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন তাঁহাদের সঙ্গে আপনারা নিজেদের তুলনা করিয়া দেখিয়াছেন কি? জগতে যাহারা প্রথম শ্রেণীর জাতি বলিয়া গণ্য, আমি তাহাদের সঙ্গে আমাদের নিজেদের তুলনা করিয়া দেখিয়াছি। আমি দেখিয়াছি— আমরা তাহাদের অপেক্ষা কোনো অংশে নিকৃষ্ট নহি। তবে কেন আমাদের এই দুর্দশা? আমরা কেন অপরের অপেক্ষা পিছনে পড়িয়া আছি— কেন আমরা বিদেশীর শাসনযন্ত্রের তলে নিষ্পেষিত হইতেছি? ইহার একমাত্র কারণ আমার মনে হয় এই যে, আমাদের দেশের মধ্যে আমরা রাষ্ট্রীয় চেতনা জাগ্রত করিতে পারি নাই। এই রাষ্ট্রীয় চেতনা জাগ্রত করিবার নিমিত্ত দেশবন্ধু দাশ যথাশক্তি চেষ্টা করেন এবং কতকটা সাফল্যও লাভ করেন। ঐ কার্য করিতে গিয়া দেশবন্ধু দাশকে অনেক বাধাবিঘ্ন সহ্য করিতে হইয়াছিল, প্রতিকূল সমালোচনার তীব্র বাণ তাঁহার উপর বর্ষিত হইয়াছিল। কিন্তু আমরা সকলে যদি এতটুকু গভীরভাবে চিন্তা করি, তবে প্রত্যেকেই বুঝিতে পারিব যে, যতদিন পর্যন্ত দেশের জনসাধারণের মধ্যে এই চেতনা জাগ্রত করিতে না পারিব ততদিন দেশের মুক্তি সম্ভব নহে। সত্যিই যদি স্বাধীনতা আমাদের কাম্য হয়; দেশের সর্বত্র স্বাধীনতার বাণী আমাদিগকে প্রচার করিতে হইবে; দূরে দূরে গ্রামে ঐ ভাবধারাকে বহন করিয়া লইয়া যাইতে হইবে এবং তদ্দ্বারা জনসাধারণকে আত্মশক্তিতে উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিতে হইবে। সংখ্যার ভাবনা আমাদের ভাবিবার আবশ্যকতা নাই। প্রত্যেক দেশেই অল্পসংখ্যক লোক স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করিয়া থাকেন, তাঁহারাই মাতৃভূমির যোগ্য বেদীতে আপনাদিগের উৎসর্গ করিয়া দিয়া স্বাধীনতার উদ্বোধন করেন। অধিকাংশ লোকের কর্তব্য তাঁহাদের পশ্চাতে থাকা এবং যথাসম্ভব তাঁহাদের নির্দেশিত কর্মতালিকা প্রতিপালন করা। দেশের অধিকাংশ লোকের সহানুভূতি যে কংগ্রেসে ও কংগ্রেসকর্মীদের উপর রহিয়াছে, এ বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই।

শুধু চাই দেশের সর্বত্র রাষ্ট্র-চেতনার জাগরণ। কেহ কেহ এই প্রশ্ন করিতে পারেন যে, এখনো তো অনেক লোক সাইমন কমিশনের নিকট গিয়া

সাক্ষ্য দিতেছে এবং কংগ্রেসের নির্দেশের অবমাননা করিতেছে, ইহার কারণ কি? তাহাদের ঐ প্রশ্নের উত্তর এই যে, উহা আশ্চর্যের বিষয় কিছুই নহে, প্রত্যেক দেশেই খানবাহাদুর, রায়বাহাদুরদের মতো বিভীষণের দল থাকে। ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট জানেন যে, দেশের লোকেদের উপর ঐ-সব ধামাধরাদের কোনো প্রভাব নাই। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টকে যদি আপস-নিষ্পত্তি করিতে হয়, যাঁহারা কমিশন বয়কট করিয়াছেন, তাঁহাদের নিকটই তাঁহাদিগকে আসিতে হইবে। সমাজকে শক্তিশালী করাই প্রথমে দরকার। সমাজ যদি ঐ-সব দেশদ্রোহীদের সমর্থনে অস্বীকৃত হয়, তাহা হইলে, ইহারা এরূপ কার্য করিতে পারে না।

আমরা যদি ব্রিটিশ-পণ্য বর্জন দৃঢ়তাসহকারে চালাইতে পারি, তাহা হইলে, ব্রিটিশ গবর্নমেণ্টকে আপস নিষ্পত্তির জন্য বাধ্য হইয়াই আমাদের নিকট আসিতে হইবে।

দণ্ডিত সম্পাদকের সম্বর্ধনা

২৭ জানুয়ারি ১৯২৯ রাজদ্রোহের অভিযোগে দণ্ডিত 'ফরওয়ার্ড' এবং 'বাংলার-কথা'র সম্পাদক সত্যরঞ্জন বকশীকে অভিনন্দিত করিবার জন্য কলিকাতা-প্রবাসী বরিশাল বাসীদের এক সম্মেলনে প্রদত্ত ভাষণ।

'ফরওয়ার্ড'-এর জন্মদিন হইতে আজ পর্যন্ত সত্যরঞ্জন বকশী মহাশয় উহার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত আছেন। তবুও এইদিনে উহার সম্পাদকের সম্বন্ধে দুই-একটি কথা বলিলে বিশেষ অশোভন হইবে না। সত্যবাবুর নিয়োগ স্বর্গত দেশবন্ধুর অসাধারণ মানবচরিত্রজ্ঞানের পরিচায়ক। 'ফরওয়ার্ড' ভারতবর্ষের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পত্রিকা; ইহার সম্পাদকের গৌরব এবং সম্মানও যথেষ্ট। এই পদের জন্য এই প্রদেশের বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি পূর্বেও লালায়িত ছিলেন এবং এখনো আছেন। প্রশ্ন উঠিতে পারে তবুও সত্যবাবু কোন্ বিশেষ বিশেষ গুণে ঐ-পদ অলংকৃত করিয়া আছেন? সত্যবাবুর চরিত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য তাঁহার তীব্র অনুভূতি হইতে উদ্ভূত বলিয়াই তাঁহার লেখনী পাঠক সম্প্রদায়ের মনকে স্পর্শ করিতে পারে। বাংলার বাহিরের বহু পাঠক তাহার প্রবন্ধগুলির উচ্চ প্রশংসা করিয়া থাকেন। সম্পাদক হিসাবে সত্যবাবুর অন্য গুণ তাঁহার খাঁটি কংগ্রেসী মনোভাব। বস্তুত এই দিক দিয়া দেখিতে গেলে তাহাকে সম্পাদকদের মধ্যে অনন্য-সাধারণ বলিতে হয়। বাংলার যে-সমস্ত সংবাদপত্র নামে জাতীয়তাবাদী, কার্যত তাহারা কংগ্রেসের এবং ব্যাপকতরভাবে দেশের বিরোধিতা করিয়া থাকে। সত্য কথা বলিতে গেলে তাহাদিগকে জাতীয়তার পরিপন্থী বলিতে হয়। এই বিষয়েও সত্যবাবুর বিশেষত্ব আছে। সত্যবাবুর চরিত্রের মধ্যে প্রতিভা এবং বিনয়ের অপূর্ব সমাবেশ ঘটিয়াছে। সময়-সময় মনে হয় তিনি আর একটু কম বিনয়ী হইলে যেন ভালো হইত। যাহা হইক তাঁহার জীবনের দৃষ্টান্ত দেশের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হইলেই দেশের মংগল।

কংগ্রেসের কার্যপদ্ধতি

২৬ জানুয়ারি ১৯২৯ বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভায় পরিবেশিত বক্তব্য।

কার্যপদ্ধতি প্রণয়নের পূর্বে আমাদের তিনটি বিষয় বিবেচনা করিতে হইবে : ১. গত বৎসর যে কার্যভার হাতে লওয়া হইয়াছিল, ২. কলিকাতা-কংগ্রেসের নির্ধারিত কার্যতালিকা, ৩. ভবিষ্যৎ লক্ষ্য।

১. প্রথম বিষয় সম্বন্ধে যে যে কাজ গত বৎসর করা হইয়াছিল তাহা এইরূপ :

ক: গত বৎসর আমরা বিভিন্ন কংগ্রেস কমিটির পুনর্গঠন ও সজীবকরণের ভার লইয়াছিলাম। তাহা অনেকাংশে কার্যে পরিণত হইয়াছে। অনেক কংগ্রেস কমিটির মধ্যে দলাদলি ও মনোমালিন্য ছিল। তাহা দূরীভূত হইয়া সকলের মধ্যে মিলনের ভাব জাগিয়া উঠিয়াছে। অবশ্য সকল ত্রুটি ও দুর্বলতাই যে দূর হইয়াছে তাহা নহে, আরো কাজ করিবার আছে।

পাটের চাষ হ্রাসের প্রয়াস

খ. গত বৎসর বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি পাটের চাষ হ্রাস করারও প্রয়াস পাইয়াছিল। একদিকে এ কাজ যেমন অনেক বিলম্বে আরম্ভ করা হয় অন্যদিকে কাজের উপযোগী অর্থও হাতে ছিল না। আমাদের উদ্দেশ্য ছিল বিদেশীর চাহিদা অনুযায়ী পাট উৎপন্ন করা। তাহাতে কৃষকদের অর্থাগমের সুবিধা হয়। গত বৎসরের পূর্ব বৎসর কৃষকগণ প্রয়োজনের অতিরিক্ত পাট উৎপন্ন করিয়া অতিশয় ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল। গত বৎসর যাহাতে তাহা না হয় তাহারই ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। সুখের বিষয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির চেষ্টা অনেকটা সার্থক হইয়াছে। এই বৎসর কৃষকগণ অন্যান্য বৎসর অপেক্ষা অনেক বেশি অর্থ পাইয়াছে। গত বৎসরের চেষ্টার ফলে এবার ক্ষেত্র যেরূপ তৈয়ারি হইয়া আছে, তাহাতে এবারকার চেষ্টা দ্বিগুণ ফলবতী হইবে।

কমিশন বর্জন

গ. গত বৎসর সাইমন কমিশন যখন প্রথম বোম্বাইয়ে অবতরণ করে তখন বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি সমগ্র বাংলায় যে 'হরতালে'র ব্যবস্থা করিয়াছিল, তাহার সাফল্য অভূতপূর্ব হইয়াছিল। তাহারই ফলে এবারের

বর্জনও সফল হইয়াছে। এই কার্য এখনো শেষ হয় নাই। সাইমন-সহযোগী-দিগকে সামাজিক বর্জন করিবার যে প্রস্তাব গত কলিকাতা-কংগ্রেস গ্রহণ করিয়াছিল তাহা এখনো বাকী আছে।

ব্রিটিশ পণ্য বর্জন

ঘ. সাইমন কমিশন বর্জনের সংগে সংগে ব্রিটিশ পণ্য বিশেষত বিলাতী বস্ত্র বর্জনেরও আয়োজন হইয়াছিল; এই কাজ যে প্রবলভাবে চলিয়াছিল তাহা বলা যায় না। কিন্তু যতটুকু কাজ চলিয়াছিল তাহারই ফলে গত বৎসর বাংলায় বিলাতী বস্ত্রের আমদানী অনেক কমিয়া গিয়াছে। দুঃখের বিষয় অনেক আবেদন সত্ত্বেও কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি নিখিল ভারত বর্জন আন্দোলন গ্রহণ করে নাই। তাহা ছাড়া বোম্বাইয়ে মিল স্বত্বাধিকারী ও শ্রমিকদের বিবাদ দীর্ঘকাল স্থায়ী হওয়ায় দেশের স্বার্থ অনেক পরিমাণে ব্যাহত হইয়াছে। এইসকল বিপদ সত্ত্বেও বাংলার কৃতকার্যতায় ইহা প্রমাণিত হইয়াছে যে সমগ্র ভারতে বর্জন আন্দোলন সমভাবে চলিলে তাহার ফল অপূর্ব হইত।

কংগ্রেস ও নির্বাচন

ঙ. গত বৎসর কংগ্রেসের পক্ষ হইতে মিউনিসিপ্যালিটি, লোকাল বোর্ড ইত্যাদি স্বায়ত্তশাসন বিভাগের কতকগুলি নির্বাচনে কংগ্রেসপ্রার্থী দণ্ডায়মান হইয়াছিল। সর্বত্রই কংগ্রেসের জয় হইয়াছে। তন্মধ্যে হাওড়ার নির্বাচন বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কলিকাতা কর্পোরেশন ও নদীয়ার উপনির্বাচনেও কংগ্রেস বিজয়মুকুট পরিয়াছে। ইহাতে এই প্রতীয়মান হয় না কি যে কংগ্রেসের প্রতি জনসাধারণের শ্রদ্ধা কত অপরিসীম। ব্যবস্থাপক সভা বর্তমান বৎসরে কর্পোরেশন এবং অন্যান্য মিউনিসিপ্যালিটির নির্বাচন-কার্য আরো সুশৃঙ্খল ও সুষ্ঠুভাবে চালাইবেন।

নিয়োগীর প্রচেষ্টা

চ. এই বৎসর কংগ্রেসের প্রচারকার্যও সুপরিচালিত হইয়াছিল। এই-জন্য জ্ঞানাঞ্জন নিয়োগী বিশেষ ধন্যবাদ ও প্রশংসালাভের যোগ্য। তাঁহার প্রচেষ্টাতেই প্রচারকার্য এইরূপ উন্নতি লাভ করিয়াছে। তাঁহার ম্যাজিক-

লণ্ঠন-বক্তৃতা প্রচারের কার্যে অনেক সহায়তা করিয়াছে। তিনি এক দল কর্মীরও সৃষ্টি করিয়াছেন। এ বৎসর প্রচারকার্য আরো জোরের সহিত চালাইতে হইবে। দুই বা ততোধিক প্রচার দল প্রত্যেক শহরে পাঠাইতে হইবে, তাঁহারা কেবল যে প্রচারকার্য করিবেন এমন নহে, স্থানীয় কংগ্রেস কমিটি কী কী কাজ করিতেছে তাহা পর্যবেক্ষণ করিয়া কলিকাতায় রিপোর্ট পাঠাইবেন।

এ বিষয়ে 'ফরওয়ার্ড' ও 'বাংলার কথা'র ভূমিকাও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। অন্যান্য পত্রিকাও এ বিষয়ে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছে। জ্ঞানাঞ্জনবাবুর 'দেশের ডাক'-ও যথেষ্ট কাজ করিয়াছে।

জাতীয় কর্মীদল : বিচারে সমর্থন

ছ. যে-সকল সহকর্মী গত বৎসর সরকার কর্তৃক বিচারার্থ নীত হইয়াছিলেন আমাদের জন্য তাঁহাদের অনেক কিছু করিতে হইয়াছে। গত হরতালে যাঁহারা ধৃত হইয়াছিলেন তাঁহারা, বাবা গুরুদৎ সিং ও জ্ঞানাঞ্জন নিয়োগীর কথা বলা যাইতে পারে। এই বৎসর হয়তো মামলার সংখ্যা বৃদ্ধি পাইবে। অন্তত এইরূপ একটি জনপ্রবাদ লোকমুখে শুনা যাইতেছে। নৃপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, জ্ঞানঞ্জন নিয়োগীর গ্রেপ্তার ও সত্যরঞ্জন বকশীর কারাদণ্ড— ইহার পূর্বাভাস। সুতরাং যাহাতে ধৃত ব্যক্তিগণের পক্ষ সমর্থন ভালোরূপে চলিতে পারে তাহার ব্যবস্থাও করিতে হইবে।

অপূর্ব প্রয়াস

জ. আলোচ্য বর্ষে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি শ্রমিকদের সাহায্যে প্রথম অভিযান করে। ইহার সাফল্য খুব উল্লেখযোগ্য না হইলেও— ইহার সার্থকতা কম নহে। এই ব্যাপারে লিলুয়া, জামশেদপুর ও বাউড়িয়ার শ্রমিক চাঞ্চল্যের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে।

এই বৎসর শ্রমিক সমস্যায় আরো জোরের সহিত কাজ করিতে হইবে। এ পর্যন্ত কৃষকদের কাজে হস্তক্ষেপ করা হয় নাই। এই বৎসর শ্রমিকদের সহিত কৃষক সংগঠনের কাজও করিতে হইবে।

দেশের বর্তমান আন্দোলন

ঝ. বিগত বর্ষে বিভিন্ন যে-সকল আন্দোলনের সৃষ্টি হইয়াছে তাহাতে কংগ্রেস পক্ষীয় লোকের কিছু-না-কিছু হাত আছে। যে কয়টি আন্দোলন

চলিতেছে তাহার মধ্যে ছাত্রদের আন্দোলন, যুব-আন্দোলন, এবং নারীজাগরণ ও শরীর চর্চা আন্দোলনই প্রধান। গত হরতালে ছাত্রগণ হইতে যে সহানুভূতি পাওয়া গিয়াছিল, তাহা আশাতীত। ছাত্রীগণও ইহাতে যোগদান করিয়া আন্দোলনকে মহিমময় করিয়া তুলিয়াছে। ছাত্রগণ রাজরোষে পড়িয়া জীবন বিপন্ন করিতেও পশ্চাৎপদ হয় নাই। ইহা গৌরবময় দিবসের সূচনা করিতেছে। ছাত্রগণকে সুনিয়ন্ত্রিত উপায়ে চালিত করিতে পারিলে তাহারা প্রকৃত মানুষ হইয়া উজ্জ্বল ভারতের সৃষ্টি করিতে পারিবে।

যুব-আন্দোলনের সাফল্য

নিখিল ভারত যুব কংগ্রেসের গত অধিবেশন বিরাট সফলতা আনয়ন করিয়াছে। যিনি এই অধিবেশনে যোগদান করিয়াছেন তিনিই মুগ্ধ হইয়াছেন। এই সাফল্যের একমাত্র কারণ, বাংলায় ১৯২৮ সালের যুব-আন্দোলনের দ্রুত উন্নতি। জনৈক কংগ্রেস কর্মী এই আন্দোলনের সহিত সংশ্লিষ্ট। সামগ্রিক-ভাবে কংগ্রেসের সহিত যুব-আন্দোলনের একটা সংযোগ থাকা উচিত। কংগ্রেসের শরীর চর্চার কার্যপন্থা যুবকদের উপর ন্যস্ত করা ভালো। ইহাই উপযুক্ত কর্ম।

নারী-জাগরণ

গত বৎসর আর-একটি আশার আলো দেখা গিয়াছে। তাহা নারী জাতির মধ্যে রাজনীতির প্রেরণা সঞ্চার। রাষ্ট্রীয় মহিলা সংঘ ও ছাত্রী সংঘের উদ্যোগে, এই প্রেরণার সূত্রপাত হইয়াছে। আলোচ্য বর্ষে পণ্য বর্জন উপলক্ষে কলিকাতা ও মফস্বলে অনেক মহিলা সভ্য হইয়াছিল। যে-সকল নারী পূর্বে কখনো রাজ-নীতির কথা কল্পনাও করেন নাই, তাঁহারাও দলে দলে উক্ত সভায় যোগদান করিয়াছিলেন। এই নারী-জাগরণের ফলেই বিগত কংগ্রেসে বহু স্বেচ্ছাসেবিকা পাওয়া গিয়াছে এবং তাঁহারা অক্লান্ত পরিশ্রমে কংগ্রেসের কাজ করিয়া সকলকে সুখী করিয়াছেন। বিহারের অনেক মহিলা পর্দা উচ্ছেদের যে প্রয়াস চালাইয়াছেন বাংলা তাহার সহিত যোগদান না করিলে বড়ো দুঃখের বিষয় হইবে। নারী জাতি জাগ্রত না হইলে এবং কংগ্রেসের সঙ্গে নারী সংঘ গঠিত না হইলে দেশের উন্নতি সুদূরপরাহত।

Bichandra State Central Library
P.R.I. Regd. No. 271
Agartala, West Tripura

অন্যান্য অনুষ্ঠান

বিগত কংগ্রেস যে নূতন কর্মপন্থা অবলম্বন করিয়াছে তাহা হইল : ১. পান-দোষ নিবারণের চেষ্টা ও মাদক দ্রব্যের দোকানে পিকেটিং ; ৩. সামাজিক কুপ্রথা তথা অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ ; ৩. স্ত্রীস্বাধীনতা ; ৪. কোনো কোনো স্থানে বিশেষ অভিযোগ উপস্থিত হইলে বার্দোলির ন্যায় নিরুপদ্রব প্রথায় তাহার সমাধান।

পূর্বে পানদোষ নিবারণের বিষয় কংগ্রেসের কার্যতালিকাভুক্ত না থাকায় গত কয়েক বৎসরে এ-বিষয়ে কোনো চেষ্টা চলে নাই।

সামাজিক কুপ্রথা

বাংলায় সামাজিক কুপ্রথা মধ্য ও দক্ষিণ ভারতের মতো না থাকিলেও অনেক দিক দিয়া ইহার উন্নতি সাধন করিতে হইবে। কালীঘাটের পাণ্ডাদের আচরণের কথা সবলেই অবগত আছেন। কয়েকজন কংগ্রেসকর্মী এই আচরণের বিরুদ্ধাচারণ করায় কিরূপে নির্যাতিত হইয়াছেন তাহাও সকলে জানেন।

ময়মনসিংহের কয়েকজন কৈবর্ত কালী মন্দিরে প্রবেশ করিতে না পারায় যে অভিযোগ করিয়াছিল তাহা উল্লেখযোগ্য। এই-সকল ব্যাপার উপেক্ষণীয় নহে। সুখের বিষয় অভিযোগের উপর ভিত্তি করিয়া একদল কর্মী তথা-কথিত অনুন্নত শ্রেণীর উন্নতিবল্পে আন্দোলন চালাইতেছেন। বাংলায় এই অনুন্নত শ্রেণী জাতীয়তাবোধে পরিপূর্ণ। জনসংঘ ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

নারীদের রাজনীতিক্ষেত্রে কোনো অধিকার না থাকায় তাহাও প্রতিষ্ঠা করিবার চেষ্টা চলিতেছে সত্য। কিন্তু বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির প্রত্যক্ষভাবে ইহার সহিত যোগস্থাপন করিতে হইবে।

ভবিষ্যৎ কার্যপদ্ধতি

বিগত ১৯২৮ সালের আন্দোলনের ফলে এই বৎসর যে ক্ষেত্র তৈয়ার হইয়াছে তাহা খুবই আশাপ্রদ। অনেক মতবিরোধই দূরীভূত হইয়াছে। বিগত কলিকাতা কংগ্রেস ও সাইমন কমিশনের আগমনের ফলে এই প্রদেশে একটা উৎসাহ ও উদ্দীপনার স্রোত বহিয়া যাইতেছে। গত কংগ্রেসে যে মতদ্বৈধ সৃষ্টি হইয়াছে তাহা তেমন মারাত্মক কিছু নহে! ইহা বাংলার কংগ্রেস-

কর্মীদের ভিতর কোনো মনান্তর আনয়ন করিবে না। আমরা অবিলম্বে স্বায়ত্তশাসনই চাই বা পূর্ণ স্বাধীনতাই চাই, উভয় ক্ষেত্রেই আমাদের পন্থা এক। উভয় উদ্দেশ্যেই দেশের মধ্যে একটা শক্তি সঞ্চয় করিতে হইবে। কংগ্রেস সকল দলেরই— এই ব্যাপারে একের অন্যের হাত ধরিয়া চলিতে হইবে। অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান পত্রিকাগুলি তাহাদের ইচ্ছামত মঞ্জুরী (Sanction) শব্দের বিভিন্ন অর্থ করিতেছে। কিন্তু কংগ্রেসের গৃহীত প্রস্তাব এই মঞ্জুরীর প্রকৃত অর্থ কী, তাহা বলিয়াছে।

কংগ্রেসকর্মীর কর্তব্য

দেশের এই জাগরণের দিনে আমি আশা করি কংগ্রেসকর্মীগণ তাহাদের সকল দ্বন্দ্ব ও মতবিরোধ ভুলিয়া একই ব্রতের জন্য মিলিত হইয়া কাজ করিবে। কংগ্রেসের কার্যতালিকাকে কার্যে পরিণত করিবার জন্য আমি সকলেরই সাহায্য প্রার্থনা করি। আমি চাই না কংগ্রেস হইতে কেহই দূরে সরিয়া যান--- কংগ্রেসের দ্বার সকলের জন্যই মুক্ত। বর্তমান বর্ষের কার্যতালিকা প্রণয়ন করিয়া কোন্ পথে তাহা কার্যে রূপায়িত করিতে পারা যায় সে বিষয়ে সকলের পরামর্শ আবশ্যক। সকলে যদি উৎসাহভরে কাজ না করেন তাহা হইলে সাব-কমিটি গঠনের কোনো মূল্য নাই।

বাংলার কংগ্রেস-সেবীরাও দেখিতেছেন যে অসহযোগ আন্দোলনের যুগ হইতে কর্মীসংখ্যা ক্রমশই কমিয়া যাইতেছে। দলে দলে কর্মী কংগ্রেসে যোগদান করিতে ইচ্ছা করিলে তাহাদের জন্য কংগ্রেসের দ্বার সর্বক্ষণ উন্মুক্ত থাকিবে! কংগ্রেস কমিটিতে এমন কোনো ষড়যন্ত্র নাই যাহাতে নূতন লোকের কংগ্রেসে যোগদান করিতে বাধা হইতে পারে। যদি এইরূপ ষড়যন্ত্র কোথাও গড়িয়া উঠিয়া থাকে তাহা নির্মমভাবে দূর করিতে হইবে।

এখন বর্তমান বর্ষের কার্যতালিকার পুঙ্খানুপুঙ্খ সমালোচনা করিতে চাই :

১. দেশবন্ধু স্মৃতিমন্দির : কংগ্রেস ও প্রদর্শনীর অর্থ কিছু বাঁচিয়া গেলে তাহা দ্বারা একটি সৌধ প্রস্তুত করিতে হইবে। উহা দেশবন্ধুর নামে উৎসর্গীকৃত হইবে।

২. পাটের চাষ হ্রাসের প্রচার।

৩. সাইমন কমিশন বর্জন এবং সাইমন-সহযোগীদের সামাজিকভাবে বয়কট।

৪. বিদেশী বস্ত্র বর্জন : প্রত্যেক হাট ও বাজারের সন্নিকটে প্রচারকেন্দ্র স্থাপন করিতে হইবে।

৫. ব্রিটিশ পণ্য বর্জন।

৬. দেশে মিউজিয়াম প্রতিষ্ঠা : কলিকাতা-কংগ্রেস প্রদর্শনীর আয়োজন করিয়া যে উত্তম কাজ করিয়াছে তাহা স্থায়ী করিতে হইলে সর্বসমেত একটি স্বদেশী মিউজিয়ামের একান্ত প্রয়োজন। সম্ভবপর হইলে ইহার সঙ্গে একটি স্বাথ্য বিভাগ থাকিবে। কলিকাতা মিউজিয়ামের প্রতিষ্ঠা হইলে পরে দেশের প্রত্যেক জিলায় মিউজিয়াম করা উচিত।

৭. মিউনিসিপ্যালিটি ও জিলাবোর্ড প্রভৃতির নির্বাচন।

৮. কলিকাতা কর্পোরেশন নির্বাচন : কলিকাতা কর্পোরেশনের কোয়ালিশন পার্টির কার্য আদৌ সন্তোষজনক হয় নাই। বরং ইহা ব্যর্থই হইয়াছে। কর্পোরেশনে যে-সকল ব্যাপার হইতেছে তাহাতে সকলের লজ্জিত হওয়া উচিত। দুর্নীতি হইতে কর্পোরেশনকে রক্ষা করিতে হইলে অবিলম্বে তাহা কংগ্রেসের হাতে নেওয়া উচিত।

৯. ১৯২৯ সালের নভেম্বর মাসে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় যে নির্বাচন হইবে তাহাতে প্রতিযোগিতা করিতে হইবে।

১০. কর্মীগণের বিচারে সাহায্য।

১১. পানদোষ নিবারণের জন্য প্রচারকার্য।

১২. সমাজ সংস্কার : অস্পৃশ্যতা-দূরীকরণ ও স্ত্রী-স্বাধীনতার জন্য প্রচেষ্টা।

১৩. বিশেষ অভিযোগ দূরীকরণের আন্দোলন।

১৪. ছাত্র যুব-আন্দোলন এবং শরীরচর্চা-আন্দোলনে সাহায্য দান।

১৫. শ্রমিক সংগঠন : ক. বর্তমান সংগঠনের সাহায্য; খ. নূতন ইউনিয়ন স্থাপন।

১৬. প্রচার : পত্রিকা ও কর্মীর সাহায্য।

অবলম্বনে কার্যপদ্ধতি গ্রহণ

আগামী দুই মাসের জন্য যে-কার্যপদ্ধতি গ্রহণ করিতে হইবে তাহা এইরূপ :

বর্তমান বর্ষে প্রধান কার্যপদ্ধতি ব্রিটিশ পণ্য বর্জন। বর্জন আন্দোলনকে সাফল্যমণ্ডিত করিতে হইলে সর্বাগ্রে চাই কংগ্রেস কমিটিগুলিকে পুনর্গঠিত করিয়া শক্তিমান করা। আগামী ফেব্রুয়ারি ও মার্চের কার্যপদ্ধতি :

১. পাঁচ লক্ষ কংগ্রেস সদস্য করা ২. দুইলক্ষ টাকা সংগ্রহ ৩. প্রত্যেক শহরে একসহস্র স্বেচ্ছাসেবক সংগ্রহ !

রাজনীতির দিক দিয়া কংগ্রেসের সদস্য সংগ্রহ করার একটা মূল্য আছে— ইহাতে গৃহে গৃহে প্রচার হয়।

দেশের অনুকূলে হাওয়া বহিতেছে। ইহা অতীব সুবর্ণ সুযোগ। সুতরাং সকলেরই এখন আন্তরিকতার সহিত কংগ্রেসের কার্যে যোগদান করা উচিত। সকলেই যদি নিষ্ঠার সহিত কাজ করে তাহা হইলে এই কার্যপদ্ধতিকে রূপায়িত করা কঠিন হয় না। কার্য সুসম্পন্ন হইলে তাহা হইতে যে বিমল আনন্দের সৃষ্টি হইবে সকলেই তাহা ভোগ করিতে পারিবে।

ভারতের রাষ্ট্রীয় ভাষা

২৮ জানুয়ারি ১৯২৯ ভারতের ভবিষ্যৎ রাষ্ট্রীয় ভাষারূপে হিন্দীর উপযোগিতা সম্বন্ধে আলোচনা করিবার জন্য আর্য সমাজ মন্দিরে আহূত জনসভায় প্রদত্ত ভাষণ।

বাংলাদেশে কাহারো কাহারো মনে এই আশংকা আছে যে, হিন্দী যদি রাষ্ট্র-ভাষারূপে গৃহীত হয় তবে বাংলা ভাষার প্রাধান্য খর্ব হইয়া যাইবে। কিন্তু এ কথা সত্য যে, আমরা স্বরাজের যতই নিকটবর্তী হইতেছি ইংরেজী ভাষার উপযোগিতা ততই কমিয়া যাইতেছে। অদূর ভবিষ্যতে বাংলাই যে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের এম. এ. পর্যন্ত শিক্ষার বাহনরূপে গৃহীত হইবে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। সমস্ত প্রকার ব্যবহারিক কার্যপ্রয়োজনে বিদেশী ভাষার প্রতি আমাদের বিমুখতা ক্রমেই বাড়িয়া যাইতেছে। সুতরাং বাংলার বাহিরে যাহাতে আমাদের কথা সকলে বুঝিতে পারে তজ্জন্য আমাদিগকে এমন একটি ভাষার আশ্রয় লইতে হইবে যাহা ভারতের সকলেরই বোধগম্য। কাজেই বাস্তব জীবনের প্রয়োজনের দিক দিয়া দেখিতে গেলে আমাদের পক্ষে হিন্দীভাষা শিক্ষা করা সংগত।

বাংলার দান

শুধু ভারতকে নয়, সমগ্র জগৎকে দিবার মতোই বাংলার অনেক কিছু আছে। কিন্তু তথাপি যদি আমরা ভারতের অন্যান্য প্রদেশকে বাংলার চিন্তা এবং সাধনার সহিত পরিচালিত করিতে চাই তবে তাহা হিন্দী ভাষার সাহায্যেই করিতে হইবে। স্বদেশবাসীর নিকট আমার অনুরোধ আপনারা হিন্দীর উপ-যোগিতা হৃদয়ংগম করিয়া কালবিলম্ব না করিয়া বিশেষ আগ্রহের সহিত হিন্দী ভাষা শিক্ষা করুন। এই ভাষা আয়ত্ত করিতে বিশেষ মস্তিষ্ক পরিচালনা করিতে হয় না কিন্তু ইংরেজীর মূল সূত্রগুলি শিখিতেই বহু বৎসর কাটিয়া যায়।

প্রতিবাদ

ফ্রী প্রেসের প্রতিনিধিদের সহিত সাক্ষাৎকার।

আমি দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে কলিকাতার সংবাদপত্র সম্বন্ধে বন্ধুদের সভায় যাহা বলিয়াছি তাহা ঠিকমতো পত্রিকায় প্রকাশিত হয় নাই। 'ফরওয়ার্ড' এবং 'বাংলার কথা' ব্যতীত কলিকাতার আর সকল পত্রিকাই কংগ্রেস জাতীয়তা-বিরোধী— এ কথা আমি বলি নাই। ঐ সকল জাতীয় পত্রিকা দেশের যে অপূর্ব সেবা করিয়া আসিতেছে তাহা আমি আমার রাজনৈতিক জীবনের প্রারম্ভ হইতে দেখিয়া আসিতেছি। সুতরাং আমাদ্বারা এইরূপ উক্তি প্রকাশ করা কখনোই সম্ভবপর নহে। এইরূপ ভ্রমপূর্ণ সংবাদ যদি ঐ সকল পত্রিকা-সংশ্লিষ্ট বন্ধুদের ব্যথা দিয়া থাকে তাহা হইলে আমি দুঃখিত।

আমি যাহা বলিয়াছি তাহা এই— "অনেকেই যে-সকল পত্রিকাকে জাতীয় পত্রিকা বলিয়া অভিহিত করিয়া থাকেন তাঁহাদের কয়েকখানি কংগ্রেস-বিরোধী" গত কয়েক বৎসরের ব্যাপারে আমার এই অভিজ্ঞতা হইয়াছে যে, ঐ কয়েকখানি পত্রিকা জাতীয় বলিয়া পরিচয় দিলেও তাহারা কংগ্রেস-বিরোধী। তাহারা কংগ্রেসের বিরুদ্ধ ভাবই প্রচার করিতেছে সময় সময় প্রত্যক্ষ-ভাবে এবং অনেক সময় অলক্ষিতে। জনসাধারণ সকলেই জানেন যে দেশবন্ধুর শেষ জীবনে কতকগুলি বিরুদ্ধবাদী পত্রিকা কিরূপে তাঁহার উপর অকথ্য আক্রমণ চালাইয়াছিলেন। কেবলমাত্র কয়েকখানি পত্রিকা তাঁহার এবং তাঁহার উদ্দেশ্যের সমর্থন করিয়াছেন। কলিকাতাস্থ ভারতীয় অনেক পত্রিকাই তাঁহার উপর এরূপ নির্দয় ব্যবহার করায় তিনি নানা কাজে ব্যস্ত থাকা সত্ত্বেও ফরওয়ার্ড পত্রিকা প্রকাশে বাধ্য হন। কলিকাতার পত্রিকাসমূহ তাঁহাকে সমর্থন করিলে তাঁহার বহুমুখী কার্যধারার উপর আরো অর্থ, শক্তি এবং সময় ক্ষয় করিয়া 'ফরওয়ার্ড' পত্রিকা প্রকাশ করিতেন না। দেশবন্ধুর মৃত্যুর পর বিখ্যাত ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মাসিক বসুমতীতে যে প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন আমি তাহার কথা সকলকে স্মরণ করাইয়া দিতে চাই। তিনি তাহাতে লিখিয়াছিলেন, দেশবন্ধু ইংরাজের হাতে যত বাধা পান নাই তাহা হইতে অধিক বাধা পাইয়াছেন দেশের লোক হইতে। আজ দুঃখের সহিত (অবশ্য ক্রুদ্ধ হইয়া নহে) বলিতে বাধ্য হইতেছি যে-সকল পত্রিকা দেশবন্ধুর জীবনে তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ করিয়া আসিয়াছেন তাঁহারাই এখন কংগ্রেসের বিরুদ্ধে রত

হইয়াছেন। এই বিরোধিতা সকল সময়ে খোলাখুলিভাবে হয় না বরং প্রচ্ছন্ন-ভাবেই হয়।

এই কংগ্রেস-বিরোধিতাকে কংগ্রেসের প্রতি প্রীতির অভাব বলিতে হইবে। আমার নিকট কংগ্রেসকে আক্রমণ করা আর জাতীয়তার বিরুদ্ধাচরণ করা দুইই সমান। কারণ এই দুর্ভাগা দেশে কংগ্রেসই একমাত্র জাতীয় প্রতিষ্ঠান। আমি বিশ্বাস করি ঐ-সকল পত্রিকার মধ্যে কংগ্রেসের প্রীতি জাগিয়া উঠিলে তাহাদের মধ্যে দেশবন্ধুর অনেক অমর শক্তিই জাগ্রত হইত।

৩১ জানুয়ারি ১৯২৯

শ্রমিক-আন্দোলনের আশু প্রয়োজন : দৃঢ় সংঘবদ্ধতা

১ ফেব্রুয়ারি ১৯২৯ লিলুয়া ময়দানের শ্রমিক সমাবেশে ভাষণ।

গত বৎসর লিলুয়া শ্রমিকগণের আংশিক ব্যর্থতার কারণ তাহাদের সংঘবদ্ধতার অভাব। পক্ষান্তরে জামশেদপুরের শ্রমিকগণ পূর্বাহ্ণেই ভালোরূপ সংঘবদ্ধ হইয়াছিল সেইজন্য কংগ্রেস জয়ী হইয়াছিল। লিলুয়া শ্রমিকগণের ব্যর্থতার আর-একটি কারণ, তাহাদিগকে বিরোধ করিতে হইয়াছে গভর্নমেন্টের সহিত—কোনো একটি কোম্পানির সহিত নহে। ৫০-৬০ লক্ষ টাকা ক্ষতি হইলেও গভর্নমেন্ট তাহা গ্রাহ্য করেন না। কেননা ভারতকে শোষণ করিয়া তাঁহারা ঐ টাকা অনায়াসেই পূরণ করিতে পারেন। কিন্তু কোম্পানি এইরূপ ভীষণ ক্ষতি স্বীকার করিতে কখনোই রাজী হইবে না; তাহারা মাত্র কয়েক হাজার টাকা ছাড়িয়া দিয়া নিশ্চয়ই বিরোধ মিটাইবে। তারপর তাহাদের ব্যর্থতার আর-একটি কারণ, রেলওয়ে বোর্ডে একজনও ভারতবাসী নাই। রেলওয়ে-বোর্ডই এই-সব বিষয়ে সর্বময় কর্তা। উক্ত বোর্ডে ভারতবাসীদিগকে লইবার জন্য কয়েক বৎসর ধরিয়া আন্দোলন করা হইয়াছে। সুতরাং স্বরাজ না হওয়া পর্যন্ত শ্রমিকগণের অভাব-অভিযোগের প্রতিকার হওয়ার কোনো আশা নাই।

পরিশেষে বলিতে চাই যে সংঘবদ্ধ শক্তি ব্যতীত দাবি আদায় সম্ভব নহে। তাই শ্রমিকগণকে আমার সনির্বন্ধ অনুরোধ, আপনারা সংঘবদ্ধ হউন।

পাবনা জেলা যুব-সম্মিলনী

৯ ফেব্রুয়ারি ১৯২৯ পাবনায় অনুষ্ঠিত সম্মেলনে সভাপতির অভিভাষণ।

পাবনা জেলার যুব-সম্মিলনীর সভাপতিপদ প্রদান করিয়া আমাকে যে সম্মান দেখাইয়াছেন তজ্জন্য আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা গ্রহণ করুন। আপনাদের এই প্রসিদ্ধ নগরীতে আসিবার সৌভাগ্য ইতিপূর্বে আমার কখনো হয় নাই, যদিও এখানে আসার বাসনা বহুদিন হইতে মনের মধ্যে ছিল। আজ এই বাসনা পূর্ণ হইয়াছে বলিয়া পরম আনন্দ লাভ করিলাম। বাংলার জাতীয় জীবনের জটিল সমস্যা যখনই উপস্থিত হইয়াছে এবং মতানৈক্য যখন মনো-মালিন্যে পরিণত হওয়ার উপক্রম হইয়াছে এইরূপ সময়ে একাধিকবার এই প্রসিদ্ধ নগরীতে মীমাংসা ঘটিয়াছে। আজ দেশের যে অবস্থা উপস্থিত হইয়াছে তাহাতে আমি আশা করি যে জাতীয় সমস্যার সমাধানে প্রবীণ ও বিচক্ষণ পাবনা জেলাবাসী যাবতীয় দেশহিতকর কর্মপ্রচেষ্টায় অগ্রণী হইয়া পথ-প্রদর্শকের কাজ করিবেন।

যখন চক্ষু উন্মীলন করিয়া দেশ-বিদেশে দৃষ্টি নিক্ষেপ করি তখন কী দেখিতে পাই?— দেখিতে পাই চারিদিকে জীবনের স্পন্দন— জাগরণের সমুদয় লক্ষণ ও নবসৃষ্টির উন্মেষ। পৃথিবীর একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত তরুণের প্রাণ জাগিয়াছে। দুর্বলতা, অবিশ্বাস ও ক্লৈব্য পরিহার করিয়া সে আপনার পায়ে ভর করিয়া দাঁড়াইতেছে। ভবিষ্যতের উত্তরাধিকারী যাহারা সেই তরুণ সম্প্রদায় আজ নিশ্চেষ্ট নয়। তাহারা আজ অধিকার লাভের জন্য বদ্ধপরিকর হইতেছে এবং অধিকার সংরক্ষণের জন্য যোগ্যতা অর্জন করিতেছে। তরুণের এই নব জাগরণ পৃথিবীর ইতিহাসে নূতন ঘটনা নয়, ইহাকে পাশ্চাত্য বস্তু জ্ঞান করিলে আমরা অন্যায় করিব। সকল দেশে ও সকল যুগে ধ্বংস ও সৃষ্টির আবশ্যকতা যখনই ঘটিয়াছে তখনই তরুণের প্রাণ জাগিয়াছে। কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধের প্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া শ্রীকৃষ্ণ যখন বজ্রনির্ঘোষে বলিয়াছিলেন "ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ" তখন তাঁহার ভিতর দিয়া মৃত্যুঞ্জয়ী তরুণ শক্তির বাণী প্রকট হইয়াছিল। তাই গত বৎসর নাগপুরে তরুণদের সভায় আমি একদিন বলিয়াছিলাম "The voice of Krishna was the voice of immortal Youth"। ধ্বংসের করাল মূর্তি দেখিয়া অর্জুন ভীতিগ্রস্ত হইয়াছিলেন; ক্ষণিকের জন্য তিনি বিস্মৃত হইয়াছিলেন যে ধ্বংস বিনা সৃষ্টি

হইতে পারে না : তাই শ্রীমদ্‌ভাগবৎ গীতার সাহায্যে তাঁহাকে বুঝাইতে হইয়াছিল যে, কুরুক্ষেত্রের মহাশ্মশানের উপরেই ধর্মরাজ্যের প্রতিষ্ঠা হইবে।

এখন প্রশ্ন উঠিতেছে তরুণের আদর্শ কি ? তরুণের আদর্শ— বর্তমানের সকল প্রকার বন্ধন, অত্যাচার, অবিচার ও অনাচার ধ্বংস করিয়া নূতন সমাজ ও নূতন জাতি সৃষ্টি করা। প্রাচীনের ও বর্তমানের উচ্চ প্রাচীর অতিক্রম করিয়া সুদূরের সন্ধান পাইবার জন্য মানবের দৃষ্টি অতি আদিম কাল হইতে উৎসুক আছে। শুধু তাই নয়, সুদূরের স্বপ্নকে বাস্তবের মধ্যে মূর্ত করিবার চেষ্টা মানবজাতি বরাবর করিয়াছে। এই প্রেরণার ফলে অতি প্রাচীন-কালে ভারতবর্ষে গৌতম বুদ্ধের আবির্ভাব হয় এবং প্রাচীন গ্রীসে সক্রেটিস, প্লেটো প্রভৃতি মনীষিবৃন্দের অভ্যুদয় হয়।

আমরা মনে করিতে পারি যে, তরুণদের রচিত যে-কোনো প্রতিষ্ঠান— যেমন সেবাসমিতি, যুবক সমিতি বা তরুণ সংঘ আখ্যা পাইবার যোগ্য, কিন্তু এ ধারণা ভ্রান্ত। যে প্রতিষ্ঠান বা আন্দোলনের মূলে স্বাধীন চিন্তা ও নূতন প্রেরণা নাই সে প্রতিষ্ঠান বা আন্দোলন তরুণের আন্দোলন বলিয়া অভিহিত হইতে পারে না। তরুণ প্রাণের লক্ষণ কি ?— লক্ষণ এই যে, সে বর্তমানকে বা বাস্তবকে অখণ্ড সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে পারে না, সে বন্ধনের বিরুদ্ধে, অন্যায়ের বিরুদ্ধে ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিতে চায় এবং সে আনিতে চায় ধ্বংসের মহাশ্মশানের বুকে সৃষ্টির অবিরাম তাণ্ডব নৃত্য। ধ্বংস ও সৃষ্টি লীলার মধ্যে যে আত্মহারা হইতে পারে একমাত্র সেই ব্যক্তিই তরুণ। তারুণ্য যার আছে সে ধ্বংস ও সংগ্রামের ছায়া দর্শনে ভীত হয় না অথবা নব-সৃষ্টিরূপ কার্যে অপারগ হয় না। বৃদ্ধ হইয়াও মানুষ তরুণ হইতে পারে যদি তার প্রাণ সবুজ থাকে আর তরুণ হইয়াও মানুষ বৃদ্ধ হইতে পারে যদি তার অবস্থা হয় "বৃদ্ধত্বম্ জরসা বিনা।"

বহুদিন যাবৎ তরুণশক্তি আত্মবিস্মৃত ছিল, তাই কলুর বলদের মতো সে পরের কশাঘাত খাইয়া পরের নির্দিষ্ট পথে চলিয়াছে— এবং দায়িত্বভার অপরের হাতে তুলিয়া দিয়া অন্ধের মতো কাজ করিয়া আসিয়াছে। যতদিন পর্যন্ত এরূপ অবস্থায় সমাজের ও জাতীয় ক্রমিক উন্নতি ঘটিয়াছে, ততদিন পর্যন্ত বিশেষ কোনো গোলমাল সৃষ্টি হয় নাই ; কিন্তু যে দেশে বা যে যুগে নেতৃবর্গের অযোগ্যতার জন্য সমাজের ও জাতির দুর্গতি ঘটিয়াছে সেখানে তরুণসম্প্রদায় বিদ্রোহী হইয়াছে। সুলতানের হাতে সমস্ত শক্তি ও কর্তব্যভার

অর্পণ করিয়া তুর্কি জাতি যখন ক্রমশ অধোগতির মুখে চলিতে লাগিল, তখন বিদ্রোহী তুর্কি-তরুণেরা নব্য তুর্কিদলের প্রতিষ্ঠা করে। সম্রাট কাইজার ও তাঁহার পারিষদবর্গ যখন সেনাপতিকুলের হস্তে সমস্ত দায়িত্ব তুলিয়া দিল, তরুণ জার্মানী তখন নিশ্চিন্ত হইতে পারিল না— বিশেষ করিয়া যখন তরুণ জার্মানেরা দেখিল যে তাহাদের নেতৃত্বের ফলে মহাযুদ্ধে সমগ্র জার্মান জাতিকে পরাজয়ের লাঞ্ছনা ও দৈন্য বরণ করিতে হইল, তখন জার্মানীতে তরুণের আন্দোলন শক্তিশালী হইয়া উঠিল। মাঞ্চুরাজ-বংশকে স্বীয় ভাগ্যনিয়ন্তা করিবার ফলে সমগ্র চীন জাতি যখন শৌর্য, বীর্য, স্বাধীনতা ও সম্পদ হারাইতে লাগিল, তখন চীন দেশে তরুণের জাগরণ আরম্ভ হইল। যে পরিমাণে তরুণ সম্প্রদায় আত্মবিশ্বাস ফিরিয়া পাইয়াছে এবং দায়িত্বজ্ঞান-প্রণোদিত হইয়া ও সম্পূর্ণরূপে আত্মনির্ভরশীল হইয়া স্বীয় জাতির উদ্ধার সন্ধানে বদ্ধপরিকর হইয়াছে সেই পরিমাণে তরুণ আন্দোলনের প্রসার হইয়াছে। আজ যে আমরা ভারতের একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত তরুণের জাগরণ দেখিতেছি তাহার অর্থ এই— ভারতের তরুণশক্তি আত্মবিশ্বাসী হইয়াছে, স্বীয় জাতির উদ্ধার সাধনের ভার গ্রহণ করিয়াছে এবং আরব্ধ ব্রত উদ্‌যাপনের জন্য সাধনায় প্রবৃত্ত হইয়াছে।

কেহ কেহ অজ্ঞতাবশত মনে করিয়া থাকেন যে, যুব-আন্দোলন রাষ্ট্র-নৈতিক আন্দোলনের নামান্তর মাত্র— কিন্তু এ ধারণা সত্য নয়। ফুল যখন ফোটে তখন প্রত্যেক পাপড়ির মধ্যে তার সুষমা ও সৌরভ আত্মপ্রকাশ লাভ করে। বহুদিন শয্যাশায়ী থাকার পর মানুষ যখন পূর্বস্বাস্থ্য ফিরিয়া পায় তখন শরীরের প্রত্যেক অংগের ভিতর দিয়া শক্তি, তেজ ও প্রফুল্লতা ফুটিয়া ওঠে। শৈশব ও কৈশোর পার হইয়া আমরা যখন যৌবন-রাজ্যে অভিষিক্ত হই তখন প্রকৃতিদেবী সকল সম্পদে আমাদিগকে ভূষিত করেন। শারীরিক শক্তি, মানসিক তেজ, নৈতিক বল, শৌর্য, বীর্য— সব দিক দিয়া আমরা মানুষ হইয়া উঠি। ব্যক্তির জীবনে যতগুলি দিক আছে এবং জাতির জীবনে যতগুলি দিক আছে— ততগুলি দিক আছে যুব-আন্দোলনের। এই বিচিত্র আন্দোলনের বিভিন্ন রূপের মধ্যে কোনো রূপটি হেয় নয়। এই রূপের সমষ্টিতে যে অভিনব সৌন্দর্য-সৃষ্টি হয় তাহাই যুবক মাত্রেরই কাম্য ও সাধ্য।

যুব-আন্দোলন রাষ্ট্রনৈতিক আন্দোলন নয়, কিন্তু তা বলিয়া ইহা non-

political নয় ; রাজনীতি বর্জন করা এ আন্দোলনের উদ্দেশ্য নয়। এই আন্দোলনে রাষ্ট্রনীতির স্থান আছে, যেমন জাতীয় আন্দোলনেও রাষ্ট্রনীতির স্থান আছে। কিন্তু তার জন্য আমরা বলিতে পারি না যে জাতীয় আন্দোলন রাষ্ট্রনৈতিক আন্দোলন মাত্র। কাব্য, সাহিত্য, শিল্পকলা, দর্শন-বিজ্ঞান, ব্যবসায়-বাণিজ্য, ব্যায়াম-ক্রীড়া, সমাজ ও রাষ্ট্র এ-সবের মধ্য দিয়া জাতীয় জীবনের বিকাশ হইয়া থাকে। সুতরাং এ-সবের ভিতর দিয়া তরুণের আত্ম-প্রকাশ ঘটিয়া থাকে। অন্তরের প্রাণ যখন জাগে তখন সুপ্তোত্থিত প্রাণধারা শতমুখী হইয়া নিজেকে প্রকট করে। কোন্ মন্ত্রবলে সুপ্তশক্তির বোধন হইতে পারে তাহাই অনুসন্ধানের বিষয়।

অনেকের ধারণা যে জনসাধারণকে বা তরুণ সমাজকে জাগাইতে হইলে রাষ্ট্র বা সমাজ-সম্পর্কীয় মতবাদ প্রচার করিতেই হইবে। সমাজ বা রাষ্ট্রের আদর্শ কি হওয়া উচিত এ বিষয়ে আজকাল অনেক প্রকার মতবাদ (বা 'Ism') প্রচলিত আছে যথা—Anarchism, Socialism, Communism, Bolshevism, Syndicalism Republicanism, Constitutional monarchy, Fascism ইত্যাদি। এক-একটি "ism"-এর গোঁড়া ভক্তেরা মনে করেন যে ঐ মতের প্রতিষ্ঠা হইলে পৃথিবীর সকল দুঃখ দূর হইবে। আজকাল তাই কোনো কোনো দেশে "ism"-এর লড়াই খুব ঘনাইয়া উঠিয়াছে। আমার নিজের কিন্তু মনে হয় যে কোনো ism-এর বা মতবাদের দ্বারা মানবজাতির উদ্ধার হইতে পারে না, যদি সর্বাগ্রে আমরা মানুষোচিত চরিবল লাভ না করিতে পারি। স্বামী বিবেকানন্দ তাই বলিতেন— man-making is my mission— মানুষ তৈরি করা আমার জীবনের উদ্দেশ্য। জাতিগঠনের এবং ism প্রতিষ্ঠার ভিত্তি— খাঁটি মানুষ। খাঁটি মানুষ সৃষ্টি করা যুব আন্দোলনের প্রধান উদ্দেশ্য। খাঁটি মানুষ সৃষ্টি করিতে হইলে সবদিক দিয়া তাহার বিকাশ হওয়া চাই। ইহা হইতে প্রতিপন্ন হইবে যে যুব-আন্দোলনের সহিত Socialism বা সমাজতন্ত্র-বাদের অভেদ প্রতিপন্ন করা ঠিক নয়। সব "ism"-এর মূলে যে সমস্যা— সেই সমস্যার সমাধান করা যুব-আন্দোলনের অন্যতম আদর্শ।

তরুণ-আন্দোলনের দুইটি দিক আছে— আন্তর্জাতিকতার দিক ও জাতিয়তার দিক। আন্তর্জাতিকতার দিক হইতে এই আন্দোলনের উদ্দেশ্য— বিশ্বমানবকে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করা। দেশ ও জাতি নির্বিশেষে মানুষে

মানুষে যে ভাইয়ের সম্বন্ধ— এ ভাব তরুণ-আন্দোলনের দ্বারা স্পষ্ট হইয়াছে। আন্তর্জাতিক যুব-সম্মেলনের অধিবেশন এই ভাব সঞ্চারের সহায়তা করিয়া থাকে। আজ আত্মস্থ তরুণ-জাতি অনুভব করিতেছে যে সব দেশে ও সব যুগে তরুণের আদর্শ, প্রেরণা, সাধনা ও অনুভূতি মূলত একই। বিশ্বের তরুণ সম্প্রদায়ের মধ্যে এই আত্মীয়তা ও অভেদাত্মা-ভাব ঘনীভূত হইলে ইহার প্রভাব যে কতদূর পৌঁছিবে তাহা চিন্তা করিলেই আমরা বুঝিতে পারিব।

বিভিন্ন জাতির মধ্যে যে বিদ্বেষ-বহ্নি এখন প্রজ্বলিত আছে তাহা যদি নির্বাপিত করিতে হয় তাহা হইলে দেশে দেশে আন্দোলনের যথেষ্ট প্রসার হওয়া উচিত। বিভিন্ন জাতির মধ্যে যাহাতে যুদ্ধবিগ্রহ না হয় এবং পৃথিবীতে শান্তি যাহাতে স্থাপিত হয় এই উদ্দেশ্যে অনেক দেশের তরুণেরা সংঘবদ্ধ হইতেছে। তরুণেরা এতদিন পরে বুঝিতে পারিয়াছে যে কূট রাজনীতি-বিদ্‌দের হাতে তাহারা ক্রীড়ার পুত্তলিকার মতো। কামান-বন্দুকের সম্মুখে তাহাদিগকেই বারে বারে অগ্রসর হইয়া আত্মবলিদান করিতে হইবে— অথচ এমন অনেক যুদ্ধ হয় যাহা শুধু কূট চক্রান্তের ফল এবং তাহার দ্বারা কোনো জাতির প্রকৃত কল্যাণ হয় না। পৃথিবীতে শান্তি স্থাপনের চেষ্টা এখন ব্যর্থ হইবেই হইবে কারণ আজ অনেক জাতি শৃঙ্খলিত ও পরপদদলিত। যে পর্যন্ত তাহারা সকলে মুক্ত না হইতেছে সে পর্যন্ত শান্তির অর্থ দাসত্ব ও পরাধীনতা। তথাপি এ-কথা স্বীকার করিতে হইবে যে যদি কোনোদিন পৃথিবীতে শান্তি সংস্থাপিত হয়— তবে বিশ্বের তরুণ সমাজই তাহা স্থাপনা করিবে।

শান্তি সংস্থাপনের চেষ্টা ব্যতীত অন্যান্য অনেক বিষয়ে দেশ-বিদেশের তরুণেরা সংঘবদ্ধভাবে কাজ করিতে শিখিবে। মানুষের স্বভাব সব দেশেই মোটের উপর একই রকম এবং মানব-জীবনের সমস্যাগুলি সর্বদেশে ও সর্বযুগে প্রায় একই প্রকার। এ অবস্থায় বিভিন্ন দেশের তরুণ সমাজ আন্তর্জাতিকতার সূত্রে আবদ্ধ হইলে যে পরস্পরের সাহায্য করিতে পারেন এ কথা আমরা সহজেই বুঝিতে পারি।

জাতীয়তার দিক হইতে যুব-আন্দোলনের উদ্দেশ্য নূতন আদর্শে নূতন জাতি গড়িয়া তোলা। নূতন জাতি সৃষ্টি করিতে হইলে জাতীয় অভ্যুত্থান ও পতনের নিয়ম বা কারণ প্রথমে আবিষ্কার করিতে হইবে। আমরা মনে

করিতে পারি যে প্রাচীন কাল হইতে বিভিন্ন জাতির যে অভ্যুত্থান ও পতন দেখা যাইতেছে ইহার পশ্চাতে বিধির কোনো বিধান নাই। এ বিষয়ে পাশ্চাত্য দেশে বহু চিন্তা ও গবেষণা হইয়া গিয়াছে এবং কোনো কোনো বৈজ্ঞানিক এই অভ্যুত্থান ও পতনের কারণ নির্দেশ করিতে পারিয়াছেন বলিয়া মনে করেন। তাঁহাদের গবেষণার সারমর্ম এই যে, ব্যক্তির জীবনে যেরূপ জন্ম মৃত্যু বিকাশ আছে, জাতির জীবনেও তদ্রূপ জন্ম, উন্নতি ও মৃত্যু আছে। জীবনী-শক্তি হ্রাস পাইলে ব্যক্তি যেরূপ মৃত্যুমুখে পতিত হয়, জাতিও তদ্রূপ মুমূর্ষু হইয়া পড়ে। কখনো জাতিবিশেষ ধরাপৃষ্ঠ হইতে একেবারে বিলুপ্ত হইয়া যায় এবং মাত্র ইতিহাসের পৃষ্ঠায় তার অস্তিত্বের নিদর্শন পাওয়া যায়, কখনো-বা জাতিবিশেষ একেবারে বিলুপ্ত না হইয়া নররূপী পশুর মতো কোনো প্রকারে জীবনধারণ করিতে থাকে। যে জাতি নিতান্ত ভাগ্যবান্ সে জাতি মৃত্যুর দ্বারদেশে উপনীত হইয়াও আবার পুনর্জন্ম লাভ করে। কিরূপ অবস্থায় জাতির পুনর্জন্ম হওয়ার সম্ভাবনা আছে তাহাও কোনো কোনো বৈজ্ঞানিক নির্দেশ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। বিভিন্ন জাতির রক্ত সংমিশ্রণের ফলে এবং বিভিন্ন শিক্ষার (culture) সংস্পর্শের ফলে জাতির এবং জাতীয় সভ্যতার পুনর্জন্ম হইতে পারে। পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকের বাণী আমরা গ্রহণ করি আর না করি এ-কথা বোধ হয় স্বীকার করিতে হইবে যে ভারতবর্ষে বিভিন্ন জাতির মধ্যে রক্ত সংমিশ্রণ ঘটিয়াছে এবং বিভিন্ন জাতির আগমনের ফলে এই ভারত-ভূমি বিভিন্ন শিক্ষাধারার সংগমস্থলে পরিণত হইয়াছে। হয়তো এই সংমিশ্রণের দরুনই ভারতীয় জাতি ও ভারতের সভ্যতা বার বার মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াও পুনর্জন্ম লাভ করিয়াছে এবং তাহারই ফলে এই প্রাচীন জাতি অমর হইয়া পৃথিবীর বুকে বাস করিতেছে।

বিবিন্ন জাতি বা বিভিন্ন বর্ণের মধ্যে রক্ত-সংমিশ্রণের পরিণাম সম্বন্ধে আমাদের মত যাহাই হউক-না কেন, এ-কথা বোধ হয় কেহ অস্বীকার করিবে না যে বিভিন্ন সভ্যতা ও শিক্ষার (culture) সংঘর্ষের দরুন চিন্তাজগতে বিপ্লব উপস্থিত হয়। এই বিপ্লবই জাতির চৈতন্যের লক্ষণ। ইংরেজ এদেশে আসার পর আমাদের চিন্তাজগতে একটা বড়ো রকমের ওলটপালট হইয়াছিল। ইহা বর্তমান যুগের নবজাগরণের সূত্রপাত। তারপর হইতে আমরা অন্তর্দৃষ্টি ফিরিয়া পাইয়াছি, নিজেদের বর্তমান অবস্থা বিশ্লেষণ করিয়া দেখিতে শিখিয়াছি এবং আমাদের বর্তমান অবস্থার সহিত একদিকে আমাদের প্রাচীন

অবস্থার তুলনা করিয়াছি এবং অপরদিকে স্বাধীন জাতির অবস্থা তুলনা করিয়াছি। নিজেদের বর্তমান অবস্থার হীনতা ও লাঞ্ছনার অনুভূতির সঙ্গে সঙ্গে আমরা গৌরবময় ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখিতে শিখিয়াছি। যে ভবিষ্যতের স্বপ্ন আমরা দেখিতে শিখিয়াছি তাহা আমাদের গৌরবময় অতীত হইতেও অধিক গরিমাময়। এই স্বপ্ন বা আদর্শবাদের মধ্যে সৃষ্টির বীজ লুক্কায়িত। জাতিকে যদি জাগাইতে হয় তাহা হইলে বর্তমানের প্রতি প্রবল অসন্তোষ সৃষ্টি করিতে হইবে এবং এক উচ্চ আদর্শের ধ্যান করিতে শিখাইতে হইবে। তাই আমাদের যুব-আন্দোলনের একদিকে আছে অসন্তোষ, আর-এক দিকে আছে আদর্শের আকর্ষণ।

কোন্ মতবাদকে ভিত্তি করিয়া নূতন সমাজ গড়িবার চেষ্টা করিব এ-বিষয়ে অনেক আলোচনা হইয়াছে ও হইতেছে। আমি এ ক্ষেত্রে এ আলোচনায় প্রবেশ করিব না; আমি শুধু মূল আদর্শের দিকে আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চাই। যে মতবাদ বা ইজম্ আপনি গ্রহণ করুন-না কেন, তাহা যদি সার্থক করিয়া তুলিতে হয়, তাহা হইলে অতীত ইতিহাসের ধারা, আমাদের পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও চারিদিকের আবহাওয়া স্মরণ করিয়া কাজ করিতে হইবে। উদাহরণ-স্বরূপ আমি বলিতে চাই যে কার্ল মার্কসের নীতি কাজে পরিণত করিবার সময় বর্তমান রুশ জাতি বা বলশেভিকগণ এমন পরিবর্তন করিতে বাধ্য হইয়াছেন যাহা প্রকৃতপক্ষে কার্ল মার্কসের মূল নীতির বিরোধী। অনেকের ধারণা আছে যে Socialism অথবা Republicanism বুঝি-বা পাশ্চাত্য সামগ্রী, কিন্তু এ ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত; প্রাচীন ভারতের কোনো কোনো নিভৃত প্রান্তে তার নিদর্শন পাওয়া যায়।

এই-সব মতবাদ বা প্রতিষ্ঠান প্রাচ্যও নয় অথবা পাশ্চাত্যও নয়— ইহা বিশ্বমানবের সম্পত্তি। ভারত আজ যদি কায়মনোবাক্যে Socialism গ্রহণ করিতে সংকল্প করে, তাহা হইলেই যে ভারত বিদেশীভাবাপন্ন হইয়া পড়িবে সে আশা আমি করি না। কিন্তু যে ism বা মতবাদ আমরা গ্রহণ করি-না-কেন, ইতিহাসের ধারা ও বর্তমানের প্রয়োজন উপেক্ষা করিলে আমাদের সৃষ্টিকার্য কখনো সার্থক বা সাফল্যমণ্ডিত হইতে পারিবে না।

আজ ভারতের এই হীন অবস্থা কেন? আছে তো সবই— প্রকৃতি, সৌন্দর্য, শারীরিক বল, শিক্ষা, দীক্ষা, শৌর্য, বিদ্যা,বুদ্ধি— এর কোনোটির তো অভাব নাই; এ-সব উপাদান লইয়া আমরা এক নিখুঁত মূর্তি রচনা

করিতে পারি কিন্তু প্রাণ প্রতিষ্ঠার আয়োজন কোথায়? প্রাণ প্রতিষ্ঠা হইবে সেই দিন— যেদিন সমগ্র জাতির মধ্যে মুক্তিলাভের প্রবল আকাঙ্ক্ষা জাগরিত হইবে। কোথায় সে পুরোহিত যে মৃতসঞ্জীবনী সুধা আহরণ করিয়া মুমূর্ষু জাতির দেহপিঞ্জরের মধ্যে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিতে পারে? যে ব্যক্তি মুক্তির আস্বাদ পাইয়াছে, মুক্ত হইবার জন্য এবং জাতিকে মুক্ত করিবার জন্য যে ব্যক্তি পাগল হইয়াছে, সে অপরকে পাগল করিতে পারে এবং সে-ই 'জাতীয় যজ্ঞে'র পুরোহিত হইবার যোগ্য। আমাদের এই যুব-আন্দোলন এইরূপ শত-সহস্র পুরোহিত সৃষ্টি করুক।

আমাদের আছে সবই, নাই শুধু এক বস্তু— নিঃশেষে আত্মবলিদান— বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া, যাবতীয় বিপদ তুচ্ছজ্ঞান করিয়া একটা আদর্শের পশ্চাতে সারাটি জীবন অনুধাবনের ক্ষমতা। এই ক্ষমতা, এই tenacity of purpose আমাদের নাই, ইংরেজের আছে— তাই ইংরেজ এত বড়ো আর আমরা এত হীন, আমরা অন্তরের সঙ্গে দেশকে ভালোবাসি না, স্বজাতিকে ভালোবাসি না তাই আমরা করি গৃহবিবাদ, তাই আমাদের মধ্যে জন্মায় মীরজাফর উমিচাঁদ। মীরজাফর ও উমিচাঁদ আজও মরে নাই— এখনো তাদের বংশবৃদ্ধি হইতেছে। আমরা যদি দেশকে ভালোবাসিতে শিখি তাহা হইলে আত্মবলিদানের ক্ষমতা লাভ করিব, আমাদের চরিত্রে অবিরাম ও অশ্রান্ত পরিশ্রমের ক্ষমতা tenacity of purpose ফিরিয়া আসিবে। এই দুইটি বল— tenacity of purpose বা moral stamina কোথায় পাইব? বনে জঙ্গলে যুগ-যুগান্তর তপস্যা করিলেও পাইব না! পাইব নিষ্কাম কর্মের মধ্যে জীবন ঢালিয়া দিলে— অবিরাম সংগ্রামে লিপ্ত হইলে, ঘরের কোণে বসিয়া উপাসনা করিলে বা সংসার ত্যাগ করিলে, সন্ন্যাস গ্রহণ করিলে— সাধনা বা শক্তি সঞ্চয় হয় না।

শক্তি পূজা কথার কথা না
যদি কথার কথা হত তবে চিরদিন ভারত
শক্তিপূজে শক্তিহীন কভু হত না।

সাধনার স্বরূপ তাই স্বামী বিবেকানন্দ ব্যাখ্যা করেছিলেন এইভাবে:

"পূজা তাঁর সংগ্রাম অপার
সদা পরাজয়,
তাহা না ডরাক তোমা,
হৃদয় শ্মশান, নাচুক তাহাতে শ্যামা।"

এই কর্ম-সংগ্রামে অবিরতভাবে আত্ম-নিয়োগ করিতে পারিলে শক্তিলাভ হইবে। এই সংগ্রামের মধ্য দিয়াই পৃথিবীর স্বাধীন জাতিরা শক্তিশালী হইয়া উঠিয়াছে। ভারতের তরুণ সমাজ এই পথে চলুক; তাহা হইলে আমরা ফিরিয়া পাইব আমাদের লুপ্ত গৌরব, ফিরিয়া পাইব আমাদের প্রাচীন বিভব, ফিরিয়া পাইব আমাদের স্বাধীনতার ঐশ্বর্য আর বিশ্বের এই মুক্ত প্রাঙ্গণে আবার শির উন্নত করিয়া মানুষের মতো চলিতে শিখিব।

ছাত্র ও রাজনীতি

২ মার্চ ১৯২৯ মালিকান্দার অভয় আশ্রম ডাক্তারখানা প্রাংগণে প্রদত্ত ভাষণ।

ভারতবর্ষ এক যুগ-সন্ধিক্ষণে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। এ যুগে ভারতের প্রত্যেক ছাত্রেরই রাজনীতিতে যোগদান করা কর্তব্য। কিছুদিন পূর্বে অনেক অভিভাবক ও শিক্ষক মনে করিতেন ছাত্রদের রাজনীতিতে যোগদান করা দূষণীয়। সুখের বিষয় এখন মতের অনেক পরিবর্তন হইয়াছে। পৃথিবীর অন্য সকল দেশের ছাত্রদের ন্যায় এদেশের ছাত্ররাও রাজনীতিতে যোগদান করিতেছেন— রাজনীতিচর্চা শিক্ষার একটা অংশ বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। কিছুদিন পূর্বে কলিকাতায় যে ছাত্রসম্মিলনী হইয়া গিয়াছে তাহা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলার ড. আর্কুহার্ট উদ্বোধন করেন। ছাত্রদের প্রধান কর্তব্য— শিক্ষার সংগে সংগে রাজনীতিতে যোগদান করা এবং দেশের সর্বপ্রকার জনহিতকর কার্যে যোগদান করা। বর্তমান স্কুল-কলেজের শিক্ষায় দেশের কোনো ফল হয় না। অনেক বি. এ., এম. এ. পাস করিয়া হাকিম উকিল প্রভৃতি হইতেছে, কিন্তু তাহারা দেশের কোনো উপকারে আসে না। ছাত্র ও যুবকেরাই দেশের সৈনিক— যুদ্ধে যেমন একদল সৈনিকের মৃত্যু হইলে তৎক্ষণাৎ অন্য একদল সৈন্য আসিয়া সে স্থান পূরণ করে, সেইরূপ কোনো জাতীয় কর্মী অবসর গ্রহণ করিলে ছাত্রদের মধ্য হইতে সেই স্থান পূর্ণ করা কর্তব্য।

ইংরেজ শাসনের ইতিহাস

প্রথমে ইংরেজ এদেশে বণিকরূপে আসে, তখন মুসলমান বাদশাহের কাছে তাহাদিগকে কুর্নিশ করিয়া কুঠি নির্মাণ করিবার জন্য একখণ্ড ভূমি এবং বাণিজ্য করার জন্য অনুমতি প্রার্থনা করিতে হইয়াছিল। তারপর তাহারা এ-যাবৎ বাণিজ্যের সংগে সংগে এদেশে শাসন ও শোষণ করিয়া আসিতেছে। মুসলমান রাজত্বের সময়ে আমাদের দেশে কোনোপ্রকার অভাব-অভিযোগ ছিল না, কারণ মুসলমান রাজারা এদেশেই বাস করিতেন— এ-দেশকেই তাঁহারা নিজের দেশ বলিয়া মনে করিতেন এবং তাঁহাদের সমস্ত অর্থ এদেশের মংগলের জন্যই ব্যয় করিতেন। কিন্তু বর্তমানে শাসকগণ এ দেশ শাসন করিয়া নিজের দেশের জন্যই অর্থ ব্যয় করে। ফলে ভারতবর্ষে দিন দিন দারিদ্র্য বাড়িতেছে।

কংগ্রেস

ভারতের অনেক ব্যাধি— শিক্ষার অভাব, খাদ্যের অভাব, জলের অভাব, স্বাস্থ্যের অভাব ; কিন্তু এই ব্যাধির মধ্যে সর্বপ্রধান ব্যাধি— ভারতের পরাধীনতা। এই ব্যাধি ঘুচিলেই অন্য সব ব্যাধি ঘুচিবে— এইজন্য চাই স্বাধীনতা। ভারতকে স্বাধীন করিতে হইলে কংগ্রেসকে শক্তিমান করিতে হইবে। এইজন্য প্রয়োজন গ্রামে গ্রামে কংগ্রেস কমিটি স্থাপন— অর্থ ও স্বেচ্ছা-সেবক সংগ্রহ। ১৯২১ সালে যে আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছিল, অনেকে মনে করেন যে সে আন্দোলন বন্ধ হইয়াছে। বাহিরের চাঞ্চল্য ও উৎসাহ প্রভৃতি নাই দেখিয়া যদি কেহ মনে করেন যে অসহযোগ আন্দোলন বন্ধ হইয়াছে তবে তিনি ভুল করিবেন। উদ্দেশ্য সাফল্যমণ্ডিত না হওয়া পর্যন্ত কোনো আন্দোলন বন্ধ হইতে পারে না। সরকার অনেক প্রকারে এই আন্দোলনকে বন্ধ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন-- কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য হইতে পারেন নাই। ১৯২১ সালের অসহযোগ আন্দোলনের উদ্দেশ্য ও নীতি কোনো প্রকারেই পরিবর্তন করা হয় নাই। তবে সময়ের ও অবস্থার জন্য কাজের কিছু পরিবর্তন করা হইয়াছে। অসহযোগ আন্দোলনের উদ্দেশ্য ও প্রভাব অনেক আগেই যাহা ছিল কংগ্রেস চল্লিশ বৎসর ধরিয়া দেশের মধ্যে তাহাই প্রচার করিয়া আসিতেছেন। মহাত্মা গান্ধী ১৯২০ সালে এই আন্দোলনে এক নূতন রূপ দিয়াছিলেন, স্বাধীনতা না পাওয়া পর্যন্ত এ আন্দোলন কিছুতেই বন্ধ হইতে পারে না।

সাইমন কমিশন

সরকার ভারতবাসীর সমবেত ইচ্ছার বিরুদ্ধে সাইমন কমিশন নিয়োগ করিয়া ভারতবাসীকে অপমান করিয়াছে ও তাহাদের আত্মসম্মানে আঘাত দিয়াছে। আমরা আমাদের ঘরের ব্যবস্থা নিজেরা করিতে পারি ও করিতে চাই— ইহাতে পরের সাহায্য চাই না। যদি আমরা একটি কমিটি গঠন করিয়া ইংলণ্ডে গিয়া তথাকার দেশবাসীর ব্যবস্থা বন্দোবস্ত করিয়া দিতে বলি তাহা হইলে তাহারা যেমন আমাদের আবদার কিছুতেই সহ্য করিবে না, আমরাও তেমনি সরকারের এ আবদার কিছুতেই সহ্য করিব না, আমরা এই কমিশনকে সর্বপ্রকারে বর্জন করিয়া চলিব। প্রত্যেক ভারতবাসীরই কমিশনকে সর্বপ্রকারে বর্জন করা কর্তব্য।

১৯২৯ সালের কার্যক্রম

আমরা বিদেশী বস্ত্র বয়কট আন্দোলন এই বৎসর সফল করিতে চাই। বিদেশী বস্ত্র বর্জন করিতে হইলে চরকার বহুল প্রচার চাই। আমাদের দেশে অনেক তাঁতি আছে যাহারা একযোগে কার্য করিলে আমাদের বস্ত্রের অভাব অনেক পরিমাণে হ্রাস পাইবে। যদি আমরা চরকা কাটিয়া সুতা নিজের ঘরে প্রস্তুত করিয়া লইতে পারি, তবে তদ্দারা যে বস্ত্র হইবে তাহা একেবারে দেশী — এইভাবে যদি আমরা নিজেদের বস্ত্র-শিল্পের উন্নতি করিতে পারি তবে আমাদের বয়কট-আন্দোলন সফল হইতে পারে। এ বৎসরে আমরা প্রত্যেক জেলা হইতে পাঁচ হাজার করিয়া স্বেচ্ছাসেবক চাই। আমি আশা করি প্রত্যেক ছাত্র ও যুবক স্বেচ্ছাসেবক হইবেন।

মালিকান্দা

আমি আপনাদের একটি কথা বলিতে চাই। মালিকান্দা অঞ্চলের প্রত্যেক বালকবালিকার শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে ও প্রত্যেক গ্রামে একটি করিয়া প্রাইমারি বিদ্যালয় খুলিতে হইবে। এর বেশি কিছু আমি আর বলিতে চাহি না। কারণ মালিকান্দা শ্রদ্ধেয় ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষের জন্মস্থান ও কর্মক্ষেত্র। অনেকদিন পূর্বেই শ্রদ্ধেয় প্রফুল্লবাবুর সহিত পরিচিত হইবার সৌভাগ্য আমার হইয়াছিল : কিন্তু তাঁহার এই সাধনার ক্ষেত্র দেখিবার ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও এতদিন এখানে আসিবার সৌভাগ্য আমার ঘটে নাই। আজ এখানে আসিয়া এবং তাঁহার কর্মপ্রচেষ্টা দেখিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়া বিশেষ প্রীতিলাভ করিলাম। আমার মনে হয় এইরূপ কর্মকেন্দ্র বাংলার প্রত্যেক জেলায় স্থাপিত হইলে আমরা স্বরাজলাভে সক্ষম হইব। আশা করি আপনারা তাঁহার নেতৃত্বে থাকিয়া দিনে দিনে দেশের কার্যে অগ্রসর হইবেন এবং ভগবানের আশীর্বাদ লাভেও সক্ষম হইবেন। বন্দে মাতরম্।

মহাত্মা গান্ধীর মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখুন

৪ মার্চ ১৯১৯ শ্রদ্ধানন্দ পার্কের জনসভায় প্রদত্ত ভাষণ।

সমবেত ভদ্রমহোদয় ও ভদ্রমহিলাগণ, আজিকার এই সভায় আমরা বিশেষ বক্তৃতা করিতে চাই না। আজ আমরা স্বয়ং মহাত্মাজীর মুখ হইতে বিদেশী বর্জনের বাণী শুনিব এইজন্য এখানে সমবেত হইয়াছি। বিদেশী বস্ত্র বর্জনের বাণী বাংলাদেশে নূতন নহে। ১৯০৫ খ্রীস্টাব্দ হইতে আজ পর্যন্ত আমরা বিদেশী বর্জনের পথেই চলিয়াছি। তথাপি স্বীকার করিতে হইবে— আমরা আশানুরূপ ফল পাই নাই। তাই বারে বারে কাগজে লিখিয়া, পুস্তিকা প্রচার করিয়া এবং সভা করিয়া দেশবাসীকে এই কথা স্মরণ করাইয়া দিতে হয়। এই কথা আজ আবার স্মরণ করাইয়া দিবার জন্যই স্বয়ং মহাত্মাজী আসিয়াছেন। আপনারা অনেকে জানেন, অনেকদিন পর মহাত্মাজী আবার কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছেন। আমার অনুরোধ, আপনারা মহাত্মার সম্মান রক্ষা করিবেন। আজ তাঁহার মুখে যে বাণী শুনিবেন তাহার মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিবেন। অনেকদিন হইল আমরা এই ব্রত গ্রহণ করিয়াছি। মাঝে অবসাদ আসিয়াছিল, গতবছর হইতে আবার নব আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছে।

সমাজ-শক্তি

আমাদের কিরূপ বস্ত্রশিল্প ছিল, এবং কিরূপে ইহা ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে তাহা অনেকেই জানেন না। বিলাতী বণিকের অত্যাচারে, গভর্নমেণ্টের শুষ্ক ধার্যে এই শিল্প নষ্ট হইয়া গিয়াছে। আমাদের হাতে আইন নাই, রাষ্ট্রশক্তি নাই, কিন্তু সমাজশক্তি আছে। যদি এই শক্তি প্রয়োগ করিতে পারি তবে আমরা বর্জন সফল করিতে পারিব।

আমি আর অধিক কিছু বলিতে চাই না। তবে বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির সভাপতিরূপে করজোড়ে আপনাদের চরণে এই নিবেদন, আপনারা মহাত্মাজীর সম্মান রক্ষা করিবেন। মীরজাফর উমিচাঁদ এখনো আমাদের মধ্যে আছে। তাহাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত আমাদিগকেই করিতে হইবে। আপনারা আজ রাত্রিতে প্রতিজ্ঞা করিবেন— প্রভাত হইলে আর বিদেশী বস্ত্র স্পর্শ করিবেন না। বন্দেমাতরম্

কর্তব্য পালনে অবহিত হউন

৪ মার্চ ১৯২৯ শ্রদ্ধানন্দ পার্কের সভার পরে মহাত্মা গান্ধী ও শ্রীযুক্ত কিরণশংকর রায়ের গ্রেপ্তারের পরিপ্রেক্ষিতে দেশবাসীর প্রতি নিবেদন।

শ্রদ্ধানন্দ পার্কে বিলাতী বস্ত্র দাহ বন্ধ করিতে চেষ্টা করিয়া এবং মহাত্মা গান্ধী ও কিরণশংকর রায়কে গ্রেপ্তার করিয়া গভর্নমেণ্ট আমাদিগকে অগ্নিপরীক্ষায় আহ্বান করিয়াছেন। আশা করি, বাঙালী এই আহ্বানে সাড়া দিবে এবং এই প্রদেশ হইতে বিলাতী বস্ত্র দূরীভূত করিয়া অগ্নি-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে সক্ষম হইবে। এই প্রদেশের যে-সকল স্থানে বিলাতী বস্ত্র দাহ করা সম্ভব, সেই-সমস্ত স্থানে যেন উহা নিঃশেষে দাহ করা হয়। শ্রদ্ধানন্দ পার্কের মতো কলিকাতার পার্কসমূহে বিলাতী বস্ত্র পোড়ানো আইনসংগত কিনা তাহা নির্ধারিত না হওয়া পর্যন্ত ঐ-সমস্ত স্থানে দাহ-কার্য সম্পন্ন করা উচিত হইবে না। কিন্তু ইতিমধ্যে আমরা ব্যক্তিবিশেষের বাড়িতে অথবা ঐরূপ অন্যান্য স্থানে এই কার্য সম্পন্ন করিতে পারিব। আজ মহাত্মা গান্ধী যে পবিত্র বহ্নিশিখা প্রজ্বলিত করিয়াছেন তাহাতে যে বিলাতী বস্ত্র নিঃশেষে দগ্ধ হইয়া যাইবে তাহাতে আমার কোনো সন্দেহ নাই। বাঙালী যেন গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া কর্তব্য পালনে অবহিত হয়।

বিদেশী বস্ত্রযজ্ঞ : একটি বিবরণ

৪ মার্চ ১৯২৯ সন্ধ্যায় শ্রদ্ধানন্দ পার্কের শান্ত জনতার উপর পুলিসের অত্যাচার সম্পর্কে বিবরণ।

সোমবারের সভার শেষ পর্যন্ত আমি শ্রদ্ধানন্দ পার্কে উপস্থিত ছিলাম। রাত্রি নয় ঘটিকার সময় আমি সে স্থান হইতে চলিয়া আসি। মহাত্মা গান্ধী স্বয়ং বস্ত্রদাহের সূচনা করেন। অতঃপর অগ্নি প্রজ্বলিত হয়। ইহার একটু পরেই ইউরোপীয় সার্জেণ্ট ভারতীয় কর্মচারী ও কনস্টেবল লইয়া গঠিত একদল পুলিস তথায় আগমন করে এবং যেখানে আগুন জ্বলিতেছিল সে স্থান ঘিরিয়া ফেলে। পুলিসের হাতে লাঠি ছিল। পুলিস গায়ে পড়িয়া মারপিট করে; কেহই তাহাদিগকে আগে আক্রমণ করে নাই। ইহাতে সমবেত জনতা ক্রুদ্ধ হইয়া

উঠে। মহাত্মা গান্ধী ও শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত প্রভৃতি তখন সকলকে শান্ত হইতে এবং আসন গ্রহণ করিতে অনুরোধ করেন। ইহার কিছু সময় পরে পুলিসের আক্রমণ একটু শান্ত হইলে মহাত্মা গান্ধী সভাস্থল পরিত্যাগ করেন। তখন ঘন ঘন "বন্দেমাতরম্" ধ্বনি উত্থিত হয়।

পুনরায় সভায় আগমন

মহাত্মাজীকে বিদায় দিয়া আমি আবার পার্কে ফিরিয়া আসিলাম। কারণ আমার সন্দেহ হইয়াছিল যে, পুলিস আবার আক্রমণ চালাইতে পারে এবং এ বিষয়ে যথাসাধ্য চেষ্টা করাই আমার কর্তব্য বিবেচনা করিয়াছিলাম। ফিরিয়া আসিয়া দেখিলাম যে, পার্কের বিভিন্ন স্থানে পুলিস জনতাকে আক্রমণ করিতেছে। জনতা তখন ছত্রভঙ্গ হইয়া চলিয়া যাইতেছিল। পুলিস যদি একটু ধৈর্য ধরিত তাহা হইলে কোনোই গোল বাধিত না। কয়েকজন পুলিস অফিসারকে আমি বার বার অনুরোধ করিলাম যে, তাঁহারা চলিয়া যাইতে পারেন এবং তাহাতে কোনো গোল বাধিবে না। আমি ইহাও বলিয়াছিলাম যে, তাঁহারা যদি কনস্টেবলদিগকে শান্ত করিতে পারেন তবে আমি জনতাকে সংযত করিবার ভার লইতে প্রস্তুত আছি। কিন্তু কিছুতেই পুলিস আমার কথা শুনিল না।

অপ্রত্যাশিত আক্রমণ

একবার পুলিস অকস্মাৎ লাঠি লইয়া আমাদিগকে আক্রমণ করে। আমি সেই সময় সহকর্মীদিগকে সঙ্গে লইয়া বি. পি. সি. সি.-র জিনিসপত্র স্থানান্তরিত করিবার আয়োজন করিতেছিলাম। আমি তখন অগ্রসর হইয়া এই অন্যায় আক্রমণের প্রতিবাদ করিলাম। সার্জেন্টগণ তখন লাঠি তুলিয়া আমার দিকে ধাইয়া আসিল। জনৈক পুলিস আমার গায়ে হস্তক্ষেপ পর্যন্ত করিয়াছিল। সৌভাগ্যবশত একটিও আঘাত আমার উপর পড়ে নাই। সেই পুলিসের নাম জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। কিন্তু কেহই তাহার উত্তর দিল না। আমি তাহার নম্বর জানিবার জন্য দেশলাই ধরাইয়াছি দেখিয়া সে গা ঢাকা দিল এবং অন্যান্য পুলিস তাহাকে সাহায্য করিল। অতঃপর একজন সার্জেন্ট আমার নিকট আসিয়া ব্যঙ্গ করিয়া বলিল— যদি পারেন একবার পুলিসের নম্বর খুঁজিয়া বাহির করুন।

এই ঘটনার পরও আমি পুলিস কর্মচারীদিগকে বারবার অনুরোধ

করিয়াছিলাম— তাহারা যেন পার্ক হইতে চলিয়া যায়। কিন্তু সে কথায় কেহই কর্ণপাত করে নাই। আমি আরো আধঘণ্টা আন্দাজ অপেক্ষা করিয়া দেখিলাম যে, পার্ক হইতে জনতা সকলেই একরূপ চলিয়া গিয়াছে। সেই সময় আমি ফিরিয়া আসি।

ইহার কিছুসময় পরে একজন প্রত্যক্ষদর্শী আসিয়া আমাকে বলিল যে, তখনো পুলিস লাঠি হস্তে পার্কের আশেপাশে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। অধিকন্তু আরো অশ্বারোহী পুলিস আসিয়া জনতাকে ইতস্তত তাড়া করিতেছে। রাত্রি সোয়া দশ ঘটিকায় এই সর্বশেষ সংবাদ পাইয়াছিলাম।

৫ মার্চ ১৯২৯

অন্তরে ও বাহিরে অগ্নি *

৬ মার্চ ১৯২৯ শ্রদ্ধানন্দ পার্কের সভায় প্রদত্ত ভাষণ।

মহাত্মাজী যে অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়াছেন, দেশে একখণ্ড বিলাতী বস্ত্র থাকা পর্যন্ত তাহা নির্বাপিত হইবে না। এই অগ্নি শুধু বাহিরে জ্বলে নাই; ইহা আজ সকলের অন্তরে অন্তরে জ্বলিয়াছে। দেশের সম্মুখে আর দুই বৎসর পড়িয়া রহিয়াছে। ইহার মধ্যে স্বরাজ লাভের জন্য সম্পূর্ণভাবে প্রস্তুত হইতে হইবে। গ্রামে গ্রামে কংগ্রেস কমিটি স্থাপন, অর্থ সংগ্রহ, কংগ্রেস সভ্য সংগ্রহ, স্বেচ্ছাসেবক দল গঠন ইত্যাদি কার্য দ্বারা কংগ্রেসকে শক্তিশালী করিতে হইবে। এমনিভাবে দেশ যখন প্রস্তুত হইয়া উঠিবে তখন বিলাতী বর্জনের আন্দোলন পূর্ণ সাফল্য লাভ করিবে সে বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। যদি আইন অমান্যের প্রয়োজনই হয়, দেশ তখন পশ্চাৎপদ হইবে না।

সেদিনকার অভিনয় আপনারা অনেকেই দেখিয়াছেন। আপনারা যে আজও এত অধিক সংখ্যায় আসিয়াছেন তাহাতে মনে হয় আপনারা সত্যই একটা সংকল্প লইয়া আসিয়াছেন। আজ এমন ঘটনা ঘটিয়াছে যাহার জন্য বর্জন আন্দোলন এক নূতন রূপ লইয়া দেখা দিয়াছে। বর্জন আন্দোলন শুধু আমাদের দেশেই নূতন নহে। স্বদেশের স্বাধীনতার জন্য আমেরিকা এবং আয়ারল্যান্ডবাসীগণ বিলাতী দ্রব্য বর্জন করিয়াছেন।

বর্জনের মহাস্ত্র

আমরা নিরস্ত্র হইলেও আমাদের হাতে এমন এক অস্ত্র আছে যাহার শক্তি অমোঘ। আমরা বিলাতের অন্ন যোগাই। বিলাতের লক্ষ লক্ষ লোক আমাদের সহিত ব্যবসা সূত্রে আবদ্ধ। প্রতি বৎসর একশত কুড়ি কোটি টাকার জিনিস বিদেশ হইতে এদেশে আমদানী হয়। সমস্ত ব্যবসাই আজ অন্যের হাতে। কিভাবে আমাদের বস্ত্রশিল্প নষ্ট হইয়াছে তা আপনারা জানেন। শতকরা পঁচিশ টাকা হইতে তিনশত টাকা পর্যন্ত শুল্ক বসাইয়া এই শিল্প নষ্ট করা হইয়াছে। শুধু তাই নয়, বিলাতের ব্যবসায়ী যদি ভারতের বস্ত্র আমদানী করে কিংবা তথাকার স্ত্রী কি পুরুষ যদি ভারতের বস্ত্র ব্যবহার করে তবে তাহাদের শাস্তি হইবে, এইরূপ বিধান ছিল। এ-সমস্ত আমরা তাহাদের লেখা পুস্তকেই পাই। এইভাবে ভারতের বস্ত্রশিল্প নষ্ট হইয়াছে, কিন্তু তাদের দোষ দিই না। সর্বাগ্রে আত্মরক্ষা, তারপর অন্য কথা। ইংরেজ আত্মরক্ষার জন্য এরূপ করিতে বাধ্য হইয়াছিল। আমরাও যদি এরূপ করি তবে দোষ হয় না। কিন্তু আমাদের বর্জন আন্দোলন ইংরেজকে মারিবার জন্য নহে— নিজেদের বাঁচাইবার জন্য : আবেদন নিবেদন অনেক করিয়াছি, সমস্তই ব্যর্থ হইয়াছে। এখন আমরা ঘরে ফিরিয়াছি। আমাদের শিল্পবাণিজ্য রক্ষা করিতে হইবে। আমাদের স্বাধীনতা লাভ করিতে হইবে। আমাদের দাবি ন্যায্য। আমাদের পথ সত্যের পথ, ন্যায়ের পথ।

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভিত্তি

এই ব্রিটিশ সাম্রাজ্য কি লাঠির উপর প্রতিষ্ঠিত? যদি তাহাই হয় তবে বলিব, ইহার পরমায়ু শেষ হইয়া আসিয়াছে। ইংরেজ বলিয়া থাকে, এদেশে ব্রিটিশ শাসন এদেশের লোকের সদিচ্ছার উপর প্রতিষ্ঠিত। যদি তাই হয় তবে গত পরশু এরূপ অভিনয় করিবার কারণ কি? বিনাবিচারে দেশের কর্মী-দিগকে কারারুদ্ধ করা হয়। তাহার অর্থ— প্রচলিত আইনে আর কুলায় না, কাজেই বুঝা যাইতেছে, ইংরেজ শাসন এদেশে সদিচ্ছার উপর নহে— অসদিচ্ছার উপর প্রতিষ্ঠিত। কাহাকেও বিদ্বেষ করা, ঘৃণা করা আমাদের জাতির প্রকৃতি নয়। কাজেই সেই জাতির সদিচ্ছা যদি নষ্ট হইয়া থাকে তবে বুঝিতে হইবে ইহার কারণ অতি গভীর।

বিদেশী বর্জনের সংগে সংগে গঠনমূলক কাজ চাই। গ্রামে গ্রামে কংগ্রেস কমিটি স্থাপন করিতে হইবে। এই প্রতিষ্ঠানগুলিকে কেন্দ্র করিয়া কাজ আরম্ভ করিতে হইবে। এজন্য তিনটি জিনিসের প্রয়োজন— কংগ্রেস সভ্য, অর্থ এবং কর্মী। কংগ্রেস স্থির করিয়াছেন, বাংলাদেশ হইতে আমাদের পাঁচ লক্ষ কংগ্রেস সদস্য দুই লক্ষ টাকা এবং এক হাজার কর্মী সংগ্রহ করিতে হইবে। এইভাবে যদি একবার কংগ্রেস কমিটিগুলিকে শক্তিশালী করিতে পারা যায় তবে সেই কার্যপদ্ধতি সফল করা যাইবে। সম্মুখে দুই বছর পড়িয়া আছে। ইহার মধ্যে আমাদিগকে প্রস্তুত হইতে হইবে। পথে বাধা-বিঘ্ন অনেক আছে জানি। কিন্তু কিছুতেই বিচলিত হইলে চলিবে না। মহাত্মা গান্ধী অনেকদিন পর আবার কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছেন। কাজেই বড়ো সুযোগ উপস্থিত। এ সুযোগ পূর্ণভাবে গ্রহণ করিতে হইবে। যদি এই গঠন-মূলক কর্মপদ্ধতি আমরা সফল করিয়া তুলিতে পারি তবে আমরা আইন অমান্যের জটিল সমস্যার সম্মুখীন হইতে পারিব। তখন কিছুই আমাদের সাধ্যাতীত হইবে না।

অন্তরে বাহিরে অগ্নি

৪ মার্চ মহাত্মা গান্ধী যে আগুন জ্বালিয়াছেন তাহা যতক্ষণ পর্যন্ত এক টুকরা বিলাতী বস্ত্র এদেশে থাকিবে কিছুতেই নিভিবে না। অগ্নি শুধু বাহিরে জ্বলে নাই, অগ্নি আজ অন্তরেও জ্বলিয়াছে। পার্কে বিলাতী বস্ত্রে অগ্নি সংযোগ পুলিস আইনে নাকি বে-আইনী। তাই আজ বাড়িতে বাড়িতে হস্টেলে হস্টেলে বস্ত্র পোড়াইতে হইবে। দেখি তাহাও বে-আইনী হয় কিনা। যদি তাহা হয় তবে বুঝিব, গৃহেও আমাদের কোনো অধিকার নাই।

তরুণের উপর গুরু দায়িত্ব

আজ তরুণ সমাজের উপর এই আন্দোলনের সাফল্য নির্ভর করিতেছে। তাহারাই দেশের আশাভরসা। তাহারা যদি প্রাণমনে এই আন্দোলনে যোগদান করে তবে আর কেহ আন্দোলন হইতে দূরে থাকিতে পারিবে না। তখন আমাদের সাফল্য অনিবার্য। দেশে যদি সত্যই সেরূপ জনতা সৃষ্টি হয় তবে শত মীরজাফর উমিচাঁদ থাকিলেও কেহই আমাদিগকে ব্যর্থ করিতে পারিবে না। আজ আমাদের সংগ্রাম আরম্ভ হইয়াছে। অবশ্য সংগ্রাম আমাদের অহিংস।

বিলাতী বস্ত্র নিক্ষেপ

আমি সমবেত শ্রোতৃমণ্ডলীকে আহ্বান করিতেছি— আপনাদের নিকট যদি বিলাতী কাপড়জামা থাকে— এখানে ফেলিয়া দিন।

সেদিন মহাত্মাজীও বলিয়াছেন, বিদেশী বস্ত্র বর্জনের সঙ্গে সঙ্গে খদ্দর পরিধান করিতে হইবে। মহাত্মাজীর ভাষায়— আপনারা চরকার কথা ভাবুন। মিলের ভাবনা মিলই ভাবিবে। আপনাদের সাহায্য ও সহানুভূতি ব্যতীত এই শিল্পগুলি বাঁচিতে পারে না। দরিদ্র এবং নিরন্নের জন্য এই শিল্পকে বাঁচাইয়া রাখিতে হইবে।

'জয় মা বলে ভাসা তরী'

বাঁচিবার জন্য, জাতীয় জীবনের জন্য, আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্য স্বরাজ লাভ করিতে হইবে। সকলে স্বরাজের সৈনিক হউন। 'জয় মা' বলিয়া তরী ভাসাইয়া দিন। আসুন আমরা সকলে মিলিয়া দুস্তর সাগরে পাড়ি দিই— পরপারে পেঁাছিবই।

বর্জন আন্দোলন ও বিদেশী বস্ত্রের বহ্ন্যুৎসব

৭ মার্চ ১৯২৯ সিমলা ব্যায়াম সমিতির প্রাঙ্গণে বর্জন আন্দোলন প্রচার ও বিদেশী বস্ত্রের বহ্ন্যুৎসব উপলক্ষে অনুষ্ঠিত জনসভায় প্রদত্ত ভাষণ।

মহাত্মা গান্ধীর গ্রেপ্তার ও শ্রদ্ধানন্দ পার্কে সেদিন যে ঘটনা ঘটিয়াছে, তাহার সম্বন্ধে গভীরভাবে চিন্তা করিলে ইহাই প্রতীয়মান হয় যে, সমগ্র দেশব্যাপী এই আন্দোলনকে দমন করার উদ্দেশ্যেই এইরূপ করা হইয়াছে। ইহাতে দেশবাসী উত্যক্ত হইয়া উঠিয়াছে। এইজন্যই সকলে বাহিরে আসিয়া বিদেশী বস্ত্রে অগ্নি সংযোগে উদ্যত হইয়াছে। আজ সকলে শুধু বিদেশী বস্ত্র দাহ করিয়াই নিরস্ত হইতেছি না, পরন্তু ভগবানের নিকট এই প্রার্থনা জানাইতেছি যে, দেশ হইতে বিদেশী বস্ত্র সম্পূর্ণভাবে দূর করিবার ক্ষমতা যেন তিনি তাহাদিগকে দেন।

দেশের মুক্তির জন্য যে শক্তি প্রয়োগের দরকার, সেই শক্তি প্রয়োগের ক্ষমতাই বর্জন-আন্দোলনের অন্তর্নিহিত প্রকৃত স্বরূপ। দেশের তরুণ

দলেরই এই কাজে সর্বাগ্রে অগ্রসর হওয়া উচিত। তাঁহারা দেশের সর্বত্র ঘুরিয়া বিদেশী বস্ত্র বর্জনের বাণী প্রচার করুন।

আজ মহাত্মা গান্ধী আশ্রম ত্যাগ করিয়া কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ, তিনি স্বয়ং বিদেশী বস্ত্র বর্জনের বহ্ন্যুৎসবে ঋত্বিকের পদ গ্রহণ করিয়া যে অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়াছেন, তাহা সমস্ত বিদেশী বস্ত্র ভস্মীভূত না হওয়া পর্যন্ত নির্বাপিত হইবে না।

প্রত্যেক বৎসর বিদেশী বস্ত্র আমদানীর জন্য ১২০ কোটি টাকা ভারত হইতে বিদেশে চলিয়া যাইতেছে। যদি বিদেশীবস্ত্র বর্জন আন্দোলন সফল হয়, তাহা হইলে ম্যাঞ্চেসটারের মিলসমূহ বন্ধ হইয়া যাইবে। যাহারা এতদিন ভারতের অর্থ শোষণ করিতেছিল তাহারাই সরকারকে ভারতের দাবি রক্ষা করিবার জন্য বাধ্য করিবে।

এই বর্জন-আন্দোলনকে সফল করিতে হইলে বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে কয়েকটি কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। এইজন্য অর্থ ও কর্মীর প্রয়োজন। সেইজন্য প্রত্যেকেরই কংগ্রেসের সভ্য হইয়া বর্জন-আন্দোলন চালাইবার নিমিত্ত অর্থসংগ্রহকার্যে নিযুক্ত হওয়া উচিত, খদ্দর ব্যবহার করিয়া দেশীয় শিল্পের উন্নতি সাধনে তৎপর হওয়া একান্ত কর্তব্য।

বিলাতী বস্ত্র বর্জন

৮ মার্চ ১৯২৯ ভবানীপুর হরিশ পার্কে বিলাতী বস্ত্র বর্জন উপলক্ষে জনসভায় প্রদত্ত ভাষণ।

১৯৩১ সনে পুলিস দেশবন্ধুকে বিনা ওয়ারেন্টে গ্রেপ্তার করিয়া প্রেসিডেন্সি জেলে লইয়া গিয়াছিল। দেশবন্ধুর প্রশ্নে ডেপুটি কমিশনার তাঁহাকে জানান যে, তাঁহাকে ৫৪ ধারায় গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। ঐ ধারায় চোর গাঁটকাটা প্রভৃতিকে ধরা হয়। দেশবন্ধু হাসিয়া বলিলেন, আমি বার (Bar) ত্যাগের পর কি আইন বদলাইয়াছে? তেমনি মহাত্মাকে ৫ আইনে ধরিয়া তাঁহাকে অপমান করা হইয়াছে। যদি গ্রেপ্তার করিতেই হয় ১২৪ক, ১২১ ইত্যাদি ধারায় গ্রেপ্তার করিলেই তো হইত। কিন্তু প্রশ্ন— কেন এমন ঘটে? ১৯০৫ সাল হইতে আজ পর্যন্ত বহ্ন্যুৎসব হইয়াছে। কিন্তু তখন তো কিছুই হয় নাই;

এবার এরূপ হইল কেন? সেদিন পার্লামেণ্টে এ-বিষয়ে প্রশ্ন হইয়াছে। উত্তরে বলা হয়, গভর্নমেণ্ট এ বিষয়ে কিছু জানাইবেন না।

দেশের বর্তমান অবস্থা

১৯২১ খ্রীস্টাব্দ অপেক্ষা আজ দেশ অধিক শক্তিশালী। ইংরেজের অবস্থা চতুর্দিক হইতে খারাপ হইয়া আসিতেছে। আমরা এখন অনেক সংঘবদ্ধ হইয়াছি। পৃথিবীর চারিদিকে যুদ্ধবিগ্রহের সূচনা দেখা যাইতেছে। এই-সবের জন্যই সাইমন কমিশন নিয়োগ করিয়া আমাদিগকে শান্ত রাখিবার চেষ্টা হইয়াছে।

কিন্তু ভারতবর্ষ সাইমন কমিশনকে অগ্রাহ্য করিয়াছে। আমরা কংগ্রেসের আদেশ মান্য করিয়া লইয়াছি। ওয়ার্কিং কমিটির কার্যপদ্ধতির তাৎপর্য আমাদের অপেক্ষা পার্লামেণ্টই বেশি বুঝিয়াছে। কারণ তাহারা জানে, যদি পল্লীতে পল্লীতে এই অগ্নি প্রজ্বলিত হয় এবং সেই অগ্নি যদি অন্তরেও জ্বলে তবে তাহার ফল ভীষণ হইবে।

সমাজ-শক্তি

আমরা নিরস্ত্র হইলেও সমাজ-শক্তি আমাদের হাতে আছে। ইংরেজের জীবিকা নির্ভর করে আমাদের হাতে। প্রতি বৎসর ১২০ কোটি টাকার বিলাতী দ্রব্য আমাদের দেশে আমদানী হয়। ইহার অর্ধেকই কাপড়। শাসনের নামে এই শোষণ চলিতেছে। যদি আমরা এই শোষণের পথ রুদ্ধ করিয়া দিই তবেই আমাদের অভিষ্ট সিদ্ধ হইবে। কামান-বন্দুকের চেয়েও বড়ো অস্ত্র অর্থনীতি। যদি আমরা বিলাতের রসদ বন্ধ করিতে পারি, তবে জয় আমাদের অবশ্য-ম্ভাবী। ইংরেজের অনিষ্ট করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। আমাদের মঙ্গলের জন্য এই পথ আমরা গ্রহণ করিয়াছি। সুতরাং তাতে যদি তাহার অনিষ্ট হয়, আমরা দায়ী হইব না।

গঠনকার্য

আমলাতন্ত্রের দুর্গের পাশাপাশি আমাদের দুর্গ গড়িয়া তুলিতে হইবে। কংগ্রেস সভ্য, অর্থ ও স্বেচ্ছাসেবক সংগ্রহ করিতে হইবে। পল্লীতে পল্লীতে শক্তিশালী কংগ্রেস কমিটি গঠন করিতে হইবে। যদি কংগ্রেসকে আমরা এইরূপ

শক্তিশালী প্রতিষ্ঠানে পরিণত করিতে পারি তবে আইন অমান্যও অসম্ভব হইবে না। ১৯২৯ সন উদ্যোগ পর্ব। এজন্য আমাদের প্রাণপণ কার্য করিতে হইবে।...

মহাত্মাজী যে আগুন জ্বালাইয়াছেন তাহা নিভিবে না। ঘরে ঘরে এই আগুন জ্বালাইতে হইবে। এই অগ্নি আমাদের সমস্ত অন্যায় ও পাপ ক্ষালনের প্রতীক।

বিলাতী বস্ত্র বর্জন ও স্বদেশী গ্রহণ

৬ মার্চ ১৯২৯ দেশবন্ধু পার্কে বিলাতী বস্ত্র বর্জন ও স্বদেশী গ্রহণ সম্পর্কে একটি জনসভায় প্রদত্ত ভাষণ।

অনেকের মনের মধ্যে মাঝে মাঝে এই প্রশ্ন ওঠে, এই যে আন্দোলন ইহা কেন তেমন জমাট বাঁধিতেছে না? যদি কেহ মনে করেন, শতকরা ১০০ জন লোক এই আন্দোলনে যোগদান না করিলে আন্দোলন সফল হইবে না, তবে তাহা ভুল। বাস্তবিক পক্ষে প্রত্যেক দেশে মুষ্টিমেয় লোকই চরম পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হয়, তাহারাই স্বাধীনতা আনয়ন করে। প্রত্যেক দেশের মুক্তি-পথিক-দের জীবন পাঠ করিলেই এই সত্য হৃদয়ংগম হইবে যে, তাহারা শত নির্যাতন, শত লাঞ্ছনাতেও আদর্শচ্যুত, সংকল্পভ্রষ্ট হয় নাই। এইরূপ কর্মী আমাদের দেশেও গড়িয়া উঠিতেছে। মুক্তিপথের যাত্রী যাঁরা তাঁরা অনেক সময় প্রশ্ন করেন, আমাদের মধ্যে এত মীরজাফর উমিচাঁদ আসিল কোথা হইতে, ইহার প্রতিকারই বা কী? বাস্তবিক, মীরজাফর-উমিচাঁদ আবহমানকাল হইতে আছে এবং ক্রমেই তাহাদের বংশ বৃদ্ধি পাইতেছে। ইহা বন্ধ করার একমাত্র পন্থা প্রবল জনমত গঠন করা।

দুই দল

দেশে আজ বাস্তবিক দুইটি দল আছে— একটি গভর্নমেন্ট দল, অন্যটি দেশের জনগণের দল। যাহারা গভর্নমেন্টের চাকরি করে তাহাদের কথা বাদ দিলেও অনেক লোক আছে যাহারা প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষভাবে সামান্য অর্থের প্রলোভনে গভর্নমেন্টের সহায়তা করিয়া থাকে। বিলাতে এই-সব মীরজাফর-

উর্মিচাঁদ টিকিয়া থাকিতে পারে না, কেননা সেখানকার সমাজ ও রাষ্ট্র অন্যরূপ।

প্রধান কর্ম

আমাদের জাতির মধ্যে আজ কর্মের জন্য ঐকান্তিকতা সৃষ্টি করিতে হইবে। এইভাবে সকলকে কংগ্রেসের পতাকাতলে সমবেত করিয়া কংগ্রেসকে শক্তিশালী করিতে হইবে। আমলাতন্ত্রের দুর্গের পাশাপাশি আমাদিগকে দুর্গ গড়িয়া তুলিতে হইবে। দেশময় কংগ্রেস কমিটি স্থাপন করিতে হইবে। কংগ্রেসের দ্বার সকলের জন্য উন্মুক্ত। সেখানে সকলেই আসিতে পারেন। কংগ্রেসের কাজ চালাইতে হইলে অর্থ এবং কর্মবীরের প্রয়োজন। দুই লক্ষ টাকা এবং প্রতি জেলায় একহাজার স্বেচ্ছাসেবক বাংলার পক্ষে কিছুই নয়। যদি ইহা সংগৃহীত হয় তবে আমরা যে-কোনো কার্যপদ্ধতি সফল করিয়া তুলিতে পারিব। বর্তমান কার্যপদ্ধতির শীর্ষে কংগ্রেস স্থান দিয়াছেন বিদেশী বস্ত্র বর্জনকে।

পরাধীনতাই মূল সমস্যা

ব্যাবসা-বাণিজ্যের সমস্যা, শিল্পের সমস্যা, সমাজ সমস্যা প্রভৃতি সকল সমস্যার মূলে হইল পরাধীনতার সমস্যা, পরাধীনতা ঘুচিলেই আমাদের সকল সমস্যার সমাধান হইয়া যাইবে। এই পরাধীনতা ঘুচাইতে হইলে আমাদের মধ্যে শক্তি সঞ্চার করিতে হইবে। নারীগণ পুরুষগণের সহিত যোগদান না করিলে আমাদের আন্দোলন কিছুতেই সাফল্য লাভ করিতে পারে না। দেশের মধ্যে একটা নূতন মনোভাব নূতন শক্তি সৃষ্টির মনোভাব গড়িয়া তুলিতে হইবে। একবার যদি এই দৃষ্টান্ত স্থাপিত হয় তবে দেশময় অসহযোগের ভাব ছড়াইয়া পড়িবে।

দাসত্বের প্রতীক

বিলাতী বস্ত্রে অগ্নি সংযোগের অর্থ— আমাদের কলঙ্ক-কালিমা বিদূরিত করা। বিলাতীবস্ত্র আমাদের দাসত্বের প্রতীক।

এই অপমান সহিব না

১২ মার্চ ১৯২৯ গোপাল মুখার্জী লেনে রায়বাহাদুর গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বাড়িতে অনুষ্ঠিত সভায় প্রদত্ত ভাষণ।

এক্ষণে আমরা বিদেশী বস্ত্র পোড়ানো আরম্ভ করিয়াছি, কারণ বিদেশী বস্ত্র দেশ হইতে তাড়াইবার উহাই একমাত্র পথ, অনেকে আমাকে বলিয়াছিলেন যে, তাঁহাদের নিকট যে বিদেশী বস্ত্র আছে তাহা ছিঁড়িয়া গেলে আর বিদেশী কাপড় কিনিবেন না— এরূপ কথা ১৯০৫ সনে স্বদেশী আন্দোলনের সময়ও অনেকে বলিতেন। কিন্তু আমার মনে হয় যাঁহারা এরূপ কথা বলেন তাঁহারা বিদেশী কাপড় পোড়াইবার হাত এড়াইবার জন্যই এরূপ অজুহাত দেখান। বাস্তবিকপক্ষে একবার যিনি বিদেশী কাপড় পোড়াইয়া ফেলিবেন তিনি আর কখনো বিদেশী কাপড় কিনিবেন না— তাঁহার মনে সর্বদাই ভয় থাকিবে যে বিদেশী কাপড় কিনিলেই তাহা পোড়াইয়া ফেলিতে হইবে। বিদেশী কাপড় আমাদের পরাধীনতার নিদর্শন। উহা উচ্ছিষ্ট খাদ্যাংশ, সুতরাং, বিষবৎ পরিত্যাজ্য। বিদেশী কাপড় পোড়ানোয় মনে একটা উৎসাহ ও প্রেরণা আসে। শ্রদ্ধানন্দ পার্কে বিদেশী কাপড় পোড়ানোর দিন হইতে উহা সর্বত্র ব্যাপকভাবে আরম্ভ হইয়াছে। ইহা মনের মধ্যে একটা ভীষণ বিপ্লবের সৃষ্টি করিয়াছে। ইহা আমাদের সমস্ত পাপ ক্ষয় করিয়া আমাদের পবিত্র করিবে— যতদিন না আমরা পরাধীনতার শৃংখল হইতে মুক্ত হইতে পারি ও স্বাধীনতা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিতে পারি ততদিন যেন মহাত্মা গান্ধী শ্রদ্ধানন্দ পার্কে যে অগ্নি স্বহস্তে প্রজ্বলিত করিয়াছেন তাহা নির্বাপিত না হয়। এই বিদেশী বস্ত্রের ধ্বংস আমাদের অসহিষ্ণুতা প্রকাশ করিতেছে। দেড়শত বৎসর পরাধীনতার ফলে আমরা বিদেশীর সর্বপ্রকার অত্যাচার যেন সহ্য করিতে অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছি যাহা কোনো স্বাধীন জাতি একমুহূর্তেও সহ্য করিতে পারে না। আমাদের এই সদাজাগ্রত অসহিষ্ণুতা জীবনধর্মের পরিচায়ক। বাঙালী জাতি তাহাদের পূর্ব গৌরব হারাইয়াছে। কোনো পরাধীন জাতিই এরূপ অবস্থায় উন্নতি লাভ করিতে পারে না। আর কিছুদিন যদি এরূপ অবস্থা আমাদের থাকে তাহা হইলে জাতি একেবারে ধ্বংসের সীমানায় উপনীত হইবে। আমাদের ছাত্রসমাজের শারীরিক অবস্থাও একেবারে শোচনীয়। তাহারাই ভবিষ্যৎ জাতির আশাস্থল। সুতরাং ছাত্রসমাজের দৈহিক উন্নতির একান্তই প্রয়োজন।

ইংরেজ আমাদের সাহায্যেই আমাদের শাসন করিতেছে। তাহারা আমাদের জেলের ভয় দেখাইয়া শাসন করিতেছে, কিন্তু মানুষ একবার জেলে গেলে তাহার আর জেলের ভয় থাকে না। অনেকেই জেলে গিয়াছেন, অনেকেই তো ফাঁসিকাষ্ঠে প্রাণ বিসর্জন দিয়াছেন— তবে আর ভয় কিসের? যতদিন না আমাদের মাতৃজাতি সন্তানদের শিশুকাল হইতে সাহসী হইতে শিক্ষা দেন ততদিন এই মিথ্যা ভয় যাইবে না।

কংগ্রেস এই স্বাধীনতার বাণী গৃহে গৃহে প্রচার করিতেছেন। আমাদের যতপ্রকার ভীরুতা, কাপুরুষতা আছে, এই বিদেশী বস্ত্রের সঙ্গে সঙ্গেই পুড়িয়া আমাদের পবিত্র করুক। সেই ভস্মরাশি হইতে নূতন জীবনের সূচনা হউক।

অপমানের চাবুক যখন গায়ে লাগে তখন দেশের চৈতন্যের উদয় হয়। কয়েকদিন পূর্বে মহাত্মা গান্ধী ও কিরণশংকর রায়ের গ্রেপ্তারে আজ অনেকের চক্ষু খুলিয়াছে। আজ দেশের লোককে বিশেষ করিয়া বুঝিতে হইবে ইংরেজ তাহাদের নিজেদের স্বার্থ বজায় রাখিবার জন্য সব-কিছু করিতে প্রস্তুত। যদি দিনের পর দিন ইংরেজ তাহাদের স্বার্থের জন্য ঐরূপ করে, আর আমরা যদি চুপ করিয়া শান্ত ছেলের মতো নীরবে সকল অত্যাচার সহ্য করি তবে আমাদের মনুষ্যত্ব রহিল কোথায়? যদি আমাদের মনুষ্যত্ব থকে তবে বীরের মতো হুঙ্কার দিয়া বলিতে হইবে যে আমরা কিছুতেই এই অপমান সহিব না। দেড়শত বৎসর শাসন ও শোষণের ফলে আজ আমরা সর্বস্ব হারাইয়াছি। আমাদের নিজেদের বলিতে কিছুই নাই। এমন-কি আমাদের মনটা পর্যন্ত ইংরেজ জয় করিয়া ফেলিয়াছে। আমাদের ব্যাবসা-বাণিজ্য সব নষ্ট করিয়া আমাদিগকে একেবারে পঙ্গু করিয়া ফেলিয়াছে।

ইংরেজ জাতি তাহাদের দোকান হইতে বেশি অর্থ দিয়া জিনিস ক্রয় করে। তবুও তাহারা কোনো ভারতবাসীর দোকান হইতে সেই জিনিস অল্প মূল্যে পাইলেও ক্রয় করে না। ইহা বাস্তবিক তাহাদের নিকট হইতে শিক্ষা করিবার বিষয় বটে।

প্রত্যেক হাটে বাজারে কংগ্রেস কমিটি প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। যেখানে বিলাতী বস্ত্রের আড়ত সেইখানেই কংগ্রেস কমিটি প্রতিষ্ঠা করিয়া বিলাতী বস্ত্র কেনাবেচা বন্ধ করিতে হইবে। সমগ্র দেশের ভিতর একটা নূতন প্রেরণা জাগাইতে হইবে। সেজন্য চাই কংগ্রেসের সদস্য, অর্থ ও স্বেচ্ছাসেবক।

প্রাণের লক্ষণ

১৫ মার্চ ১৯২৯ হ্যারিসন পার্কে বস্ত্র বয়কট ও স্বদেশী গ্রহণ প্রসঙ্গে জনসভায় প্রদত্ত ভাষণ।

আমাদের দেশের একপ্রকার জীব আছেন যাঁহারা সব বিষয়েই সমালোচনা না করিয়া থাকিতে পারে না। তাঁহারা নিজেরা কোনো ভালো কাজ করা দূরে থাকুক অপরকেও নানাপ্রকার ব্যঙ্গোক্তি করিয়া তাহাদিগকে নিরুৎসাহিত করেন। সেদিন বড়বাজারের একজন বস্ত্র-ব্যবসায়ী বলিয়াছেন যে পূর্বে এখানে প্রায় ত্রিশ হাজার টাকার অধিক কাপড় বিক্রয় হইতে, এখন দেশী কাপড় তাহার দোকানে বিক্রয় হয় বৎসরে অনধিক ৫ লক্ষ টাকার মতো। বয়কট-আন্দোলন যত অল্পই হউক-না-কেন সে আন্দোলনের ফল কিছু হইবেই হইবে। এবার ল্যাংকাশায়ারে ৭৬টি বিলাতী কাপড়ের মিল বন্ধ হইয়াছে। এ-সব দেখিয়া শুনিয়া যিনি সমালোচনা করিতে চান মনুষ্য সমাজে তাঁহার স্থান নাই। চক্ষু থাকিতে যিনি চক্ষু বুজিয়া থাকিতে চান তিনি থাকুন, দেশের তাহাতে কিছু আসে যায় না।

যদি ছাত্রেরা প্রত্যেক স্কুলে কলেজে, এমন-কি ক্লাসে, ঐরূপ একটা সমিতি গঠন করে ও সংঘবদ্ধভাবে সংকল্প করে যে তাহারা বিলাতী বস্ত্র পরিধান করিবে না— তাহা হইলে অনেক কাজ হইতে পারে। অনেক ব্যাপারে স্কুল-কলেজের কর্তৃপক্ষ অনেক প্রকার পুরস্কারের ব্যবস্থা করেন। যে ছাত্র যত বেশি বস্ত্র সংগ্রহ করিবে তাহাকে যদি ঐপ্রকার পুরস্কার দেওয়া হয় তাহা হইলে ছাত্রদের মধ্যে একটা দেশাত্মবোধের সঞ্চার হইবে। ছাত্রেরা যদি নিজেরাই এ-কার্যে অগ্রসর হয় তবে সর্বাপেক্ষা আনন্দের কথা। দেশের লোক আজ একটু অসহিষ্ণু হইয়াছে। ইহাই প্রকৃত জীবনের লক্ষণ।

আমাদের মনোভাব পরিবর্তন করিবার ইহাই উত্তম সুযোগ। যদি বিলাতী বস্ত্র ত্যাগ করিলে উত্তম মনোবৃত্তির পরিচয় দিতে পারি তবে সেই আবহাওয়াই সৃষ্টি করিতে হইবে। যদি এরূপ আবহাওয়া সৃষ্টি হয় তবে যাহারা তখনো বিলাতী কাপড় পরিবে— তাহারা হয় দেশছাড়া হইবে, না-হয় তাহাদিগকে সমাজের মধ্যে একঘরে হইয়া বাস করিতে হইবে।

স্বাধীনতা সংগ্রামে দেশ গঠন

১৬ মার্চ ১৯২৯ সংবাদপত্রে প্রকাশিত দেশবাসীর প্রতি আবেদন।

জনসাধারণ অবগত আছেন যে গত ১৯২৮ সালের ডিসেম্বর মাসে কলিকাতা-কংগ্রেসের যে অধিবেশন হইয়া গিয়াছে তাহাতে উদ্যমের সহিত কাজ করিবার জন্য একটি কার্যতালিকা প্রণয়ন করা হইয়াছে, একমাত্র যাহার অনুসরণে ব্রিটিশ সরকারও ভারতের জাতীয় দাবি স্বীকার করিতে বাধ্য হইবে। সুতরাং ভারতে রাজনৈতিক মুক্তিসংগ্রামে দেশকে প্রস্তুত করিবার জন্য সম্পূর্ণ ১৯২৯ সাল ব্যয় করিতে হইবে।

বিদেশী বস্ত্র বর্জন

বর্তমানে বিদেশী বস্ত্র বর্জনই কংগ্রেস কার্যতালিকার প্রধান বিষয় বলিয়া গ্রহণ করা হইয়াছে। সমগ্র দেশ এই বিষয়ে মনোযোগ দিয়াছে। মহাত্মা গান্ধীর কংগ্রেসের বর্জন কমিটির সভাপতি হওয়া এবং নির্জনবাস হইতে আসিয়া এই আন্দোলনের নেতৃত্বভার গ্রহণ করা এক পরম সৌভাগ্যের বিষয় বলিতে হইবে।

মহাত্মাজীর কার্যারম্ভ

গত ৪ মার্চ মহাত্মাজী স্বয়ং শ্রদ্ধানন্দ পার্কের সভায় বাংলার এই আন্দোলন আরম্ভ করিয়াছেন এবং তিনি বিংশতি সহস্র লোকের সম্মুখে প্রথম বহ্ন্যুৎসবের অগ্নি সংযোগ করিয়াছেন। এই কারণে এবং সরকারের দমননীতির দরুন বাংলার জনসাধারণের পূর্ণোদ্যমে বর্জন-আন্দোলন চালানো উচিত।

বিদেশী বস্ত্র বর্জনের সংকল্প বাংলায় নূতন নহে। এই রাজনৈতিক অস্ত্রের সাফল্যও বাংলা এতকাল বিশ্বাস করিয়া আসিয়াছে। স্বদেশী আন্দোলনের সময় বংগভংগ রহিত করিবার জন্য এই অস্ত্র নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল। ইহার ফল কী হইয়াছিল তাহাও সর্বজনবিদিত।

বিদেশী বস্ত্র বর্জন পূর্ণ সাফল্যমণ্ডিত করিতে হইলে নিম্নের এই কর্মসূচী গ্রহণ করিতে হইবে :

১. বর্জন-আন্দোলনকে জনপ্রিয় করিবার জন্য পুস্তিকা ও পোস্টার প্রভৃতি মুদ্রিত করিয়া জনসাধারণের মধ্যে বিতরণ।

২. কংগ্রেসের কার্যতালিকাকে কার্যে পরিণত করিবার জন্য প্রত্যেক জেলায় বহুসংখ্যক স্বেচ্ছাসেবক সংগঠন।

৩. প্রত্যেক শহরে ও গ্রামে বিশেষত হাট ও বাজারের সন্নিকটে বর্জন সভা আহ্বান করা।

৪. প্রচারকার্যের জন্য শিক্ষিত বক্তা তৈয়ার করণার্থ কলিকাতায় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা।

৫. বর্জন প্রচারের জন্য ছায়াচিত্র সহ একশত কর্মী মফস্বলে প্রেরণ করা।

৬. বক্তাগণকে ছায়াচিত্র প্রদান করা।

৭. প্রয়োজনমতো খদ্দর ও স্বদেশী বস্ত্র বিক্রয়ের জন্য ভাণ্ডার প্রতিষ্ঠার জন্য উৎসাহিত করা।

৮. এই দেশের স্বদেশ-জাত দ্রব্য প্রদর্শনার্থ, কলিকাতা ও মফস্বল শহরে স্বদেশী মিউজিয়াম স্থাপন।

৯. স্বদেশ-জাত দ্রব্যের আধুনিক সংবাদ পাওয়ার জন্য স্বদেশী ডিরেক্টরি প্রণয়ন।

এই বৎসরের মধ্যে সমগ্র প্রদেশে উল্লিখিত কার্য চালাইতে হইলে অন্যূন দুই লক্ষ টাকার প্রয়োজন। অধুনা প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির ভাণ্ডার অর্থশূন্য। কার্য সুচারুরূপে চালাইতে হইলে অর্থের একান্ত প্রয়োজন। সুতরাং আমি জনসাধারণের নিকট আমার সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাইতেছি যে তাঁহারা যেন কংগ্রেস ভাণ্ডারে তাঁহাদের সাধ্যমতো অর্থ সাহায্য করিয়া দেশবাসীর সেবায় সহায়তা করেন। আমি বিশ্বাস করি দেশবাসী এই ডাকে সাড়া দিবেন। যিনি যাহা সাহায্য করিবেন তাহা বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সম্পাদকের নিকট পাঠাইবেন। বাড়ি বাড়ি এবং রাস্তায় রাস্তায়ও অর্থ সংগ্রহের ব্যবস্থা করা হইবে। দাতাকে তাঁহার দানের জন্য বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভাপতি বা সম্পাদকের স্বাক্ষরিত রসিদ প্রদান করা হইবে।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সমন্বয়

১৬ মার্চ ১৯২১ শনিবার সন্ধ্যায় সবুজ সংঘের সভায় ভাষণ।

ভ্রাতৃমণ্ডলী, রাত অনেক হইয়াছে ; তরুণদের সভায় অন্তরের অনুকূল আবহাওয়া আমাকে আনন্দ দেয়, সেখানে আমি নিজের অন্তরের প্রতিধ্বনি শুনিতে পাই ; তরুণদের নিমন্ত্রণ এইজন্য আমার কাছে একান্ত লোভনীয়।

অশান্তি— জীবনের লক্ষণ

আজ সর্বত্র যে অশান্তি দেখা যাইতেছে তাহা জীবনের লক্ষণ। এই অশান্তির মধ্য দিয়া যুবকের আশা আকাঙ্ক্ষা ফুটিয়া উঠিয়াছে। যুব-আন্দোলন ইতিহাসে নূতন নয় ; পাশ্চাত্য হইতেও ইহার আমদানী হয় নাই। অতি প্রাচীনকাল হইতে এই আন্দোলন ইতিহাসের রংগমঞ্চে বারে বারে দেখা দিয়াছে।

যুব-আন্দোলনের হেতু

ভিতরে প্রাণ হারাইয়া ফেলিয়া বাহিরের আচার ও বন্ধনকে আমরা যখন একান্ত সত্য বলিয়া গ্রহণ করি, তখন দেশে দেশে এই আন্দোলনের আবির্ভাব হয়। গীতায় যখন শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে উৎসাহিত করিবার জন্য বলিয়াছিলেন— ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ। তখন তাঁহার মুখ দিয়া তরুণের মর্মবাণী প্রকটিত হইয়াছিল।

সৃষ্টি ও ধ্বংস পাশাপাশি চলিয়াছে

সৃষ্টি আর ধ্বংস— উভয়ই পাশাপাশি চলিয়াছে। যাহা নিজে গড়িতেছি তাহাই আবার ভাঙিতেছি। ভাঙিতেছি— কেননা কোনো জিনিসই দীর্ঘকাল জীবন্ত থাকে না, কালক্রমে ভিতরের প্রাণ শুকাইয়া যায় ; জাগিয়া থাকে কেবল বাহিরের প্রাণহীন রূপ ; এই শুষ্ক কংকালকে ভাঙিবার জন্যই চাই ধ্বংস।

ধ্বংসের নীতি চিরকালের

গৌতম বুদ্ধ হইতে শুরু করিয়া যত বড়ো বড়ো মহাপুরুষ পৃথিবীতে আসিয়াছেন তাঁহারা সমাজের প্রাণহীন নীতি ভাঙিবার চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহারা সমাজের সংগে গোঁজামিল দিয়া চলিতে পারেন নাই, সমাজকে তাঁহারা আঘাত করিয়াছেন। মানুষের ইতিহাস গড়িয়া উঠিয়াছে এই-সব বিদ্রোহী

পুরুষদের হাতে, যাঁহাদের হাতে ছিল ধ্বংসের নিশান। তাঁহারা একদিকে ভাঙিয়াছেন, আর-একদিকে গড়িয়াছেন। ধ্বংস বাদ দিলে সৃষ্টি থাকে না; সৃষ্টি বাদ দিলে ধ্বংস থাকে না।

জীবনের লক্ষণ—সৃষ্টি ক্ষমতা

আমরা বাঁচিয়া আছি কিনা— বাঁচার মতো বাঁচিয়া আছি কিনা— ইহাই প্রশ্নের বিষয়। জীবনের লক্ষণ— সৃষ্টি ক্ষমতা, যাহার সে ক্ষমতা নাই সে বাঁচিয়া নাই— সে মৃত। ব্যক্তির পক্ষেও যেমন শৈশব, কৈশোর, যৌবন, জরা ও মৃত্যু আছে, জাতির পক্ষেও তাহা সত্য। অনেক জাতি পৃথিবী হইতে লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। অনেক সময়ে জাতির অস্তিত্ব লোপ না পাইলেও পুরাতনের রোমন্থন করিয়া কোনো রকমে সে জীবন কাটায়। এই অবস্থা হইতে জাতির পুনর্জন্ম হইতে পারে। আমাদের সৌভাগ্য আমরা এখনো বাঁচিয়া আছি। যখন দেখিতেছ আমরা পুরাতনকে ভাঙিতেছি এবং সেই ধ্বংসস্তূপের উপর নূতনকে সৃষ্টি করিবার চেষ্টা করিতেছি তখন মনে হয় আমরা এখনো বাঁচিয়া আছি। আমাদের কর্তব্য জীবনীশক্তির সাধনা। এই শক্তি নিজেদের মধ্যে সৃষ্টি করিতে হইবে, অপরের মধ্যে সঞ্চারিত করিতে হইবে। নিজেদের মধ্যে যতক্ষণ শক্তিকে অর্জন করিতে না পারিতেছি ততক্ষণ অপরের মধ্যে আমরা তাহা সঞ্চারিত করিতে পারিব না।

অসন্তোষ জ্ঞান ও আত্মবিশ্বাস

সর্বত্র আজ অসন্তোষ ও অশান্তির প্লাবন দেখা দিয়াছে। ইহা আমাদের জীবন চাঞ্চল্যের প্রথম অধ্যায়। দ্বিতীয় অধ্যায়ে মানুষ বুঝিতে পারে, কেন তাহার ভিতর এই চাঞ্চল্য। আমাদের জাতীয় জীবনে এই দ্বিতীয় অধ্যায় শুরু হইয়াছে। আমরা দিন দিন যুব-আন্দোলনের উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিতেছি। এই জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস জাগিতেছে। আত্মবিশ্বাস (ব্যষ্টি ও সমষ্টির উপর) আমাদের উন্নতির পথে লইয়া যায়।

নূতনত্ব— তারুণ্যের লক্ষণ

যাহার প্রাণ জাগিয়াছে সে সব কাজের নূতনত্ব ফুটাইয়া তুলিবে। প্রাণ যেখানে জাগিয়া উঠিয়াছে সেখানে রাষ্ট্রে, খেলাধুলায়, সাহিত্যে— সর্বত্র

বৈশিষ্ট্য ফুটিয়া উঠিবেই। এই নূতনত্বের মাপকাঠিতেই আমরা সকল প্রতিষ্ঠানের তারুণ্য বুঝিতে পারিব। সেবা-সমিতি, সাহিত্য যদি গতানুগতিকের বাঁধা রাস্তা দিয়া একটানা চলে, তবে তাহা তরুণোচিত হয় না, কোনো প্রতিষ্ঠান বা আন্দোলনকে তরুণোচিত হইতে গেলে চাই নূতন vision, চাই নবজীবনের সাড়া।

আমূল পরিবর্তন চাই

আমূল পরিবর্তন চাই। চাই সর্বাংগীণ মুক্তি। Social, economic, political —সকল ক্ষেত্রে স্বাধীনতার সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। ফুল যখন ফোটে তখন তাহার প্রত্যেকটা পাপড়ির মধ্যে ফুল ফোটার সন্ধান পাই। আমাদের জাতি যখন জাগিবে তখন সেই জাগরণের লক্ষণ আমরা জাতির সকল ক্ষেত্রে দেখিতে পাইব। ঘরের এককোণে যখন প্রদীপ জ্বালাই তখন সমস্ত ঘরখানি আলোকিত হইয়া উঠে। মুক্তির প্রকৃত আকাঙ্ক্ষা জাতির মর্মে যদি একবার জাগাইতে পারি তবে সকল দিকে জীবনের জ্যোতিঃ প্রকাশ পাইবে। অনেক দেশ আছে যেখানে মুক্তি সর্বাংগীণ নয়। আমরা যে মুক্তির সাধনা করিতেছি তাহা রাষ্ট্রে, সমাজে, অর্থনীতির ক্ষেত্রে সর্বত্র আমাদিগকে মুক্তিদান করিবে— কোনোদিকে আমাদের কোনো বন্ধন থাকিবে না।

নূতন মনোভাবের সৃষ্টি চাই

নূতন মনোভাবের সৃষ্টি চাই। The new conception of freedom তরুণদের মধ্যে জাগাইতে হইবে। নবীনের চিত্তে এই নূতন মনোভাবের যদি আমরা সৃষ্টি করিতে পারি তবে আমাদের অর্ধেক কাজ সফল হইবে। এই নূতন mentality চাই। কী প্রকারে অতি অল্প সময়ের মধ্যে, দেশের চিত্তে আমরা এই নূতন মনোভাবের সৃষ্টি করিতে পারিব, তাহাই আমাদের সমস্যা।

সমাজের ভিত্তি নড়াইতে হইবে

সমাজের ভিত্তি না নড়িলে জাতি জাগিবে না। সমাজের অধিকাংশ লোকের কাছে সামাজিক অত্যাচার রাষ্ট্রীয় অত্যাচারের চেয়ে বেশি সত্য। নিম্নশ্রেণীর লোকগুলি যতদিন সামাজিক নির্যাতন হইতে মুক্তি না পাইবে ততদিন তাহারা রাষ্ট্রীয় আন্দোলনে যোগদান করিবে না। আমরা সকল দিক দিয়া মুক্তি

চাই— এই বিশ্বাস যখন জাগিয়া উঠিবে তখন জাতি মুক্তির জন্য পাগল হইবে। একবার মুক্তির জন্য পাগল হইলে মুক্তি সহজসাধ্য হইয়া উঠিবে।

জীবন ও সাহিত্য

সাহিত্য ও জীবন— অংগাংগীভাবে জড়িত। আমাদের মধ্যে নূতন জীবন না জাগিলে নূতন সাহিত্য অসম্ভব। এই সৃষ্টির জন্য চাই ধ্বংস।

বাঁচার সার্থকতা আছে

আমরা যে এখনো বাঁচিয়া আছি মরি নাই, তার মানে আমাদের একটা Mission আছে। এই Mission-এর অর্থ অতীতের মধ্যে ডুবিয়া থাকা নয়। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সমন্বয় করিবার শক্তি আমাদের আছে; স্বামিজী সেই উপদেশ দিয়া গিয়াছেন। আমরা নানা দিক দিয়া বন্দী হইলেও এখনো জগৎকে অনেক নূতন জিনিস দান করিতেছি। এই জাতি যদি একবার জাগে ইহার দ্বারা অসাধ্য সাধন হইবে।

অতীতের চেয়ে উজ্জ্বলতর ভবিষ্যৎ

আমাদের দানের জন্য জগৎ অপেক্ষা করিয়া আছে। আমাদের অতীতের অপেক্ষা উজ্জ্বলতর আমাদের ভবিষ্যৎ। সেই দানের যোগ্য হইবার জন্যই তরুণের সাধনা।

পূজা তার সংগ্রাম অপার

আমরা অবিরাম কর্মের প্রবাহে যেন চলিতে পারি। কর্ম সংগ্রামের মধ্য দিয়াই আমরা ভগবানের পূজা করি। তাঁহার পূজা মানে অবিশ্রান্ত অক্লান্ত সাধনা। এইভাবে কর্মের পথে চলিতে পারিলেই আমাদের জীবন সার্থক হইবে।

এবারের হোলি রঙের নয়, আগুনের

১৭ মার্চ ১৯২৯ বড়বাজার কংগ্রেস কমিটির উদ্যোগে বড়বাজার অর্জুন ব্যায়ামশালা প্রাঙ্গণে আয়োজিত জনসভায় প্রদত্ত ভাষণ।

আজ আমাদের দেশে বিলাতী বয়কট করিবার যে আন্দোলন ব্যাপকভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে— তাহাকে সাহায্য ও সাফল্যমণ্ডিত করাই সর্বপ্রধান কাজ। আজ আপনারা সকলেই জানেন, প্রতি বৎসর আমাদের দেশে ষাট কোটি টাকার বিলাতী বস্ত্র আমদানী হয়। যদি আমরা বিলাতী বস্ত্র পরিধান করিব না বলিয়া প্রতিজ্ঞা করি তবে বিলাতের অবস্থা কী হয় তাহা আপনারা সকলেই বুঝিতে পারেন। সামান্য কয়েকদিনের চেষ্টার ফলে ল্যাঙ্কাশায়ারে ৭৬টি কাপড়ের কল বন্ধ হইয়াছে। এমন সহজ ও শান্ত উপায়ে আমরা ইংরেজকে জব্দ করিতে পারি। দেশের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ ও মহাত্মা গান্ধী বিলাতীবস্ত্র বয়কট করিবার জন্য দেশবাসীকে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিতেছেন। সেদিন তিনি স্বয়ং শ্রদ্ধানন্দ পার্কে বিংশসহস্র লোকের সম্মুখে এক বিরাট বিলাতী বস্ত্রস্তূপে অগ্নি সংযোগ করিয়াছেন। সেই আগুন দেখিয়া পুলিস যে অভিনয় প্রদর্শন করিয়াছে তাহা সকলেই জানেন। মহাত্মা গান্ধী যে-আগুন বাংলায় প্রজ্বলিত করিয়াছেন যতদিন দেশে একখণ্ড বিলাতী বস্ত্র থাকিবে সে আগুন আমাদিগকে জ্বালাইয়া রাখিতে হইবে। সমগ্রভারতে যে আগুন জ্বলিয়া উঠিয়াছে এ আগুনে সকলকে শুদ্ধসত্ত্ব পবিত্র হইয়া একমনে ভারতের স্বাধীনতার জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে। এ কাজে অনেক দুঃখ কষ্ট, অনেক লাঞ্ছনা সহ্য করিতে হইবে। বিপদের মধ্যে মানুষের সত্যকার রূপ আত্মপ্রকাশ করে। ভারতের এই বিপদে দেশবাসীকে শান্ত ও সংযতভাবে অগ্রসর হইতে হইবে। তবেই আমরা মুক্ত হইতে পারিব।

হোলি আসিয়াছে। এ সময় দেশের লোকের কী করা কর্তব্য তাহা আর বলিয়া দিতে হইবে না। আমি আশা করি এবার হোলি উৎসবে কেহই যেন বিলাতী বস্ত্র ক্রয় না করেন। হোলি আমরা করিব— তবে রঙের নহে, আগুনের। বিলাতী বস্ত্রের আগুনে আমাদের আবিলতা, পঙ্কিলতা পুড়িয়া ভস্ম হইয়া সত্যের পথকে প্রকাশিত করিয়া দিবে।

একমাত্র অস্ত্র বিলাতী বর্জন

১৯ মার্চ ১৯২৯ ব্র্যাকোয়ার স্কোয়ারে বিদেশী বস্ত্র বর্জনের সভায় প্রদত্ত বক্তৃতা।

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সিসি ও মেরিডিথ টাউনসেন্ডের ন্যায় চিন্তাশীল বুদ্ধিয়া-ছিলেন যখনই ভারতবাসীর মনোবৃত্তির পরিবর্তন হইবে এবং জাতির প্রাণের বিদ্রোহের বহ্নি প্রজ্বলিত হইবে তখন এতবড়ো শক্তিশালী ব্রিটিশ সাম্রাজ্যও তাসের পাহাড়ের ন্যায় ধসিয়া পড়িবে।

বেকার সমস্যা

বাংলার এমন কোনো মধ্যবিত্ত পরিবার নাই যে বেকার সমস্যার দায়ে পড়ে নাই। ফরাসী বিদ্রোহের সময় এই সর্বধ্বংসী অবস্থা দূর করাই ছিল বিদ্রোহী-দের প্রথম ও প্রধান কাজ। ইংলন্ডেও আজকাল বেকার-সমস্যা দেখা দিয়াছে, সেই দেশের লোক আমাদের দেশের ন্যায় এইরূপ সর্বংসহা নহে। পাছে কোনো বিদ্রোহের সৃষ্টি হয় এই ভয়ে সরকার ইহার প্রতিকারের ব্যবস্থা করিতেছে। কিন্তু এদেশের অবস্থার দিকে তাকাইলে মনে হয় ইহা হইতে মুক্তির আর পথ নাই। ইহার মূল কারণ কোথা এবং কিরূপে ইহাকে দূর করা যায় ইহাই তো আমাদের সম্মুখে বড়ো সমস্যা।

বিদেশাগত দ্রব্য

হিসাবে দেখা গিয়াছে আমাদের দেশে বিদেশ হইতে ১২০ কোটি টাকার দ্রব্য আমদানী হয়। আমাদের গ্রামবাসীরা তাহাদের খাদ্যের অতিরিক্ত দ্রব্য বিক্রয় করিয়া ঐ-সকল বিদেশী জিনিস ক্রয় করে। এই দেশের অদৃষ্টের কী পরিহাস; এদেশে যে শস্য উৎপন্ন হয় দেশবাসীর তাহা খাওয়ার পরও অনেক শস্য উদ্বৃত্ত থাকার কথা। কিন্তু দেশ হইতে দুর্ভিক্ষ কখনো দূর হয় না। দেশে যে শস্য হয় আমাদের তাহার ব্যবহার করিবার ক্ষমতা নাই। এমনই আমাদের দুর্ভাগ্য। ইংরেজরা এদেশে আসার পর হইতেই আমরা তাহাদের বস্ত্র ও অন্যান্য পণ্যদ্রব্য ক্রয় করিতে আরম্ভ করিলাম। ইহার ফলে দরিদ্র তন্তুবায় সম্প্রদায়ের মধ্যে বেকার সমস্যা প্রথম মূর্ত হইয়া দেখা দেয়। পরে আস্তে আস্তে দেশের সকল গৃহশিল্প ধ্বংস হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বেকার সমস্যাও দেশের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত ছাইয়া ফেলিল।

গৃহশিল্পের প্রতিষ্ঠা

সুতরাং ইহা দূর করিতে হইলে পুনরায় গৃহশিল্পের প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। শিল্পের উন্নতির জন্য অর্থ ও সরকারী সাহায্যরূপ যে দুইটি প্রধান উপাদানের প্রয়োজন, আমাদের তাহার একটিও হাতে নাই। এই ধ্বংসোন্মুখ জাতিকে উদ্ধার করিতে হইলে অবিলম্বে আমাদের শাসনভার হাতে নেওয়া প্রয়োজন।

শাসনভার গ্রহণ

দুইটি উপায়ে ইহা সম্ভবপর হইতে পারে। একটি সশস্ত্র বিদ্রোহের দ্বারা, অপরটি তাহাদের বাণিজ্যের সহিত অসহযোগিতা— অর্থাৎ সর্বপ্রকারে বিদেশী দ্রব্য বর্জন করিয়া। প্রথমটা আমাদের দেশে সম্ভবপর নহে। কিন্তু আমরা দ্বিতীয়পথ অবলম্বন করিতে পারি। ইহা আমাদের সাধ্যায়ত্ত। বিদেশী দ্রব্য বিষবৎ ত্যাগ করিলে একদিকে যেমন সেই দেশে বিদ্রোহানল জ্বলিয়া উঠিবে, অন্যদিকে আমাদের দেশের শিল্পও গড়িয়া উঠিবে। আমাদের দেশে বর্জন-আন্দোলন আরম্ভ হইতে না হইতেই পার্লামেন্টে একটা আতঙ্কের সৃষ্টি হইয়াছে। বহু সভ্য এই আন্দোলনকে অংকুরেই বিনাশ করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছেন। কারণ এ পর্যন্ত ৬৬টি মিলের কার্য বন্ধ হইয়া গিয়াছে। সুতরাং বিদেশী বস্ত্র বর্জনের যে কী অমোঘ শক্তি তাহা সহজেই অনুমেয়।

বস্ত্রযজ্ঞের উপকারিতা

বিদেশী বস্ত্র দাসত্বের প্রতীক। সুতরাং দাসত্বের হাত হইতে মুক্তি পাইতে হইলে ইহাকে সর্বাগ্রে ভস্মীভূত করিতে হইবে। অগ্নি পবিত্র করে বলিয়া তাহার এক নাম পাবন। আমরা বিদেশী বস্ত্র পরিধান করিয়া দেশকে যে পরাধীনতার শৃংখলে আবদ্ধ করিয়াছি এবং তাহাতে যে পাপ সঞ্চয় করিয়াছি, আজ তাহা অগ্নিতে আহুতি দিয়া আবার পবিত্র হইব। এই বস্ত্র ত্যাগ করিতে পারিব কি পারিব না এইরূপ দ্বিধাগ্রস্ত মন যাঁহাদের তাঁহারাও এই বস্ত্র বর্জন করিয়া দুর্বলতার হাত হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারিবেন।

একতাবদ্ধ শ্রমিক-আন্দোলন

২২ মার্চ ১৯২৯ অ্যালবার্ট হলে সমগ্র ভারতবর্ষে, বিশেষত বাংলাদেশে শ্রমিকনেতাদের, গ্রেপ্তারের প্রতিবাদকল্পে আয়োজিত জনসভায় ভাষণ।

অনেকদিন পূর্বে বিলাতের ভূতপূর্ব প্রধানমন্ত্রী মি. লয়েড জর্জ বিলাতের নির্বাচনের সময় বলিয়াছিলেন যে যদি তিনি পার্লামেন্টে ক্ষমতা পান তবে কাইজারকে ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলাইবেন ও জার্মান দেশ হইতে টাকা আদায় করিবেন। নির্বাচন আসন্ন হইলে পরই এরূপ একটা-না-একটা ধরপাকড় করিয়া বিলাতের ভোটারদিগকে জানানো হয় যে তাহারা ভারতবর্ষকে শাসনাধীনে রাখিবার জন্য কত চেষ্টা করিতেছেন। যখনই ইংরেজ দেখে যে দেশের শক্তি বৃদ্ধি হইয়াছে তখনই গ্রেপ্তার বা ঐরূপ একটা কিছু অত্যাচার করিয়া দেশের শক্তি নষ্ট করিতে চেষ্টা করে। ৫৬ বৎসরপূর্বে একদিন এরূপ ভাবে বাংলার শতশত কর্মীকে গ্রেপ্তার করিয়াছিল। আজ আবার ভারতের শ্রমিক-আন্দোলনের কর্মী ও নেতৃবৃন্দকে গ্রেপ্তার করিয়াছে। এতদ্দ্বারা ইহাই বিশেষরূপে প্রতীয়মান হয় যে দেশে একটা শক্তি জাগিয়াছে। বিলাতের নির্বাচন আসন্ন বলিয়াই এই গ্রেপ্তার। দ্বিতীয় কারণ এই যে Assemblyতে Trade Dispute Bill ও Public Safety Bill পাস করাইবার জন্য গভর্নমেন্ট উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন। তৃতীয় কারণ হুইট্‌লি কমিশন (লেবার কমিশন)। হুইট্‌লি কমিশন ভারতে আসিয়া যাহাতে সাইমন কমিশনের মতো অবস্থায় না পড়ে সেজন্য পূর্ব হইতেই নেতৃবৃন্দকে অপসারণ করা হইয়াছে।

হুইট্‌লি কমিশন বয়কট

আমার মতে হুইট্‌লি কমিশন বয়কট করা একান্ত কর্তব্য। ইংরেজ আমাদের কাঁধের উপর যত প্রকার কমিশন চাপাইয়া দিক-না কেন আমরা বয়কট করিব। বয়কটই একমাত্র অস্ত্র।

এখন আমাদের সম্মুখে তিনটি কর্তব্য আছে। প্রথমটি এই যে আমাদিগকে এই মকদ্দমা পরিচালিত করিবার জন্য অর্থ সংগ্রহ করিতে হইবে। দ্বিতীয়ত, যাহারা গ্রেপ্তার হইয়াছে তাহাদের পরিবারবর্গ যাহাতে কোনো প্রকার কষ্ট না পায় তাহার চেষ্টা করিতে হইবে। আর-একটি প্রয়োজনীয় কাজ এই যে শ্রমিক-আন্দোলনকে বাঁচাইয়া রাখিবার জন্য কর্মী সংগ্রহ করিতে

হইবে। যে-সব স্থান শূন্য হইয়াছে সে-সব স্থান নূতন কর্মীদ্বারা পূরণ করিতে হইবে।

দেশের এই বিপদের সময় আমাদিগকে একতাবদ্ধ হইয়া শ্রমিক-আন্দোলনকে সংঘবদ্ধ করিতে হইবে। যে-সব নেতৃবৃন্দ গ্রেপ্তার হইয়াছেন তাঁহারা যদি জেল হইতেই দেখেন যে তাঁহাদের কাজ কিছুমাত্র নষ্ট না হইয়া উত্তরোত্তর উন্নতির দিকে অগ্রসর হইতেছে তবেই তাঁহাদিগের প্রতি সত্যকার সম্মান দেখানো হইবে।

সমিতির লক্ষ্য

বেহালা সেবাসমিতির চতুর্থ বার্ষিক অধিবেশনে প্রদত্ত ভাষণ।

আজ উৎসব উপলক্ষ্যে আপনারা যে আমাকে আমন্ত্রণ করেছেন সেজন্য আপনারা আমার কৃতজ্ঞতা গ্রহণ করুন। ইতিপূর্বে এই বেহালায় এলেও কোনো সভায় যোগদান করবার, সকলের সঙ্গে সম্মিলিত হবার কোনো সুযোগ ঘটে নি, তাই আজ সানন্দে আপনাদের এ আমন্ত্রণ গ্রহণ করেছি। সকলের সঙ্গে মিলিত হবার সুযোগ পেয়ে আনন্দলাভ করেছি।

দেশে আজ অসংখ্য সমিতি গড়ে উঠেছে। সকলেই এইভাবের উদ্দেশ্য নিয়ে কাজ করছে। এই কাজ যে কত বড়ো, কত বিরাট তা দেশের অবস্থা একটু চিন্তা করলে বেশ বুঝতে পারা যায়। আপনাদের কাজ দেখে আনন্দ ও আশা পাওয়ার অনেক কিছুই আছে। এই কয় বৎসরের মধ্যে যে কাজ করেছেন, তা প্রকৃতই উল্লেখযোগ্য। তবে এও বোধ হয় বুঝতে পেরেছেন, যে আরো বেশি চেষ্টা করলে আরো বেশি সুফল পাওয়া যেতে পারে।

কার্যাবলী দেখে বোঝা যাচ্ছে, একসঙ্গে অনেকগুলি কাজ আরম্ভ হয়েছে। এইরকম সর্বতোমুখী কাজ একযোগে আরম্ভ করা সত্যই আনন্দের বিষয়, আর এই-ই সকলের আদর্শ হওয়া উচিত। মানুষের সকল অভাব, সকল দিক দিয়ে দূর করবার জন্য সর্বাঙ্গীণভাবে চেষ্টা হওয়া প্রয়োজন। আমরা সাধারণত ভাবি মুষ্টিভিক্ষা বা অর্থভিক্ষা দ্বারা সমস্ত কল্যাণ সাধিত হয়। কিন্তু এইটুকু ভাবলেই চলবে না। দেখা উচিত আমাদের উদ্দেশ্য কি? উদ্দেশ্য— অভাব মোচন। কিন্তু অভাব কি? অভাব— অন্ন, বস্ত্র, শিক্ষা, স্বাস্থ্য! একযোগে এই অভাব দূর করবার চেষ্টা না হলে, সবই ব্যর্থ হবে। আনন্দের কথা, আপনাদের এখানে, মুষ্টিভিক্ষা ভিন্ন আরো নানাভাবের কার্য আরম্ভ করা হয়েছে।

একটা কথা বলতে চাই, এ পর্যন্ত সেবাসমিতিগুলি যেভাবে কাজ করে এসেছে, ঠিক সেইভাবে কাজ করলে চলবে না। এই যে অন্নাভাব, এটা কি করে দূর হবে? প্রতি সপ্তাহে অন্ন অর্থ সংগ্রহ করা হয়, সে ভালো কথা! কিন্তু দেখা দরকার, যাদের সাহায্য করা হচ্ছে, তারা কোনোদিন স্বাবলম্বী হবে কিনা। সাহায্যপ্রার্থী ছাত্রই হোক বিধবাই হোক— তাকে স্বাবলম্বী করার

দিকে দৃষ্টি দিতে হবে। আপাতত কজনের দুঃখ ভিক্ষা করে দূর করলেও দারিদ্র্য এতে দূর হবে না।

দারিদ্র্য দূর করবার উপায় কি— তাই দেখা উচিত। ১৯২২ সালে বন্যায় উত্তর বাংলা বিপন্ন হয়ে পড়েছিল। সেই বিপন্ন নরনারীর সাহায্যের জন্য— তাদের দুঃখ দূর করবার জন্য সারা বাংলায় বিপুল চেষ্টা হয়েছিল। তাদের অভাব মোচনের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। এই উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন— এই বাংলাদেশে বৎসরের পর বৎসর দুর্ভিক্ষ, বন্যা দেখা দিচ্ছে। দেশবাসী বিপন্ন হচ্ছে, কিন্তু এর প্রতিকার কী, সেই সম্বন্ধে অনুসন্ধান করা দরকার! তাঁর কথার মর্ম অনেকদিন পরে আমরা বুঝতে সক্ষম হয়েছি। জাতির মধ্যে— তাঁর কর্মে ও চিন্তায় এমন একটা নিশ্চেষ্টভাব এসেছে, যাতে আমরা কোনো সমস্যার সমাধান করতে চাই না। বন্যা কেন হয়, সেটা অনুসন্ধান না করে শুধু দুঃখ মোচন করতে অগ্রসর হলেই কাজের সমাধান হবে না। দারিদ্র্য, দুর্ভিক্ষের সম্বন্ধেও এ কথা খাটে। প্রকৃত সেবক হতে হলে দেখতে হবে, এ দুঃখের কারণ কি, আর কিভাবে সেটা দূর করা যায়। যদি কারণ নির্ধারণ করতে সক্ষম না হই, তবে ফলে কিছুই লাভ করা যায় না।

যারা সমিতির সাহায্য গ্রহণ করে তাদের দিয়ে ঠোঙা তৈরি, সুতা কাটা এমনি ভাবের নানা কাজ করিয়ে নিতে হবে। কুটিরশিল্পের এতে বিশেষ উন্নতি হয়। অন্যদেশে দেশলাই-এর কাঠি, কাগজ প্রভৃতি ঘরে ঘরে দিয়ে আসা হয়, তারা অবসর সময়ে সেগুলি তৈয়ারি করে। সুইজারল্যান্ডে এই ভাবে আলপিন তৈয়ারি হয়। আমাদের দেশে ও ঢাকার গ্রামে গ্রামে কুটির-শিল্পের সাহায্যে বোতাম প্রস্তুত হয়। এইভাবে অবসর সময়ে কাজ করে লোকে আয়বৃদ্ধি করতে পারে। প্রত্যেক সমিতিরও এই বিষয়ে চেষ্টা করা দরকার। এতে সমিতিরও আয় হয়, আর যারা সমিতির সাহায্য গ্রহণ করে, তারাও ভাবতে পারে যে তারা খেটে খাচ্ছে, তাদের মনের কুণ্ঠা দূর হতে পারে। অলস থাকলে, পরানুগ্রহে জীবন ধারণ করলে, মনুষ্যত্বের অপমান করা হয়। Dignity of labour বলে একটি কথা আছে। সত্যই এ একটা সম্মানের জিনিস। এই মনোভাব দেশের মধ্যে সৃষ্টি করা দরকার।

একটি কথা শুনে সুখী হলুম যে, জলসত্রের ব্যবস্থা করে আপনারা মেলার সময় কাজ করে থাকেন। এই-সব মেলা হচ্ছে কাজ করবার একটা মস্ত সুযোগ— উপযুক্ত ক্ষেত্র। দেশের সম্বন্ধে কোনো কথা বলতে হলে, এই-সব

জেলাতেই তার আয়োজন করা দরকার। দেশ-বিদেশ থেকে, কত ভাবের কত লোকেরই না একত্রে সমাবেশ হয়— দেশের লোককে শিক্ষা দিতে হলে এর চেয়ে আর কি সুযোগ পাওয়া যেতে পারে? এখানে Lantern lecture, যাত্রা প্রভৃতি দ্বারা সমাজে সৎশিক্ষা দেওয়া যায়। Propaganda করবার এই একটা মস্ত সুযোগ। তবে, যে দেশে কাজ করতে হবে, সেখানকার আচার-অনুষ্ঠান প্রভৃতির দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখা দরকার। আজকাল মেলাস্থলে সুশিক্ষার কোনো বন্দোবস্ত থাকে না। কুশিক্ষাই বরং লাভ করবার সুযোগ পাওয়ায় জীবন কলুষিত হইয়া ওঠে। এই-সব ভার আমাদের নিতে হবে। মেলার এই বিবিধ লোকের মিলনের অপব্যবহার না হয়ে যাতে সৎশিক্ষার ব্যবস্থা হয়, সেই বিষয়ে দৃষ্টি রাখতে হবে। এই মেলাই হচ্ছে আমাদের দেশোপযোগী শিক্ষার প্রকৃত বাহন। অন্য দেশে অন্য রকম ব্যবস্থা থাকলেও আমাদের দেশে এই মেলাকেই প্রকৃত সুযোগে পরিণত করতে, প্রকৃত ব্যবস্থা বলে গ্রহণ করতে হবে।

অভাবগ্রস্তকে বস্ত্রাদি দান খুব ভালো ব্যাপার। কিন্তু এই বস্ত্র বাজারে না কিনে যদি সুতো কেটে, তাঁত রেখে কাপড় বুনিয়ে বিতরণ করা যায়, তবে আনন্দ আরো বেশি হয়। আর যারা এই কাজ করে তাদেরও সঙ্গে সঙ্গে লাভ হয়। এইভাবে তাঁতেরও বিস্তারলাভ হতে পারে। নানা কারণে এই বিষয়ে দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন।

তারপর রোগ-পরিচর্যা— রোগীর সেবা-শুশ্রূষা— এ খুব বড়ো কাজ। কিন্তু কাজটা সার্থক করতে হলে, এমন কাজের সূচনা করতে হবে, যাতে রোগের নিবারণ হয়, সাধারণের স্বাস্থ্য ভালো থাকে। এ-বিষয়ে সাধারণের মধ্যে জ্ঞান বিস্তার করতে হবে। ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর, কলেরা প্রভৃতি কী— কী ভাবে এই-সব রোগ চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে, আলোক-চিত্র সাহায্যে তা ঘরে ঘরে জানানো প্রয়োজন। আর এভাবে কাজ না করলে সেবাকার্য সার্থক হবে না। রোগকে অবিরত সেবা করে পারা যায় না। Health propaganda করা দরকার। আজকাল চারিদিকে প্রায়ই Health Exhibition হচ্ছে, তারই সাহায্যে বক্তৃতা দিতে পারলে খুব কার্যকরী হয়। এইভাবে সাধারণের মধ্যে জ্ঞান বিস্তার করা বিশেষ দরকার। আর সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োজন ব্যায়াম-চর্চা। আজকাল শিক্ষিত যুবকদের, স্কুল-কলেজের ছাত্রদের দেখলে মনে ভয় হয়, কি করে এরা জীবনযাত্রার সংগ্রামে জয়ী হয়। শিক্ষার এমন ব্যবস্থা থাকা দরকার,

যাতে বিদ্যালয় থেকে বেরিয়ে এলে শরীর ও মনের পূর্ণ শক্তি থাকবে। কিন্তু আমাদের ভাগ্যক্রমে তা ঘটে না। আমরা কী মনে, কী শরীরে নিস্তেজ হয়ে পড়ি, তাই সব বিষয়েই আমরা পশ্চাৎপদ।

আজকাল অধিকাংশ সমিতিতে ব্যায়াম প্রদর্শনী হয়। লাঠিখেলা, ছোরা-খেলা সব শেখানো হয়। বার্ষিক উৎসবে তার নৈপুণ্যও দেখানো হয়। এইভাবে ব্যায়ামের ফলে ছেলেরা সাহসী, শক্তিশালী হয়। বাজারে ভালো খাদ্যের অভাবে ছেলেমেয়েরা নির্জীব হয়ে পড়ছে— এই কারণে ব্যায়াম-চর্চা বিশেষ প্রয়োজন। দরিদ্র হলেও, ব্যায়ামের পক্ষে কোনো অন্তরায় ঘটে না। ব্যায়ামের ফলে আমরা রোগের সঙ্গে যুঝতে পারব, শুধু তাই নয়, রোগ থেকে মুক্তও হতে পারব। বাংলার চারিদিকে ঘুরে বেড়িয়ে দেখছি, অনেক জেলা এমন শোচনীয় অবস্থায় এসে পড়েছে, এমনভাবে মৃত্যুহার বেড়ে চলেছে যাতে মনে হয়, একশো বৎসর পরে দেশে আর মানুষ থাকবে না। দশ লক্ষের মধ্যে এক লক্ষ লোক এক বৎসরে মরে কেন? এর প্রতিকার সম্পূর্ণভাবে আমাদের হাতে না থাকলেও যতটুকু আমাদের হাতে আছে, তা করতে হবে, এইজন্য ব্যায়াম শিক্ষা করা দরকার।

গ্রামে অগ্নিকাণ্ডেও ছেলেরা যে কাজ করেছে এ খুব আনন্দের কথা। এ-বিষয়েও fire drill শিক্ষা করা দরকার। এই শিক্ষা পেলে বেশ যন্ত্রের মতো কাজ করতে পারা যায়। কোনো গোলমাল ঘটে না। অগ্নিকাণ্ডের সময় প্রায়ই সাধারণ লোকে একটা হট্টগোলের সৃষ্টি করে। যারা কাজ করতে যায়, তারাও এই গোলমালে কাজ করার সুযোগ পায় না। এই কারণেই এই বিষয়ে বিশেষ শিক্ষার প্রয়োজন যাতে গোলমালের মধ্য হতেও কাজ করবার মতো সুযোগ আবিষ্কার করা যেতে পারে।

তারপর First Aid শিক্ষার ব্যবস্থা। হাসপাতালে যাঁরা কাজ করে, তাঁদের মধ্যে এক-একজন বেশ প্রিয় পটু বলে মনে হয়। আবার কেউ-বা অপ্রীতিকর বিরাগভাজন বলে মনে হয়। রোগের সময় ঔষধ চাই, কিন্তু পরিচর্যা তার চেয়ে ঢের বেশি কাজ করে। রোগীকে মিষ্ট কথায় ভোলানো, তাকে শান্ত করা বেশ শক্ত কাজ। ব্যাণ্ডেজ বাঁধা প্রভৃতি ব্যাপার শিক্ষা করা উচিত— সঙ্গে সঙ্গে শেখানো উচিত, সেবকের মনোভাব create করা। সম্ভবপর হলে, এ বিষয়ে উপযুক্ত 'ট্রেনিং' দিতে পারলে, খুব অল্প সময়ের মধ্যেই, ভালো 'নার্স' তৈরি করতে পারা যায়।

সংগীতের ব্যবস্থা দেখে বলতে হয়- এই কাজটা এখন খুব বেশি প্রয়োজনীয়। এমন একটা সময় ছিল, এমন মনোভাব আমাদের দেশে এসেছিল, যখন এর চর্চাটা সময় নষ্ট বলে বিবেচিত হত। এর অনাদরের ফলে, আমরা অমানুষ হয়ে পড়েছিলুম। ব্যায়াম যেমন শরীরের পক্ষে প্রয়োজনীয়, সংগীত তেমনি মনের পক্ষে। একমাত্র জাতীয় সংগীতই সারা বাংলাকে স্বদেশীভাবে অনুপ্রাণিত করতে সক্ষম হয়েছিল। আজ আমরা বুঝেছি, সংগীত কত আদরের হওয়া উচিত। এর শিক্ষার একটা আয়োজন করতে হবে। সমাজে যাতে এর আদর হয়, তার ব্যবস্থা করতে হবে। লোকের ভুল ধারণা ভাঙতে হবে। শুধু বিদ্যালয়ের প্রথম ছাত্র হলেই পুরুষার্থ লাভয় হয়, অন্য বিষয়ে প্রশংসা লাভের মূল্য নেই— এই ছিল এতদিনকার ধারণা। কিন্তু কার্যত দেখা যাচ্ছে, জীবন-সংগ্রামে মানুষ জয়লাভ করে, শুধু বিদ্যালয়ে প্রথম স্থান অধিকার করে নয়, সবদিক দিয়ে মানুষ হয়ে। তাই শুধু লেখাপড়ায় প্রথম না হয়ে, জীবনক্ষেত্রে প্রথম হবার শিক্ষা, আমাদের লাভ করতে হবে। তাই যে পর্যন্ত সমাজে এই সংগীতের চর্চা না হয়, ততদিন এর সুফল পাওয়া যাবে না।

সেবকদের জন্য একটা শিক্ষার পদ্ধতি স্থির করতে হবে। সেবার উদ্দেশ্য লোককে "মানুষ" করে তোলা। যতদিন নিজেরা না মানুষ হচ্ছি, ততদিন কি করে লোককে মানুষ করব? এই-সব শেখার জন্য রীতিমত **training** নেওয়া দরকার, সাধারণ লোককে শিক্ষা দেবার জন্য **Night School** খোলা যেতে পারে। কিন্তু তা করতে হলে, কি শেখানো হবে— কিভাবে শিক্ষার বিস্তার করতে হবে, সেগুলি আবিষ্কার করা দরকার। সাধারণ স্কুল-পাঠশালার ব্যবস্থা এখানে চলবে না। এর জন্য **special training** দরকার, নচেৎ ভালো কর্মী তৈরি হতে পারে না। অথচ নৈশ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করাও বিশেষ দরকার। দশজন ভালো কর্মী পেলে, একটা স্কুল বেশ চলতে পারে। আর এই-ই লোকশিক্ষার একটা মস্ত field, তবে এই-সব কাজ সার্থক করতে হলে, দেখতে হবে, দেশের যে অবস্থা নিত্য দেখছি, তাই দেশের প্রকৃত রূপ কি না। বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠে দেশমাতৃকার যে তিনটি চিত্রের কথা আছে, সেই চিত্র তিনটি মানসপটে অঙ্কিত রাখতে হবে তবেই বর্তমান সময়ে কী করা উচিত— তা আমরা বুঝতে পারব। চিত্র তিনটি: দেশ কী ছিল— কী হয়েছে— আর কী হবে।

যে দেশ এককালে বড়ো ছিল, যে দেশে গার্গী মৈত্রেয়ী জন্মগ্রহণ করেছিলেন,

যে দেশে এককালে মানুষ জন্মেছিল, সে দেশ আবার বড়ো হতে পারে। স্বামী বিবেকানন্দ বলতেন, "জাতির মধ্যে আত্মবিশ্বাস ও শ্রদ্ধা ফিরিয়ে আনো।" দেশবন্ধুও বলতেন— "আত্মবোধ ভুলে যাওয়াতেই বাঙালী এইরূপ হয়ে পড়েছে।" এ খুব সত্য কথা। তাই মেকলে আমাদের সম্বন্ধে যা বলেছেন, তাতে জাতি হিসাবে আমরা অপমানিত হয়েছি বটে, কিন্তু তার মধ্যেও কিছু সত্য আছে। কেননা যাদের সংসর্গে তিনি এসেছিলেন, তাদের মধ্যে কয়েকটি সত্যই তেমনি স্বার্থপর হীন লোক তখনো ছিল। মেকলে ভুলক্রমে তাদের কটিকেই বাংলার স্বরূপ, প্রতীক বলে গ্রহণ করেছিলেন।

আজ আমরা আবার মানুষ হবার চেষ্টা করছি। আত্মবিশ্বাস আমাদের ফিরিয়ে আনতে হবে— নিজের শক্তির ওপর বিশ্বাস আনতে হবে। যাঁদের গৌরবে আমরা আজ গর্ব অনুভব করি, তাঁদের জীবনী আলোচনায় দেখতে পাই, যে, স্বামী বিবেকানন্দ বা রবীন্দ্রনাথ বা জগদীশচন্দ্র প্রমুখ সকলেই জীবনের গোড়া থেকে এমনি আত্মবিশ্বাস পেয়েছিলেন। আত্মবিশ্বাস হারিয়েই আজ আমরা অন্নবস্ত্রহীন, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যহীন। দুর্দিনের এই অন্ধকারের মধ্যেও আমাদের দেশে এত মনীষী জন্মগ্রহণ করেছেন, যে সত্যই আশ্চর্য হতে হয়। বাঙালী সভ্যজগতে সকলের সঙ্গেই প্রতিযোগিতায় সক্ষম। কী বিদ্যা, কী জ্ঞান, শিল্প, বাণিজ্য— সকল বিষয়েই আমাদের দেশের লোকেরা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ লোকদের সঙ্গে সমান আসন গ্রহণ করতে পারে। এই পরাধীন জাতির মধ্যেও এই ভাব দেখে মনে হচ্ছে, জাতি এখনো বেঁচে আছে।

বিবেকানন্দ বলতেন— man making is my mission— খাঁটি মানুষ তৈরি করাই সবচেয়ে বড়ো কাজ। কেননা ব্যক্তি হচ্ছে জাতির ভিত্তিস্বরূপ। আর এই ব্যক্তিত্ব ফুটবে কি করে— মানুষ তৈরি হবে কি করে? হবে, এই-সব সমিতির দ্বারা। বাংলাদেশের শিক্ষার ব্যবস্থায় কিছু হবে না— যদি কিছু হয়, এই সমিতির দ্বারাই হবে।

সমিতির যারা সেবক, তাদের একটা কথা মনে রাখতে হবে, সেবা করে তারা অপরকে ধন্য করে না, তারা নিজেরাই ধন্য হয়। তারা সত্যকার শিক্ষা লাভের সুযোগ পেয়ে "মানুষ" হতে পারে। সেবা করে জীবনে এমন একটা প্রেরণা আনন্দ জাগে, এমন একটা ছাপ হৃদয়ে অংকিত হয়, যা সারা জীবনের একটা সম্পদ হয়ে ওঠে। আমার ব্যক্তিগত ধারণাও এই। সমিতিই প্রকৃত মানুষ হবার কেন্দ্র। এই ভাবটি সর্বদা মনে রাখতে হবে। পাঁচজনের উপকার করব,

এ ভ্রান্ত ধারণা ত্যাগ না করলে কিছু হবে না। সাহায্যপ্রার্থীর মধ্যে প্রকৃত মনুষ্যত্বের উদ্বোধন না হলে জানতে হবে আমরা অপরের কিছুই করি নি, আমাদের নিজেদেরই উপকার করছি। সেবার প্রকৃত উদ্দেশ্য কি ? তা জানতে হলে একটু দূরদর্শী হতে হবে, পরিণামের দিকে দৃষ্টি রাখতে হবে। পূর্বে বন্যার প্রসঙ্গে যা বলেছিলুম সেই কথাই আবার বলি, এ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করা দরকার। সেবা করতে গিয়ে, আমরা এ কাজে কিঞ্চিৎ অগ্রসরও হয়েছিলুম। অনেকের সাহায্যও নেওয়া হয়েছিল, তাতে বোঝা গেল, এর প্রতিকার সম্ভবপর। দুর্ভিক্ষ বন্যার প্রতিরোধ করা আমাদের সাধ্যাতীত নয়। সবই মানুষের হাতে। একটা কথা ভেবে দেখলেই হবে, অন্য দেশে দুর্ভিক্ষ হয় না আর আমাদের দেশেই বা হয় কেন ? এই ইংলণ্ডে দু মাসের উপযোগী খাদ্য উৎপন্ন হয় আর আমাদের দেশে দু বৎসরের উপযোগী খাদ্য জন্মায়— এ ক্ষেত্রে আমাদের দেশেই বা এরূপ দুর্ভিক্ষ হয় কেন ?

এর একমাত্র কারণ আমাদের দেশে সংরক্ষণে কোনো ব্যবস্থা নেই। সংরক্ষণের রীতিমত ব্যবস্থা থাকা দরকার। পূর্বে এই ব্যবস্থা ছিল, কাজেই দুর্ভিক্ষ এত অধিক হত না। আর আজকাল একটি জেলায় যদি কোনো বৎসর অজন্মা হয়, তবে সেখানে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়। এর কারণ কি ? এ সমস্যার সমাধান করা দরকার কেননা এ-ই প্রকৃত অন্ন সমস্যা !

এক শত বৎসর পূর্বেও ঘরে ঘরে চরকা তাঁতের প্রচলন ছিল। বাংলাতে লক্ষাধিক তাঁতি জোলার বাস ছিল ; তারাই কোটি কোটি লোকের বস্ত্র সরবরাহ করত। যখন বিলাতী সস্তা কাপড়ের আমদানী হল— তখন সস্তার দিকে দৃষ্টি রাখতে গিয়ে, একবার ভেবে দেখলুম না, এর পরিণাম কি হবে ! গ্রামে গ্রামে চরকা তাঁত বন্ধ হয়ে যাওয়ার ফলে, বাংলার লক্ষ লক্ষ লোক অন্নহারা হয়েছে, অনেকে প্রাণত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছে। এইভাবে যখন অন্যসব জিনিস বিদেশ হতে আসতে লাগল, তখন বাংলাদেশের যাবতীয় শিল্প একে একে ধ্বংস হতে লাগল। আর জীবিকা অর্জনের পথ বন্ধ হওয়ায় কোটি কোটি লোক অন্নাভাবে প্রাণত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছে। চাষবাস আর শিল্প-বাণিজ্যই হচ্ছে দেশের উন্নতির সোপান, পরম সম্পদ। শিল্প বাণিজ্য হস্তান্তরিত হওয়ার ফলে, কেবলমাত্র চাষের উপর নির্ভর করায়, আমরা আরো দরিদ্র হয়ে পড়ছি। দারিদ্র্য এত অধিক যে, জমিতে চাষের জন্য সার ব্যবহার করে জমিকে উর্বরা করার ক্ষমতা পর্যন্ত আমাদের নেই।

আর, এই একশত বৎসর ইংরেজদের অবস্থা কি ছিল দেখা যাক। তখন এদেশের কাপড় বিলাতে বিক্রীত হয়ে এদেশে অর্থেরই আমদানী করত। নিজের দেশের উৎপন্ন থেকে নিজেদের অভাব মিটে যেত ; যা উদ্বৃত্ত থাকত, তাই বিদেশে রপ্তানী করা হত। তাই সেই সময় ইউরোপ এ-দেশ সম্বন্ধে মন্তব্য প্রকাশ করত— India drinks wealth of the world but gives nothing in return— আজ ইউরোপ যা করছে ভারত একদিন তাই করত, তাই দুদিক দিয়ে আমাদের লাভের অঙ্ক পুষ্টিলাভ করত— ফলে ভারত সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছিল।

ভারতের এই ধন ঐশ্বর্যের আকর্ষণেই ইংরেজ এদেশে এসেছিল। ঐশ্বর্যের কারণ ছিল, আমরা এ দেশের উদ্বৃত্ত রপ্তানী করতুম বটে, ওদেশ থেকে তার বিনিময়ে কিছুই আমদানী করতুম না। ইংরেজ তাই নিজের দেশকে সমৃদ্ধ করবার আশায় নিয়ম করে শুল্ক বসিয়ে আমাদের দেশের কাপড় চালান দেওয়া বন্ধ করতে চেষ্টা করেছিল। তাতেও বিশেষ ফললাভ না হওয়ায়, তারা আইনের আশ্রয় গ্রহণ করল যে, ভারতীয় বস্ত্র কেহ ব্যবহার করতে পারবে না, কোনো ব্যবসায়ী তা আমদানী করতে পারবে না— করলে রাজদণ্ডে দণ্ডিত হবে। তাতেও যখন আশানুরূপ ফললাভ হল না, তখন তারা সামাজিক প্রথার সাহায্য গ্রহণ করলে। এইভাবে তারা সে দেশে ভারতীয় বস্ত্রের ব্যবহার বন্ধ করে, দেশে বস্ত্রশিল্পের অভ্যুদয় ঘটিয়েছিল। আমাদের দেশের ধ্বংসের সঙ্গে সঙ্গে তাদের শ্রীবৃদ্ধি হতে লাগল।

আমাদের দেশে বর্তমান অবস্থায় এভাবে শিল্পের অভ্যুদয় ঘটানো অসম্ভব। এমনভাবে আমরা শৃঙ্খলিত যে, কোনো কাজ করতে সক্ষম নই। ইম্পিরিয়েল ব্যাঙ্ক আমাদের দেশের ব্যাঙ্ক হলেও, দেশের কোনো ব্যবসাকে সে সাহায্য করবে না। এদেশের রেলের ব্যবস্থাও ভিন্ন। এক প্রদেশ থেকে আর প্রদেশে কোনো জিনিস চালান করতে রেলে যা খরচ পড়ে ইংলণ্ড কি আমেরিকা থেকে সে জিনিস ভারতে আনতে তার চেয়ে অল্প খরচ লাগে— এত বেশি এর ভাড়া ! কাজ করবার কোনো সুযোগই আমাদের নেই। গভর্নমেণ্ট স্টোর আছে, কিন্তু এদেশী জিনিসের এখানে কদর নেই ; এর উদ্দেশ্য নিজেদের ব্যাবসার শ্রীবৃদ্ধি করা ! এমন-কি, জার্মানির অল্প মূল্যের জিনিস বাদ দিয়ে বেশি দামের ব্রিটিশ Goods এখানে কেনবার ব্যবস্থা হয় ! Department of Industriesও এইরকম একটা ভুয়ো সংস্থা। ইংরেজ বণিক ব্যাবসা

করতে এসেছে, সুতরাং গভর্নমেণ্টের উদ্দেশ্য তাদের ব্যাবসা-বাণিজ্যে সাহায্য করা। বেঙ্গল কাউন্সিলেও ইংরেজ ব্যাবসাদার সদস্যরা গভর্নমেণ্টের পক্ষে ভোট দেন এই কারণে ব্যবসায়ে সাহায্য লাভে আমাদের স্থান কোথাও নেই। অল্প মাইনের চাকুরি কয়েকটা খোলা আছে— তার কারণ এত অল্প বেতনে বিদেশ থেকে লোক আসে না। একটু ভালো চাকুরিতে এ দেশীয় লোকদের অধিকার নেই।

বেশ দেখা যাচ্ছে, শুধু চাষবাসে দেশ বড়ো হতে পারে না ; অন্ন সমস্যা বেকার সমস্যার কোনো সমাধান হয় না। কি কাজ আমরা করব ? এক চাকরি আর ব্যাবসা। কিন্তু সেও আমাদের করায়ত্ত নয়। এর জন্য কমিটি অনেক নিযুক্ত হয়েছে— কিন্তু আসল কথা, যতদিন না ব্যাবসা-বাণিজ্য আমাদের হাতে আসছে, ততদিন কোনো আশা নেই। আমাদের সংকল্প করতে হবে— ব্যাবসা আমাদের হাতে নেওয়াই চাই ! যে-সব বন্ধনে আমরা আবদ্ধ, তা মোচন করতেই হবে। আমাদের পথ খুঁজে নিতেই হবে, কেননা ব্যাবসা ছেড়ে দিলে, শিক্ষার দিক দিয়েই বা আমরা কোথায় ? ইংরেজ আজ দেড়শো বৎসর ধরে ভারতবর্ষ শাসন করে শতকরা পাঁচজনকে শিক্ষা দিয়েছে— এতে তাদের এদেশে আর শাসন করবার দাবি কোথায় ? এইভাবে শিক্ষা পেতে হলে, সারা ভারতের শিক্ষিত হওয়ার পূর্বেই জাতি ধ্বংস হয়ে লোপ পেয়ে যাবে। শিক্ষার ব্যবস্থা করতে বললেই গভর্নমেণ্ট বলেন টাকার অভাব, অথচ তাঁদের কোনো কাজে টাকার কখনো অভাব ঘটে না। উদাহরণস্বরূপ দেখানো যেতে পারে ছ' কোটি টাকা ব্যয়ে "বালী ব্রিজ" হতে পারে— পুলিসের জন্য অজস্র টাকা ব্যয়ও কিছুই নয়— কেননা পুলিস না হলে বর্তমান শাসন-পদ্ধতি চলবে না— ব্যাবসা-বাণিজ্য ও ধর্মঘট প্রভৃতিতে বা কুলী-মজুরের হক দাবিতে বন্ধ হয়ে যাবে— কাজেই এ বিষয়ে ব্যয় করতে গভর্নমেণ্ট মুক্তহস্ত। কেবল আমাদের দেশের কাজের বেলাতেই টাকার অভাব ঘটে। অন্ন, বস্ত্র, শিক্ষা আর স্বাস্থ্য— এই চারটি হচ্ছে আমাদের বড়ো সমস্য— গভর্নমেণ্টের সাহায্য না পেলে দেশ জুড়ে ব্যাপকভাবে কোনো কাজ না করলে এ-বিষয়ে কোনো সুফল হবে না। কিন্তু গভর্নমেণ্টের সকল কাজের বেলায় উত্তর একই, টাকার অভাব। **Primary Education Bill** কার্যকরী করবার ব্যবস্থা হচ্ছে তাতেও tax দিতে হবে। যদিও আমাদের দেশ দরিদ্র, করভারে ইতিমধ্যে প্রপীড়িত তবুও টাকা চাইলেই সেই এক উত্তর— **Tax** দাও।

সকল সমস্যার মূলে ধন-সমৃদ্ধি করতে হবে। শস্যের রপ্তানী বন্ধ করে, দেশে অন্নের সংস্থান রাখতে হবে। পানীয় জলের ব্যবস্থা করতে হবে। অবশ্য এ-বিষয়েও সেই উত্তর— টাকার অভাব! প্রকৃতপক্ষে গভর্নমেণ্ট ট্রেজারি আমাদের হাতে না এলে, কিছুই হবে না। গভর্নমেণ্ট আমাদের ওপর কি রকম ধারণা পোষণ করেন, তা দিনাজপুরে গতবার দুর্ভিক্ষের সময় প্রকাশ পেয়েছে। ভীষণ দুর্ভিক্ষের ফলে মানুষ পশুতে পরিণত হয়েছিল— মা সন্তানকে বিক্রয় করেছে, স্বামী স্ত্রীকে পর্যন্ত বিক্রয় করতে বাধ্য হয়েছে। শোচনীয় দুর্দশাতেও গভর্নমেণ্ট এ-বিষয়ে দৃষ্টিপাত করলেন না। শুধু তাই নয়, স্ত্রী ও সন্তানবিক্রয়ের অন্য কারণ নির্দেশ ক'রে ব্যাপারটি অতিরঞ্জিত ঘটনা বলে এক ইস্তাহার জারী করলেন! এ সময় সাহায্য করা দূরে থাক্, এই ব্যাপারে জাতিকে অপমান করতেও তাঁরা কুণ্ঠিত হন নি। স্বাধীন দেশ হলে এই ইস্তাহার দেওয়ার পর গভর্নমেণ্ট একদিনও থাকত কি না সন্দেহ।

যাঁরা বেশ ভালোভাবে, ঐশ্বর্যের মধ্যে সুখে থাকেন, তাঁরা দুঃখ-দারিদ্র্য বুঝতে পারেন না। শাসক যদি প্রজার বেদনা অনুভব না করে তবে এরকম ইস্তাহার হবেই। যদি তারা দুর্ভিক্ষ-পীড়িত অঞ্চলে বাস না করে তবে সেখানকার দুঃখ ব্যথা বুঝবে কি করে? তাই আমাদের সমস্ত Political Problem। ইংরেজ বলেন সামাজিক সংস্কার না হলে Political Problem ঘুচবে না। কিন্তু মুখে তা বললেও, কার্যত তাঁরা কোনো সংস্কারই পছন্দ করেন না, তাঁরা বেশ জানেন যে 'প্রাণ' যে জাতির একবার জেগে উঠেছে, সে জাতি সর্বতোভাবে জেগে উঠবে। তাঁরা কোনো অংগের মধ্যেই জীবনের স্পন্দন দেখতে চান না। তাঁরা জানেন, তাহলে এ শাসন এ শোষণ আর চলবে না। এই কারণেই বিশেষ দরকার 'সেবা'। কিন্তু এ-বিষয়ে অনেকদূর লক্ষ্য রেখে, আমাদের গভীরভাবে চিন্তা করতে হবে। আমাদের এখন বড়ো সমস্যা হচ্ছে পরাধীনতা— জাতিকে এর নাগপাশ থেকে মুক্ত করা। ক্ষমতা আমাদের কিছুই নেই। ক্ষমতা নিজেদের হাতে এলে বলতে পারি আমাদের ইচ্ছা অনুসারে আমরা জাতি গড়ে তুলব। গত দশ বৎসরে আমাদের এশিয়ার কত সুপ্ত জাতিই জেগেছে, তার কারণ ক্ষমতা এসেছে তাদের হাতে।

এদেশেও আজ প্রাণের স্ফুরণ দেখা দিচ্ছে। জাতির জীবনীশক্তি আজ আত্মপ্রকাশ করতে চেষ্টা করছে। সাহিত্য, দর্শন, কাব্য, রসায়ন, খেলাধুলো, ব্যায়াম— সব বিষয়েই নূতন সৃষ্টি দেখা যাচ্ছে, এই হচ্ছে জাতির জীবনের

লক্ষণ। আমাদের মধ্যে যে সৃষ্টির ক্ষমতা আছে, তার যে লক্ষণ চারিদিকে ফুটে উঠেছে, এই আশার কথা। জাতীয় জীবনের আজ সর্বতোমুখী আত্ম-প্রকাশ দরকার।

এই-যে সমিতির মধ্যে এসে সকলে মিলিত হয়, এ সুখের বিষয়— কেননা এই প্রকৃত শিক্ষার কেন্দ্র। বুঝতে হবে সেবা কি? মানুষ কি? দেশের বর্তমান অবস্থা, দেশের স্বরূপ কি? এই-সব বুঝতে প্রাণে অনুভূতি দরকার। মহৎ কাজের মূলে থাকে অনুভূতি। গৌতম বুদ্ধ, জরা দৈন্যের নিদর্শন দেখে দুঃখ পেয়ে, সেই দুঃখ দূর করবার সমস্যার সমাধান করতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন। লোকের কষ্ট দেখে সে কষ্ট দূর করবার জন্য যদি প্রাণে আগ্রহ না জাগে তবে প্রেরণা আসবে কোথা হতে? দুঃখের মূর্তি দেখলে প্রাণে বেদনা জন্মে। বেদনা না জাগলে সেবা করা যায় না। প্রত্যেক কর্মীকেই একটা-না-একটা বেদনা পেতে হয়েছে— তবেই জীবনে একটা transformation এসেছে।

লেখাপড়ার উদ্দেশ্য শুধু নিজের সুখবৃদ্ধি নয়। গতানুগতিকের পথ থেকে সকলকে ফেরাতে হলে প্রাণে বেদনা, অনুভূতি জাগাতে হবে। যদি আমরা ভাবি, আমরা কী ছিলুম, আর যদি কল্পনায় ভেবে দেখি আমরা কী করতে পারি, যদি প্রাণকে জাগাতে পারি, বর্তমানে স্বাধীন জাতিরা কিভাবে আছে আর আমরা কী হতে পারি তবেই মানুষের প্রাণ জাগবে। মানুষের জীবনকে এমনভাবে রূপ ভারিত করতে হবে যাতে তারা দেশসেবার জন্য আত্ম-বিসর্জন করতে পারবে। এই হওয়া উচিত যুবকের আদর্শ, আর এতে আছে আনন্দ। ত্যাগে কোনো কষ্ট নেই, তাহলে মানুষ ত্যাগ করতে পারত না। আপনাকে নিঃশেষে বিলিয়ে দিতে না পারলে আনন্দ জাগে না। ত্যাগেনৈব আনন্দম্— এ কথায় মিথ্যা কিছুই নেই।

সমিতির মধ্যে যতদিন না মানুষ তৈরি হবে, ততদিন বুঝতে হবে সমিতির উদ্দেশ্য সফল হয় নি। মানুষের শক্তি জাগাতে পারলেই অসম্ভবকে সম্ভব করতে পারা যায়। বর্তমান যুগ কর্মের যুগ, আত্মবিসর্জনেই প্রকৃত আনন্দ, এই ভাব মনে জাগিয়ে রাখলে দশ-বিশ বৎসরের মধ্যে নূতন জাতির সৃষ্টি হবে। বিরাটত্বে, বৈচিত্র্যে, আমাদের দেশে অভাবের কিছুই নেই। এমন প্রাকৃতিক সৌন্দর্য এমন জাতীয় সম্পদ কোথায় আছে? কবি, দার্শনিক, বণিক, শক্তিশালী বলবান লোক প্রত্যেকেরই এক 'বৈশিষ্ট্য' আছে। প্রকৃতপক্ষে

উপাদানের অভাব আমাদের কিছুই নেই। আমাদের এখন দরকার এই বিচিত্র উপাদানগুলি একত্র আহরণ করে সংঘবদ্ধ করে এক অপূর্ব মূর্তি গঠন করা। তারপর সেই মূর্তিতে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করতে হবে। আর সেটা সম্ভবপর হবে যদি আমাদের প্রাণ জাগে। যদি আমরা বেদনা পেয়ে প্রাণকে জাগাতে পারি, তবেই অসীম শক্তির উদ্বোধন হবে। এই শক্তির প্রথম উদ্বোধন হবে ব্যক্তিত্ব— তারপর ব্যক্তি থেকে সমগ্র জাতির মধ্যে এ শক্তি অনুপ্রাণিত হবে।

আজ আশা করি, সেই দিকে লক্ষ্য রেখে আপনারা চলবেন। আপনাদের সমিতিতে ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশ হবে।

২২ মার্চ ১৯২৯

অভিভাষণ

৩০ মার্চ ১৯২৯ রংপুরে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনে সভাপতির অভিভাষণ।

মাননীয় অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি মহাশয়,

সমবেত ভদ্রমহিলা ও ভদ্রমহোদয়গণ,

প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মিলনীর সভাপতিত্বে বরণ করিয়া আপনারা আমার প্রতি যে অসীম স্নেহ ও অতুলনীয় সম্মান প্রদর্শন করিয়াছেন তাহার জন্য আমার অন্তরের ঐকান্তিক কৃতজ্ঞতা গ্রহণ করুন। স্বর্গাদপি গরীয়সী জন্মভূমির সেবকমাত্রই আপনাদের স্নেহের পাত্র এবং আমি গত কয়েকবৎসর যাবৎ দেশ-মাতৃকার সেবার ভিতর দিয়া নিজের জীবন সার্থক ও সফল করিবার চেষ্টা করিয়া আসিতেছি। বিদেশী আমলা-তন্ত্র মাতৃসেবার প্রচেষ্টাকে সন্দেহপূর্ণ দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করিয়া থাকে এবং তারই জন্য আমলাতন্ত্রের নিকট মাতৃ-সেবককে নানাপ্রকার লাঞ্ছনা ও অত্যাচার ভোগ করিতে হয়। কিন্তু লাঞ্ছিত সেবকের ম্লান ললাটে আপনারা সম্মান ও প্রীতির রক্তচন্দন টিকা পরাইয়া থাকেন এবং ভাব-প্রবণ বাঙালী জাতির স্বাভাবিক উচ্ছ্বাসের সহিত তাহার উপর স্নেহ ও শুভ-ইচ্ছা বর্ষণ করিয়া থাকেন। তথাপি এ কথা আমি আজ বলিতে বাধ্য যে ব্যক্তিগত যোগ্যতার গুণে আমি আজ এ-আসন গ্রহণ করি নাই। আমাকে সভাপতিত্ব প্রদান করিয়া আপনারা সম্মান ও আস্থা দেখাইয়াছেন বাংলার জাগ্রত তরুণ শক্তির প্রতি; এই অনুষ্ঠানে আমি আজ নিমিত্তমাত্র। আমি এখনো যৌবনের সীমানা অতিক্রম করি নাই এবং অগণিত মুক্তিপথযাত্রীর মধ্যে আমিও এক জন পথিক। তাই বলি, হে আমার বাংলা মায়ের সন্তানবৃন্দ, আশীর্বাদ করুন যেন আজিকার এই প্রীতি ও সম্মানের কথঞ্চিৎ যোগ্য হইতে পারি; যৌবনের প্রারম্ভে যে পথ আশ্রয় করিয়াছি, সারাটি জীবন যেন ধৈর্য্য, শ্রান্তি ও মোহের হাত এড়াইয়া সেই পথেই বীর-পদক্ষেপে চলিতে পারি।

যে স্থানে আজ আপনারা সমবেত হইয়াছেন কত ইতিহাস তাহার আছে। কত রাগোজ্জ্বল প্রভাত ও কত ঘোর অমানিশার কাহিনী তার অঙ্গে অঙ্গে জড়াইয়া আছে, কত সভ্যতার কাহিনী এই ধূলিতে তাহার চরণচিহ্ন রাখিয়া গিয়াছে। সেই অতীত সমৃদ্ধির স্মৃতি বাঙালীর মানসপট হইতে লুপ্তপ্রায়। কিন্তু আত্মবিস্মৃতির ভিতর দিয়া জাতির নবজাগরণ আসিতে পারে না।

তাই আসুন, স্মৃতিবহুল এই পুরাতন ও পবিত্র বরেন্দ্রভূমে আমরা একবার কালের অবগুণ্ঠন সরাইয়া রংপুরের অতীত গৌরবের পর্যালোচনা করি।

প্রাচীন কিংবদন্তী এই অঞ্চলের সহিত দেবাদিদেব মহাদেবের লীলা বিজড়িত করিয়া রাখিয়াছে। এই শিবধামে মুক্তিকামী বাঙালীকে আপনারা আজ আহ্বান করিয়াছেন। কালের চক্রান্তে অমৃতের পুত্রগণ শিবত্ব হারাইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে; 'তাই স্মৃতি দিয়ে ঘেরা' এই অতীতের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে আমরা শব-সাধনার জন্য সম্মিলিত হইয়াছি।

মহাভারতের যুগে রংপুর কামরূপ বা প্রাগ্‌জ্যোতিষের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ভগদত্ত ছিলেন রংপুরের অন্যতম রাজা এবং তিনিই নাকি রাজপ্রাসাদ নির্মাণের পর 'রঙ্গপুর' নামকরণ করিয়াছিলেন। পরবর্তী যুগে বিখ্যাত পালবংশীয় অধিপতিগণ রংপুর অঞ্চলে শাসন বিস্তার করিয়াছিলেন এবং তাহাদের মধ্যে ধর্মপালের নাম উল্লেখযোগ্য। ধর্মপালকে পরাজিত করিয়া মানিকচন্দ্র তাঁহার রাজত্ব স্থাপন করেন। মানিকচন্দ্রের গান আজও নানাস্থানে গীত হইয়া থাকে। এই-সব গানের ভিতর দিয়া উত্তরবঙ্গের অধিবাসীগণ মানিকচন্দ্রের পত্নী ময়নামতীর অলৌকিক ক্ষমতার কথা, তাঁহার পুত্র গোপীচন্দ্রের ও তদীয় পত্নীদ্বয় অদুনা-পদুনার হৃদয়গ্রাহী কাহিনী শুনিয়া থাকেন। তারপর উত্তরবঙ্গে যখন প্রবল পরাক্রান্ত নীলধ্বজ বংশীয় রাজগণ রাজত্ব করেন, তখন রংপুর তাঁহাদের অন্যতম রাজধানী ছিল। মুসলমান যুগে হুসেন শাহের মতো বিচক্ষণ ও ধর্মপরায়ণ নৃপতি এই অঞ্চলে শাসন করিয়াছিলেন। মুসলমান যুগের অবসানে ও ব্রিটিশ যুগের প্রারম্ভে যখন অরাজকতা সৃষ্টি হইয়াছিল তখন ভবানী পাঠক, দেবী চৌধুরানী প্রভৃতির নেতৃত্বে শত শত সন্ন্যাসী এবং সহস্র সহস্র নির্ভীক ও স্বদেশানুরাগী বঙ্গবাসী স্বাধীনতার জন্য প্রাণপাত করিয়াছিলেন। এই-সব অলৌকিক ঘটনা অবলম্বন করিয়া, বর্তমান যুগে বঙ্কিমচন্দ্র 'আনন্দমঠ' ও 'দেবী চৌধুরানী' — প্রণয়নের দ্বারা নবজাগরণের বোধন করিয়াছেন। জাতীয়তার প্রধান পুরোহিত— কবি, শিল্পী ও সাহিত্যিক বঙ্কিমচন্দ্রকে এই রংপুর জেলা চিন্তার ও সৃষ্টির কত উপকরণ যোগাইয়াছে! কে বলিতে পারে যে অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ ভারতের যে স্বপ্ন সত্যদ্রষ্টা বঙ্কিমচন্দ্র দেখিয়াছিলেন এবং তাঁহার অতুলনীয় লেখনী সঞ্চালনের দ্বারা তিনি যাহা সাহিত্যে অমর করিয়া গিয়াছেন— সেই স্বপ্ন তিনি রংপুরে দেখেন নাই?

রংপুরের ইতিবৃত্ত আলোচনা করিতে গেলেই মনে পড়ে বরেন্দ্রভূমের কথা, গৌড়ের স্বপ্নময়ী স্মৃতি, পাল সাম্রাজ্যের কাহিনী ; সহস্রাধিক বৎসর পূর্বে যে বরেন্দ্রভূমে বাংলার রাজগণের অপূর্ব শৌর্য বীর্য দেখা গিয়াছিল কী শিল্প, কী সাহিত্য, কী পাণ্ডিত্য— সকল বিষয়ে একদিন যে দেশে বাঙালী প্রতিভার চরম বিকাশ হইয়াছিল— আজিকার এই রংপুর সেই বরেন্দ্রভূমেরই অন্যতম অংশ— বাঙালীর শৌর্য-বীর্যের গৌরবময় লীলাস্থল।

এই বরেন্দ্রভূমে সপ্তম ও অষ্টম শতাব্দীতে প্রজাশক্তি ও রাজশক্তির মধ্যে বিপুল সংঘর্ষের ফলে অরাজকতা সৃষ্টি হইয়াছিল। সে সংঘর্ষে জয়ী হইয়া প্রজাবর্গই নিজ মনোনীত ব্যক্তি গোপালদেবকে সিংহাসনে বসাইয়াছিল এবং দেশ হইতে 'মাৎস্য-ন্যায়' বা অরাজকতা বিদূরিত করিয়াছিল। তারপর পালবংশের অন্যতম রাজা মহীপালের অত্যাচারে প্রজাবৃন্দ বিদ্রোহী হইয়া উঠে এবং মহীপাল সিংহাসনচ্যুত ও নিহত হন। প্রজামণ্ডলী কৈবর্তজাতীয় একজন প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তিকে রাজপদে অভিষিক্ত করেন। তাঁহার নাম দিব্বোক। কৈবর্তজাতীয় রাজগণ কিছুকাল শাসন করার পর পালবংশীয়েরা আবার বাহুবলে রাজ্য ফিরিয়া পান। পালবংশীয় রাজা দেবপালের আমলে বাঙালী হিমাদ্রি হইতে বিন্ধ্যাচল এবং পূর্বসাগর হইতে পশ্চিমসাগর পর্যন্ত এক বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল। "এই দেবপাল উৎকল-কুল উৎকলিত করিয়াছিলেন, হূণ-গর্ব খর্ব করিয়াছিলেন, দ্রাবিড় গুর্জর-নাথের দর্প চূর্ণ করিয়াছিলেন, সমুদ্র মেখলাভরণা বসুন্ধরা উপভোগ করিয়াছিলেন।" (নরুড় স্তম্ভলিপি, ১৩শ শ্লোক)। ই সাম্রাজ্যের রণতরী ভারতের বিভিন্ন নদ-নদীতে গমনাগমন করিত— সুদূর সিংহল সুমাত্রা যবদ্বীপে পর্যন্ত বাংলার পণ্যবাহী অর্ণবপোত চলিত। কথিত আছে যে বাঙালীর এই দিগ্বিজয়ী বার্তা শ্রবণমাত্র— "উৎকলাধীশ অবসন্ন হৃদয়ে রাজধানী পরিত্যাগ করিতেন— আর প্রাগ্‌জ্যোতিষের অধীশ্বর রাজাদেশ মস্তকে ধারণ করিয়া সন্ধি-বন্ধন করিতেন। বাঙালীর বিজয়গৌরবে দাক্ষিণাত্যের শিল্পরুচি অতিক্রান্ত হইয়াছিল, লাট দেশের কমণীয় কান্তি আবিল হইয়াছিল, অঙ্গদেশ অবনত হইয়া পড়িয়াছিল ; কর্ণাটের লোলুপ দৃষ্টি অধোমুখে অবস্থিত থাকিতে বাধ্য হইয়াছিল, মধ্যদেশের রাজ্যসীমা সংকুচিত হইয়া গিয়াছিল।"

এই হইল প্রায় সহস্রবৎসর পূর্বের কথা। এ কীটদষ্ট জীর্ণ ইতিহাস

আজিকার বাঙালীর নিকট হয়তো নিশাশেষের সুখ-স্বপ্নের ন্যায় প্রতীয়মান হয়।

বাঙালীর এই জাতীয় সভায় দাঁড়াইয়া বাঙালীর কর্তব্য সম্বন্ধে কিছু বলিবার পূর্বে আমি তাই একবার আলোচনা করিতে চাই— বাংলার ইতিহাসের ধারা, বাংলার স্বরূপ, বাংলার আদর্শ ও সাধনা। বাংলাকে যে চেনে না— বাঙালীর সুখ-দুঃখের কাহিনী ও আশা-আকাঙ্ক্ষার সংবাদ যে রাখে না, সে বাঙালীকে তাহার কর্তব্য সম্বন্ধে কি পরামর্শ দিতে পারি ?

সমগ্র বাংলা জেলা-মহকুমা প্রভৃতি ভাগ-বিভাগ সত্ত্বেও এক অখণ্ড পূর্ণাঙ্গ দেশ। শীর্ষে ধবলতুষার-কিরীট হিমাদ্রি ; চরণদেশে কলহাস্যময় চিরচঞ্চল বারিধি ; বক্ষে গংগা-পদ্মা-করতোয়া-ব্রহ্মপুত্র প্রভৃতি কলুষহর-তরংগা নদ-নদীর বিচিত্র শোভা ! এই বৈচিত্র্যের সমাবেশের ফলে আজ আমাদের বংগজননী এক অখণ্ড নিখুঁত রূপের মধ্যে আমাদের নিকট প্রকট হইয়াছেন।

বিভিন্ন জেলায় সামান্য সামান্য পার্থক্য সত্ত্বেও বাংলার ইতিহাস, বাংলার সমাজ, বাংলার ধর্ম— এক অখণ্ড সত্য। তাই দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ একদিন বলিয়াছিলেন— 'বাংলার মাটির মধ্যে এক চিরন্তন সত্য নিহিত আছে। সেই সত্য যুগে যুগে আপনাকে নব নব ভাবে প্রকাশিত করিতেছে। শত সহস্র পরিবর্তন আবর্তন ও নিবর্তনের সংগে সংগে সেই চিরন্তন সত্যই ফুটিয়া উঠিয়াছে। সাহিত্যে, দর্শনে, কাব্যে, যুদ্ধে, বিপ্লবে, ধর্মে, কর্মে, অজ্ঞানে, অধর্মে, স্বাধীনতায় পরাধীনতায় সেই সত্য আপনাকে ঘোষণা করিয়াছে, এখনো করিতেছে। সে যে বাংলার প্রাণ— বাংলার মাটি, বাংলার জল সেই প্রাণেরই বহিরাবরণ।'

বাঙালীর সভ্যতা একদিনে ফুটিয়া উঠে নাই। ফুল কখনো একদিনে ফোটে না। তাহার বিকাশের জন্য অতীতের অনেক আয়োজন আবশ্যক। শত সহস্র বৎসর ধরিয়া বাঙালী আত্মবিকাশের জন্য চেষ্টা করিয়া আসিতেছে। শতদলরূপী যে বাঙালী সভ্যতা, তার প্রত্যেক দলের মধ্যে আছে অনেক গান, অনেক কথা, সুখদুঃখের অনেক করুণ কাহিনী। তাহার গন্ধে আছে অনেক কালের অনেক মধুময় স্মৃতি, তাহার প্রতি বৃন্তে আছে বহু শতাব্দীর অনুভূতি চিহ্ন।

বাংলার একটা চিরন্তন আদর্শ আছে। বিশ্বদরবারে শুনাইবার বাঙালীর

একটি চিরন্তন বাণী আছে। সমগ্র বাঙালী-জাতির যে অখণ্ড ইতিহাস তাহা সেই শাশ্বত বাণীকে প্রকট করিবার জন্য চিরকাল চেষ্টা করিয়াছে, করিতেছে ও করিবে। আজ আমরা আমাদের ইতিহাসের ধারা ভুলিয়া যাইতে পারি কিন্তু বাংলার ইতিহাস ও বাংলার প্রাণ-ধর্ম কখনো আমাদেব ভুলিবে না। বাংলার প্রাণ চায় সর্বদা— বৈচিত্র্য, সমন্বয় ও সাম্য। বাঙালী সব কাজের মধ্যে বৈশিষ্ট্য ও নূতনত্ব ভালোবাসে। সে স্বভাবত গতিশীল ও পরিবর্তনাভিলাষী— 'বিপ্লবী' বলিলেও বোধ হয় অত্যুক্তি হইবে না; অতি প্রাচীনকাল হইতে এমন-কি বৈদিক যুগ হইতে, আজ পর্যন্ত এই কথার ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়।

বৈদিক যুগে মগধ, বঙ্গ প্রভৃতি পূর্বাঞ্চলকে 'কিরাত' দেশ বলা হইত। এই প্রদেশ আর্য সভ্যতার গন্ডীর বাহিরেই ছিল এবং এই দেশে কোনো আর্য আসিলে সে পতিত হইত। এই অঞ্চলের অধিবাসীবৃন্দের সহিত আর্যদের নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রাম চলিত। 'দস্যু', 'অনার্য' প্রভৃতি আখ্যা আর্যদের নিকট পাইলেও এই অঞ্চলের অধিবাসীরা যে অত্যন্ত সুসভ্য ছিল তাহা বেদ ও মহাভারত পাঠ করিলে বুঝা যায়। বৃহত্তর মগধে (বা পূর্বাঞ্চলে) আর্য সভ্যতা ক্রমশ প্রভাব বিস্তার করিলে স্মৃতির বিধান পরিবর্তন হইল এবং তখন পূর্বাঞ্চলে আসিলে আর্যেরা পতিত হইত না। কিরাত দেশে গমনা-গমনের বাধা উঠিয়া যাওয়ার পর এই প্রদেশের লোকেরা ক্রমশ আর্যসমাজে স্থান পাইল।

আর্যসভ্যতার সংস্পর্শ লাভ করিয়া যে শিক্ষা (or culture) পূর্বাঞ্চলে গড়িয়া উঠিল— আমরা তাহার নাম দিতে পারি 'মাগধী শিক্ষা' (Magadhi Culture)। এই শিক্ষার কেন্দ্র প্রথমে ছিল মগধ দেশে কিন্তু পরবর্তী যুগে মগধ দেশ উত্তরাপথের সহিত সম্পূর্ণরূপে মিলিয়া গেলে বঙ্গদেশ মাগধী শিক্ষার উত্তরাধিকারী হইল এবং মাগধী শিক্ষার নূতন কেন্দ্র বাংলায় উদ্ভূত হইল। কিছুকাল বৈদিক সভ্যতার প্রভাবে বাস করিয়া পূর্বাঞ্চল-বাসীরা বৈদিক ধর্মকান্ড ও বর্ণাশ্রম ধর্ম আর সহ্য করিতে পারিল না। দুইটি বিপ্লবের ধারা তখন এই প্রদেশ হইতে প্রবাহিত হইল— জৈনধর্ম ও জৈন মতবাদ এবং বৌদ্ধধর্ম ও বৌদ্ধমতবাদ। এই বিপ্লবের ভিতর দিয়া বৃহত্তর মগধ চেষ্টা করিল সমাজের উচ্চ প্রাচীর ধ্বংস করিয়া সাম্য প্রতিষ্ঠা করিতে এবং বেদের পারলৌকিকতা ও কর্মকান্ডের পরিবর্তে ইহ-জীবনে

নিষ্কাম কর্ম ও সেবার দ্বারা শ্রেষ্ঠ মানবত্ব লাভ করিতে। বহু শতাব্দী পরে বৈষ্ণব কবির অনিন্দনীয় ভাষায়ও এই মানবতার আদর্শ প্রচারিত হইয়াছিল—

'শুনহ মানুষ ভাই
সবার উপরে মানুষ সত্য
তাহার উপরে নাই।'

এই মানবতা ও সাম্যবাদের আদর্শ রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রেও প্রকট হইল। বৌদ্ধযুগে বৃহত্তর মগধে গণতন্ত্রমূলক শাসনপদ্ধতি প্রবর্তিত হয়। ঐতিহাসিকগণ এই যুগের ইতিহাস হইতে প্রায় ৮০টি গণতন্ত্রমূলক রাজ্যের নাম উদ্ধার করেন। যে জৈনধর্ম আজ মাত্র ভারতের পশ্চিম প্রান্তে আশ্রয় পাইয়াছে— বাঙালী আজ যে ধর্ম সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করিয়াছে, সেই জৈনধর্মের মহাপুরুষ তীর্থংকরগণ যে অধিকাংশই আমাদের অর্থাৎ অনার্য মগধ-বঙ্গ প্রদেশের মধ্যে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন সে সংবাদ কি আমরা আজকাল রাখি? জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মের ভিতর দিয়া বেদ ও বৈদিক ধর্মের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ যে প্রদেশে প্রথম দেখা দিয়াছিল সেখানকার জল ও মাটি যদি বিপ্লবের অনুকূল হয় তবে সে অপরাধ কাহার?

নূতন ধর্ম ও নূতন আদর্শের প্রেরণায় পূর্বাঞ্চলবাসীরা দিগ্বিজয়ে বাহির হয়। ইহাই বোধ হয় ভারতের প্রথম অভিযান— যদিও এই অভিযানের অস্ত্র ছিল তরবারি নয়— জ্ঞানের প্রদীপ! জ্ঞানের প্রদীপ হস্তে লইয়া এই প্রদেশের লোকেরা মেঘস্পর্শী পর্বতরাজি ও উত্তাল তরঙ্গসংকুল সমুদ্র পার হইয়া দেশ দেশান্তরে ছড়াইয়া পড়িল। নূতন সত্য, নূতন উদ্দীপনা লাভের ফলে ভারতীয় সভ্যতা সব দিক দিয়া ফুটিয়া উঠিল; কাব্য-শিল্প, দর্শন-বিজ্ঞান, ধর্ম-কর্ম ব্যবসায়-বাণিজ্য কিছুরই অভাব রহিল না। যে সম্পদ সৃষ্টি করিয়া ভারতবাসী ধন্য হইল, তাহা লাভ করিয়া সমগ্র এশিয়া জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত হইল। ভারতের ইতিহাসে সে এক অতুলনীয় গৌরবময় যুগ।

এই সময়ে পূর্বাঞ্চলে জগদ্বিখ্যাত নালন্দা বিহার প্রতিষ্ঠিত হয়। চীন পরিব্রাজক ইউয়ান চোয়াং এর গুরু অম্বিতীয় পণ্ডিত শীলভদ্র এবং জগদ্বিখ্যাত দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান এই যুগে বাংলা দেশে জন্মগ্রহণ করেন। এতদ্ব্যতীত কত শিল্পী, কত সাধক যে জন্মিয়াছিলেন কে তাহার হিসাব রাখে?

বৈদিক যুগের পর ব্রাহ্মণ্যশক্তিকে খর্ব করিয়া ক্ষত্রিয়শক্তি যেরূপ প্রতিষ্ঠা

লাভ করিয়াছিল— বৌদ্ধযুগের পর আবার সেই ব্রাহ্মণ্যশক্তির প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হইল এবং হিন্দুধর্মের পুনরভ্যুদয় হইল। মৌর্যবংশীয় রাজগণ যেরূপ বৌদ্ধধর্ম প্রচারের সহায়তা করিয়াছিলেন পরবর্তী গুপ্তবংশীয় রাজগণ তদ্রূপ হিন্দুধর্মের পুনরভ্যুত্থানের সহায়তা করিলেন। বৌদ্ধযুগে ভারতীয় জাতির যে সম্প্রসারণ (Expansion) ঘটিয়াছিল তাহা কতকটা বাধা পাইলেও বন্ধ হইল না। সমুদ্রগুপ্তের শাসনকালে তাঁহার রাজ্য বিপুল ঐশ্বর্য, শক্তি ও বৈভব লাভ করিল। দেশের বাহিরে সুমাত্রা, যবদ্বীপ প্রভৃতি দ্বীপপুঞ্জে ভারতীয় সভ্যতা প্রচারিত হইতে লাগিল।

প্রাচীনকাল হইতে আরম্ভ করিয়া গুপ্তবংশীয় রাজগণের শাসনকাল পর্যন্ত মগধ ও বাংলাদেশ শিক্ষায় দীক্ষায় ধর্মে কর্মে একসূত্রে সংযুক্ত ছিল। কিন্তু গুপ্তেরা হীনবল হইয়া পড়িলে দেশে অরাজকতা বা 'মাৎস্য-ন্যায়' সৃষ্টি হইল। এই অরাজকতা-যুগের শেষে মগধ ও বাংলা (বা গৌড়-বঙ্গ) বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল। বাংলা দেশে সুপ্তোত্থিত প্রজাশক্তি গোপালদেবকে মনোনীত করিয়া তাঁহাকে সিংহাসনে বসাইল এবং পাল বংশের অধীনে বাঙালী আবার বৌদ্ধ হইল। এই সময় হইতে একদিকে মগধ দেশ শিক্ষায় দীক্ষায় উত্তরাপথের সহিত মিশিয়া গেল এবং অপর দিকে বাংলাদেশ নিজের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিয়া স্বীয় অন্তর্দৃষ্টি ও অনুভূতির প্রেরণায় বৈশিষ্ট্যের পথে চলিতে লাগিল। মাগধী শিক্ষার (Magadhi Culture) কেন্দ্রগুলি মগধদেশ হইতে বাংলাদেশে স্থানান্তরিত হইল। তারপর বাংলাদেশে অসংখ্য বৌদ্ধ বিহারের প্রতিষ্ঠা ; শীলভদ্র ও দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানের আবির্ভাব, বিখ্যাত ভাস্কর ধীমান ও বীতপালের জন্ম। পালবংশের অধীনে বাঙালী শিক্ষায় আত্মপ্রতিষ্ঠ হইয়া রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে দিগ্বিজয়ের অভিযানে বাহির হয়। যুক্ত মগধবাংলা মৌর্যবংশের অধীনে যেরূপ সম্প্রসারণ ও দিগ্বিজয় আরম্ভ করিয়াছিল স্বতন্ত্র বাংলা তদ্রূপ পালবংশের অধীনে সম্প্রসারণ ও দিগ্বিজয় আরম্ভ করে। বাঙালীর সাম্রাজ্য যে কতদূর বিস্তৃত হইয়াছিল তাহা বর্ণনা করিতে হইলে শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রলাল আচার্য মহাশয়ের ভাষায় বলিতে হয়—

"সিংহাসনে আরোহণ করিয়া ধর্মপালদেব 'মনোরম ভূভাগ বিলাসে' ভোজ, মৎস্য, কুরু, যদু, যবন অবন্তি গান্ধার ও কীর প্রভৃতি বিভিন্ন জনপদের নরপালদিগকে পরাজিত করিয়া[১] কান্যকুব্জের রাজশ্রী লাভ করিয়াছিলেন।

১. খালিমপুর শাসক, ১২শ শ্লোক। ভাগলপুর শাসক, ৩য় শ্লোক।

রাজসিংহাসন তখন সমগ্র উত্তরপথের অধিপতি ইন্দ্রদ্যুম্নের করতলগত ছিল। তাঁহার রাজ্য গান্ধার হইতে মিথিলার প্রান্ত সীমা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

আমি ঐতিহাসিক নহি, তবুও আমার বিশ্বাস যে খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে অরাজকতার অবসানে পালবংশীয় রাজা গোপালদেবের প্রতিষ্ঠায় স্বতন্ত্র বাংলার (বা গৌড়-বঙ্গের) জন্ম। সহস্রাধিক বৎসর বাংলা নানা সুখ-দুঃখের ভিতর দিয়া স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্যের পথে চলিয়া আসিতেছে।

চিরকাল একভাবে যায় না, তাই পাল-বংশ শক্তিহীন হইয়া পড়িলে সেন-বংশের রাজগণ গৌড়-বঙ্গের সিংহাসন অধিকার করেন। সেন-বংশের প্রতিষ্ঠার সঙ্গে হিন্দুধর্মের পুনরভ্যুত্থান আরম্ভ হয় এবং সেন-বংশীয় রাজগণের রাজত্ব-কালে হিন্দু ও বৌদ্ধ সমাজের মধ্যে ভীষণ সংগ্রাম সৃষ্টি হয়। সেনবংশীয়েরা গৌড়-বঙ্গের একচ্ছত্র অধিপতি ছিলেন বটে কিন্তু তাঁহাদের আমলে সামাজিক কলহ-বিবাদের দরুন রাষ্ট্রশক্তিও দুর্বল হইয়া পড়িয়াছিল। তারপর পাঠান-রাজ বক্তিয়ার খিলজি মগধ বিজয় করিয়া গৌড়-বঙ্গের পশ্চিমাংশ অধিকার করেন। পশ্চিমবঙ্গের প্রাসাদ-তোরণে যখন ইসলামের অর্ধচন্দ্র শোভা পাইতে-ছিল পূর্ববঙ্গের প্রাসাদশীর্ষ হইতে তখনো স্বাধীনতা-সূর্যের শেষ রশ্মিটুকু নিভিয়া যায় নাই। কিন্তু প্রায় এক শতাব্দী পরে অন্যত্র বাংলা (বা গৌড়-বঙ্গ) মুসলমান শাসনের অধীনে আসে।

মুসলমান শাসনের সময়ে সাম্যবাদী বৌদ্ধসমাজ দো-টানার মধ্যে পড়িয়া গেল। অধিকাংশ বৌদ্ধরা ব্রাহ্মণ্যশক্তির পুনরভ্যুদয় পছন্দ না করিয়া এবং ইসলামের সাম্যবাদে আকৃষ্ট হইয়া ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিল, অবশিষ্ট বৌদ্ধ হিন্দু সমাজে ফিরিয়া আসিল। বাহ্যত বৌদ্ধধর্মের ধ্বংস হইলেও বৌদ্ধধর্মের সাম্যবাদের লোপ হইল না। হিন্দুসমাজের ধমনীতে এই আদর্শ ক্রিয়া করিতে লাগিল। ইহার ফলে স্মার্ত রঘুনন্দন নূতন হিন্দুসমাজ গঠন করিবার জন্য নূতন স্মৃতি প্রণয়ন করিলেন— তখন তিনি রাখিলেন মাত্র দুইটি বর্ণ— ব্রাহ্মণ ও শূদ্র। উদার দৃষ্টি লইয়া দেখিলে স্বীকার করিতে হইবে যে রঘুনন্দনের স্মৃতি সাম্যের দিকে বাংলার হিন্দু সমাজকে অনেক দূরে লইয়া গিয়াছে। রঘুনন্দনের আরব্ধ কার্য সমাধা করিবার জন্য, অর্থাৎ সাম্যবাদের ভিত্তির উপর হিন্দু সমাজকে গঠন করিবার উদ্দেশ্যে, বাংলাদেশে বৈষ্ণব ও ব্রাহ্ম আন্দোলনের আবির্ভাব। সাম্যস্থাপনের প্রচেষ্টা এখনো সফল হয় নাই। ইহা সফল করিতে তিন দিক দিয়া কাজ করা সম্ভব—

১. জাতিভেদ একেবারে তুলিয়া দেওয়া। বৈষ্ণব ও ব্রাহ্ম আন্দোলন মোটের উপর এই চেষ্টাই করিয়াছে।

২. সব বর্ণকে শূদ্রে পরিণত করা।

৩. সব বর্ণকে ব্রাহ্মণ করা।

প্রথম উপায় অবলম্বন করিয়া বাঙালী হিন্দুসমাজ সাফল্যমণ্ডিত হয় নাই। এখন সেই দিক দিয়া আরো চেষ্টা করা উচিত— না অবশিষ্ট দুইটি উপায়ের মধ্যে কোনো উপায় অবলম্বন করা বাঙালীর কর্তব্য, তাহা বাঙালী হিন্দুর পক্ষে এখন চিন্তার বিষয়।

যে জাতির মধ্যে রক্ত-সংমিশ্রণ বেশি পরিমাণে ঘটিয়াছে— সেই বাঙালী জাতিকে আজ রক্ত-সংমিশ্রণের ভয় করিলে চলিবে না। আজ আর অস্বীকার করা যায় না যে বাংলাদেশে মঙ্গোল, দ্রাবিড় ও আর্য রক্তের সংমিশ্রণ খুব ব্যাপকভাবে ঘটিয়াছে। বাঙালী চরিত্রে যে বৈচিত্র্য ও সার্বভৌমিকতা আমরা পাই তাহার অন্যতম কারণ যে এই রক্ত-সংমিশ্রণ নয়— এ কথা জোর করিয়া কে বলিতে পারে?

দ্বাদশ শতাব্দীর পর যখন বাংলার রাজদণ্ড মুসলমানদের হাতে, সে সময়েও বাঙালীর প্রাণধারা সজীব ছিল এবং জীবনের নব নব দিকে নব নব ভাবে আত্মপ্রকাশের চেষ্টা করিতেছিল। আমি পূর্বেই বলিয়াছি যে বাঙালী চায় সর্বদা— বৈচিত্র্য, সমন্বয় ও সাম্য। সাম্য স্থাপনের জন্য ফল্গু নদীর ধারার মতো একটা প্রচেষ্টা যেন আদিম কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে— তদ্রূপ বাঙালী যখনই শক্তি সামর্থ পাইয়াছে তখনই সব দিক দিয়া নিজের ব্যষ্টির ও সমষ্টির জীবনকে ফুটাইয়া তুলিবার চেষ্টা করিয়াছে। একঘেয়ে জীবন বা একঘেয়ে নীতি সে কখনো পছন্দ করিতে পারে না। কিন্তু বৈচিত্র্য যেখানে সে সৃষ্টি করিয়াছে সেখানে সে একতার দৃষ্টি ও সমন্বয়ের ক্ষমতা হারায় নাই। চতুর্দশ, পঞ্চদশ, ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে যে কয়টি বিচিত্র চিন্তার, সাধনার ও শিক্ষার ধারা বাংলাদেশে প্রসূত হইয়া বাঙালীর প্রাণধর্মের অদ্ভুত পরিচয় দিয়াছে তাহার সমন্বয়ও বাঙালী সঙ্গে সঙ্গে করিতে পারিয়াছে। বাংলার বৈশিষ্ট্যের পরিচয় আমরা পাই— রঘুনাথ শিরোমণির নব্যন্যায়ে, গৌরাঙ্গের দ্বৈতাদ্বৈতবাদে, কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশের তন্ত্রসারে, রঘুনন্দনের স্মৃতিতে এবং জীমূতবাহনের দায়ভাগে। ন্যায়শাস্ত্রে, আইনশাস্ত্রে, বৈষ্ণব-শাস্ত্রে ও সাধনায় এবং স্মৃতিতে বাঙালী নূতন ধারা প্রবর্তিত করিয়াছে।

আর তন্ত্রশাস্ত্র সম্বন্ধে আপনারা তো জানেনই যে ইহা "গৌড়ে প্রকাশিতা বিদ্যা"। পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীকে Golden age of Bengali Culture বলিলে অন্যায় করা হইবে না। চিন্তা ও সাধনার রাজ্যে বাঙালী যাহা আবিষ্কার বা সৃষ্টি করিয়াছিল তাহার পরিচয়, আমরা সমসাময়িক সাহিত্যে পাই। বিদ্যাপতি ও চণ্ডিদাস, মুকুন্দরাম ও ভারতচন্দ্র, কাশীরাম কৃত্তিবাস ও রামপ্রসাদ প্রভৃতি অসংখ্য জ্যোতিষ্ক চতুর্দশ শতাব্দী হইতে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত বাংলার সাহিত্য গগন আলোকিত করিয়া রাখিয়াছে।

বাংলা সাহিত্যে মুসলমানের দান

বাংলা সাহিত্যের উন্নতি ও পরিপুষ্টি সাধনকল্পে মুসলমানগণও যে কিরূপ সাহায্য করিয়াছেন তাহার সামান্য উল্লেখ করিলেই বুঝা যাইবে মুসলমান বিজয়ের পর হইতে এদেশের প্রতি তাহাদের ভালোবাসা ও মমতা-বোধ কিরূপ প্রবল ও আন্তরিক ছিল।

পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগ হইতে ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমাংশ পর্যন্ত সম্রাট হুসেন শাহ গৌড় দেশ শাসন করিতেন। তিনি বঙ্গসাহিত্যের উৎসাহবর্ধক ছিলেন; তাঁহার রাজসভায় হিন্দু মুসলমান একত্রে শাস্ত্রের আলোচনা করিতেন, তিনি মহাপ্রভুকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করিতেন। 'পরাগলি মহাভারত ও ছুটি খাঁর অশ্বমেধ পর্বে পত্রে পত্রে হুসেন শাহের প্রশংসা ও গুণ বর্ণনা দৃষ্ট হয়।' ('বঙ্গভাষা ও সাহিত্য')

পদাবলী সাহিত্য বাংলার অমূল্য সম্পদ। কিন্তু মাত্র হিন্দু বা বৈষ্ণব কবিগণের রচনা দ্বারাই যে এ সাহিত্যের পুষ্টি হইয়াছে তাহা নহে। অন্যান্য রচয়িতা ব্যতীত আকবর ও আকবর শাহ আলি, কবীর, কমরালি, নসীর মামুদ ফকির হবিব, কতন, সাল-বেগ, শেখ জালান, শেখ ভিখ, শেখলাল, সৈয়দ মর্তুজা প্রভৃতি মুসলমান কবিগণের দান কিছুমাত্র তুচ্ছ নহে।

এইরূপে সাহিত্য-প্রচার ও অনুরূপ সামাজিক রীতিনীতির মধ্য দিয়া হিন্দু ও মুসলমান সমাজের মধ্যে এক নিবিড় বন্ধনের সৃষ্টি হইয়াছিল— এ কথা যে কত সত্য তাহা সমসাময়িক সাহিত্য রচনার মধ্য দিয়াই স্পষ্ট প্রকাশিত হইয়াছে। হিন্দু কবি গল্প বর্ণনাকালে মুসলমান সমাজের নানা পরিচয় দিয়াছেন মুসলমান কবিগণও তাঁহাদের কাজে রামায়ণ বা মহাভারত-সম্পর্কীয় বহু উপমা ও দৃষ্টান্ত প্রদান করিয়াছেন। "ক্ষেমানন্দ রচিত মনসার ভাসানে

দৃষ্ট হয়, লখীন্দরের লোহার বাসরে হিন্দুয়ানী রক্ষাকবচ ও অন্যান্য মন্ত্রপূত সামগ্রীর সঙ্গে একখানি কোরাণও রাখা হইয়াছিল, রামেশ্বরের সত্যনারায়ণ মুসলমান ফকির সাজিয়া ধর্মের ছবক্ শিখাইয়া গিয়াছেন। মীরজাফরের মৃত্যুকালে তাঁহার পাপ মোচনের জন্য কিরীটেশ্বরীর পাদোদক পান করিতে দেওয়া হইয়াছিল, ইহা ইতিহাসের কথা। হিন্দুগণ যেরূপ পীরের সিন্নি দিতেন, মুসলমানগণও সেইরূপ দেবমন্দিরে ভোগ দিতেন।" (বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, পৃ. ৪৬৩) ; "হিন্দু মুসলমানের মৈত্রী ও সখ্যতা সম্বন্ধে এরূপ বহু দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়। প্রায় আড়াই শত বৎসর পূর্বে কবি আলাওল রচিত 'পদ্মাবতী' কাব্যে আলাওলের গভীর পাণ্ডিত্যের পরিচয় আছে। তাঁহার বিদ্যা বুদ্ধিতে যতদূর কুলাইয়াছিল, তিনি পদ্মাবতীতে তাহার কিছু বাদ দেন নাই।" (ঐ পৃ. ৪৬৮)

এই সেদিন ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির আমলেও মুজা হুসেন আলি ও সৈয়দ জাফর খাঁ এই দুই সমসাময়িক কবি যেভাবে বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের সেবা করিয়াছেন, তাহা এ যুগের অনেকেরই দৃষ্টান্তস্বরূপ। বস্তুত বাংলার আধুনিক ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য— ইহার উন্নতিসাধনকল্পে হিন্দু ও মুসলমান উভয়ে কী পরিমাণ সাহায্য করিয়াছেন তাহা নির্ধারণ করা সহজ নয়— এক কথায় বলা যায় জাতি-বর্ণ নির্বিশেষে সকল বাঙালীর চেষ্টায়ই আজিকার সমাজ ও সাহিত্য গড়িয়া উঠিয়াছে।

জাতীয় অবসাদ ও নবজাগরণ

অষ্টম শতাব্দী হইতে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত অশ্রান্ত কর্মপ্রচেষ্টার ফলে বাঙালী যখন ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে তখন মহম্মদ বক্তিয়ার বাংলার দ্বার-দেশে আঘাত করেন। বাহিরের সংঘাতে তন্দ্রাবিজড়িত নেত্র উন্মীলিত হইল, বাঙালী আবার সাধন-সমরে প্রবৃত্ত হইল। চতুর্দশ হইতে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত অবিরাম সাধনার পর ক্লান্তির ছায়া বাংলাকে আচ্ছন্ন করিল। ঠিক এই সময়ে ইংরেজের তূর্য নিনাদ বাংলার প্রান্তরে শুনা যায়। পাশ্চাত্য শক্তির সংঘাতে বাঙালীর শ্রান্তি ক্লান্তি আজ দূর হইয়াছে, সে আজ আত্ম-বিস্মৃতি ঘুচাইয়া নব নব সৃষ্টির কার্যে ব্যাপৃত।

ক্লান্তি, অশ্রদ্ধা ও অবিশ্রাম আত্মকলহ দূর করিবার জন্য ঊনবিংশ শতাব্দীতে রাজা রামমোহন নূতন আন্দোলন প্রবর্তিত করেন। গৃহবিবাদ

ও মতভেদ ঘুচাইবার জন্য তিনি উদার বেদান্ত তত্ত্ব প্রচার করেন। যে-সমস্ত আবর্জনা বহু শতাব্দী হইতে পুঞ্জীভূত হইয়া হিন্দুসমাজকে পূতিগন্ধময় করিয়া তুলিয়াছিল তাহা দূর করিবার জন্য সংস্কার আরম্ভ হইল এবং ব্রাহ্ম-সমাজ সৃষ্ট হইল। এই আন্দোলনের ফলে খ্রীস্টীয় ধর্ম ও খ্রীস্টীয় সভ্যতার আক্রমণ হইতে বাঙালী আত্মরক্ষা করিল।

রামমোহনের বেদান্ত প্রচারের মধ্যে যে সমন্বয়ের সূচনা আমরা দেখিতে পাই তাহা ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষদিকে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের মধ্যে পূর্ণভাবে ফুটিয়া উঠিল। রামকৃষ্ণ পরমহংস তাঁহার জীবনের অপূর্ব ও অলৌকিক সাধনার বলে বিভিন্ন সাধন পদ্ধতির (যেমন, কর্ম, ভক্তি, জ্ঞান) মধ্যে সমন্বয়, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে (যেমন শাক্ত, বৈষ্ণব, যোগী, শৈব ইত্যাদি) সমন্বয় এবং বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে (যেমন খ্রীস্টীয় ধর্ম, ইসলাম ধর্ম, হিন্দু ধর্ম ইত্যাদি) সমন্বয় স্থাপন করিয়া গেলেন। পরমহংসের অনুভূতি ও সাধনার উত্তরাধিকারী হইলেন প্রথমে স্বামী বিবেকানন্দ এবং তারপর সমগ্র বংগবাসী। এই সমন্বয় স্থাপনের সংগে সংগে জীবনের বিভিন্ন দিক দিয়া— কাব্যে, সাহিত্যে, দর্শনে, বিজ্ঞানে, ব্যবসায়-বাণিজ্যে, ক্রীড়া ও ব্যায়ামকৌশলে সৃষ্টি ও নূতন প্রচেষ্টা চলিতেছে। এতদ্ব্যতীত সমাজে পূর্ণ সাম্য স্থাপনের চেষ্টা চলিতেছে— এবং হিন্দু-মুসলমান-নির্বিশেষে সমগ্র বাঙালীজাতি সাহিত্য-সাধনায় প্রবৃত্ত হইয়াছে। আধুনিক বাংলা সাহিত্যে মুসলমান সাহিত্যিকের দান যে কোনো যুগে শ্লাঘ্য ও গৌরবময় বলিয়া পরিগণিত হইবে।

পরমহংসের আরব্ধ ও অসম্পূর্ণ কাজ স্বামী বিবেকানন্দ হাতে লইলেন। ভারতের বহুযুগসঞ্চিত জ্ঞানের সম্পদ দেশবিদেশে বিকীর্ণ করিবার জন্য তিনি প্রাচীন বৌদ্ধ পরিব্রাজকের মতো জ্ঞানের প্রদীপ হাতে লইয়া সাগরপারে চলিলেন। এতদিন পরে ভারতবাসী ঘর ছাড়িয়া বাহিরের জন্য পাগল হইল; বিশ্বদরবারে দিবার মতো সামগ্রী নিজের ঘরে খুঁজিয়া পাইল, তারপর রবীন্দ্রনাথ, জগদীশচন্দ্র, প্রফুল্লচন্দ্র, রামানুজম, রামন প্রভৃতি ভারতের শ্রেষ্ঠ কবি, সাহিত্যিক, বৈজ্ঞানিক ও মনীষিগণ কতদিক দিয়া বিশ্বসভ্যতাকে পরিপুষ্ট করিয়াছেন। এই-সব মহাপুরুষের আজীবন সাধনার ফলে আজ সমগ্র ভারতীয় জাতি বুঝিতে পারিয়াছে যে তাহাদের একটা আদর্শ আছে। বাঁচিবার একটা উদ্দেশ্য আছে— পৃথিবীতে জাতি হিসাবে একটা mission আছে।

নিজের দেশের নবীন জাতি সৃষ্টির কাজও বিবেকানন্দ আরম্ভ করিয়াছিলেন। ব্যক্তির সমষ্টিই জাতি। খাঁটি মানুষ তৈয়ারি না হইলে স্বাধীন ও বলবান জাতি জন্মিতে পারে না। তাই তিনি বলিলেন 'Man making is my mission'— খাঁটি মানুষ প্রস্তুত করাই আমার জীবনের কর্তব্য। তারপর খাঁটি মানুষ সৃষ্টি করিবার জন্য তিনি শ্রেণী-বিশেষের মধ্যে দৃষ্টি আবদ্ধ না রাখিয়া সমগ্র সমাজের মধ্যে খুঁজিতে লাগিলেন। তাঁহার সেই বাণী অমর হইয়া এখনো বাঙালীর ঘরে ঘরে ঘুরিতেছে :—

"তোমরা উচ্চবর্ণেরা কি বেঁচে আছ ?··· তোমরা শূন্যে বিলীন হও, আর নূতন ভারত বেরুক। বেরুক লাঙল ধরে, চাষার কুটির ভেদ করে; জেলে, মালা, মুচি মেথরের ঝুপড়ির মধ্যে হ'তে। বেরুক মুদির দোকান থেকে, ভুনাওয়ালার উনুনের পাশ থেকে। বেরুক কারখানা থেকে, হাট থেকে, বাজার থেকে।··· এরা সহস্র সহস্র বৎসর অত্যাচার সয়েছে, নীরবে সয়েছে তাতে পেয়েছে অপূর্ব সহিষ্ণুতা।··· অতীতের কঙ্কালচয়— এই সামনে তোমার উত্তরাধিকারী ভারত।"

এই তো বাংলার Socialism। এই Socialism-এর জন্ম কার্ল মার্কসের পুঁথিতে নয়। এই Socialism-এর জন্ম ভারতের শিক্ষাদীক্ষা ও অনুভূতি হইতে।

যে গণ-আন্দোলনের সূচনা বিবেকানন্দের উক্তির মধ্যে পাই তাহা আরো পরিস্ফুট হইয়াছে, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের বাণী ও সাধনার মধ্যে।

দেশবন্ধু বলিয়াছেন : মনে করিয়ো না শুধু তোমার মধ্যে ও আমার মধ্যে নারায়ণের বিরাজ। সে অহংকার একেবারে ছাড়িয়া দাও। যাহারা দেশের সারবস্তু, যাহারা মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া মাটি কর্ষণ করিয়া আমাদের জন্য শস্য উৎপাদন করে— যাহারা ঘোর দারিদ্র্যের মধ্যেও মরিতে মরিতে দেশের সভ্যতা ও সাধনাকে সজাগ রাখিয়াছে, যাহারা সর্বপ্রকার সেবায় নিরত থাকিয়া আজিও দেশের ধর্মকে অটুট ও অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে— যাহারা আজিও শুদ্ধ চিত্তে সরল প্রাণে, মর্মে মর্মে দেশের মন্দিরে মন্দিরে পূজা দেয়, মসজিদে মসজিদে প্রার্থনা করে— যাহারা জাতির জাতিত্বকে জ্ঞান কি অজ্ঞানে সাগ্নিকের অগ্নির মতো জ্বালাইয়া, জাগাইয়া রাখিয়াছে— যাহারা বাস্তবিকই এদেশের একাধারে রক্তমাংস ও প্রাণ— 'উঠ, জাগ জাগ'— তাঁহাদেরই মধ্যে 'নর-নারায়ণ' জাগ্রত হউক।

জাতি-গঠন-কার্যে প্রথম সোপান খাঁটি মানুষ সৃষ্টি, দ্বিতীয় সোপান সংঘ-স্থাপন। বিবেকানন্দ প্রমুখ মনীষীগণ চেষ্টা করিয়াছিলেন মানুষ তৈরি করতে। দেশবন্ধু চেষ্টা করিলেন রাষ্ট্রীয় সংঘ (Political Organisation) গঠন করিতে। এমন সংঘ তিনি গঠন করিলেন যাহা ইংরেজরা স্বীকার করিতে বাধ্য হইল তাহারা ইতিপূর্বে কখনো দেখে নাই। দেশবন্ধু আজ নাই — তাঁহার আশা, আকাঙ্ক্ষা ও স্বপ্নের উত্তরাধিকারী ভাগ্যহীন আমরাই।

আজকাল পাশ্চাত্য দেশ হইতে গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র-বিষয়ক আধুনিক চিন্তার ধারা এদেশে আসিতেছে। ইহার ফলে অনেকের চিন্তাজগতে বিপ্লব উপস্থিত হইতেছে। কিন্তু যাহা নূতন বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে তাহা প্রকৃতপক্ষে অতি পুরাতন। গণতন্ত্র বা সমাজতন্ত্র এদেশে নূতন তত্ত্ব নয়। আমরা আমাদের ইতিহাসের ধারা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছি এবং এখনো ভারতের কোন্ নিভৃত প্রান্তে গণতন্ত্র বা সমাজতন্ত্রমূলক রাষ্ট্র আছে তাহা জানি না বলিয়া অতি পুরাতনকে নূতন অতিথি জ্ঞান করিয়া আদরের সঙ্গে আহ্বান করিতেছি।

সমাজ ও রাষ্ট্র-সম্পর্কীয় কোনো মতবাদকে অভ্রান্ত ও অখণ্ড সত্য বলিয়া মনে করা সমীচীন নয়। অধিকাংশ ism বা মতবাদের ভিতর অল্পাধিক সত্য আছে। তাহাই Socialism (গণতন্ত্র বা সমাজতন্ত্র)-এ সত্য যাহা আছে তাহা আমরা চাই। কিন্তু তাই বলিয়া Fascism-এর শৃঙ্খলা, সংঘবদ্ধতা ও আজ্ঞানুবর্তিতা একেবারে বর্জনীয় নয়। আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে কার্ল মার্কসের প্রধান শিষ্য যাঁহারা— সেই রুশ জাতি— কার্ল মার্কসের বাণী অন্ধভাবে অনুসরণ করে নাই। তা যদি করিত তাহা হইলে এত শীঘ্র রাশিয়াতে Bolshevism-এর প্রতিষ্ঠা হইত না। বস্তুত Socialism-এর মূলতত্ত্বগুলি দেশকালোপযোগী করিবার পর রুশ জাতি তাহা গ্রহণ করিয়াছে।

বর্তমান সময়ে Socialism-এর নীতিগুলি প্রয়োগ করার পথে আরো বেশি বিঘ্ন উপস্থিত হওয়াতে রুশ জাতি New Economic Policy নামে নূতন অর্থনীতি গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছে। এই নূতন নীতি অনুসারে ব্যক্তির নিজস্ব সম্পত্তি (Private Property) থাকিতে পারে এবং ব্যবসায়ের কোনো কোনো ক্ষেত্রে কোনো ব্যক্তি কারখানার মালিক হইতে পারে। Socialist-এর পক্ষে new economic policy (বা নূতন অর্থনীতি) গ্রহণ করা

আত্মহত্যা করার তুল্য। কিন্তু রুশ জাতি নিতান্ত বাধ্য হইয়া তখন তাহা গ্রহণ করিয়াছে। আমাদের মনে রাখা উচিত যে জাতির ইতিহাসের ধারা, পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও আবহাওয়া এবং দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজনীয়তার কথা অবহেলা করিয়া কোনো মতবাদ বলপূর্বক কোনো দেশে প্রয়োগ করা যায় না। এরূপ চেষ্টা করিলে হয় সেদেশে বিপ্লবের সৃষ্টি হইবে নতুবা Fascism-এর মতো কোনো বিরুদ্ধ মতবাদের প্রতিষ্ঠা হইবে।

আর একটি কথা আমাদের মনে রাখা উচিত, ব্যক্তিত্বের বিকাশ না হইলে, খাঁটি মানুষ তৈরি না হইলে, কোনো ism বা মতবাদের দ্বারা কোনো জাতির উদ্ধার হইতে পারে না। ব্যক্তিত্ব বিকাশের সহিত জাতির শিক্ষাদীক্ষার নিবিড় সম্বন্ধ আছে। সুখের বিষয় এই যে বলশেভিক রাশিয়ার মনীষীগণ আজকাল এই কথা হৃদয়ংগম করিতেছেন। ট্রট্স্কি (Trotsky) তাঁহার *Problems of Life* নামক পুস্তকে এ-সব কথা সমর্থন করিয়াছেন। তাঁহার পুস্তকের সমালোচনা করিতে গিয়া মিনস্কি (Minsky) বলিতেছেন :—

"Life itself, the life of the masses and of the individual must be transformed, Trotsky says; new Principles of life are needed, a new type of citizen must be helped to evolve, a new type of family is about to come into existence in Russia and ought to be helped to do so···

Two admissions acquire a special importance, coming from Trotsky. In the first place he rejects most emphatically... the superstitious idea of a distinctly proletarian class culture. The masses in Trotsky's new and wiser view, need communion with the universal culture of the ages and ought to be educated accordingly. It should be the task of the Russian intellectuals to help them.

Trotsky's second admission is no less important. He says now that the development of Personality is an absolute necessity for the evolution of a new type of family, Communism and Individualism, he declares in his book, far from being antagonistic, are but different social forces mutually attracting and completing each other.

বলশেভিক রুশজাতির চিন্তাধারা যেরূপ দ্রুতগতিতে পরিবর্তিত

হইতেছে তাহাতে আমার মনে হয় যে জ্ঞানালোকের জন্য রাশিয়ার উপর অতি-নির্ভরশীল হওয়া বাঞ্ছনীয় নহে। আমাদের সমাজ ও রাষ্ট্র আমরা গড়িয়া তুলিব আমাদের আদর্শ ও প্রয়োজন অনুসারে এবং আবশ্যকমত বিদেশ হইতে জ্ঞানরত্ন সংগ্রহ করিব— ইহাই ভারতবাসী মাত্রেরই উদ্দেশ্য হওয়া উচিত।

বিংশ শতাব্দীতে যে মুক্তিসংগ্রাম দেশের মধ্যে চলিতেছে তাহার দ্বিতীয় অধ্যায় পার হইয়া আমরা এখন তৃতীয় অধ্যায়ে পৌঁছিয়াছি। প্রথম অধ্যায় স্বদেশী যুগ; দ্বিতীয় অধ্যায় বিপ্লবের যুগ; তৃতীয় অধ্যায় অসহযোগ ও গণ-আন্দোলনের যুগ। অনেকে মনে করিতে পারেন যে আমাদের মুক্ত হইবার সকল প্রচেষ্টা বুঝি ব্যর্থ হইয়াছে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কোনো শুভ প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হয় নাই। যে জাতীয় আন্দোলন গত ২৫ বৎসর বা ৩০ বৎসর ধরিয়া প্রবলভাবে চলিয়াছে তাহার ফলে আমরা ক্রমশ হৃতশক্তি আত্মবিশ্বাস ও আত্ম-সম্মানের জ্ঞান ফিরিয়া পাইতেছি; মেরুদণ্ডহীন জাতি চরিত্রবল অর্জন করিতেছে; শারীরিক বল ও ইচ্ছাশক্তির অনুশীলন দেশের মধ্যে বাড়িতেছে এবং দেশবাসী ক্রমশ সংঘবদ্ধ হইতেছে, এ জাত একদিন মুক্ত হইবেই হইবে; ইহা বিধাতৃ-নির্দিষ্ট সত্য। পার্থিব শক্তির সাধ্য নাই যে চিরকাল আমাদের জন্মগত অধিকার হইতে আমাদিগকে বঞ্চিত করিয়া রাখে। আমাদের একমাত্র সমস্যা কত শীঘ্র আমরা স্বাধীন হইতে পারিব।

বর্তমান সমস্যা ও ভবিষ্যৎ কার্যপদ্ধতি

অনেকে এই প্রশ্ন করিয়া থাকেন— সশস্ত্র বিপ্লবের পথ ছাড়িয়া দিলে আমরা কী উপায়ে দেশকে মুক্ত করিতে পারিব? তাহার উত্তরে আমি বলি— মুষ্টিমেয় ইংরেজ এ বিরাট দেশ শাসন করিতেছে শুধু আমাদের সহযোগিতা লাভ করিয়াছে বলিয়া। গণ-আন্দোলন আরো শক্তিশালী ও ব্যাপক হইয়া উঠিলে জনসাধারণের মধ্যে আর সহযোগাভিলাষ থাকিবে না। তখনই প্রকৃত-পক্ষে আমরা অসহযোগ নীতি সার্থক ও সফল করিতে পারিব। এই কার্যে আমাদের একমাত্র অস্ত্র বা উপায়— Propaganda বা প্রচারকার্য! এই Propagandaর বলে ইংরেজরা গত যুদ্ধে জয়লাভ করিয়াছিল— এই Propagandaর বলে বলশেভিকরা এত শক্তিশালী হইয়া উঠিয়াছে, এই Propagandaর বলে চীন জাতি বিনা রক্তপাতে জাতীয় শাসন পদ্ধতি প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিয়াছে। ইংরেজের এই অস্ত্র— গুপ্তমন্ত্র (অর্থাৎ Propagandaর

রীতি) বলশেভিকরা সম্যক্‌রূপে শিক্ষা করিয়াছে বলিয়াই ইংরেজরা বলশেভিকদিগকে এত ভয় করে।

ইংরেজ জাতি প্রতি বৎসর ভারতবাসীকে ১২০ কোটি টাকার পণ্য বিক্রয় করিয়া থাকে। এই পণ্যভার উৎপন্ন করিবার জন্য বিলাতে বহু কলকারখানার প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। এই ব্যবসায়ের দ্বারা প্রায় ১ কোটি ইংরেজ প্রতিপালিত হয়। ভারতবাসীরা যদি বিলাতী পণ্য বর্জন করিতে পারে তাহা হইলে ইংরেজ জাতির কী অবস্থা হইবে তাহা চিন্তা করিলেই আমরা বুঝিতে পারিব। সুতরাং প্রবল পরাক্রান্ত ইংরেজ জাতি অন্নের জন্য ভারতবাসীর উপর একান্ত নির্ভরশীল। ভারতবাসী কোনো প্রকার শান্তি ভঙ্গ না করিয়া যদি বিলাতী পণ্য বর্জন ও অসহযোগ নীতি অবলম্বন করিতে পারে তাহা হইলে এমন অবস্থা আমরা ঘটাইতে পারিব যে ইংরেজ জাতি আমাদের ষোলো আনা দাবি শির নত করিয়া স্বীকার করিতে বাধ্য হইবে।

বর্তমান বৎসর আমাদের উদ্যোগ পর্ব। এই বৎসর প্রাণপণ পরিশ্রম করিলে আমরা আগামী বৎসর আইন অমান্য বা খাজনা বন্ধ আরম্ভ করিতে পারিব। এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই যে আগামী লাহোর কংগ্রেসে পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব গৃহীত হইবে। তখন আমরা যেন প্রস্তাব পাস করিয়াই ক্ষান্ত না হই। আগামী জানুয়ারি মাসে সমগ্র দেশে বিপুল আন্দোলন সৃষ্টি করিতে হইবে এবং প্রয়োজন হইলে কাউন্সিল ও অ্যাসেম্‌ব্লি পরিত্যাগ করিয়া আসিতে হইবে। এমন লোক এবার কংগ্রেস কর্তৃক মনোনীত হইয়া ব্যবস্থাপক সভায় যাওয়া উচিত, যাঁহারা দ্বিরুক্তি না করিয়া সেখান হইতে চলিয়া আসিতে পারিবেন, প্রয়োজন হইলে সিন্‌ফিন্‌ দলের মতো নির্বাচনের পর **Oath of allegiance** না লইয়া আমরা বাহিরে আসিয়া জাতীয় ব্যবস্থাপক সভা গঠন করিব।

এই কার্য আগামী বৎসর সফল করিতে হইলে এখন হইতেই বিরাট আয়োজন দরকার। আজ জাতির পক্ষে নবোদ্যমে নবভাবে সাধনায় প্রবৃত্ত হইবার প্রয়োজন ঘটিয়াছে ; অল্প দিনের মধ্যে যে-সকল ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছে, সে-সকল হইতে বুঝিতে পারা যায়, যে আমলাতন্ত্র সরকার সহজে আপনার সম্ভূত অধিকার ত্যাগ করিতে সম্মত হইবে না। জাতি মাত্রেরই আপনার ভাগ্য নিয়ন্ত্রণের সম্পূর্ণ অধিকার আছে ; এ কথা ইংরেজ রাজনীতিকরাও স্বীকার করেন না, এমন নহে। কিন্তু সাম্রাজ্যমদগর্বিত শ্বেতাঙ্গ জাতি আপনাদিগকে

বিধাতা কর্তৃক নিযুক্ত কৃষ্ণাঙ্গদের অভিভাবক ভাবিয়া শাসন ও শোষণ নীতির সমন্বয়ে যে অধিকার বাহুবলে প্রতিষ্ঠিত করে, তাহা আত্মিক বলের নিকট তুচ্ছ হইলেও সেই তুচ্ছতা সহজে তাহার নিকট প্রতিভাত হয় না। এইজন্যই কিছুদিন হইতে এশিয়া বিদ্রোহী হইয়া উঠিয়াছে! দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয় প্রাচীন জাতিসমূহের সংঘ প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন সম্যক উপলব্ধি করিয়া সে প্রস্তাব তাঁহার দেশের লোকের সমক্ষে উপস্থাপিত করিয়াছিলেন। এশিয়ার এই যে বিদ্রোহ, ইহা স্বাবলম্বী ও স্বাধীন হইবার জন্য সংগ্রাম। ভারতবর্ষ এই ভাব ও আন্দোলন হইতে কখনোই দূরে থাকিতে পারে না। কেবল ইংরেজ সাম্রাজ্য নহে পরন্তু ইংলণ্ডের অস্তিত্বও যখন বিপন্ন হইয়া উঠিয়াছিল, সেই সময় ইংরেজ পার্লামেণ্টে ঘোষণা করিয়াছিল— এদেশে দায়িত্বশীল শাসন প্রতিষ্ঠা করিবার উদ্দেশে শাসনকার্যে দেশবাসীর সহযোগিতা লাভই ভারতে ইংরেজ শাসনের কাম্য। এই ঘোষণানুসারে এদেশের শাসন প্রবর্তিত হইয়াছে, তাহার অসারত্ব দূরদর্শী রাজনীতিকগণ প্রথমেই উপলব্ধি করিয়াছিলেন এবং তাহার পর তাহা পদে পদে প্রতিপন্ন হইয়াছে।

প্রায় ৮ বৎসর শ্বেতশাসনের অভিজ্ঞতার পর ভারতের শাসন-পদ্ধতির নির্ধারণ করিবার জন্য বিলাতের পার্লামেণ্টও এদেশের অবস্থা-ব্যবস্থা সম্বন্ধে বিশেষভাবে অজ্ঞ, কয়েকজন ইংরেজকে এ দেশে পাঠাইয়াছেন। তাঁহারা পুলিশ প্রহরী পরিবেষ্টিত হইয়া স্থানে স্থানে গমন করিয়া আপনাদিগের ইচ্ছামত তদন্ত করিয়া ফিরিয়াছেন। দেশের লোক তাহাদিগের কার্যে কোনো-রূপ সহযোগ করা জাতির আত্ম-সম্মানের পক্ষে হানিজনক মনে করিয়া, তাহাতে বিরত রহিয়াছে। অথচ এই অসহযোগের জন্যই এদেশের লোক ইংরেজের ক্রোধ অর্জন করিয়াছে। মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে এদেশের লোক বিদেশীবস্ত্র ও বিলাতী পণ্য বর্জন করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছে। যেদিন কলিকাতায় প্রথম বিদেশী বস্ত্র দগ্ধ করা হয়, সেদিনের ঘটনা কাহারো অবিদিত নাই! সেদিনের ঘটনায় একদিকে যেমন দেশের লোকের দৃঢ় সংকল্পের পরিচয় পাওয়া গিয়াছে, আর-একদিকে তেমনই বুঝিতে পারা গিয়াছে যে এই কার্যে পদে পদে কিরূপ পর্বতপ্রমান বাধা। সে বাধা আমাদিগকে অতিক্রম করিয়া অগ্রসর হইতে হইবে।

আজ কয়েকদিন হইল, আকাশে আবার নূতন মেঘ সঞ্চার হইয়াছে। রাশিয়ার কম্যুনিস্ট আন্দোলনের আতঙ্কে এদেশে গ্রেপ্তার আরম্ভ হইয়াছে।

এরূপ ব্যাপার গত ২০ বৎসরের মধ্যে এতবারই ঘটিয়াছে, যে ইহাতে আর নূতনত্ব কিছুই নাই। দেশের লোককে সন্তুষ্ট করিতে পারিলে এবং তাহাদিগকে দেশরক্ষার কার্যভার প্রদান করিলে যে সর্ববিধ আপদের শান্তি হয়, ইহা বোধ হয়, স্বাধিকারপ্রমত্ত আমলাতন্ত্র সরকারের বুদ্ধি-বিবেচনার অতীত। আর সেইজন্যই তাঁহারা চণ্ডনীতির প্রবর্তন করিয়া অসন্তোষ পুঞ্জীভূত করিতেছেন। এই নূতন বিপদই যে শেষ বিপদ, তাহা যেন কেহ কল্পনাও না করেন। এইরূপ বিপদের জন্য আমাদিগকে সর্বদাই প্রস্তুত থাকিতে হইবে, কেননা আমরা স্বরাজলাভ না করা পর্যন্ত, তরঙ্গের পর তরঙ্গের মতো, বিপদের পর বিপদ দেশের উপর আসিয়া পড়িবে।

আমাদের এখন চিন্তা করা উচিত যে এই-সকল গ্রেপ্তার সম্পর্কে আমাদের শিক্ষণীয় ও করণীয় কিছু আছে কি না। আমার তো মনে হয় যে আমরা তিনটি শিক্ষা গ্রহণ করিতে পারি :—

১. শ্রমিক আন্দোলন যতদিন শক্তি সঞ্চয় না করিতে পারিবে ততদিন গ্রেপ্তার ও অন্যান্য প্রকার অত্যাচারের সম্ভাবনা রহিয়া যাইবে। অতএব শ্রমিক-আন্দোলনের বিভিন্ন শাখার মধ্যে মনোমালিন্য দূর করিয়া সদ্ভাব সৃষ্টি করা উচিত।

২. লেবার কমিশন (Labour Commission) বর্জন করা উচিত। আমি বুঝিতে পারি না যে হুইট্‌লির সভাপতিত্বে যে কমিশন নিয়োগ করা হইয়াছে তাহা বর্জনের প্রস্তাব আজ পর্যন্ত কেন All India Trade Union Congress (অল ইণ্ডিয়া ট্রেড্‌ ইউনিয়ন কংগ্রেস) কর্তৃক গৃহীত হয় নাই। আমরা একদিকে সাইমন কমিশন বর্জন করিব এবং অপর দিকে হুইট্‌লি কমিশন বর্জন করা উচিত।

৩. শ্রমিক-আন্দোলন ও জাতীয় সমিতির মধ্যে অধিক সহযোগিতা হওয়া বাঞ্ছনীয়। একে যাহাতে অপরের সহায়তা করিতে পারে এবং পরস্পরের মধ্যে যাহাতে কোনোপ্রকার অসদ্ভাব বা মনোমালিন্য না থাকে তাহার জন্য সচেষ্ট হওয়া উচিত। আইরিশ ও চীন জাতির মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাস যত্নসহকারে পাঠ করিয়া আমি দেখিয়াছি যে ঐ দেশে শ্রমিক দলের সহিত রাষ্ট্রনীতিক দলের সহযোগিতা না হইলে মুক্তিলাভ কোনোদিন সম্ভব হইত না। আয়ার্ল্যাণ্ডে সিন্‌ফিন্‌ দল ও শ্রমিক দল একযোগে কাজ করিতে পারে; চীনদেশে কুয়োমিনট্যাং ও কম্যুনিস্ট দল একযোগে কাজ করিয়া বিদেশীর

ক্ষমতা ও অধিকার খর্ব করিতে পারে ; আর আমরা জাতীয় মহাসমিতি ও শ্রমিকদলের মধ্যে সহযোগিতা স্থাপন করিতে পারিব না কেন ? আমার মনে হয় যে এই দুই বিরাট শক্তি সংহত করিতে না পারিলে কী রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা, কী অর্থনৈতিক স্বাধীনতা, আমরা কোনোটাই লাভ করিতে পারিব না। অথচ সহযোগে কাজ করিলেই দুইটাই যথাসময় করতলগত করিতে হইবে।

বর্তমান কার্যপদ্ধতি

বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস সমিতি হইতে আমরা বর্তমান বৎসরের জন্য যে কার্যপদ্ধতি স্থির করিয়াছি, আজ সেই কার্যপদ্ধতি আপনাদিগের সম্মুখে উপস্থাপিত করিয়া তাহাতে আপনাদিগের সম্মতি লাভ করিতে ইচ্ছা করি। আমাদিগের প্রথম ও প্রধান কার্য বাংলার সর্বত্র রাষ্ট্রীয় সমিতিগুলি সবল করিয়া সেইগুলিকে দেশের কর্মকেন্দ্রে পরিণত করা ; নির্বাসন হইতে ফিরিয়া আসিয়া আমি লক্ষ্য করিয়াছিলাম, অসহযোগ আন্দোলনের প্রারম্ভে আমাদিগের রাষ্ট্রীয় সমিতিসমূহ যেরূপ কার্যকরী ছিল, এখন অনেক স্থলে আর সেরূপ নাই। কোথাও বা দলাদলির জন্য, কোথাও বা উৎসাহের বা কর্মীর অভাবে এমন ঘটিয়াছে। তাই আমি দেশবাসীর নিকট সনির্বন্ধ অনুরোধ জ্ঞাপন করিয়াছিলাম, তাঁহারা মিলিত হইয়া এই-সকল প্রতিষ্ঠানে যোগদান করুন। তাহার পর কলিকাতায় কংগ্রেসের অধিবেশন হইয়াছে। সেই উপলক্ষ্যেও আমরা রাষ্ট্রীয় সমিতিসমূহের পুনর্গঠন চেষ্টা করিয়াছি। কিন্তু এ কথা অস্বীকার করিতে পারি না যে, এখনো অনেক সমিতিতে আশানুরূপ উন্নতি সাধন হয় নাই, এখনো কতকগুলি সমিতি দুর্বল রহিয়াছে। অথচ এই সকল সমিতির দ্বারাই আমাদিগের কার্য সমগ্র প্রদেশে পরিচালিত হইবে— শিরা-উপশিরার মধ্য দিয়া যেমন শরীরের সকল অংশে রক্ত প্রবাহিত হয়, তেমনই কংগ্রেসের নির্দেশ এই-সকল সমিতির মধ্য দিয়া সমগ্র দেশে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িবে ; কাজেই এইগুলি দুর্বল হইলে কার্যসিদ্ধি বিলম্বিত হইবে।

সেইজন্য আমি মনে করি রাষ্ট্রীয় সমিতিগুলিকে সবল করিয়া তাহাদিগকে কার্যোপযোগী করিয়া নবোদ্যমে কার্যে প্রবৃত্ত হওয়া আমাদিগের প্রথম ও প্রধান কর্তব্য। সময়ের উপকরণ সৈন্য ও সরঞ্জাম না পাইলে সেনাপতি কী করিতে পারেন ? প্রত্যেক জিলা সমিতিকে এ-বিষয়ে সচেষ্ট হইয়া কেন্দ্রে কেন্দ্রে

শাখা-সমিতির প্রতিষ্ঠা বা প্রতিষ্ঠিত শাখা-সমিতির উন্নতি সাধন করিতে হইবে। তাহা হইলে কর্মপন্থা সুগম হইবে।

বঙ্গীয় কংগ্রেস কমিটির পক্ষ হইতে সাধারণভাবে নিম্নলিখিত কার্যগুলি বর্তমান বৎসরে সম্পাদন করা হইবে স্থির হইয়াছে :

১. দেশবন্ধু স্মৃতিসৌধ গঠন।
২. পাট চাষ হ্রাস আন্দোলন পরিচালন।
৩. সাইমন কমিশন ও কমিশন-সহযোগীদের বর্জন আন্দোলন পরিচালন।
৪. বিদেশী বস্ত্র বর্জন ও খদ্দর গ্রহণ।
৫. ব্রিটিশ পণ্য বর্জন ও স্বদেশী পণ্য গ্রহণ।
৬. স্বদেশী মিউজিয়াম প্রতিষ্ঠা।
৭. লোকাল বোর্ড নির্বাচনে যোগদান।
৮. কলিকাতা কর্পোরেশন নির্বাচনে যোগদান।
৯. বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার নির্বাচনে যোগদান।
১০. নির্যাতীত দেশ-সেবকগণের সাহায্যার্থে মামলা পরিচালন।
১১. মদ্যপান নিবারণ আন্দোলন।
১২. অস্পৃশ্যতা নিবারণ, মহিলাগণের উন্নতিসাধন ইত্যাদি বিবিধ সমাজ-সেবার কার্য সাধন!
১৩. বিভিন্ন স্থানীয় অভাব-অভিযোগ দূরীকরণের ব্যবস্থা সাধন।
১৪. ছাত্র-আন্দোলন, যুব-আন্দোলন, স্বাস্থ্যচর্চা আন্দোলন ইত্যাদির উৎসাহ দান।
১৫. শ্রমিক আন্দোলনে সাহায্য দান।
১৬. বিবিধ উপায়ে প্রচারকার্য সাধন!

বর্তমান শোচনীয় অবস্থায় পাটচাষের সংকোচ সাধন করা প্রয়োজন তাহা কি আর বলিয়া দিতে হইবে? মার্কিনে তুলা উৎপন্ন হয়। যে বৎসর প্রয়োজনাতিরিক্ত পরিমাণ তুলা উৎপন্ন হয়, সে বৎসর তাহারা অতিরিক্ত তুলা নষ্ট করিয়া ফেলে তথাপি সস্তায় মাল ছাড়িয়া বাজার খারাপ করে না। আর আমরা প্রয়োজনাতিরিক্ত পরিমাণ পাট উৎপন্ন করায় যে দামে তাহা বিক্রয় করিতে বাধ্য হই, তাহাতে পড়তা পোষায় না।

পাটের প্রয়োজন যতদিন থাকিবে এবং যতদিন পাট উৎপাদন বিষয়ে

বাংলার বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান থাকিবে ততদিন বাংলা পাটচাষ করিয়া লাভবান হইবার চেষ্টা অবশ্যই করিবে। কিন্তু যেভাবে আমরা পাটচাষ করিতেছি তাহাতে লাভ না হইয়া ক্ষতিই হইতেছে।

এই পাট সম্পর্কে আর-একটি কথা বলিতে ইচ্ছা করি। এদেশে কলিকাতার উপকণ্ঠে যে-সব পাটকল আছে, তাহার অধিকাংশই বিদেশীয়— এদেশের লোক তথায় কেবল শ্রমিক। যদি মফস্বলে স্থানে স্থানে ছোটো ছোটো কলের দ্বারা পাটের সূত্র প্রস্তুত করা যায়, তবে থলিয়া ও চট প্রস্তুত করা কুটীরশিল্প হিসাবে দেশে চালিত হইতে পারে এবং তাহাতে বেশ উপকার হয়। আমি আশা করি, আপনারা এই প্রস্তাবে বর্ণিত বিষয় বিশেষভাবে বিবেচনা করিয়া দেখিবেন, এবং এ-বিষয়ে আবশ্যক উপায় অবলম্বন করিবেন। সাইমন কমিশন বর্জন সম্বন্ধে আজ আর অধিক কথা বলিবার প্রয়োজন নাই। কেননা সে কাজ শেষ হইয়াছে। কমিশন যে স্থানেই গিয়াছেন, সেই স্থানেই দেশের লোক তাহাদিগকে জানাইয়া দিয়াছেন, দেশ তাহাদিগকে চাহে না, দেশ-বাসী আত্মনিয়ন্ত্রণ চাহে এবং বিদেশী কমিশন তাহাদিগের আত্মনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা করিতে পারে না। ১৯২৮ খ্রীস্টাব্দের ২০ ফেব্রুয়ারি সাইমন কমিশনের সদস্যরা কলিকাতায় আসিলে স্থির হয় বিলাতী পণ্য—বিশেষত বিলাতী কাপড় বর্জন করা হইবে। দেশের লোককে এই বিষয় জানাইয়া দেওয়া হয় এবং তাহার পর বাংলায় বিলাতী কাপড়ের আমদানীও হ্রাস পায়। কিন্তু সমগ্র ভারতে এখনো বিলাতী বস্ত্রের বর্জন ঘোষিত হয় নাই। এবার বিদেশী বস্ত্র ও বিলাতী পণ্য বর্জন ঘোষিত হইয়াছে। মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে বাংলাই ইহাতে অগ্রণী হইয়াছে। বাংলার উপর এই সম্পর্কে বিদেশী সরকারের রোষ প্রথম ব্যক্ত হইয়াছে। ইহা আমাদের আনন্দের বিষয় বলিয়া বিবেচনা করি! স্বদেশী আন্দোলনের সময় এই বাংলাই দেখাইয়াছিল, আমরা বিদেশী পণ্য বর্জন করিতে পারি— আমরা ইচ্ছা করিলে স্বাবলম্বী হইতে পারি। সেদিন বাংলার গোমুখী হইতে যে ভাবধারা প্রবাহিত হইয়াছিল, তাহা সমগ্র ভারতকে প্লাবিত করিয়াছিল— তাহাতে জাতি ধন্য হইয়াছিল, আজ বোধহয়, সেইজন্যই এই কার্যে অগ্রণী হইবার ভার আবার বাঙালীর উপর পতিত হইয়াছে।

এবার সঙ্গে সঙ্গে আমাদিগকে গঠনের স্থায়ী ব্যবস্থা করিতে হইবে। এদেশের হাতে চালিত তাঁত যে বিদেশী কলের তাঁতের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করিতে পারে, তাহা প্রতিপন্ন হইয়াছে। আইনের বলে বিলাত এদেশের কাপড়

আমদানী বন্ধ করিয়া বিলাতকে এদেশের হাতে-কাটা সুতায় হাতের তাঁতে প্রস্তুত বস্ত্রব্যবসায় খুন করিতে হইয়াছিল— সংগত উপায়ে তাহা সম্ভব হয় নাই।

তাঁত এদেশে এখনো আছে। সেই-সব তাঁতের জন্য আবশ্যক-মত দেশী সুতা যোগাইবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। ইংরেজ ঐতিহাসিক উইলসন স্বীকার করিয়াছেন, এই শিল্পকে শ্বাসরোধ করিয়া মারিবার জন্য ইংরেজকে রাজনীতিক অত্যাচার প্রয়োগ করিতে হইয়াছিল।

খদ্দর আমাদিগের স্বাবলম্বনের নিদর্শন। আমরা তাহার জন্য ত্যাগ স্বীকার করিলে চরকার ব্যবহারে দেশের দারিদ্র্য-সমস্যার আংশিক সমাধান সম্ভব। ইংরেজ রাজত্বেই দিনাজপুর জেলায় গৃহে গৃহে কিরূপ চরকা চলিত এবং তাহাতে অবসরকালে চরকা চালাইয়া মহিলারা কিরূপ লাভবান হইতেন, তাহার হিসাব ডক্টর বুকানন দিয়াছেন। দেশ এখন কৃষিপ্রধান হইতে কৃষি-প্রাণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই অবস্থার পরিবর্তন করিতে হইবে, দেশে আবার শিল্প প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। কিন্তু যতদিন তাহা না হয়, ততদিন কৃষক-দিগের জন্য— অবসরকালে একটা অতিরিক্ত কার্যের ব্যবস্থা করা বিশেষ প্রয়োজন। যাঁহারা বলেন, চরকায় সুতা কাটিয়া লাভ অতি অল্প হয়, তাঁহারা এদেশের লোকের গড় আয় সম্বন্ধে বিবেচনা করিয়া দেখিয়াছেন কি? সেই গড় আয় বিবেচনা করিয়া দেখিলে আর চরকার সুতা কাটার লাভ সামান্য বলিয়া বিবেচিত হইবে না.

দেশে অনেকগুলি কল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং সেই-সকল কলে সুতা প্রস্তুত হয়। যাহাতে সুতা সরবরাহের সুব্যবস্থা হয়, তাহা করিলে দেশের তাঁতে উৎপন্ন কাপড়ের পরিমাণ বর্ধিত হইবে। বিলাতী বণিকসভা আমাদিগের বিলাতী বস্ত্র বর্জনের বিরুদ্ধে প্রচারকার্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। তাঁহারা সম্প্রতি যে পুস্তিকা প্রচার করিয়াছেন, তাহাতে দেখানো হইয়াছে, যে ভারতে যে বস্ত্র ব্যবহৃত হয়, তাহার এক-তৃতীয়াংশ দেশী তাঁতে প্রস্তুত হয় এবং এক-তৃতীয়াংশ বিদেশী। বিদেশী বস্ত্র বর্জন করিতে হইবে আর দেশী তাঁতে যে সুতা ব্যবহৃত হয় তাহাও প্রায় সবই বিদেশী বলিয়া তাহার স্থানে দেশী সুতা সর-বরাহ করিতে হইবে।

সমগ্র প্রদেশে দেশী কাপড় উৎপন্ন করিবার ও সরবরাহ করিবার জন্য যে বিস্তৃত ব্যবস্থা প্রয়োজন তাহা করিতেই হইবে, নহিলে আমাদিগের বিলাতী

বর্জন সংকল্প কার্যে পরিণত করা সম্ভব হইবে না। এ কার্যে অবিলম্বে প্রবৃত্ত হইতে হইবে।

কয়মাস পরেই ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নির্বাচন হইবে। দেশের জনসাধারণ যে কংগ্রেসের মনোনীত প্রার্থীকেই নির্বাচিত করিতে চাহে, তাহা বহুক্ষেত্রেই প্রতিপন্ন হইয়াছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে কংগ্রেস কর্মীর অভাবে অথবা প্রার্থীর স্থানীয় প্রভাবের অভাবে অন্য দলের প্রার্থীর নির্বাচন সম্ভব হইয়াছে। তাহারই ফলে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সাহায্যে আবার দ্বৈত শাসন প্রবর্তিত করিবার চেষ্টা হইয়াছে। যাহাতে আগামী নির্বাচনে আর এমন না হয়, যাহাতে আগামী নির্বাচনে কংগ্রেসের মনোনীত প্রার্থী ব্যতীত আর কেহ নির্বাচিত হইতে না পারে, নির্বাচন-প্রার্থী হইতে সাহসও না করেন, তাহা করিতে হইবে, লোকমত সেইভাবে গঠিত করিতে হইবে। সজীব ও সবল রাষ্ট্রীয় সমিতি সমূহের সাহায্যে কংগ্রেসের বাণী ঘরে ঘরে পৌঁছাইয়া দিতে হইবে। দেখিবেন তাহা মন্ত্রশক্তির কাজ করিবে।

এই কার্যের জন্য প্রচারকার্যের প্রয়োজন। এদেশে অবশ্য অন্যান্য দেশের মতো সংবাদপত্রের সাহায্যে প্রচারকার্য চালিত হয় কিন্তু অন্যান্য দেশের তুলনায় তাহা যথেষ্ট নহে। ইংরেজ এদেশে প্রাথমিক শিক্ষা আজও অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক করে নাই। দেশ এখন অজ্ঞতার অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন। কাজেই সংবাদপত্রের সাহায্যেও প্রচারকার্য সুসম্পন্ন হয় না। বক্তৃতার দ্বারা, আলোকচিত্র দ্বারা, কিরূপ কাজ করিতে হইতে পারে তাহা গত বৎসর শ্রীযুক্ত জ্ঞানাঞ্জন নিয়োগী দেখাইয়াছেন। সমগ্র বঙ্গদেশে তাঁহার মতো কত জন প্রচারকের প্রয়োজন তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। যে দেশে কথকতা যাত্রা প্রভৃতির সাহায্যে ধর্মকার্য পরিচালিত হইয়া সাফল্য লাভ করিয়াছে সে দেশে এরূপ প্রচারকার্য দ্বারা লোককে দেশের ডাক শুনাইবার সার্থকতা আর প্রতিপন্ন করিতে হইবে না। প্রচারকার্যের জন্য উপযোগী পুস্তিকা রচনার ও প্রকাশের ভারও আমাদিগকে গ্রহণ করিতে হইবে।

কংগ্রেস এবার শ্রমিক-আন্দোলনকে আপনার আশ্রয় প্রদান করিয়াছেন। সেই আন্দোলন সম্বন্ধে আমার প্রধান বক্তব্য অন্য প্রসঙ্গে পূর্বেই বলিয়াছি। শ্রমিকদিগকে সত্যবদ্ধ করিয়া সুনিয়ন্ত্রিত করিতে হইবে। যাহাতে তাহারা উত্তেজিত ও উৎপীড়িত হইলেও অহিংসায় অবিচলিত থাকে, তাহার শিক্ষা তাহাদিগকে দিতেই হইবে।

এই-সব কর্মের জন্য প্রয়োজন— অর্থের, আর অর্থ অপেক্ষাও প্রয়োজন কর্মীর।

বাংলার দিকে দিকে তাই বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির আহ্বান পাঞ্চজন্যনাদের মতো প্রচারিত হইতেছে, এসো বাঙালী, কংগ্রেসে যোগ দাও। প্রায় দুই মাস পূর্বে আমরা চাহিয়াছিলাম—

৫ লক্ষ কংগ্রেসের সভ্য।

২ লক্ষ টাকা।

প্রতি জেলায় ১ হাজার স্বেচ্ছাসেবক।

আমার মনে হয়, আমাদের প্রার্থনা অতি সামান্য। যে বাংলায় প্রায় ৫ কোটি লোকের বাস, যে বাংলায় প্রতি বৎসর কেবল ম্যালেরিয়ায় ৪ লক্ষ লোক মৃত্যুমুখে পতিত হয়, সেই বাংলায় আমার দেশের সেবার জন্য ৫ লক্ষ লোককে কংগ্রেসেই সদস্য হইতে আহ্বান করিতেছি। ৫ লক্ষের পরিবর্তে আমরা ৫০ লক্ষ সদস্য পাইব, এ আশা যদি আমি এই পবিত্র পীঠে দাঁড়াইয়া করি, তবে সে কি দুরাশা হইবে? সে প্রশ্নের উত্তর আপনারা দিবেন। উত্তর আমি মুখের কথায় চাহি না— কথার সময় আর নাই; আমি কাজে ইহার উত্তর চাহি। আমাদের যুদ্ধযাত্রা আরম্ভ হইয়াছে, এখনো কি আমরা কথার মোহে মুগ্ধ হইয়া থাকিব? কংগ্রেসের সভ্য না হওয়াই লজ্জার কথা, ইহাই মনে রাখিয়া আমি বাঙালী মাত্রকেই হিন্দু-মুসলমান নরনারী নির্বিশেষে সকলকে কংগ্রেসের সভ্য হইতে অনুরোধ করিতেছি। রংপুর হইতে কলিকাতায় ফিরিয়া গিয়াই আমি যেন ঘোষণা করিতে পারি, বাংলার গৃহে গৃহে কংগ্রেসের সদস্য বর্তমান। কংগ্রেসের দাবি যেন 'সপ্তকোটি কণ্ঠে কল কল নিনাদ করালে' ঘোষিত হয়।

তাহার পর দুই লক্ষ টাকা। একক ২ লক্ষ টাকা প্রদান করিয়া আপনাকে ধন্য জ্ঞান করিতে পারেন, বঙ্গদেশে এমন বাঙালীর অভাব নাই; এই রংপুরেও সেরূপ লোক অনেক আছেন। তাঁহারাই কেন এ দানের গৌরব লাভ করিবেন? দেশসেবার অধিকার কেবল তাঁহাদিগের নহে। এই কার্যে অতি দরিদ্রও যাহা প্রদান করিবেন তাহা দাতাকে ধন্য করিবে। এসো ধনী, এসো দরিদ্র— মাতৃপূজার উপকরণ সংগ্রহে পরস্পরের সহিত প্রতিযোগিতার প্রবৃত্ত হও, মাতৃমন্দির প্রার্থনায় পূর্ণ করো।

কর্মী ব্যতীত কর্ম সম্ভব নহে। দেশের আহ্বানে সমবেত হইবার জন্য

প্রতি জেলায় ১ হাজার কর্মী পাইতেও কি বিলম্ব হইবে? আমার দেশের লোকের প্রতি আমার শ্রদ্ধা অবিচলিত। বঙ্গভূমি কেবল বীরপ্রসবিনী নহেন। ইহার বৃহত্তর গৌরব— ত্যাগে। বাংলার বিজয় বাহিনী যেমন গঙ্গা-যমুনার মিলনক্ষেত্র পুণ্য প্রয়োগে জয়স্তম্ভ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল, 'পুণ্যভূমি বারাণসী' অধিকার করিয়াছিল, উড়িষ্যার তালিবনশ্যাম-নীলাম্বু-বেলায় শিবির স্থাপন করিয়াছিল, এবং উত্তুঙ্গতরঙ্গ ভীষণ সাগর অতিক্রম করিয়া সিংহলাদি বিজয় করিয়াছিল— বাংলার ত্যাগের আদর্শ তেমনই হিমারণ্যের দুর্গম পথ অতিক্রম করিয়া নানা দেশে ব্যপ্ত হইয়াছিল। এই বঙ্গদেশে প্রেমধর্ম-প্রচারক শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাব হইয়াছিল। এই বঙ্গদেশে দেশবন্ধু দেশসেবাকে ধর্মের বেদীতে প্রতিষ্ঠিত করিয়া ভক্তির পঞ্চপ্রদীপ নিষ্ঠার গব্যঘৃতে পূর্ণ করিয়া তাহার আলোকে মার পূজা করিয়া আপনার জীবন পর্যন্ত দান করিয়া গিয়াছেন। সেই বাংলায় কী কখনো ত্যাগী কর্মীর অভাব হইতে পারে? এ কথা বিশ্বাস করিয়া বাঙালী হইয়া বাঙালীর নাম কলঙ্ককালিমালিপ্ত করিতে পারি না। দধীচির মতো দেশবন্ধু আত্মত্যাগ করিয়া বাঙালীর ব্যবহারের জন্য অস্ত্রোপকরণ দিয়া গিয়াছেন। বাঙালী! তোমরা সবল বাহুতে সেই বজ্র ব্যবহার করো— অনাচার অত্যাচার মুহূর্ত-মধ্যে বিনষ্ট হইয়া যাইবে। আজ আমি আবার স্বরাজ-সংগ্রামের জন্য সৈনিক ও সমর-সরঞ্জাম চাহিতেছি। আপনাদিগের উৎসাহ, আপনাদিগের উদ্যম, আপনাদিগের সংকল্প দৃঢ়তা, আপনাদিগের দেশভক্তিতে আমার আস্থা আছে। তাই আমার বিশ্বাস, আমার প্রার্থনা ব্যর্থ হইবে না।

সমবেত সভ্যমণ্ডলী! আমার বক্তব্য সমাপ্ত হইয়াছে। বলিবার অনেক কথাই ছিল, কিন্তু মনে হইতেছে কিছুই বলা হইল না। আপনারা যে এত ধৈর্য সহকারে আমার বক্তব্য শ্রবণ করিয়াছেন তাহার জন্য আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা গ্রহণ করুন। পরিশেষে আসুন একবার সকলে মিলিয়া দেশমাতৃকাকে স্মরণ করি। আসুন সমস্বরে মাকে ডাকি।

"মা যদি গঙ্গায় ডুবিয়া থাকেন, মা যদি পদ্মায় ডুবিয়া থাকেন, মা যদি মহাসাগরের স্থির গভীর অতল জলেও ডুবিয়া থাকেন, তিনি শুনিতে পাইবেন। মার ভাষা দিয়াই মাকে ডাকি, আসুন! মা তো আমাদের আর কোনো বাণী শিখান নাই। মা আছেন, আবার মা উঠিবেন। আবার আমরা এই সোনার বাংলার বুকে ও মুক্ত আকাশের তলে মুক্ত হইয়া প্রাণ মন ঢালিয়া

মাতৃপূজা করিব। আবার সেই সহস্রদলবাসিনী রাজরাজেশ্বরীর রক্তচরণে প্রাণের শ্রেষ্ঠ ও প্রিয়তম হবিঃ দান করিব। আর গললগ্নীকৃতবাসে বলিব—জননী জাগ্রহী।" বন্দেমাতরম্।

রংপুর সম্মিলনের সাফল্য

ফ্রী প্রেসের প্রতিনিধির সঙ্গে সাক্ষাৎকার।

এইবারে প্রাদেশিক সম্মেলন সর্বতোভাবেই সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে। আয়োজন উদ্যোগ খুবই সন্তোষজনক হইয়াছিল! সেইজন্য উদ্যোক্তা ও স্বেচ্ছাসেবকদিগকে খুবই প্রশংসা না করিয়া পারা যায় না। বিশেষত স্বেচ্ছাসেবকবাহিনী দেখিয়া আমি পরিতৃপ্ত হইয়াছি। কলিকাতাতে যে কাজ আরম্ভ করা হইয়াছিল তাহা এখানে যোগ্যভাবে সম্পন্ন করা হইয়াছে দেখিয়া সত্যই আমি খুব আনন্দিত। প্রদর্শনীও প্রশংসাযোগ্য হইয়াছিল। সম্মিলনের কাজও খুব কৌশলের সহিত সম্পন্ন করা হইয়াছে। খুব বেশি আবশ্যকীয় প্রস্তাব উপস্থিত করা হয় নাই। ইহাতে আমার খুবই সুবিধা হইয়াছিল। কংগ্রেসের পুনর্গঠন, বিদেশী বস্ত্র এবং বিলাতী পণ্য বর্জনই এখন কর্মীদের সম্মুখে প্রধান কর্তব্য বলিয়া নির্ধারিত করা হইয়াছে। অন্যান্য যে-সমস্ত প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে তাহার মধ্যে পাটচাষ নিয়ন্ত্রণ, শ্রমিক ও কৃষক সংগঠন সম্বন্ধীয় প্রস্তাবই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বর্তমান বৎসর আমাদের ভাবী সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হইবার সময়। কাজেই, বেশি কাজে হাত দিয়া কোনো লাভ নাই।

বিভিন্ন জেলায় কর্মীদের সহিত আলাপ করিয়া বুঝিতে পারিয়াছি যে এই সম্মিলনের পরে সমস্ত বাংলাদেশব্যাপী খুব কাজ আরম্ভ হইবে।

সম্মিলনে হিন্দু সমাজের জাতিভেদ তুলিয়া দিবার উদ্দেশ্যে যে প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে তাহার কথাও উল্লেখ করা প্রয়োজন। প্রতিনিধি বিশেষের এই বিষয়ে যে মতই থাকুক-না-কেন, বর্তমান হিন্দু সমাজের পুনর্গঠন যে একান্ত আবশ্যক সেই বিষয়েই অনেক প্রতিনিধিই আমার সহিত একমত।

মহিলাদের যে উৎসাহ আমি দেখিয়া আসিয়াছিলাম, তাহাতেও প্রাণে আশার সঞ্চার হয়। বহু মহিলা এই সম্মিলনে যোগদান করিয়াছিলেন। স্বেচ্ছাসেবিকাবাহিনীর কাজের প্রশংসা শতমুখে করিয়াও শেষ করা যায় না।

৩ এপ্রিল ১৯২৯

জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের স্মৃতি

৬ এপ্রিল ১৯২৯ জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের স্মৃতি উপলক্ষে কলিকাতায় জাতীয় সপ্তাহ পালন। দেশবন্ধু পার্কে অনুষ্ঠিত উদ্বোধনী জনসভায় প্রদত্ত ভাষণ।

জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের স্মৃতি নিদর্শন স্বরূপ আমরা জাতীয় সপ্তাহ পালন করিতেছি, কিন্তু অন্য কোনো আনন্দকর জাতীয় উৎসাহের স্মৃতিরক্ষার্থে আমরা জাতীয় সপ্তাহ পালন করি না, ইহার কারণ কি? ইহার কারণ পরাধীন জাতির পক্ষে নির্যাতন ও অপমান ব্যতীত আর কিছুই সঞ্চয় করিয়া রাখিবার নাই। জাতি হিসাবে আমাদের মধ্যে আত্মচেতনা জাগাইবার জন্য— জাতিসমূহের মানদণ্ডে আমাদের অবস্থা উপলব্ধি করিবার জন্য জাতীয় সপ্তাহের অনুষ্ঠান। জার্মানী ১৮৭০ খ্রীস্টাব্দে ফরাসী রাজ্যের কিয়দংশ অধিকার করিলে ফ্রান্স কি করিয়াছিল? ফ্রান্সের মিউজিয়ামে অধিকৃত অংশের প্রতিকৃতি কৃষ্ণবর্ণের রেখা দ্বারা চিহ্নিত করিয়া রাখা হইয়াছিল। ফরাসীদের ন্যায় স্বাধীন জাতিও তাহাদের অপমানের বিষয় জাতির মনে সর্বদা জাগরূক রাখিবার জন্য ঐরূপ ব্যবস্থা করিয়াছিল।

নির্যাতন, অপমান ও অক্ষমতা সম্বন্ধে জাতীয় মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করিবার উদ্দেশ্যেই এই 'জাতীয় সপ্তাহে'র অনুষ্ঠান। উপসংহারে জাতির পক্ষে প্রচারকার্য চালাইবার জন্য কংগ্রেসকে অর্থ ও লোক দ্বারা সাহায্য করিতে সমবেত জনমণ্ডলীকে অনুরোধ করিতেছি। স্বাধীনতা লাভের জন্য বিদ্রোহ ও বোমার দিন চলিয়া গিয়াছে; শত শত অত্যাচারের প্রতি জাতির মনকে একমাত্র প্রবুদ্ধ করিয়াই স্বাধীনতা লাভ করা যাইতে পারে। জাতিকে উদ্বুদ্ধ করিয়া কংগ্রেসের পতাকাতলে আনিবার জন্য সমবেত শ্রোতৃমণ্ডলীকে

কংগ্রেসের সদস্য হইতে, কংগ্রেসের ভাণ্ডারে অর্থ সাহায্য করিতে ও কংগ্রেসের কার্য করিতে অনুরোধ করিতেছি, এবং কংগ্রেসকে এরূপ শক্তিশালী করিতে হইবে, যাহাতে কংগ্রেস নিজেকে সমগ্র ভারতবাসীর প্রতিনিধিমূলক প্রতিষ্ঠান বলিয়া প্রকৃতই গর্ব করিতে পারে।

বীর পূজা

৭ এপ্রিল ১৯২৯ বীর যুবক খড়্গবাহাদুর অভিনন্দন সভা, টাউন হল, কলিকাতা।

আমরা এখানে আসিয়াছি বীরের সম্মান করিতে। যে জাতি বীরত্বের সম্মান করিতে শেখে নাই তার মধ্যে মনুষ্যত্বের উদ্বোধন হয় নাই। জাতি হিসাবে আমাদের ব্যর্থতার অনেকখানি কারণ— আমাদের মধ্যে বীরপূজার প্রবৃত্তির অভাব। মাতৃজাতির পক্ষ হইতে যে এখানে আজ এত মহিলার সমাবেশ হইয়াছে তাতে স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে— আমাদের দেশে মনুষ্যত্বের উদ্বোধন হইয়াছে।

ত্যাগের পথে তরুণ চলুক

কেবল সভা করিলেই খড়্গবাহাদুরের প্রতি যথেষ্ট সম্মান দেখানো যাইবে না। তাঁর প্রকৃত সম্মান সেই দিন হইবে যেদিন তাঁর নির্দিষ্ট পথে আমরা চলিতে পারিব। তিনি যে ত্যাগ দেখাইয়াছেন তাহার তুলনা নাই। সেই ত্যাগের পথে তরুণ চলুক।

যে দেশে নারী পূজিত

আমাদের দেশে মাতৃজাতি আজও লাঞ্ছিতা, আমাদের শাস্ত্রে আছে— যে দেশে নারীর পূজা হয় সেখানে দেবতাগণ আনন্দ করেন। আমরা যে মাতৃজাতির সম্মান করিতে শিখাইয়াছি— সেটাই আমাদের আনন্দের কথা। যেখানে নারীর অপমান হয় সেখানে আমরা যেন শির উন্নত করিয়া তাঁহার সম্মান রাখিতে পারি।

না জাগিলে ভারত ললনা

মাতৃজাতির উদ্বোধন না হইলে জাতি জাগিবে না। কবি বলিয়াছেন— 'না জাগিলে সব ভারত ললনা, এ ভারত আর জাগে না, জাগে না।'

আপনি কৃপাণ ধরো

অনেকদিন আগে কোনো সংবাদপত্রের সম্পাদকীয় স্তম্ভে পড়িয়াছিলাম— আপদার মান রাখিতে, জননী, আপনি কৃপাণ ধরো। লেখক দেখিয়াছিলেন, এদেশে পুরুষের পৌরুষের এমনই অভাব হইয়া পড়িয়াছে যে নারীর সম্মান রক্ষার ভার নারীকে স্বহস্তে গ্রহণ না করিলে তাদের উদ্ধারের উপায় নাই।

ছোরা মেয়েদের অলংকার

দেশে যে দিনকাল আসিয়া পড়িয়াছে তাহাতে মেয়েদের অলংকারস্বরূপ অংগে সর্বদা ছোরা রাখা সমীচীন। এই অভাগা দেশে মাতৃজাতিকে নিজের উদ্ধারের পথ নিজেকে করিয়া লইতে হইবে। এইভাবে যে শক্তির বোধন হইবে তার দ্বারাই আমরা দেশের মুক্তি আনিতে পারিব।

নবনির্বাচিত মেয়র

শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত মেয়র নির্বাচিত হওয়ায় কর্পোরেশনের কংগ্রেসদলের পক্ষ হইতে আনন্দ প্রকাশ।

অনেক সদস্য থাকিতে পারেন যাঁহারা হয়তো বলিবেন যে, কোনো সদস্যের একবারের অধিক মেয়র হওয়া উচিত নহে, কিন্তু আমি তাঁহাদিগের সহিত এ-বিষয়ে একমত হইতে পারি না।

এক ব্যক্তি যে বহুবার মেয়র হইয়াছেন এরূপ নজীর পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে বিরল নহে। বস্তুত নজীর দেখিবার জন্য বাহিরে যাইবারও প্রয়োজন নাই— কলিকাতা কর্পোরেশন তাহার নিজের নজীর দ্বারাই পরিচালিত হইবে। গত বৎসর আমি যখন শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ বসুকে তাঁহার মেয়র পদ লাভের জন্য সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করি, তখন তিনি বলিয়াছিলেন যে, প্রথম মেয়র

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া তাঁহার গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিবার আশা করেন। এ বৎসর তিনি ইহার পুনরুক্তি করিয়াছেন। আমি আশা করি, শ্রীযুক্ত সেনগুপ্ত আমাদের প্রথম মেয়র দেশবন্ধুর আদর্শ ও গৌরবের প্রতি সুবিচার করিতে সক্ষম হইবেন। তাঁহার আদর্শ পবিত্র। শ্রীযুক্ত সেনগুপ্তের অতীত কার্যকলাপ হইতে আমার নিঃসংশয়ে প্রতীতি হয় যে তিনি ঐ-সকল উচ্চ আদর্শ যোগ্যতার সহিত রক্ষা করিবেন। তাঁহাকে চতুর্থবার মেয়রের আসন অধিকার করার জন্য আহ্বান করা হইয়াছিল। তাঁহার অপেক্ষা এই সম্মান লাভের উপযুক্ত ব্যক্তি কেহ আছেন বলিয়া আমি জানি না। বহু প্রয়োজনীয় সমস্যা সমাধানসাপেক্ষ রহিয়াছে : সেই হেতু এ বৎসর শ্রীযুক্ত সেনগুপ্ত বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হওয়ায় আমি অতীব আনন্দিত হইয়াছি। সমস্যাসমূহ যেরূপ গুরুতর এবং তাহার সমাধানের জন্য মেয়রের এ বৎসর যে গুরু কর্তব্যভার গ্রহণ করিতে হইবে, তাহাতে তাহার কর্পোরেশনের একটিমাত্র দলের সমর্থন লাভ নহে, সমগ্র সভার বিশ্বাসভাজন হওয়া দরকার। জল সরবরাহ প্রসার পরিকল্পনা অনতিবিলম্বে কার্যে পরিণত করিতে হইবে। পয়ঃপ্রণালী সমস্যার সমাধানেও শীঘ্রই হাত দিতে হইবে। প্রাথমিক শিক্ষার এখনই বিস্তারসাধন আবশ্যক। তাহা ছাড়া প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করিতে হইবে। রাস্তা ও শহরে স্বাস্থ্যের উৎকর্ষ সাধন করিবার যথেষ্ট আছে। তাহার পর এ বৎসরের শেষভাগে কর্পোরেশনকে সাধারণ নির্বাচনের সম্মুখীন হইতে হইবে, এরূপক্ষেত্রে আমার বিশ্বাস, সভা শ্রীযুক্ত সেনগুপ্তকে মেয়র নির্বাচন করিয়া বিশেষ বিজ্ঞতার পরিচয় দিয়াছেন। আমার বিশ্বাস শ্রীযুক্ত সেনগুপ্তের কার্যকালের মধ্যে কর্পোরেশন তাঁহার কার্যের জন্য শহরবাসীর অনুমোদন লাভ করিবেন। আমার নিঃসংশয় ধারণা শ্রীযুক্ত সেনগুপ্ত তাঁহার নিজের প্রতি, কংগ্রেস দলের প্রতি এবং কর্পোরেশনের সুবিচার করিতে সক্ষম হইবেন।

১১ এপ্রিল ১৯২৯

জালিয়ানওয়ালাবাগের স্মৃতি

১৩ এপ্রিল ১৯২৯ শ্রদ্ধানন্দ পার্কে 'জালিয়ানওয়ালাবাগ দিবস' উপলক্ষে আয়োজিত সভায় প্রদত্ত ভাষণ।

ক্ষণিকের উল্লাসে আমাদের স্রোতে ভাসিয়া গেলে চলিবে না। মুক্তি লাভই আমাদের আদর্শ। দুঃখকষ্টের ভিতর দিয়া আমরা তাহারই অনুসরণ করিব। কষ্ট ও দুঃখের মধ্য দিয়াই সেই আনন্দকে উপভোগ করিতে হইবে। ১৩ এপ্রিলের তিথি আমাদের উল্লাসের দিন নহে। একটা আনন্দের বস্তুকে গ্রহণ না করিয়া বেদনার স্মৃতিকে সজাগ রাখিবার জন্য কেন আমরা এত তৎপর হইয়াছি? কারণ এই যে, পরাধীনের জীবনে গৌরবের কিছুই নাই। যে জাতি নির্জীব হইয়া পড়িয়াছে তাহাকে ইহার স্মরণের দ্বারা জাগাইতে পারিবেন, আর কিছুর দ্বারা পারিবেন না। জালিয়ানওয়ালাবাগ আমাদের পরাধীনতার পুঞ্জীভূত বেদনারই মূর্ত প্রকাশ। এই ব্যাপারে চিন্তা করিতে করিতে আমাদের মধ্যে তীব্র বেদনা জাগিবে, ঐ বেদনার দ্বারা আমরা ব্যক্তিকে এবং জাতিকে জাগাইব। জালিয়ানওয়ালাবাগের স্মৃতিকে জাতির অন্তরে নিত্য জাগ্রত রাখিতে হইবে; যতদিন পর্যন্ত আমরা স্বাধীনতা লাভ করিতে না পারি, ততদিন পর্যন্ত পুরুষপরম্পরায় ঐ স্মৃতির দীপ প্রজ্বলিত রাখিতে চাই, তজ্জন্য আজিকার এই তিথিতে বেদনারূপ তৈল সংগ্রহ করা হয়।

কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানগুলিকে শক্তিশালী করাই আমাদের প্রথম কর্তব্য, তৎপর বিদেশী বস্ত্র এবং পণ্য বর্জন। বয়কট-আন্দোলন সফল করিবার জন্য যে গঠনকার্য করা হইবে, যদি আমরা তাহা করিয়া উঠিতে পারি, তাহা হইলে তাহার সাহায্যেই আমরা অন্য কাজ— যেমন আইন অমান্য প্রভৃতিও চালাইতে পারিব। এ বৎসর আমাদের উদ্যোগ-আয়োজনের বৎসর। লাহোর কংগ্রেসে নিশ্চয়ই পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব গৃহীত হইবে। সুতরাং তদুপযোগী কার্যের জন্য এখনই আমাদিগকে প্রস্তুত হইতে হইবে। এই প্রস্তুত হইবার প্রকৃষ্ট পন্থাই হইল কংগ্রেসের প্রভাব সর্বাগ্রে প্রসারিত এবং সুপ্রতিষ্ঠিত করা।

কাজের কৈফিয়ৎ

২১ এপ্রিল ১৯২৯ ময়মনসিংহ জেলা সম্মিলনের জামালপুর অধিবেশনে প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভাপতি রূপে ভাষণ।

মাননীয় সভাপতি মহাশয়, সমবেত ভদ্রমহিলা এবং ভদ্রমহোদয়গণ— সভাপতি মহাশয় আমাকে আদেশ করিয়াছেন কিছু উপদেশ দিবার জন্য। আমি প্রথমেই বলিয়া রাখি উপদেশ দিবার স্পর্ধা আমার নাই। দেশের বর্তমান সমস্যা ও তাহার সমাধানের জন্য অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি মহাশয়, সম্মিলনীর সভাপতি মহাশয় এবং দেশনায়ক সেনগুপ্ত মহাশয়ের সারগর্ভ বক্তৃতার পর নূতন কিছু বলিবার আবশ্যকতা আছে বলিয়া আমি মনে করি না। তৎসত্ত্বেও আমি যে এখানে কিছু বলিবার জন্য দাঁড়াইয়াছি তাহার কারণ এই— বাংলার কংগ্রেস সভ্য এবং কংগ্রেস কর্মীগণ আমার উপর যে গুরুভার অর্পণ করিয়াছেন— প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির সভাপতি হিসাবে— তাহা স্মরণ করিয়া আমার মনে যে কর্তব্যের উদয় হইয়াছে তাহা এই যে— যে কর্মের ভার আমি গ্রহণ করিয়াছি কি উপায়ে তাহা সফল করিতে পারিব। আমাদের জাতীয় আন্দোলনের দুর্বলতা কোথায়, কি মনোভাব নিয়া আমি এই কার্যে অবতীর্ণ হইয়াছি— এ সম্বন্ধে নিজের একটা কৈফিয়ত আছে। আমরা অনেক সময় সাময়িক কার্যে ব্যাপৃত থাকি, প্রোগ্রামের আলোচনা বেশি করি। এই-সমস্ত প্রোগ্রামের পশ্চাতে যে চিন্তা-রাশি আছে, তাহার আলোচনা আমরা অনেক সময় করি না। অথচ মানুষ যে পর্যন্ত সেখানে গিয়া না পৌঁছিয়াছে, কর্মের আদর্শ যেখানে সেখানে যতদিন মানুষ না পৌঁছিয়াছে ততদিন পর্যন্ত শক্তি ও প্রেরণা মানুষ লাভ করিতে পারে না।

আমরা প্রায়ই শুনিতে পাই, এই যে এত বড়ো অসহযোগ আন্দোলন প্রবল বন্যার মতো ভারতের বুকের উপর দিয়া বহিয়া গেল। ইহার পূর্বে কত আন্দোলন বহিয়া গিয়াছে— তাহার ফল কি হইল? যাঁহারা অল্প বাধাতেই নিরাশ হন, তাঁহারা বলেন ফল কিছু হয় নাই। আমাদের চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে। মহাত্মা গান্ধীকে সামনে রাখিয়া আমরা কত আশা নিয়া কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলাম— ফল কিছু হইল না। উত্তরে বলিতে চাহি— গত ৩০ বৎসর ধরিয়া বাংলাদেশে যে মহতী চেষ্টা চলিয়াছে— তাহা ব্যর্থ হয়

নাই— অনেকাংশে সফল হইয়াছে ও সাফল্যের দিকে চলিয়াছে। আপাত-দৃষ্টিতে লক্ষ্য করিলে মনে হইবে এটা বুঝি ব্যর্থ হইয়াছে। কিন্তু বাংলার ৩০ বৎসরের ইতিহাস বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে দেখিতে পারেন— একটা অধ্যায়ের পর অধ্যায় যেন আসিয়াছে, যেন আমরা ক্রমশ উন্নতির দিকে চলিয়াছি।

বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে যে আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছে. তাহার নাম স্বদেশী আন্দোলন। উহা প্রথম অধ্যায়। বঙ্গভঙ্গের পর যে উদ্দীপনা ও উন্মাদনা দেশে আসিয়াছিল, তাহার ফলে এই আন্দোলন শক্তিশালী হইয়াছে। তখন অস্ত্র ছিল বিলাতী পণ্য বর্জন। সব জিনিস বর্জন করিতে পারি না। কেবল বিলাতী কাপড় ও বিলাতী লবণ বর্জন করিতে চেষ্টা করিয়াছিলাম। আনুষাঙ্গিক কাজ করিয়াছি— সমিতি গঠন, ব্যায়াম-চর্চার প্রসার ইত্যাদি। তাহার ফলে বঙ্গভঙ্গ রদ হইয়াছিল। ইংরেজ যে গর্ব করিয়া বলিয়াছিল Partition of Bengal is a settled fact তাহা unsettled হইয়াছিল। সুতরাং আমরা বলিতে পারি না সে আন্দোলন ব্যর্থ হইয়াছে, তাহা সফল হয় নাই। তারপর আসিল মিণ্টো-মর্লি রিফর্ম। তাহাতেও আশা পূর্ণ হইল না। সমস্ত জাতি পূর্ণ স্বাধীনতার জন্য চঞ্চল হইয়া উঠিল। অরবিন্দবাবু যখন 'বন্দেমাতরম্' পত্রিকায় লিখিলেন — We want complete autonomy free from British control তখন বিদ্যুতের মতো সেই বাণী তরুণ সমাজের শিরায় শিরায় প্রবাহিত হইল, তাহাতে সমগ্র বাংলাদেশ যেন জাগরিত হইয়া উঠিল। বঙ্গভঙ্গ রদ হওয়ার পর বাঙালী জাতি সেই আদর্শ অনুসরণ করিতে লাগিল।

তারপর দ্বিতীয় অধ্যায় বিপ্লবের যুগ। সে সম্বন্ধে আলোচনা করিবার আবশ্যকতা নাই। সে পন্থা অবলম্বন উচিত হইয়াছে কিনা তাহার আলোচনার প্রয়োজন নাই— তবে বলিব— ইতিহাসে কোনো জিনিস ব্যর্থ নয়, সকল জিনিসের সার্থকতা আছে। বিপ্লব যুগের অবসানে ১৯১৯ সালে নূতন শাসননীতি প্রবর্তিত হইল। ইহা বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হইবে না যে— বিপ্লব যুগ যদি না আসিত তাহা হইলে যে সামান্য অধিকার পাইয়াছি তাহাও পাইতাম না। ইহা ইংরেজরাও স্বীকার করেন। সুতরাং বিপ্লব চেষ্টা ব্যর্থ হয় নাই। তারপর ১৯১৯ সালের রিফর্ম পাইয়া এক সম্প্রদায় সন্তুষ্ট হইলেন এবং সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা আরম্ভ করিলেন ; কিন্তু দেশের অধিকাংশ লোক তাহা করিলেন না।

তৃতীয় অধ্যায় গণ-আন্দোলনের যুগ। এই আন্দোলনের অস্ত্র ধর্মঘট, আইন অমান্য, খাজনা বন্ধ এবং বিলাতী পণ্য বর্জন। এইপ্রকার বিবিধ উপায়ে বর্তমান যুগের জাতীয় আন্দোলন সার্থক করিতে আমরা চেষ্টা করিয়াছি ও করিতেছি। আমাদের আদর্শ সম্পূর্ণ সফল না হইলেও এখানেই তাহার শেষ হইবে না। নূতন অধ্যায় আরম্ভ হইবে। তখন আমাদের অস্ত্র কী হইবে সে সম্বন্ধে কেহ কিছু বলিতে পারে না। তবে ইহা নিশ্চিত যে শক্তি জাগ্রত হইয়াছে। যতদিন পর্যন্ত ভারত পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ না করিবে ততদিন পর্যন্ত এই আন্দোলন কিছুতেই নির্বাপিত হইবে না, হইতে পারে না। ক্রমশ শক্তি সঞ্চার করিয়া ইহা গন্তব্য পথে চলিবেই চলিবে। এখন দেখিতে হইবে— জাতীয় দুর্বলতা কোথায়? ১৯২৭ সালে আমার কারা-মুক্তির পর এই প্রশ্ন বিশেষভাবে আমার মনকে আলোড়িত করিয়াছিল। এত চেষ্টা সত্ত্বেও কেন আমাদের আন্দোলন সার্থক হইতেছে না। আপনাদের মনে থাকিতে পারে, সাকলাতওয়ালা যখন কলিকাতা আসিয়াছিলেন, তখন তিনি একটি কথা বলিয়াছিলেন। তাহা এই, লেনিন যখন রাশিয়াতে রাষ্ট্রগুরুর কার্যভার গ্রহণ করেন তখন তাঁহার পিছনে যত লোক ছিল তাহা অপেক্ষা বেশি following মহাত্মা গান্ধীর ছিল এবং এখনো আছে। অল্প following নিয়া লেনিন কেমন করিয়া সাফল্য লাভ করিলেন আর মহাত্মা গান্ধী এত বড়ো following পাইয়াও সাফল্য লাভ করিতে পারিলেন না, ইহা বাস্তবিক চিন্তার বিষয়। ইহার উত্তর আমার মনে হয় এইরূপ: আমরা যাহাকে following বলি তাহার স্বরূপ কি? একজন নেতা আসিলেন— তাঁহার নামে জয়ধ্বনি উঠিল, দিকে দিকে তাহা প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল— আমরা মনে করিলাম— খুব বড়ো following হইয়াছে। জয়ধ্বনি না পাইয়াও যদি কোনো নেতা তাহার পশ্চাতে কৃতসংকল্প দৃঢ়প্রতিজ্ঞ কর্মী পান যাহারা দেশমুক্তির দিকে অগ্রসর হইবে। যে পর্যন্ত এইরকম কর্মীর দল না পাওয়া যাইবে, যাহারা মৃত্যুভয় রাখে না, যাহারা সর্বস্ব পণ করিয়া স্বজাতির উদ্ধার সাধন করিতে প্রস্তুত— সে পর্যন্ত কোনো নেতা দেশকে উদ্ধার করিতে পারিবে না। কি উপায়ে এইরকম কর্মী সৃষ্টি করা যাইতে পারে তাহা চিন্তার বিষয়। আয়ারল্যান্ড বলুন রাশিয়া বলুন— সকলে আমার চোখের সামনে স্বাধীনতা লাভ করিল। সেই সকল দেশের কর্মীর সঙ্গে আমাদের দেশের কর্মীর তুলনা করুন, তাহাদের জীবনের সঙ্গে আমাদের জীবনের তুলনা করুন। কী

দেখিবেন ? তাহারা বার বার কারা-যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছে, লাঞ্ছিত হইয়াছে, অত্যাচারিত হইয়াছে, বিদেশে বিতাড়িত হইয়া সারা জীবন কাটাইয়াছে— কিন্তু তবু তাহারা আদর্শভ্রষ্ট হয় নাই। এইরকম কর্মীর সংখ্যা কম নয়। সহস্র সহস্র কর্মী এইভাবে জীবন কাটাইয়াছে। তাহার ফলে তাহারা স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে। যেদিন আমরা সেইরূপ নির্ভীক কৃতসংকল্প কর্মী পাইব সেইদিন আমাদেরও স্বাধীনতা অবশ্যম্ভাবী। এইরকম কর্মী আমাদের দেশে সৃষ্টি হইয়াছে— এই সভায় সেইরকম কর্মী অনেক আছেন যাঁহারা ফাঁসি-কাষ্ঠ হইতে ফিরিয়া আসিয়াছেন, আন্দামান হইতে ফিরিয়া আসিয়াছেন— নানাপ্রকারে তাঁহারা লাঞ্ছিত হইয়াছেন কিন্তু আদর্শভ্রষ্ট হন নাই। তাহাদিগকে দেখিয়া আশা হয়— মানুষ তৈরি হইয়াছে। এমন কর্মীর সংখ্যা যতই বাড়িবে ততই আমরা আদর্শের নিকটবর্তী হইব। এই মুষ্টিমেয় লোক সর্ব-দেশে জাতির উদ্ধার সাধনের অগ্রদূত। জাতি যদি সহানুভূতি নিয়া তাহাদের পশ্চাতে আসিয়া দাঁড়ায়, তাহা হইলে জাতির উদ্ধার সাধন অবশ্যম্ভাবী। সেই রকম জাতীয় ভাব এখনো আমাদের দেশে জাগ্রত হয় নাই।

যখন শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করাই আমাদের উদ্দেশ্য হয়, তখন দেখি শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধের পরিবর্তে নিজেদের সঙ্গে সংগ্রাম করিতে করিতেই কর্মীদের শক্তির অপব্যয় হয়। অন্য উপায় নাই। আপনি যদি কর্মে অবতীর্ন হন, আর দেশবাসী যদি আপনার শত্রু হয় তবে সেই বাধাকেও অতিক্রম করিতে হইবে। সুতরাং স্বদেশবাসীর সঙ্গে সংগ্রাম না করিয়া উপায় নাই। দেশ-বন্ধুর তিরোধানের পর প্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় দুঃখের সঙ্গে লিখিয়াছিলেন — আজ সব চেয়ে বেদনা মনে এই জাগিতেছে যে দেশবন্ধুর অমূল্য জীবনের কত উদ্যম ও শক্তি নষ্ট হইয়াছে দেশবাসীর সঙ্গে সংগ্রাম করিতে করিতে। ইহা শুধু দেশবন্ধুর জীবনের অভিজ্ঞতা নহে। বোধ হয় প্রত্যেক কর্মীর জীবনের অভিজ্ঞতা। যতই ব্যাপকভাবে জাতীয় ভাবের প্রসার হইবে ততই দেশবাসীর সঙ্গে সংগ্রাম করিতে হইবে। যদিও এইরকম ব্যাপার নিন্দনীয়, জাতির পক্ষে দুঃখের কথা— কিন্তু বলিতে হইবে মীরজাফর এবং উমিচাঁদের মতো লক্ষ লক্ষ লোক এখনো এদেশে বাস করিতেছে। এখন চিন্তা করিতে হইবে— দেশের লোক যদি দেশের স্বার্থের বিরুদ্ধে কাজ করে তবে তাহাদের সেই মনোবৃত্তির পরিবর্তন কেমন করিয়া হইতে পারে ? ইহার প্রতিকার কি ?

জাতীয় আন্দোলনকে শক্তিশালী করিবার পক্ষে প্রথম বাধা— সমাজের অধিকাংশ লোক যাহারা তথাকথিত অনুন্নত শ্রেণী, তাহাদিগকে আমরা বাদ দিয়া রাখিয়াছিলাম। আমরা বাদ দিয়াছি তাহা নয়— আমরা তাহাদিগকে চাই কিন্তু যে উপায় অবলম্বন করিলে তাহাদিগকে পাইতে পারি তাহা করি না— ব্যাপকভাবে সে চেষ্টা করি না। রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার কথা প্রচার করিতে যখন আমরা গ্রামে গ্রামে যাই তখন যে ব্যক্তি সামাজিক অত্যাচার ভোগ করিতেছে সে বলিবে যে অভিজ্ঞতা— যে বেদনা আমার কাছে সত্য তাহার প্রতিকার না হওয়া পর্যন্ত আমি কিরূপে বুঝিব— আপনারা বাস্তবিক জাতিকে মুক্ত করিতে চান?' এখানে প্রশ্ন ওঠে— মুক্তির অর্থ কি? শুধু রাষ্ট্রীয় বন্ধন হইতে মুক্তিই একমাত্র মুক্তি নয়। মানুষকে সর্ববিধ বন্ধন হইতে মুক্ত করিতে হইবে। তিন প্রকার বন্ধন আছে: ১. সামাজিক বন্ধন, ২. রাষ্ট্রীয় বন্ধন, ৩. অর্থনৈতিক বন্ধন— এই ত্রিবিধ তাপে মানুষ তাপিত, নিষ্পিষ্ট; মানুষকে মুক্ত করিতে হইলে এই তিন দিক দিয়া মুক্ত করিতে হইবে— নহিলে সে মুক্ত হইতে পারে না। আজ যাহারা সমাজের কাছে অস্পৃশ্য, যাহাদের জলচল নাই, যাহারা মানুষের অধিকার ভোগ করিতে পারে না, যে পর্যন্ত না তাহাদিগকে মনুষ্যত্বের আসনে বসাইতেছি সে পর্যন্ত তাহারা কেমন করিয়া বিশ্বাস করিবে— আমরা বাস্তবিক মুক্তিকামী। চণ্ডীদাসের বুলি মুখে আওড়াই বটে—

শুনহ মানুষ ভাই
সবার উপরে মানুষ সত্য
তাহার উপরে নাই—

কিন্তু কয়জন তাহা কার্যে পরিণত করিতে পারে? কিশোরগঞ্জে গিয়াছিলাম। দেখিলাম কালী মন্দিরে কোনো শ্রেণীর প্রবেশ করিবার অধিকার নাই। প্রস্তাব হইল— সার্বজনীন মন্দির তৈরি করা হউক। কেন, মন্দির তো রহিয়াছে। সেখানে প্রবেশের অধিকার দিবে না কেন? স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন— শাস্ত্রের দোহাই দিলে চলিবে না। সমাজের যে যেখানে লাঞ্ছিত হইতেছে তাহাকে লাঞ্ছনার হাত হইতে রক্ষা করিতে হইবে। পূর্ণ অধিকার না দিলে মানুষকে রাষ্ট্রীয় আন্দোলনে আনিতে পারিবেন না। রাষ্ট্রীয় অধিকার দিবার ক্ষমতা হয়তো আমাদের নাই কিন্তু ইচ্ছা করিলে সামাজিক বন্ধন হইতে আমরা তাহাদিগকে মুক্ত করিতে পারি। যে পর্যন্ত আমরা তাহা না করিব সে

পর্যন্ত তাহাদের বিশ্বাস জন্মিবে না, জন্মিতে পারে না— বাস্তবিক আমরা মুক্তিকামী। আমি শুনিলাম— এখানে ১৫০টি ভাই আসিয়াছে, তাহাদের কিছু দাবি আছে— সে দাবি তাহারা শুনাইতে চাহে। তাহারা জলচল নয়, জলচল হইতে চায়। আমি মনে করি ইহা সামান্য দাবি। যে দাবি মানুষের করা উচিত তাহা হইতেছে মনুষ্যত্বের দাবি। মানুষ হিসাবে মানুষের যত রকম অধিকার আছে তাহা দেওয়া চাই। জলচল তো সামান্য কথা। যদি আমরা মানুষকে ভালোবাসি তবে তাহাকে মানুষের আসনে বসাইতে হইবে। এইভাবে যদি সামাজিক আন্দোলন চালাইতে পারি তাহা হইলে অল্প সময়ের মধ্যে যাহারা আমাদের দূরে রহিয়াছে তাহারা দলে দলে যোগদান করিবে। যেদিন তাহারা যোগদান করিবে সেদিন আমাদের আন্দোলন শক্তিশালী হইবে।

তারপর নারী সমাজ। ইহারা সমাজের অর্ধেক কিন্তু জাতীয় আন্দোলনের জন্য তাঁহারা কতটুকু করেন, তাঁহাদিগকে আমরা কতটুকু করিতে দিই। দেশ সেবার অধিকার কি আমরা তাহাদিগকে দিই? পারিবারিক ও সামাজিক আচার-ব্যবহার ও চিরাচরিত প্রথার ফলে ইচ্ছা থাকিলেও দেশের জন্য যাহা করা উচিত তাহা তাঁহারা করিতে পারেন না। যখন অন্যান্য স্বাধীন জাতির কথা আমরা পড়ি, দেখি দেশের জন্য নারীরা কত-না দান করিয়াছে। সমাজের অর্ধেককে বাদ দিয়া কোনো কাজ চলিতে পারে না। কংগ্রেস ও অন্যান্য প্ল্যাটফরম হইতে আমি বরাবর বলিতে চেষ্টা করিয়াছি যে পর্যন্ত নারী-আন্দোলন, শ্রমিক-চাষীর আন্দোলন সাফল্যের দিকে অগ্রসর না হইতেছে, আমাদের রাষ্ট্রীয় আন্দোলন সার্থক হইতে পারে না। আমাদের আদর্শ দেশকে মুক্ত করিব। যদি আমরা বাস্তবিক দেশকে স্বাধীন করিতে চাই তবে স্বাধীনতার মূল্য দেওয়া উচিত। যদি সে মূল্য দিতে না চাই স্পষ্ট করিয়া তাহা বলিয়া দেওয়া উচিত— স্বাধীনতার মূল্য আমরা দিব না। নারী-সমাজকে, চাষী ও মজুরদিগকে আমরা মুক্তি দিতে চাই কিন্তু তাহার মূল্য দিব না। এটা স্পষ্ট করিয়া বরং বলিয়া দেওয়া ভালো। যদি বলি স্বাধীনতা চাই, তাহার মূল্য নিশ্চয়ই দিতে হইবে। সে মূল্য— সামাজিক বন্ধন হইতে মানুষকে মুক্ত করা। নারী-সমাজকে মুক্ত করিতে হইবে, জাগ্রত করিতে হইবে। আমরা বিলাতী পণ্য বর্জন, বিদেশী বস্ত্র বর্জনের চেষ্টা করিয়াছি ও করিতেছি। যে পর্যন্ত আমাদের মা ও ভগিনীগণ এই কাজে যোগদান না করিবে সে পর্যন্ত কংগ্রেস যতই propaganda করুক, সাফল্য লাভ করিতে

পারিবে না। সংসার যাহাদের মুঠার মধ্যে তাহারা স্বদেশী মন্ত্র গ্রহণ না করিলে সমস্ত পুরুষ সমাজ একত্র হইলেও কিছুই করিতে পারিবে না। অথচ মাতৃজাতি যদি স্বদেশী মন্ত্রে দীক্ষিত হন তাহা হইলে অতি অল্প সময়ে, অতি অল্প বিদেশী বস্ত্র বর্জনে আমরা সাফল্য লাভ করিতে পারিব। এই কাজ যদি করিতে হয়, মহিলা কর্মী চাই। আমি বলি না পুরুষ-সমাজ যেভাবে কাজ করিবে নারী-সমাজ সেভাবে করিবে। আমাদের কার্যপদ্ধতি অন্যরকম হইতে পারে। পথে ঘাটে মাঠে আমাদের কর্মক্ষেত্র হইতে পারে, অন্তঃপুরের মধ্যে তাহাদের কর্মক্ষেত্র হইতে পারে। পুরুষ সমাজে যেমন পুরুষ কর্মী চাই। মহিলা সমাজেও সেইরূপ মহিলা কর্মী চাই। তাহা যদি না পাই তাহা হইলে আমাদের প্রচেষ্টা আংশিক ভাবে ব্যর্থ হইবে। বিদেশি বস্ত্র বর্জন বা যে-কোনো propaganda বলুন, সার্থক করিতে হইলে সমগ্র নারী সমাজের সহানুভূতি পাওয়া দরকার।

তারপর শ্রমিক এবং চাষীদের অবস্থা ভাবিয়া দেখুন। তাহারা একটি কথা বলে— তাহাদের দৈনন্দিন জীবনের দুঃখ ও কষ্টের সমাধান হইতেছে না। তাহার সমাধান যদি করিতে না পারি তাহা হইলে কেমন করিয়া তাহারা বিশ্বাস করিবে— বাস্তবিক আমরা স্বাধীনতা চাই। এই ময়মনসিংহের আটিয়া পরগনায় যে অত্যাচার হইতেছে আমার মনে হয় এটা মস্ত সুযোগ। জিলাবাসীর কাছে জিলার কংগ্রেস কর্মীদের সার্থকতা প্রতিপন্ন করিবার মস্ত সুযোগ— ইহাকে উপলক্ষ করিয়া আন্দোলন গড়িয়া তোলা। দরিদ্র প্রজার দুঃখ-কষ্ট যদি নিবারণ করিতে চান তাহা হইলে কর্তব্য হইবে এইরকম অভিযোগ যেখানে আছে তাহাকে গ্রহণ করিয়া আন্দোলন সৃষ্টি করা। সিভিল disobediencc বলুন, খাজনা বন্ধ বলুন— যদি সফল করিতে চান তাহা হইলে এই ধরনের অভিযোগ যেখানে আছে তাহা দূর করিয়া দরিদ্র প্রজার মনে বিশ্বাস জন্মাইতে হইবে— তাহাদিগকে আমরা বাস্তবিক ভালোবাসি, তাহাদের অভাব দূর করিবার জন্য আমরা সর্বদা সচেষ্ট। কোনো কোনো জায়গায় ইউনিয়ন বোর্ড লোকে চাহে না, অনেক জায়গায় জমিদারের অত্যাচার আছে। যে জেলায় যেভাবে যে অত্যাচার আছে তাহা যদি নিবারণ করিতে না পারেন তাহা হইলে দরিদ্র প্রজার মনে বিশ্বাস আসিতে পারে না। আমরা দেশকে মুক্ত করিতে চাই। প্রত্যেক ছাত্রের এবং যুবকের ব্রত হওয়া উচিত যখন যেখানে যে অবস্থায় যে-কোনো অত্যাচার সে

দেখিবে তখন নির্ভীক ভাবে তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও তাহা নিবারণ করিবার জন্য সে শির উন্নত করিয়া দাঁড়াইবে। এইরকম মানসিকতা যদি সৃষ্টি করিতে না পারি, তরুণ সমাজ মানুষ হইতে পারিবে না। একবার যদি তরুণ সমাজে এ মনোভাব আসে যে কখনো কোনো অত্যাচার সহ্য করিব না, প্রাণ পর্যন্ত পণ করিয়া তাহা নিবারণের চেষ্টা করিব— যেমন খড়্গবাহাদুর করিয়াছে ; যখন মাতৃজাতির উপর অত্যাচার হইয়াছে সে স্থির থাকেতে পারে নাই— অস্থির হইয়াছে, অসহিষ্ণু হইয়া উঠিয়াছে, সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিবার জন্য, পাপীকে শিক্ষা দিবার জন্য প্রাণপণ করিয়া বিপদ-সমুদ্রে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছিল— তাই খড়্গবাহাদুরের মতো সামান্য একটি নেপালী ছাত্র আজ সমস্ত ভারত-পূজ্য হইয়াছে, কারণ প্রাণপণ করিয়া সে মাতৃ-জাতির সম্মান রক্ষা করিতে চেষ্টা করিয়াছে— আমরা যদি সেইরূপ করিতে পারি তবেই দেশের উদ্ধার অবশ্যম্ভাবী। তরুণসমাজে এই **mentality** আনিতে হইবে, তবে মানুষ তৈরি হইবে।

তরুণ-আন্দোলন সম্বন্ধে একটা জিনিস লক্ষ্য করিয়াছি— নন-কো-অপারেশন আন্দোলনে যত কর্মী কর্মক্ষেত্রে দেখা দিয়াছে তাহার বেশি কর্মী পাই নাই। কেন পাই নাই চিন্তার বিষয়। বিশ্লেষণ করিয়া দেখা উচিত জাতীয় জীবনের দুর্বলতা কোথায় এবং তাহার প্রতিকারের উপায় কি। যুদ্ধ যখন হয় একদিকে লোক মরে অপর দিকে নূতন সেনা আসিয়া তাহার স্থান পূরণ করে। ক্ষয় এবং **supply** এই দুটির সংমিশ্রণে জাতি জয়যাত্রার পথে অগ্রসর হয়। নন-কো-অপারেশন আন্দোলনে ক্ষয় হইয়াছে। স্বাস্থ্যহানির দরুন পারিবারিক কারণে কিম্বা উৎসাহ ভঙ্গের দরুন কর্মীরা সরিয়া পড়িয়াছে। শূন্য স্থান পূর্ণ করিতে নূতন কর্মী পাই নাই। কেন পাই নাই ? ছাত্র সমাজে নূতন আন্দোলনের সৃষ্টি করিতে হইবে ; তরুণ সমাজ যেন বুঝে দেশকে তাহারাই মুক্ত করিবে, মুক্তির ফল তাহারাই ভোগ করিবে। এইরকম বিশ্বাস যদি জন্মে তাহা হইলে নূতন কর্মী আসিবে, কর্মীর অভাবে কর্ম বন্ধ থাকিবে না। এ কথা স্বীকার করিতেই হইবে— কর্মীর অভাব হইয়াছে। আমি জানি কলিকাতা হইতে চিঠির পর চিঠি লিখিলেও— অনেক জেলার কংগ্রেস কমিটি হইতে উত্তর পাওয়া যায় না, কর্মী তো দূরের কথা। নূতন কর্মী তৈরি করিতে হইবে। তরুণ আন্দোলন যত বেশি হয় ততই নূতন কর্মীর সৃষ্টি হইবে। খাঁটি কর্মী চাই। আন্দোলনকে

জয়যুক্ত করিতে পারে কর্মীদল। খাঁটি কর্মী মুষ্টিমেয় হইলেও আপত্তি নাই কিন্তু তাহাদের পশ্চাতে সমগ্র সমাজের সহানুভূতি চাই। এই দুইটির সংযোগ যেদিন হইবে সেদিন জাতির উদ্ধার অবশ্যম্ভাবী।

আন্দোলনের পশ্চাতে সমাজের সহানুভূতি থাকা চাই। সেইজন্য propaganda দরকার। এই propaganda-র মূল্য কত বেশি তাহা আমরা বুঝি না, অনেকে বলেন কংগ্রেস হুজুগ করিতেছে— সভাসমিতি করিতেছে। আজ পর্যন্ত যত বড়ো বড়ো আন্দোলন এদেশে বা বিদেশে হইয়াছে তাহাতে সর্বাপেক্ষা বড়ো অস্ত্র হইয়াছে propaganda। আপনারা জানেন ইংরেজ বাহাদুর একটি দেশকে বড়ো বেশি ভয় করেন— রাশিয়া! কেন ভয় করেন? রাশিয়ায় কামান বন্দুক এরোপ্লেন এমন-কিছু নাই যাহার ভয়ে ইংরেজ ভীত হইতে পারে। সে বলে রাশিয়া বলীয়ান নয়। কিন্তু তাহার দুই প্রকার বল আছে: ১. ভাব, ২. propaganda। রুশ জাতি দেশের সম্মুখে নূতন আদর্শ আনিয়াছে— দরিদ্র প্রজা দেশ শাসনের ভার নিজ হস্তে গ্রহণ করিবে। এই আদর্শকে ইংরেজ ভয় করে— নূতন ভাবের প্রভাব এত বেশি তাহার কাছে কামান বন্দুক টিকিতে পারে না। ফরাসী জাতি যখন স্বাধীনতা লাভ করে তাহাদের তিনটি আদর্শ ছিল— সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতা। এই তিনটি বাণী দ্বারা তাহারা কেবল দেশকে উদ্ধার করিয়াছে তাহা নয়, দিগ্‌বিজয়েও বাহির হইয়া পড়িয়াছিল। ফরাসী জাতির ভয়ে তখন সমস্ত ইউরোপ কম্পিত হইয়াছিল। সবচেয়ে বড়ো আন্দোলন— রাশিয়ান রিভলিউশান। মুষ্টিমেয় ধনী সম্প্রদায় ইংরেজের দেশ শাসন করে। ইহারা রাশিয়ার propaganda-র অভিনব রীতিকে ভয় করে। কী কৌশলে propaganda করিতে হইবে দুই জাতি জানে— ইংরেজ ও রাশিয়া। এ বিষয়ে ইংরেজ, রাশিয়ার শিক্ষাগুরু। propaganda-র কৌশল জানে বলিয়াই ইংরেজ এত শক্তিশালী হইয়াছে। কামান-বন্দুকের জোরে তাহারা গত যুদ্ধে জয়লাভ করে নাই। যখন জার্মান জাতি সন্ধি ভিক্ষা করিয়াছিল তখন তাহারা জয়ী। ফরাসী বেলজিয়ম তখন তাহাদের করতলগত। জয়যুক্ত জার্মান-সৈন্য তবে কেন সন্ধি প্রার্থনা করিয়াছিল— এইজন্য করিয়াছিল— তাহাদের দেশে ইংরেজ ও ফরাসী এমন propaganda চালাইয়াছিল যে তাহারা বিশ্বাস করিয়াছিল প্রেসিডেন্ট উইলসনের ১৪টি শর্ত অনুসারে সন্ধি হইবে— সন্ধি হইলে জার্মান জাতির স্বার্থহানি হইবে না। যখন সন্ধি

হইল দেখা গেল ১৪টি শর্তের মধ্যে একটিও তাহাতে রহিল না। ইংরেজের propaganda-য় জার্মান জাতি ভুলিয়া গিয়াছিল। ইতিহাস প্রতিপন্ন করিয়াছে propaganda দ্বারা জয়লাভ যত সহজ, কামান বন্দুক দ্বারা জয়লাভ তত সহজ নয়। এই শিক্ষা এতদিন পর রুশজাতি পাইয়াছে। রাশিয়া হইতে এখন চীনেরা তাহা নিয়াছে। সংবাদপত্রে জানিতে পারি— চীন দেশের জাতীয় দল বিনা রক্তপাতে কী অদ্ভুত উপায়ে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। চীনের এ প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত আজ তাহাদের হাতে। propaganda-র জোরে সৈন্যদল আসিয়া পড়িয়াছে। সকলে আদরের সঙ্গে জাতীয়দলকে অভ্যর্থনা করিয়াছে। তাই বলিতেছি— propaganda-র মতো শক্তিশালী অন্য অস্ত্র নাই। দেশে দেশে গ্রামে গ্রামে গিয়া বলিতে হইবে— এই তোমাদের বর্তমান অবস্থা— এ অবস্থা দূর করিতে হইলে একমাত্র উপায় নিজের পায়ে দাঁড়াইয়া আত্মনির্ভরশীল হও, ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা বর্জন করো, তাহাদের মাল খরিদ করিয়ো না, প্রয়োজন হইলে খাজনা বন্ধ করো, ধর্মঘট করো। এ-সব শান্তভাবে করিতে হইবে। অসহযোগ অনেক উপায়ে হয়। বিলাতী পণ্য বর্জন একরকম অসহযোগ, খাজনা বন্ধ একরকম অসহযোগ, আইন অমান্য একরকম অসহযোগ, ধর্মঘট একরকম অসহযোগ। অসহযোগ সর্বশ্রেষ্ঠ পথ। ইহাকে সফল করার একমাত্র উপায় propaganda। আপনারা জানেন নূতনভাবে propaganda করিবার চেষ্টা হইয়াছে— শ্রীযুত জ্ঞানাঞ্জন নিয়োগী তাহা করিতেছেন। গ্রামে গ্রামে গিয়া কংগ্রেসের উদ্দেশ্য ও প্রস্তাব সম্বন্ধে যদি ব্যাপকভাবে propaganda করিতে পারেন এবং দেশবাসীর মন যদি আকর্ষণ করিতে পারেন তাহা হইলে অদূর ভবিষ্যতে স্বাধীনতা-সূর্য ভারত গগনে উদিত হইবে। গ্রামে গিয়া কী বলিবেন— দেশের অবস্থা আগে কী ছিল, এখন কী হইয়াছে, ভবিষ্যতে কী হইতে পারে তাহার উজ্জ্বল চিত্র গ্রামবাসীদিগকে দেখাইবেন। বঙ্কিমচন্দ্র মায়ের তিন রূপ দেখাইয়াছিলেন— মা কী ছিলেন, মা কী হইয়াছেন, মা কী হইতে পারেন— আমাদিগকেও এই তিন চিত্র দেখাইতে হইবে। তিনটি অবস্থা পাশাপাশি ধরিলে মানুষের মনে শক্তির উদ্দীপনা আসিবে। তাহারা বুঝিবে— অতীত যাহার এত উজ্জ্বল ছিল, তাহার ভবিষ্যৎ কত উজ্জ্বল হইতে পারে। কেহ কেহ বলেন— অতীত অন্ধকারময়, তাহার কিছুই নাই। তা নয়। অতীতে উত্থান আছে, পতন আছে। অতীতকে যখন স্মরণ করিব, অতীতের

গৌরবময় যুগ— উত্থানের যুগকে যখন স্মরণ করিব— তখন আমাদের আত্ম-বিশ্বাস ফিরিয়া আসিবে। এ জাতি আত্মবিস্মৃত হইয়াছে। সেইজন্য অতীতের গৌরবময় যুগকে স্মরণ করাইয়া দিতে হইবে। তারপর পতন হইয়াছে, কেন হইয়াছে, দুর্বলতা কোথায়, কোথায় রন্ধ্রে শনি প্রবেশ করিয়াছিল তাহা অংগুলি নির্দেশ করিয়া দেখাইয়া দিতে হইবে। এইভাবে শিক্ষা দিলে অতীতের দুর্বলতা সমাজদেহ হইতে দূরীভূত হইয়া যাইবে। বর্তমান, অতীত ও ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অবস্থা যখন বুঝাইয়া দিতে পারিব তখন তাহারা জিজ্ঞাসা করিবে— কর্মপন্থা। তখন বলিতে হইবে— বিদেশী বস্ত্র, বিলাতী বস্ত্র বর্জন করো— এটা ভারতব্যাপী। বাংলা দেশ আর-একটা কাজ এইসংগে গ্রহণ করিয়াছে তাহা পাট সম্বন্ধে। এ-বিষয়ে অনেক কিছু করিবার আছে, এখন এইটুকু মাত্র বলিব— পাটের চাহিদা যদি কম হয়, দাম পড়িয়া যাইবে ও চাষীরা ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। তাহা হইলে সমস্ত দেশ দরিদ্র হইয়া পড়িবে। চাষী যখন ভালো quality-র পাট উৎপন্ন করে তখন জোর করিয়া উহাকে নিকৃষ্ট quality বলা হয় এবং দাম কম দেওয়া হয়— এই ব্যাপারে তাহার কোনো হাত নাই। ক্রয়-বিক্রয় ব্যাপারে সাধারণত দাম ঠিক করে কে? যে বিক্রি করে সেই ঠিক করে। কিন্তু পাট সম্বন্ধে সে নিয়ম নয়— এখানে দাম ঠিক করে খরিদ্দার, এইরকম অসম্ভব ব্যাপার কেহ কখনো শুনে নাই। ইহার প্রতিকার করিতে হইবে। তুলা ও পাট নিয়া কুটিরশিল্প হইতে পারে, চরকা ও তাঁতের সাহায্যে হেসিয়ান তৈরি হইতে পারে কি না ও অল্প মূল্যে বিক্রি হইতে পারে কি না experiment করিয়া দেখিতে হইবে। যেখানে পাট বিক্রি করিয়া ৫ কোটি টাকা পাওয়া যায়, পাট যাহারা কেনে— মিলের কর্তৃপক্ষ তার মধ্যে ৩ কোটি টাকা পায়. যে উৎপন্ন করে সে তার সামান্য অংশই পায়। পাট উৎপন্ন করিয়া নিজেরা থলে ইত্যাদি প্রস্তুত করিয়া যদি বিক্রি করিতে পারি তাহা হইলে লাভ হয়। ইহার সমাধান যদি করিতে পারি তবে বাংলার চেহারা একদিনে বদলাইয়া যাইবে— বাংলার প্রধান সমস্যা পাট— সে সমস্যার সমাধান না হইলে বাঙালী প্রজার অর্থনৈতিক উন্নতি সহজ-সাধ্য হইবে না।

তারপর ভলাণ্টিয়ার অর্গেনিজেশন। আপনারা জানেন গত কয়েক মাস যাবৎ বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলায় নূতনভাবে ভলাণ্টিয়ার অর্গেনিজেশনের চেষ্টা চলিয়াছে— এ সম্বন্ধে অনেকের সহানুভূতি নাই। অনেকে মনে করেন — এটা বিজাতীয় ভাব, অনাবশ্যক ও ব্যয়সাপেক্ষ। আমার বিশ্বাস এই—

যদি আমরা জেলায় জেলায় ভলাণ্টিয়ার অর্গেনিজেশন করিতে পারি তাহা হইলে তরুণ সমাজকে এমনভাবে শিক্ষিত ও সংঘবদ্ধ করিতে পারিব যে তাহারা অসাধ্য সাধন করিতে পারিবে। Discipline ছাড়া কোনো কাজ হয় না। ১০০ জন লোক নিয়া শৃংখলাবদ্ধ ভাবে যদি কোনো কাজ করিতে হয় তাহা হইলে একজনের আদেশ মানিতে হইবে— সেই শিক্ষা দিতে হইবে। সেজন্য ভলাণ্টিয়ার অর্গেনিজেশন চাই— শুধু যুবকদের মধ্যে নয়, মেয়েদের মধ্যেও চাই। স্বেচ্ছাসেবিকারূপে তাহাদিগকে গড়িয়া তুলিতে হইবে। সংগে সংগে তাহারা যাহাতে আত্মরক্ষা করিতে পারে সেজন্য লাঠিখেলা, ছোরাখেলা ইত্যাদি শিক্ষা দিতে হইবে। ব্যায়াম চর্চা ও ভলাণ্টিয়ার অর্গেনিজেশন, সরকার বাহাদুর ইতিপূর্বে পছন্দ করেন নাই, বরং দমন করিয়াছেন— ভবিষ্যতে কী করিবেন জানি না। আমরা যাহা কর্তব্য বলিয়া মনে করিব সমস্ত বিপদ মাথায় নিয়া তাহা করিবই করিব। বাংলার সমস্ত জেলায় যদি ভলাণ্টিয়ার অর্গেনিজেশন করিতে পারি তবে মনে করিব আমার দ্বারা বড়ো কাজ হইয়াছে। এই অর্গেনিজেশনের মধ্যে মেয়েদিগকেও আনিতে হইবে। সংগে সংগে ব্যায়াম শিক্ষা দিয়া যদি শক্তি সৃষ্টি করিতে পারা যায় তবে তাহার সামনে কোনো বাধা টিকিবে না।

এখন কাজের সময়। এক বৎসর কাজ করিয়া যাইব। গভর্নমেণ্টকে সুযোগ দিব। তাহারা যদি কংগ্রেসের প্রস্তাব অনুসারে আমাদের জাতীয় দাবি পূরণ না করেন তবে পর বৎসর আমরা কি করিব— মহাত্মা গান্ধী ইতিপূর্বেই তাহার আভাস দিয়াছেন। যতদূর বুঝিতে পারি আমাদের দাবি পূরণ করিবার ইচ্ছা এখনো গভর্নমেণ্ট প্রকাশ করেন নাই। এই বৎসর আমাদের উদ্যোগ পর্ব — দেশকে তৈরি করিতে হইবে। যদি আমাদের জাতীয় দাবি তাহারা স্বীকার না করেন তাহা হইলে লাহোর কংগ্রেসে যে প্রস্তাব পাস হইবে সেই অনুসারে আগামী বৎসরের কাজ করিতে হইবে। আমার বিশ্বাস লাহোর-কংগ্রেসে পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব পাস হইবে। যদি তাহা হয় তাহা হইলে সেখানেই ক্ষান্ত থাকিলে চলিবে না। সংঘবদ্ধ হইয়া গভর্নমেণ্টকে দেখাইয়া দিতে হইবে— আমাদের জাতীয় দাবি যতদিন পর্যন্ত না পূরণ হইতেছে ততদিন পর্যন্ত— যে উপায়েই হউক, অহিংসভাবে আমাদিগকে সংগ্রাম চালাইতে হইবে। এখন হইতে তাহার আয়োজন করিতে হইবে। তরুণ সমাজ, ছাত্র সমাজ, নারী সমাজ এবং তথাকথিত অনুন্নত শ্রেণীর মধ্যে নূতনভাবে আন্দোলন চালাইতে হইবে।

আমার মনে হয় আমাদের দেশে কর্মের সব উপাদান আছে। কী নাই? যত রকম সৌন্দর্য ভিন্ন দেশে থাকিতে পারে, হিমালয় হইতে কুমারিকা অন্তরীপ পর্যন্ত এই একটা দেশে তাহার সব আছে, যত রকম জাতি, যত রকম গুণ বিভিন্ন দেশে থাকিতে পারে এদেশে তাহার সব পাই। শ্রমিক বলুন, কুস্তিগির বলুন, দার্শনিক বলুন, সাহিত্যিক বলুন, শিল্পী বলুন, ব্যবসাদার বলুন কী নাই এদেশে? আমাদের বর্তমান পরাধীনতা সত্ত্বেও আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা যেখানে হইয়াছে— সেখানে আমরা প্রমাণ করিয়াছি নিকৃষ্ট আমরা নই। কাব্য, সাহিত্য, শিল্প, ব্যবসায়-বাণিজ্য, খেলাধুলা, ব্যায়াম-কৌশল, যুদ্ধ-কৌশল— যে-কোনো বিষয়ে আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা হইয়াছে, বার বার প্রতিপন্ন করিয়াছি নিকৃষ্ট আমরা নই— বরং অন্যান্য জাতি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। উপাদানের দিক দিয়া আমাদের কোনো অভাব নাই। অভাব একটা জিনিসের। এই সমস্ত উপাদানকে একত্র করিয়া প্রাণ প্রতিষ্ঠা করার অভাব। এমন লোক চাই যিনি উপাদান একত্র করিয়া নূতন সৃষ্টি করিতে পারিবেন। কে তাহা করিতে পারে? যে নিজের অন্তরে মুক্তির ডাক শুনিয়া পাগল হইয়াছে সে অপরের মধ্যে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা জাগরিত করিতে পারে। ব্যক্তিকে ও জাতিকে জাগাইবার একমাত্র উপায়— তাহার ভিতর মুক্তির আকাঙ্ক্ষা তীব্রতর করিয়া তোলা। মানুষ যদি বারবার তাহার বর্তমান দুর্দশা ও লাঞ্ছনা সম্বন্ধে সজাগ হয় ও বর্তমান পরাধীনতায় প্রাণের ভিতর বেদনা অনুভব করে তাহা হইলে তাহার অন্তর জাগিয়া উঠিবে। যে পর্যন্ত জাতি অত্যাচারের বেদনা অন্তরে অনুভব না করে সে পর্যন্ত সে জাগিতে পারে না। আমাদেরই জাতীয় জীবনে অনেক লাঞ্ছনা আসিয়াছে। পরাধীন জাতিকে জাগাইবে কে? লাঞ্ছনার কষাঘাত। লাঞ্ছনার কশাঘাতে মুক্ত হওয়ার আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠিবে। আমরা যদি পাগল হই অপরকে পাগল করিতে পারিব। এখন দরকার তেমন নেতার, তেমন কর্মীর যিনি এই সমস্ত উপাদানকে একত্র ও তাহার মধ্যে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিয়া নূতন জাতি সৃষ্টি করিতে পারিবেন। এ কাজে যদি সাফল্য লাভ করিতে হয় নিজেকে জাগাইতে হইবে, পাগল করিতে হইবে। স্বাধীনতা-লাভের জন্য আত্মভোলা হইতে হইবে, দেশমাতৃকার চরণে নিজেকে বলি দিতে হইবে, যে অসীম শক্তি আমাদের অন্তরে লুক্কায়িত আছে তাহাকে জাগ্রত করিতে হইবে। তাহা যদি পারি, ক্ষুদ্র হইলেও, নগণ্য হইলেও আমরা অসাধ্য সাধন করিতে পারিব। তরুণ সমাজ যদি পাগল হয়— অল্প সময়ের মধ্যে সমস্ত

জাতিকে তাহারা জাগাইতে পারিবে। তরুণের মধ্যে, বালিকার মধ্যে, যুবতীর মধে, জ্ঞানবৃদ্ধের মধ্যে— বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা জাগাইতে হইবে। একবার যদি তাহারা জাগে— অভাব কিছুতেই হইবে না। একটা জিনিসের অভাব— তাহা হইল Will to be free। সব কর্মপদ্ধতির উদ্দেশ্য Will to be free। তাহা যদি হয় তাহা হইলে দেখিব যেন মুক্ত হওয়া আমাদের পক্ষে সহজ। মুষ্টিমেয় লোক আসিয়া আমাদের উপর শাসন করিতেছে! যে উপায় অবলম্বনে অন্য দেশের লোক জাগিয়াছে সেই উপায়ে আমাদিগকে জাগিতে হইবে। এই বৎসর যদি প্রাণপণ পরিশ্রম করিতে পারি— তাহা হইলে লাহোর-কংগ্রেসে গিয়া বলিতে পারিব— বাংলাদেশ প্রস্তুত, লাহোরের কর্ম-পদ্ধতি আমরা বাংলাদেশে সফল করিব ; যত বাধা আসুক সমস্তকে অতিক্রম করিয়া জীবনে জয়যুক্ত হইব। আশা করি এই কর্মে অন্তরের সঙ্গে যোগদান করিয়া জাতীয় আন্দোলনকে পুরোভাগে রাখিয়া ময়মনসিংহ জেলা এখন হইতে তাহার উদ্যোগ আয়োজন করিবে— এবং জাতীয় সংগ্রামকে জয়যুক্ত করিবে।

শ্রীহট্ট জেলা ছাত্র-সম্মিলনী

২৫ এপ্রিল ১৯২৯ শ্রীহট্টে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে সভাপতির অভিভাষণ।

মাননীয় অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি মহাশয় ও সমবেত ভ্রাতৃমণ্ডলী—
আপনারা আমাকে ছাত্র-সম্মিলনীর সভাপতির পদ প্রদান করিয়াছেন। কেন করিয়াছেন— কোন্ গুণ আমার আছে যাহার বলে আমি এই পদ দাবি করিতে পারি— তাহা আমি তো জানি না। জানেন আপনারাই। আমার ছাত্রজীবন কিভাবে কাটিয়াছে, তাহা হয়তো আপনাদের মধ্যে কেহ কেহ অবগত আছেন। জানিয়াও যদি আপনারা আমাকে ছাত্র-সম্মিলনীর সভাপতি করিয়া থাকেন তাহা হইলে আমি কী কথা বলিব তাহা আপনারা অনুমান করিতে পারেন।

ছাত্রমণ্ডলী যদি আমাকে তাদের মধ্যেই একজন বিবেচনা করিয়া সভাপতি করিয়া থাকেন, তাহা হইলে আমি তাহাদের নিকট বাস্তবিকই কৃতজ্ঞ। আমি তাহাদের শ্রদ্ধা চাই না কারণ শ্রদ্ধার যোগ্য আমি নই ; আমি চাই তাদের ভালোবাসা, আমি চাই তাদের আপন হইতে। আমাকে আপন বোধ করিয়া তাহারা সভাপতি করিয়া থাকিলে আমার এখানে আসা সার্থক হইয়াছে।

আমি ছাত্রদের ভালোবাসি। এ কথা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না যে তাহাদের মনোভাব, তাহাদের সুখদুঃখ, তাহাদের আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা আমি বুঝি। ছাত্রজীবনে কী লাঞ্ছনা ও অত্যাচার সহিতে হয় তাহার অভিজ্ঞতা আমার আছে। তাই লাঞ্ছিত ছাত্রসমাজের মর্মের ব্যথা আমি উপলব্ধি করিতে পারি :

যে সমাজে ছাত্রেরা শ্রদ্ধা ও সম্মান পায় না— যে সমাজে ছাত্রেরা শিশুবৎ, কেবল কৃপার ও উপদেশের পাত্র— সে সমাজে মানুষ সৃষ্টি করা সহজ নয়। আমরা মুখে বলি— "প্রাপ্তে তু ষোড়শ বর্ষে পুত্রং মিত্রবদাচরেৎ"— কিন্তু ব্যবহারে বয়স্ক পুত্রকে শিশু জ্ঞান করিয়া থাকি, যদিও সে পুত্র সাবালক হইয়া বি.এ., এম.এ. পাস করিয়াছে। চল্লিশ বৎসর প্রাপ্ত হইয়াও পুত্র খোকার ন্যায় ব্যবহার পায়— এরূপ ঘটনা বিরল নয়। আর দুঃখের বিষয় এই, আমরা এরূপ ব্যাপারে লজ্জা বোধ না করিয়া গৌরব অনুভব করিয়া থাকি। প্রৌঢ়াবস্থা প্রাপ্ত হইয়া যাহাদের নাবালকত্ব ঘুচে না তাহাদের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণের জন্য সাইমন কমিশন এদেশে আসিলে কি বিস্মিত হইবার হেতু আছে ?

হিন্দুজাতি গর্ব করিয়া থাকে যে তাহারা মাতৃমূর্তির ভিতর দিয়া

ভগবানের আরাধনা করিয়া থাকে এবং তাহারা বালক-গোপাল রূপের মধ্যে ভগবান পাইয়াছে। কিন্তু আমি হিন্দু জাতিকে জিজ্ঞাসা করি, একবার বুকে হাত দিয়া বলুন— "আমাদের সমাজে বর্তমান সময়ে ঘরে এবং বাহিরে আমরা মাতৃজাতির সম্মান রক্ষা করিতে পারিতেছি কিনা— এবং আমাদের সমাজে বালক ও যুবকেরা মনুষ্যোচিত ব্যবহার ও শিক্ষা পায় কিনা ?"

মাতৃজাতির সম্মান যদি আমরা রক্ষা করিতে পারিতাম তাহা হইলে বাংলার জেলায় জেলায় দিনের পর দিন নারীসমাজের উপর শত লাঞ্ছনা ও অত্যাচার ঘটিত না এবং ঘটিলেও আমাদের পুরুষ সমাজ অম্লান বদনে ও নিশ্চিন্তমনে তাহা সহ্য করিত না। আজ যদি বাংলাদেশে পুরুষ থাকিত তাহা হইলে মাতৃজাতির অসম্মান দেখিয়া তাহারা ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া এবং বীর-শ্রেষ্ঠ খড়্গবাহাদুর সিংহের মতো প্রাণের মায়া ত্যাগ করিয়া মাতৃজাতির সম্মান-রক্ষার্থে কর্মসমুদ্রে ঝাঁপ দিত।

হে ছাত্রবৃন্দ, ইংরেজকে তোমরা হয়তো গালাগালি কর, ইংরেজকে তোমরা হয়তো ঘৃণা করিয়া থাক— কিন্তু আমি বলি, ইংরেজ যেরূপ তাহার নারী জাতির সম্মান করিতে জানে, তাহা শিক্ষা করো ইংরেজের নিকট। তোমার দেশে তোমার মা ও ভগিনীর মর্যাদা রক্ষা করা হয় না— আর মুষ্টিমেয় ইংরেজ এই দেশে তেত্রিশ কোটি বিদেশীর মধ্যে ইংরেজ মহিলার সম্মান কি করিয়া রাখে ? তাহার কারণ এই যে, একজন ইংরেজ মহিলার উপর অত্যাচার হইলে সমস্ত ইংরেজজাতি পাগলপ্রায় হয় এবং সে অপমানের প্রতিশোধ লইবার জন্য সমস্ত জাতি বদ্ধপরিকর হয়। ভারতের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের মিস্ এলিসের পাঠান-কর্তৃক অপহরণের ঘটনা হয়তো আপনাদের স্মরণ আছে।

আমরা মুখে বলি, "জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী"। কিন্তু সমস্ত প্রাণ দিয়া কি আমরা জননী ও জন্মভূমিকে ভালোবাসি ? জননীকে ভালোবাসিবার অর্থ শুধু নিজের প্রসূতিকে ভালোবাসা নয়— সমস্ত মাতৃ-জাতিকে ভালোবাসা। বাংলাদেশ— বাংলার জল, বাংলার মাটি, বাংলার আকাশ, বাংলার বাতাস, বাংলার শিক্ষা দীক্ষা ও প্রাণধর্ম— বাংলার নারীজাতির মধ্যে মূর্ত হইয়া উঠিয়াছে। যে ব্যক্তি বাংলার মাতৃজাতিকে শ্রদ্ধা করিতে জানে না— সে বাংলাদেশকে কি করিয়া শ্রদ্ধা করিবে ? যে ব্যক্তি বাংলা দেশকে অন্তরের সঙ্গে শ্রদ্ধা করে না— ভালোবাসে না— সে কি করিয়া মানুষ হইবে ? মহান্ আদর্শকে যে ভালোবাসে না— যে পাত্রে সেই আদর্শ মূর্ত

হইয়া উঠিয়াছে— সে পাত্রকে যে ভালোবাসে না— সে ব্যক্তি কোনোদিন মানুষ হইতে পারিবে না। জীবনে যাহা-কিছু পবিত্র, যাহা-কিছু সুন্দর, যাহা-কিছু কল্যাণকর— সে সবের সমাবেশ আমরা করিয়া থাকি দেশ-মাতৃকার অপরূপ রূপের মধ্যে এবং ত্রিলোকজয়ী ভুবনমনোমোহিনী মাতৃমূর্তিতে। অতএব হে ভ্রাতৃমণ্ডলী, মায়ের আরাধনা করিতে শিখ ; মাতৃজাতিকে ভক্তি করো, শ্রদ্ধা করো ; নিজের দেশে মাতৃজাতির সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য কৃতসংকল্প হও। মনে রাখিয়ো সেই কথা— যাহা বহুযুগ পূর্বে মনু বলিয়াছিলেন—

যত্র নার্যস্তু পূজ্যন্তে, রমন্তে তত্র দেবতাঃ।
যত্রৈতাস্তু ন পূজ্যন্তে সর্ব্বাস্তত্রাফলাঃ ক্রিয়াঃ॥
শোচন্তি যাময়ো যত্র বিনশ্যত্যাশু তৎকুলং।
ন শোচন্তি তু যত্রৈতা বিবর্দ্ধতে তদ্ধি সর্ব্বদা॥

"যেখানে নারী পূজিতা হন সেদেশে দেবতারা লীলা করিয়া থাকেন ; যেখানে নারীর সম্মান নাই, সেদেশে সমস্ত ক্রিয়াকাণ্ড একেবারে বিফল। যে কুলে নারীরা শোক করিয়া থাকেন (বা উৎপীড়িতা হইয়া থাকেন) সে কুল অতিশীঘ্র বিনষ্ট হয় এবং যে কুলে তাহাদের কোনো দুঃখ কষ্ট শোক নাই— সে কুলের শ্রীবৃদ্ধি হইয়া থাকে।" যে যুগে এদেশে নারীজাতির সম্মান অক্ষুণ্ণ ছিল, সে যুগে মৈত্রেয়ী-গার্গীর মতো ঋষিপত্নী জন্মিয়াছিল, সে যুগে, ক্ষণা-লীলাবতীর মতো বিদুষীর আবির্ভাব হইয়াছিল, অহল্যাবাঈ ও ঝান্সীর রানীর মতো বীর রমণীর অভ্যুদয় হইয়াছিল। সোনার বাংলায়ও আমরা একদিন রানী ভবানী ও দেবী চৌধুরানীর মতো রমণী দেখিয়াছিলাম।

আমার ছাত্রবন্ধুরা হয়তো আশ্চর্য হইতেছেন যে, ছাত্রসম্মিলনীতে আমি এ-সব কথার অবতারণা কেন করিতেছি। কিন্তু বড়ো ব্যথা পাইয়া এ কথা আজ আমি বলিতে বাধ্য হইয়াছি। নারীসমাজ যে পর্যন্ত বীরপ্রসূ না হইতেছে সে পর্যন্ত আমরা জাতিহিসাবে মনুষ্যত্ব লাভ করিতে পারিব না। কিন্তু যে পর্যন্ত আমরা ঘরে ও বাহিরে মাতৃজাতিকে সম্মান ও গৌরবের আসনে না বসাইতেছি সে পর্যন্ত এদেশের নারীজাতি বীর-প্রসবিনী হইতে পারেন না। আমাদের মাতৃজাতিকে আমরা যদি শক্তিরূপিণী করিতে চাই তাহা হইলে বাল্য-বিবাহ প্রথা উচ্ছেদ করিতে হইবে ; স্ত্রী জাতিকে আজীবন ব্রহ্মচর্য পালনের অধিকার দিতে হইবে ; উপযুক্ত স্ত্রী-শিক্ষার আয়োজন করিতে হইবে ; অবরোধ-প্রথা দূর করিতে হইবে ; বালিকা ও তরুণীদের ব্যায়াম শিক্ষার এবং লাঠি ও

ছোরাখেলা শিক্ষার আয়োজন করিতে হইবে— এমন-কি, স্বাবলম্বী হইবার মতো অর্থকরী শিক্ষাও দিতে হইবে এবং বিধবাদের পুনর্বিবাহের অনুমতি দিতে হইবে। যদি এসমস্ত নীতি কার্যে পরিণত করিতে হয় তাহা হইলে সে ভার যুবকদেরই গ্রহণ করিতে হইবে। কারণ বহুযুগ-সঞ্চিত কুসংস্কার-বশত যাঁহারা ধর্ম ও লোকাচারকে অভিন্ন জ্ঞান করেন, সেই-সব প্রাচীনপন্থীরা হয়তো এ কাজে বিশেষ বাধা প্রদান করিবেন। অনেক ক্ষেত্রে দেখিতে পাওয়া যায় যে, রাষ্ট্রীয় বিপ্লব করা বরং সহজ কিন্তু সামাজিক বিপ্লব করা তদপেক্ষা কঠিন। কারণ রাষ্ট্রীয় বিপ্লবের সময়ে লড়াই করিতে হয় শত্রুর সঙ্গে, বিদেশীদের সঙ্গে, বাহিরের সঙ্গে ; এবং এই কার্যে পাওয়া যায় জাতি ও মত-নির্বিশেষে সমগ্র দেশবাসীর সহানুভূতি। মধ্যে মধ্যে কারা-যন্ত্রণা ও অন্যান্য অত্যাচার সহিতে হয় বটে কিন্তু সমগ্র দেশবাসীর ভালোবাসা ও সহানুভূতি লাঞ্ছিত সেবককে সঞ্জীবিত ও অনুপ্রাণিত করে। সামাজিক বিপ্লবের চেষ্টা যাহারা করে তাহাদের বিপদ অন্যপ্রকার। তাহাদের লড়াই করিতে হয়— দেশবাসীর সঙ্গে, বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে, আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে। নিজের ঘরে তাহাদিগকে দিবারাত্র লাঞ্ছনা ও গঞ্জনা সহিতে হয় এবং অখণ্ড সমাজের সহানুভূতি তাহারা কোনোদিন পায় না। আত্মীয়স্বজনের সহিত, গুরুজনের সহিত বিবেক-প্রণোদিত হইয়া বিরোধ করিতে অনেক সময়ে মানুষের অবস্থা কুরুক্ষেত্র প্রাঙ্গণে অর্জুনের অবস্থার মতো হইয়া দাঁড়ায়। সুতরাং এরূপ সংগ্রামে অপূর্ব শক্তি, সাহস ও তেজ চাই। হে বন্ধুগণ, সে শক্তির সাধনা তোমরা করো।

আমি গোড়ায় বলিয়াছি যে, আমাদের দেশে এখনো যুবক সমাজ ও ছাত্রসমাজ তাহার যোগ্য আসন পায় নাই। অভ্যাসের দরুন আমরা আমাদের অবস্থা উপলব্ধি করি না ; কিন্তু স্বাধীন দেশে আমরা যখন যাই তখন সেখানকার অবস্থার সহিত নিজেদের অবস্থার তুলনা করিয়া আমাদের চক্ষু উন্মীলিত হয়। স্বাধীন দেশের ছাত্রসমাজ অভিভাবকদের নিকট, বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের নিকট, পুলিসের নিকট, গভর্নমেণ্টের নিকট এবং সমাজের নিকট যে সমাদর— এমন-কি, শ্রদ্ধা পাইয়া থাকে, তাহা আমাদের অনেকের কল্পনার বাহিরে। আর আমাদের ছাত্রেরা নিজেদের ঘরে কৃপার পাত্র ; বিদ্যালয়ে উপদেশের ও শাসনের পাত্র, সমাজে নাবালকের তুল্য ; এবং পুলিশ ও গভর্ন-মেণ্টের নিকট নিত্য অবিশ্বাসের পাত্র। এই অবিশ্বাস, অশ্রদ্ধা ও শাসনের ভিতর মনুষ্যত্বের উদ্বোধন কি করিয়া সম্ভব - স্বাধীন দেশের ছাত্রসমাজ

যে সমাদর ও শ্রদ্ধা পায় তাহার ফলে তাহাদের দায়িত্ববোধ ফুটিয়া উঠে, কর্তব্য-বুদ্ধি জাগরিত হয় এবং তাহাদের অন্তর্নিহিত দেবত্বের স্ফুরণ হয়। আমাদের সমাজের বিরুদ্ধে আমার অভিযোগ এই যে আমাদের ছাত্রেরা যেরূপ ব্যবহার পাইয়া থাকে তাহা মনুষ্যত্ব বিকাশের সহায়ক বা অনুকূল নয়।

তবে আশার কথা এই যে, এখনকার ছাত্রেরা আর নিশ্চেষ্ট নয়। সমাজের অপেক্ষায় বসিয়া না থাকিয়া তাহারা নিজেদের উদ্ধার সাধনে ব্রতী হইয়াছে। তাই আজ সমগ্র বঙ্গদেশব্যাপী ছাত্র-আন্দোলন আমরা দেখিতে পাইতেছি। ছাত্র-সমাজ নিজেদের উদ্ধার সাধন করিয়া নূতন সমাজ সৃষ্টি করিতে বদ্ধ-পরিকর হইয়াছে। আমি আশা করি ও বিশ্বাস করি যে, যে সমাদর ও শ্রদ্ধা স্বাধীন দেশের ছাত্রসমাজ সমস্ত দেশের নিকট পাইয়া থাকে, সে সমাদর ও শ্রদ্ধা এদেশের ছাত্রসমাজ ক্রমশ অর্জন করিবে নিজের শক্তি, সাধনা ও যোগ্যতার বলে। শ্রীযুক্ত খড়্গবাহাদুর সিংহের মতো ছাত্র আজ সমস্ত দেশে সকল শ্রেণীর নিকট শ্রদ্ধা ও ভক্তি অর্জন করিয়াছে নিজের সাহস, ত্যাগ ও শক্তির বলে। ঠিক এমনইভাবে বাংলার ছাত্রসমাজ ক্রমশ আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করিবে।

মানুষের উন্নতির পথে সর্বাপেক্ষা বড়ো অন্তরায় ভ্রান্ত আদর্শ। মানুষ যখন কোনো সৎ বা অসৎ কাজ করে, তখন সে কোনো নীতির দোহাই দিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করিতে চায়। বর্তমান ছাত্রসমাজ কতকগুলি ভ্রান্ত আদর্শ গ্রহণ করিয়া তাহারই সাহায্যে অন্যায় আচরণ করে এবং অন্যায় আচরণের প্রশ্রয় দেয়। উদাহরণস্বরূপ আমি একটি কথার উল্লেখ করিতে পারি যাহা আমরা প্রায়ই শুনিয়া থাকি— "ছাত্রানাং অধ্যয়নং তপঃ"— অধ্যয়নই ছাত্র-জীবনের তপস্যা। এই বচনের দোহাই দিয়া ছাত্রদিগকে দেশসেবার কার্য-করিতে নিরস্ত রাখিবার চেষ্টা অনেকেই করিয়া থাকেন।

অধ্যয়ন কোনোদিন তপস্যা হইতে পারে না। অধ্যয়নের অর্থ কতকগুলি গ্রন্থ পাঠ ও কতকগুলি পরীক্ষা পাস। ইহার দ্বারা মানুষ স্বর্ণপদক লাভ করিতে পারে— হয়তো বড়ো চাকুরি পাইতে পারে— কিন্তু মনুষ্যত্ব অর্জন করিতে পারে না। পুস্তক পাঠ করিয়া আমরা উচ্চভাব বা আদর্শ শিক্ষা করিতে পারি— এ কথা সত্য, কিন্তু সে সব ভাব যে পর্যন্ত আমরা উপলব্ধি ও হৃদয়ঙ্গম করিয়া কার্যে পরিণত না করিতেছি সে পর্যন্ত আমাদের চরিত্র গঠন হইতে পারে না। তপস্যার উদ্দেশ্য সত্যকে উপলব্ধি করা— শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন প্রভৃতি উপায়ে তদ্‌ভাবভাবিত হইয়া সত্যের সহিত মিশিয়া

যাওয়া। সে অবস্থায় মানুষ যখন পৌঁছায় তখন তাহার জীবনের রূপান্তর হয়। সে জীবনের প্রকৃত অর্থ ও উদ্দেশ্য বুঝিতে পারে এবং অন্তর্লব্ধ নূতন শক্তি ও আলোকের দ্বারা সে নূতন পথে নূতনভাবে তাহার জীবন নিয়ন্ত্রিত করে। এরূপ সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিতে হইলে অল্প বয়স হইতেই কাজ আরম্ভ করা আবশ্যক। যখন মানুষের অদম্য শক্তি ও উৎসাহ আছে, অফুরন্ত কল্পনাশক্তি ও ত্যাগস্পৃহা আছে, নিঃস্বার্থভাবে মানুষ যখন ভালোবাসিতে পারে— তখনই সে আদর্শের চরণে আত্মবলিদান করিতে পারে— অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করিয়া ভাবের তরঙ্গে জীবন-তরী ভাসাইয়া দিতে পারে! সুতরাং কৈশোর ও যৌবনই সাধনার প্রকৃষ্ট সময়। টাটকা রাঙা ফুলেই দেবীর আরাধনা হইয়া থাকে; পুরানো বাসি ফুলের দ্বারা সে পূজার কাজ সমাধা হইতে পারে না! তাই বলি, হে আমার তরুণ ভাইসব, তোমাদের হৃদয় যখন পবিত্র, শক্তি যখন অফুরন্ত, উৎসাহ যখন অদম্য এবং ভবিষ্যৎ জীবন যখন আশার রক্তিম রাগে রঞ্জিত— সেই শুভ সময়ে জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শের চরণে আত্মোৎসর্গ করো।

সে আদর্শ কি— যাহার প্রেরণায় মানুষ অমৃতের সন্ধান পায়, বিপুল আনন্দের আস্বাদ পায়, যাহার পুণ্য-পরশে দেশে দেশে যুগে যুগে মহাপুরুষের সৃষ্টি হইয়া থাকে? তোমরা হয়তো মনে কর যে মহাপুরুষেরা বড়ো হইয়াই জন্মায়— তাঁহাদিগকে চেষ্টা করিয়া, পরিশ্রম করিয়া বা সাধনা করিয়া বড়ো হইতে হয় না। কিন্তু এ ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। মহাপুরুষেরা মহত্ত্ব লাভের সম্ভাবনা লইয়াই জন্মগ্রহণ করেন সন্দেহ নাই; কিন্তু সাধনা ব্যতীত তাঁহারা সে মহত্ত্বের বিকাশ সাধন করিতে পারেন না বা সর্বসম্মতিক্রমে মহাপুরুষের আসন গ্রহণ করিতে পারেন না। যত মহাপুরুষ এ পৃথিবীতে আজ পর্যন্ত জন্মগ্রহণ করিয়াছেন তাঁহাদের জীবনী যদি বিশ্লেষণ কর তাহা হইলে তোমরাও একদিন মহাপুরুষের আসনে বসিতে পারিবে। তোমাদের প্রত্যেকের মধ্যে ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নির ন্যায় অসীম শক্তি আছে। সাধনার দ্বারা সে ভস্মরাশি অপনীত হইবে এবং অন্তরের দেবত্ব কোটি সূর্যের উজ্জ্বলতার সহিত প্রকাশিত হইয়া মানবসমাজকে মুগ্ধ করিবে।

যে আদর্শকে আশ্রয় করিয়া বাংলার তরুণ সমাজকে উদ্বুদ্ধ হইতে হইবে তাহার উল্লেখ রবীন্দ্রনাথের নব-বর্ষের গানের মধ্যে পাওয়া যায়। তাই কবির ভাষায় বলি—

"হে ভারত, আজ নবীন বরষে শুন এ কবির গান।
তোমার চরণে নবীন হরষে এনেছি পূজার দান।
এনেছি মোদের দেহের শকতি, এনেছি মোদের মনের ভকতি,
এনেছি মোদের ধর্মের মতি, এনেছি মোদের প্রাণ—
এনেছি মোদের শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য তোমারে করিতে দান।"

দেশমাতৃকার চরণে নিজেকে নিঃশেষে বিলাইয়া দিব— ইহাই একমাত্র সাধনা হওয়া উচিত। এই সাধনার আরম্ভ ছাত্রজীবনেই হওয়া উচিত। দান করিবার মতো সম্পদ অর্জন ও সঞ্চয় করিতে হইবে ছাত্রজীবনেই। শরীরে যাহার বল আছে, মনে যাহার সাহস ও তেজ আছে, শিক্ষাদীক্ষা যে পাইয়াছে, ব্রহ্মচর্য সাধনে যে ব্রতী হইয়াছে— সে ব্যক্তির দিবার মতো সম্বল আছে। যে ভিক্ষুক, যে নিতান্ত দীন হীন, তাহার দানের কোনো অর্থ নাই ; সে নিজেই কৃপার পাত্র। ছাত্রজীবনে শারীরিক বল সঞ্চয় করিতে হইবে ও চরিত্র গঠন করিতে হইবে এবং জ্ঞান আহরণ করিতে হইবে ; এক কথায় শরীর, মন ও হৃদয় এই তিন দিক দিয়া জীবনের বিকাশ সাধন করিয়া মনুষ্যত্ব অর্জন করিতে হইবে।

দেশ সেবার জন্য প্রাণের সম্পদ ও যোগ্যতা অর্জন করা যদি ছাত্রজীবনের উদ্দেশ্য হয় তাহা হইলে পরীক্ষা পাস ও স্বর্ণপদক লাভের মূল্য যে কতটা তাহা আপনারা সহজে অনুমান করিতে পারেন। আজকাল স্কুলে ও কলেজে "ভালো ছেলে" নামে একশ্রেণীর জীব পাওয়া যায় ; আমি তাহাদিগকে কৃপার চক্ষে দেখিয়া থাকি। তাহারা গ্রন্থকীট— পুঁথির বাহিরে তাহাদের অস্তিত্ব নাই এবং পরীক্ষার প্রাঙ্গণে তাহাদের জীবন পর্যবসিত হয়। ইহাদের সহিত তুলনা করুন—"বকাটে" রবার্ট ক্লাইভকে। এই "বাপে তাড়ানো মায়ে খেদানো" ছেলে সাত-সমুদ্র-তেরো-নদী পার হইয়া অজানার সন্ধানে ভ্রমণ করিতে করিতে ইংরেজ জাতির জন্য সাম্রাজ্য জয় করে।

ইংলণ্ডের ভালো ছেলেরা যাহা করিতে পারে নাই, করিতে পারিত না, তাহা সম্পন্ন করিল "বকাটে" রবার্ট ক্লাইভ। ইংরেজ জাতি মনুষ্যত্বের মর্যাদা রাখিতে জানে তাই তাহারা সর্বোচ্চ সম্মান ক্লাইভকে কৃতজ্ঞচিত্তে অর্পণ করিল। "বকাটে" রবার্ট শেষ জীবনে হইল লর্ড ক্লাইভ।

ইংরেজ— তথা পৃথিবীর অন্যান্য উন্নত জাতি যত দিক দিয়া যত উন্নতি করিয়াছে ইহার কারণ যদি বিশ্লেষণ করেন তাহা হইলে দেখিবেন যে তাহাদের দুইটি অপূর্ব গুণ আছে যাহার বলে তাহারা সকল জাতির মধে শীর্ষস্থান

অধিকার করিতে পারিয়াছে। প্রথমত, তাহারা আপন দেশকে অন্তরের সঙ্গে ভালোবাসে এবং দ্বিতীয়ত, তাহাদের spirit of adventure আছে। নূতনের আকর্ষণে তাহারা গতানুগতিক পন্থা ত্যাগ করিতে পারে; বাহিরের টানে তাহারা ঘর ছাড়িতে পারে; সংসারের আকর্ষণে তাহারা চিরাচরিত রীতি ও প্রথা বর্জন করিতে পারে। এই নির্ভীকতা, গতিশীলতা ও "সুদূরের পিয়াসী" আছে বলিয়াই ইংরেজ আজ এত উন্নত; ইহার অভাবে আমরা আজ এত দীন, হীন ও পঙ্গু।

কিন্তু চিরকাল আমাদের এমন অবস্থা ছিল না। আমরাও একদিন উত্তাল তরঙ্গমালাসংকুল সমুদ্র পার হইয়া দেশদেশান্তরে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছি, জ্ঞানালোক বিকিরণ করিয়াছি এবং শিল্পসামগ্রী ক্রয়-বিক্রয় করিয়াছি। সে ছিল আমাদের সম্প্রসারণের যুগ, আত্মবিকাশের যুগ, উত্থানের যুগ। তারপর আসিল সংকোচনের যুগ, আত্মসুপ্তির যুগ, পতনের যুগ। আজকাল আবার জীবনের স্পন্দন আমরা অনুভব করিতেছি; পতনের পর আবার উত্থান আরম্ভ হইয়াছে; তাই সুপ্তিভঙ্গের ও নবজাগরণের সমস্ত লক্ষণ চারিদিকে ফুটিয়া উঠিয়াছে। জিজ্ঞাসা-প্রবৃত্তি আবার জাগিয়া উঠিয়াছে, বাহির হইতে জ্ঞান ও সম্পদ আহরণের জন্য আমরা উৎসুক হইয়াছি। সঙ্গে সঙ্গে ঘরে সম্পদ যাহা-কিছু আছে তাহা বিশ্বদরবারে নিবেদন করিবার জন্য আমরা পাগল হইয়াছি। তাই কবি লিখিয়াছেন—

"আমি ঢালিব করুণাধারা,
আমি ভাঙিব পাষাণকারা,
আমি জগৎ প্লাবিয়া বেড়াব গাহিয়া
আকুল পাগল-পারা।...
শিখর হইতে শিখরে ছুটিব,
ভূধর হইতে ভূধরে লুটিব,
হেসে খলখল, গেয়ে কলকল
তালে তালে দিব তালি।
তটিনী হইয়া যাইব বহিয়া
নব নব দেশে বারতা লইয়া।
হৃদয়ের কথা কহিয়া কহিয়া
গাহিয়া গাহিয়া গান॥

ব্যক্তিগত যোগ্যতার দিক দিয়া ভারতবাসী আমরা পৃথিবীর অন্য কোনো জাতি অপেক্ষা কোনো বিষয়ে নিকৃষ্ট নহি ; বরং আমরা অনেক বিষয়ে শ্রেষ্ঠ। আমাদের পরাধীনতা ও বর্তমান দুর্দশা সত্ত্বেও আমাদের কবি, আমাদের সাহিত্যিক, আমাদের শিল্পী, আমাদের বৈজ্ঞানিক, আমাদের কর্মী, আমাদের বণিক, আমাদের যোদ্ধা, আমাদের খেলোয়াড়, আমাদের কুস্তিগির পালোয়ান— পৃথিবীর অন্য কোনো জাতি অপেক্ষা হীন নয়। আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় আমরা বার বার আমাদের যোগ্যতা প্রতিপন্ন করিয়াছি। কিন্তু আমাদের দেশের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিরা জাতীয় জীবনের বিভিন্ন দিক দিয়া পৃথিবীর সমক্ষে গৌরব ও সম্মান লাভ করিলেও এ কথা স্বীকার করিতেই হইবে যে আমরা জাতি হিসাবে এখনো অধঃপতিত। জনসাধারণকে আমরা যেদিন শিক্ষার দ্বারা মানুষ করিয়া তুলিতে পারিব সেদিন আমাদের সম্মুখে অন্য কোনো জাতি প্রতিযোগিতায় দাঁড়াইতে পারিবে না। জনসাধারণকে জাগাইতে হইলে সে ভার শিক্ষিত তরুণ সমাজকে গ্রহণ করিতে হইবে। প্রকৃত দেশাত্মবোধ যেদিন আমাদের মধ্যে জাগিবে সেদিন আমরা জনসাধারণের সহিত প্রাণে প্রাণে মিশিতে পারিব। দেশাত্মবোধ লাভ করিতে হইলে হৃদয়ের উদারতা চাই এবং চিন্তার সকল বন্ধন ও গন্ডী অতিক্রম করা চাই। স্বাধীন চিন্তার শক্তি ও হৃদয়ের অপরিসীম উদারতা যাহাতে তরুণ সমাজ লাভ করিতে পারে তার জন্য ছাত্রজীবন হইতেই সাধনা করা চাই।

মনুষ্যত্বলাভের একমাত্র উপায় মনুষ্যত্ববিকাশের সকল অন্তরায় চূর্ণবিচূর্ণ করা। যেখানে যখন অত্যাচার, অবিচার বা অনাচার দেখিবে সেখানেই নির্ভীক হৃদয়ে শির উন্নত করিয়া প্রতিবাদ করিবে এবং নিবারণের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিবে। বর্তমান যুগে আত্মরক্ষার জন্য এবং জাতির উদ্ধারের জন্য যে শক্তি আমরা চাই তাহা বনে জঙ্গলে বা নিভৃত কন্দরে তপস্যা করিলে পাইব না— পাইব নিষ্কাম কর্মযোগের দ্বারা— পাইব অবিরাম সংগ্রামের ভিতর দিয়া। অত্যাচার দেখিয়াও যে ব্যক্তি তাহা নিবারণ করিবার চেষ্টা করে না সে নিজের মনুষ্যত্বের অপমান করে এবং অত্যাচারিত ব্যক্তির মনুষ্যত্বের অপমান করে। যে ব্যক্তি অত্যাচার নিবারণের প্রচেষ্টায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়, অথবা লাঞ্ছিত হয়— সে সেই ত্যাগ ও লাঞ্ছনার ভিতর দিয়া মনুষ্যত্বের গৌরবময় আসনে প্রতিষ্ঠিত হয়। তাই আজ তোমাদের মতোই একজন ছাত্র খড়্গবাহাদুর সিংহ মাতৃজাতির সম্মান রক্ষার পুরস্কারস্বরূপ বরেণ্য বীররূপে ভারতপূজ্য হইয়াছে। কলিকাতা

বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রতি বৎসরে যে-সব Gold Medalist ছাত্র বাহির হইতেছে সেইরূপ এক হাজার ছাত্র একত্রিত করিলেও একজন খড়্গবাহাদুর তৈয়ারি হইবে না।

স্কুলে, কলেজে, ঘরে বাহিরে, পথে ঘাটে, মাঠে যেখানে অত্যাচার, অবিচার বা অনাচার দেখিবে সেখানে বীরের মতো গিয়া বাধা দাও। মুহূর্তের মধ্যে বীরত্বের আসনে প্রতিষ্ঠিত হইবে— চিরকালের জন্য জীবনের স্রোতে সত্যের দিকে ফিরিয়া যাইবে— সমস্ত জীবনটাই রূপান্তরিত হইবে। আমি আমার ক্ষুদ্রজীবনে শক্তি কিছু যদি সংগ্রহ করিয়া থাকি তাহা শুধু এই উপায়েই করিয়াছি।

আর-একটি কথা বলিয়া আমার আজিকার বক্তব্য আমি শেষ করিব। ছাত্র-সমাজকে সংঘবদ্ধ করিতে হইবে। তাহারা যে ভবিষ্যতের উত্তরাধিকারী, দেশের উদ্ধার যে তাহাদেরই করিতে হইবে এবং উদ্ধার করিবার শক্তি ও সামর্থ্য যে তাহাদের আছে— এ কথা ভালো করিয়া বুঝাইয়া দিতে হইবে। ছাত্রসমাজকে আত্মবিশ্বাস ফিরিয়া পাইতে হইবে। নিজের উপর বিশ্বাস এবং জাতির উপর বিশ্বাস না পাইলে মানুষ কোনো বড়ো কাজ করিতে পারে না। বাংলার তরুণ সমাজের উপর— ছাত্রসমাজের উপর আমার বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা অপরিসীম। আমি তাদের অন্তরের সঙ্গে ভালোবাসি— তাই তারাও আমাকে ভালোবাসে। ছাত্রবন্ধুগণ— তোমাদের মধ্যে কী অসীম শক্তি নিহিত আছে তাহার সংবাদ তোমরা না রাখিলেও আমি রাখি। তোমাদের আত্মবিস্মৃতি যেদিন ঘুচিবে, তোমরা আত্মবিশ্বাস যেদিন ফিরিয়া পাইবে, সাধনার দ্বারা তোমরা যেদিন মরণজয়ী হইবে সেদিন তোমরা অসাধ্য সাধন করিতে পারিবে।

আমি ইচ্ছা করিয়াই এই অভিভাষণের মধ্যে বিদেশের ছাত্র-আন্দোলন সম্বন্ধে কিছু বলিলাম না। নানা পুস্তকে ও পত্রিকায় সে-সব সংবাদ পাইবে; আমি এখানে শিক্ষকের কাজ করিতে আসি নাই। আমি আসিয়াছি আমার হৃদয়ের অনুভূতি ও জীবনের অভিজ্ঞতা তোমাদের সম্মুখে নিবেদন করিতে। নিজেদের মধ্যে esprit d' crops বা সংঘবদ্ধতার অনুশীলন করিতে হইবে — ছাত্র সমাজোপযোগী গান বাঁধিতে হইবে, পত্রিকা প্রণয়ন করিতে হইবে, পতাকা সৃষ্টি করিতে হইবে এবং সাহিত্য তৈরি করিতে হইবে। ছাত্রদের মধ্যে স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী নব্য প্রণালীতে গঠন করিতে হইবে— যেমন কলিকাতা-কংগ্রেসের সময় করা হইয়াছিল। এই volunteer organisation-এর সাহায্যে

ছাত্রেরা নির্ভীক ও শ্রমসহিষ্ণু হইবে এবং শিক্ষা করিবে শৃঙ্খলা ও আজ্ঞানুবর্তিতা। এই-সব উপায়ে ছাত্রসমাজে প্রীতি ও সহযোগিতার ভিতর দিয়া সংহত শক্তির উদ্ভব হইবে এবং class patriotism-এর সৃষ্টি হইবে। এই class patriotism-এর আবশ্যকতা রহিয়াছে। ভারতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত ছাত্রদের প্রাণ এক সুরে বাঁধিতে হইবে। এই সংহত ছাত্রশক্তির সম্মুখে কোনো বাধাবিঘ্ন দাঁড়াইতে পারিবে না। জাগ্রত ছাত্রশক্তি সকল বন্ধন হইতে স্বজাতিকে মুক্ত করিয়া স্বাধীন ভারত সৃষ্টি করিবে এবং বিশ্বের দরবারে ভারতবাসীর জন্য গৌরবময় আসন লাভ করিবে।

ভ্রাতৃবৃন্দ! আমার বক্তব্য শেষ হইয়াছে। আমি ছাত্র ছিলাম, এখনো ছাত্র আছি। আমি তোমাদেরই একজন। আমার অন্তরের ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা তোমরা গ্রহণ করো। বন্দেমাতরম্।

বাংলার সাধারণ নির্বাচন

ভোটদাতাদের প্রতি প্রচারিত আবেদন।

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভা ভাঙিয়া দেওয়া হইয়াছে; এখন সাধারণ নির্বাচন আসন্ন। ব্যবস্থাপক সভা ভাঙিয়া যাওয়ায় গভর্নমেণ্টের পরাজয় প্রমাণিত হইয়াছে, কংগ্রেসের পক্ষে উহা হইয়াছে জয়ের নিদর্শন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের প্রদর্শিত পন্থানুসারে কংগ্রেসের লক্ষ্য হইয়াছে দ্বৈত-শাসনের ধ্বংস সাধন।

ব্যবস্থাপক সভার ভিতরে এবং বাহিরে ক্রমাগত বাধা দানের ফলে দ্বৈত-শাসন ধ্বংস করিয়া দিবার জন্য কংগ্রেস কমিটি এই সাধারণ নির্বাচনের প্রাক্কালে পুনরায় দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছেন। এই কমিটি ঘোষণা করিতেছেন যে, জাতীয় আত্মপ্রতিষ্ঠায় ভারতবাসীর অধিকার আছে। আমলাতন্ত্রের সুবিধার জন্য পরদেশী গভর্নমেণ্ট আসিয়া জোর করিয়া ভারতবাসীর উপর একটা খেয়ালে-গড়া রাষ্ট্র চাপাইয়া দিবে, ইহা কংগ্রেস কমিটি কখনোই মানিয়া লইবেন না। কংগ্রেসের চোখে তাই সাইমন কমিশন নিয়োগ ভারতবাসীকে অপমান ছাড়া কিছুই নয়।

দেশের শ্রমিক আন্দোলন ও স্বাধীনতা আন্দোলনকে গলা টিপিয়া মারিবার উদ্দেশ্যে গবর্নমেণ্ট নৃশংস দলন-নীতি চালাইয়াছেন; শান্ত ও সংগত উপায়ে ইহার উপযুক্ত প্রত্যুত্তর দিতেও কংগ্রেস কমিটি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছেন।

শেষত বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি সাম্য, স্বাধীনতা ও ন্যায় নীতির উপর যাহাতে অর্থনৈতিক ও সামাজিক সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহার জন্য পূর্ববৎ জনসাধারণের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নতি সাধনে সর্বদা তৎপর; — কৃষক ও শ্রমিকদের ন্যায়সংগত অধিকার রক্ষা করাও কংগ্রেসের অন্যতম লক্ষ্য।

এই সকলকেই প্রধানত ভিত্তি করিয়া গভর্নমেণ্ট ও তাহার সমর্থনকারীদের বিরুদ্ধে কংগ্রেস সংগ্রাম করিবেন। হঠাৎ ব্যবস্থাপক সভাভঙ্গের দ্বারা জনসাধারণকে শক্তি-পরীক্ষার জন্য আহ্বান করা হইয়াছে। জনসাধারণ এই আহ্বান গ্রহণ করুন এবং কংগ্রেসের পক্ষে ভোট দিয়া উহার যথাযোগ্য উত্তর প্রদান করুন। স্বাধীনতাই কংগ্রেসের আদর্শ।

আমরা কি আশা করিতে পারি না যে, আপনারা সাধারণ নির্বাচন ব্যাপারে

আপনাদের জেলায় কংগ্রেসের আদর্শ জনপ্রিয় করিবার জন্য চেষ্টা করিবেন এবং কংগ্রেস মনোনীত প্রার্থীদিগকে সমর্থন করিবেন ? কংগ্রেসের কার্য আপনারা পূর্বে যে সমর্থন করিয়াছেন, তাহার জন্য উপসংহারে আমি আপনাদিগকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। এবারেও আপনারা যে সমর্থন করিবেন, সে-বিষয়ে আমার সন্দেহ নাই।

২ মে ১৯২৯

স্বাধীন হওয়াই প্রথম ও প্রধান কর্তব্য

১৩ মে ১৯২৯ চট্টগ্রাম জিলা সম্মেলনে প্রদত্ত ভাষণ।

১১ মে ১৯২৯, শনিবার আমি রাজনৈতিক কারণে আসিতে পারি নাই এবং লিখিত অভিভাষণ পাঠ করাও আমার পক্ষে সম্ভব হয় নাই। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি মহিমবাবু তাঁহার অভিভাষণে চট্টগ্রামকে "মগের মুলুক" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, উহাতে কোনো নিন্দা প্রকাশ পায় নাই ; কারণ, বর্মা বৌদ্ধ প্রভাবে অতীব উদার স্বভাব, অস্পৃশ্যতার নাগপাশ দক্ষিণ ভারতের তুলনায় বাংলাকে কম জড়াইতে পারিয়াছে। চট্টগ্রামের নাবিকগণের সংসাহসে আমি আশান্বিত, ভারতের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল ; কারণ এই চট্টগ্রামের নাবিকগণই হইবেন ভবিষ্যৎ ভারতের নৌ-সেনা ; তা ছাড়া বহু মনীষীও এখানে জন্মিয়াছেন— নবীন সেন, যাত্রামোহন, যতীন্দ্রমোহন, ত্রিপুরা এবং মহিম ; ইঁহারা কেবল চট্টগ্রামের নয়, সমগ্র বাংলার গৌরব।

স্বাধীন হওয়াই প্রথম কর্তব্য

অন্যান্য জাতির ন্যায় স্বাধীন হওয়াই আমাদের প্রথম এবং প্রধান কর্তব্য। স্বাধীনতা লাভ হইলেই আমাদের সমস্যা দূরীভূত হইবে, আমাদের শিক্ষার প্রসার হইবে এবং আমরা স্বাস্থ্য ফিরিয়া পাইব। গবর্নমেণ্ট এ-সব বিষয়ে আমাদিগকে সাহায্য করিবে না, এ-সবের জন্য আমাদিগকেই আত্মনির্ভর হইতে হইবে। আমাদের দেশে কেহ কেহ মনে করেন— স্বাধীনতা লাভের পূর্বে আমাদের সমাজকে উন্নত করিতে হইবে। স্বাধীনতা দুই প্রকারের, এক

রাজনৈতিক, দ্বিতীয় সামাজিক। রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভ করিতে হইলেও অর্থনীতির দিক দিয়াই করিতে হইবে এবং তাহা সম্ভব হইবে যদি আমরা বিলাতী বর্জন করি ও স্বদেশী গ্রহণের প্রচারকার্য চালাই ; উহা ছাড়া উপায় নাই, কারণ সশস্ত্র বিদ্রোহ সম্ভব নয়। ব্রিটিশ উক্ত পন্থা অবলম্বন করিয়াই গত মহাযুদ্ধে জয়লাভ করিয়াছিল। প্রচারকার্যে রাশিয়া সিদ্ধহস্ত, তাই তাহাকে ব্রিটিশের এত ভয়। প্রচারকার্য জোর চালাইলে স্বাধীনতা অর্জনে সাফলা অনিবার্য। বয়কট ভালোরকম চালাইয়া ব্রিটিশ বাণিজ্য অচল করিয়া দিলে এক কোটি ইংরেজকে ভাতে মারা যাইবে এবং তাহা হইলেই ভারতবাসীর সঙ্গে আপস করিতে তাহারা বাধ্য হইবে।

নারীর সাহচর্য

দৈনন্দিন জীবনের সকল ব্যাপারে নারীর অংশ না থাকিলে আমাদের মুক্তির আশা বৃথা। অনুন্নতদেরও সকল অভাব-অভিযোগ দূর করিয়া তীরে তুলিয়া না লইলে আমাদের সাফল্য আসিবে না।

বঙ্গভঙ্গ রোধ আমরা করিতে পারিয়াছি। মিণ্টো-মর্লে সংস্কার যদিও আমাদের আশানুরূপ নয়, তথাপি নিরাশ হইবার কিছু নাই। কারণ ১৯২১ সালের আন্দোলন এখনো শেষ হয় নাই ; মহাত্মা গান্ধী বলেন, ১৯২৯-এর আন্দোলন উক্ত আন্দোলন অপেক্ষা অধিকতর শক্তিশালী।

কর্মপদ্ধতির নির্দেশ

প্রধান প্রধান স্থানে আমাদিগকে কংগ্রেস কমিটি প্রতিষ্ঠা ও পুনঃসংগঠন করিতে হইবে, স্বাধীনতার জন্য প্রচারকার্য চালাইতে হইবে, কৃষক-শ্রমিকদের সকল অভিযোগ দূর করিতে হইবে এবং কৃষি-সমিতি গঠন করিতে হইবে। আহার, পরিধেয়, শিক্ষা এবং স্বাস্থ্য— এ-সব বিষয়ে হিন্দু এবং মুসলমানদের স্বার্থ স্বতন্ত্র নয়। এ সমস্ত সমস্যায় সকল দলের স্বার্থ এক।

শ্রমিক আন্দোলনে ব্রিটিশের আতঙ্ক

শ্রমিক আন্দোলনে ব্রিটিশরা ভয় পাইয়াছেন ; কারণ তাঁহারা মনে করেন, এই শ্রমিক-আন্দোলন সফল হইলে তাঁহাদের বাণিজ্য অচল হইবে। আমাদের বাণিজ্যের প্রসার করিতে আমাদের নিজেদের ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে।

আমাদের বাণিজ্যের উন্নতির জন্য ইউরোপীয় ব্যাংক কখনো মূলধন দিবে না। কারণ তাহাতে ইউরোপের স্বার্থহানি হইবে। চট্টগ্রামের অধিবাসীদের দ্বারা স্বদেশী স্টীমার সার্ভিস খোলা একান্ত প্রয়োজন।

বাঙালী আদর্শবাদী

বাঙালীরা আদর্শবাদী, এরূপ বলা হয়। আদর্শবাদ প্রথমে, কাজ আসে পরে। একশত লোকের মধ্যে পাঁচজন যদি খাঁটি আদর্শবাদী হন এবং বাকি সকলে সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের আদর্শ অনুযায়ী কাজ করেন তাহা হইলে স্বাধীনতা সম্ভব।

উমিচাঁদ ও মীরজাফর

বাংলায় স্বার্থান্বেষী বিরুদ্ধবাদী উমিচাঁদ ও মীরজাফর এখনো অনেক আছে। কিন্তু তাই বলিয়া নিরাশ হইলে চলিবে না। সত্যকার দেশাত্মবোধ জাগিলে আর কিছুরই আশঙ্কা করার প্রয়োজন নাই। জাতির ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই।

পূর্ণ স্বাধীনতাই একমাত্র লক্ষ্য

বর্তমানে দেশের সমুদয় প্রধান প্রধান সমস্যা সম্পর্কে প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। তন্মধ্যে একটি প্রস্তাবে পূর্ণ স্বাধীনতাই ভারতের একমাত্র লক্ষ্য বলিয়াই উল্লিখিত হইয়াছে। আমি ব্যাপকভাবে কর্মপদ্ধতির কথা বলিয়াছি। বর্তমানে বয়কট এবং পল্লী সংগঠন আরম্ভ করাই আমি সমীচীন মনে করি। অনেকে বলিয়া থাকেন— আমরা ভারতবাসী, সভ্য দেশের লোকেদের সঙ্গে বিজ্ঞান, সাহিত্য, খেলা ও অন্যান্য ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা করিয়া জয়লাভ করিতে পারি, কিন্তু জন্ম-ভূমির স্বাধীনতা অর্জন করিতে পারি না। এ কেমন? ইহার একমাত্র উত্তর আমাদের গণচেতনা উদ্বুদ্ধ হয় নাই, ব্যক্তিগতভাবে কয়েকজন মাত্র বড়ো হইলেই আমাদের আশান্বিত হইবার কিছু নাই। স্বাধীনতা পাইবার পূর্বে সর্ব-সাধারণকে উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিতে হইবে। তবেই আমাদের আশা পূর্ণ হইবে। সময় অতি অল্প, বৃথা সময় নষ্ট করিলে চলিবে না। কংগ্রেসের নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করিয়া আমাদিগকে আগামী কংগ্রেসের জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে।

আদর্শবাদই যুব-আন্দোলনের প্রাণ

২২ জুন ১৯২৯ যশোহর-খুলনা যুব-সম্মেলনে সভাপতির অভিভাষণ।

আপনাদের অনুরোধে, আপনাদের আদেশে আমি এই সভায় সভাপতিত্ব গ্রহণ করিয়াছি। চিরাচরিত প্রথা অনুসারে একজন সভাপতি না থাকিলে সভার অধিবেশন হয় না। কিন্তু আমি আশা করি আপনারা শুধু প্রথা বজায় রাখিবার জন্য আমাকে সভাপতিপদে মনোনীত করেন নাই।

আমি আজ আপনাদেরই একজন হইয়া এই সভায় আসিয়াছি। জ্ঞানের সম্ভার আমার নাই; বয়সের গুণে মানুষ যে অভিজ্ঞতা, দূরদর্শিতা ও সাবধানতা লাভ করে— তাহাও বোধহয় আমার নাই। সুতরাং উপদেশ দিবার ধৃষ্টতা লইয়া আমি আজ এখানে আসি নাই। তবে আমি বিশ্বাস করি না যে পলিত কেশ না হইলে মানুষ দায়িত্বপূর্ণ কার্যভার গ্রহণ করিতে সমর্থ হয় না। হইতে পারে, আজ ইংলণ্ডের প্রধানমন্ত্রী মি. র‍্যাম্‌জে ম্যাক-ডোনাল্ড্ বাছিয়া বাছিয়া এমন লোককে মন্ত্রী করিতেছেন যাঁহাদের বয়স পঞ্চাশের অধিক। কিন্তু এই ইংলণ্ডের ইতিহাসে দেখিতে পাওয়া যায় যে অতি সংকটাপন্ন অবস্থায় একজন তরুণ যুবক রাজ্যের প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হইয়াছিল। বর্তমান যুগে তুর্কী, ইটালী, চীন প্রভৃতি বহু নবজাগ্রত জাতির মধ্যে যুবকদেরই হস্তে সমাজের ও রাষ্ট্রের কত গুরুভার ন্যস্ত হইয়াছে।

ধ্বংসের অথবা সৃষ্টির যেখানে প্রয়োজন, সেখানে ইচ্ছায় হউক, অনিচ্ছায় হউক, যুবকদের উপর নির্ভর করিতে হইবে, তাহাদিগকে বিশ্বাস করিতে হইবে, তাহাদের হাতে ক্ষমতা ও দায়িত্ব তুলিয়া দিতে হইবে। যেখানে সংরক্ষণেরই বেশি প্রয়োজন— যেখানে নানা কৌশলপূর্ণ সংরক্ষণ-নীতির উদ্ভাবনই প্রধান কাজ— সে ক্ষেত্রে আপনি প্রৌঢ়াবস্থাপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে অথবা গলিতদন্ত পলিত-কেশ বৃদ্ধকে সমাজের ও রাষ্ট্রের পুরোভাগে বসাইতে পারেন। আমাদের দেশ, আমাদের জাতি— ধ্বংস ও সৃষ্টির লীলার মধ্য দিয়া চলিয়াছে। আজ তাই তাহাদেরই ডাক পড়িয়াছে যাহারা সবুজ, যাহারা নবীন, যাহারা কাঁচা, যাহারা আপাতদৃষ্টিতে লক্ষ্মীছাড়া।

আমি জানি আমাদের সমাজে এখনো অনেক লোক আছেন যাঁহাদের মতে youth is a crime, তাঁহাদের মতে বয়সে তরুণ হওয়ার মতো ত্রুটি বা অপরাধ আর কিছুই হইতে পারে না। কিন্তু সে মনোভাবের পরিবর্তন হওয়া দরকার।

তবে যৌবনের অর্থ যে অসংযম বা অকর্মণ্যতা বা অবিমৃষ্যকারিতা নয়— এ কথা প্রতিপন্ন করিতে হইলে শুধু নিজেদের সেবার দ্বারা, ত্যাগের দ্বারা, কর্মের দ্বারা ও যোগ্যতার দ্বারা তাহা করিতে হইবে।

আজ বয়োজ্যেষ্ঠগণ তরুণ সমাজকে অকর্মণ্য বা অপদার্থ জ্ঞান করিতে পারেন কিন্তু যুবকেরা যদি এই সংকল্প করে যে তাহারা স্বীয় চরিত্রগুণে, সেবা ও কর্মক্ষমতার দ্বারা, বয়োজ্যেষ্ঠগণের হৃদয় অধিকার করিবে এবং তাহাদের বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিবে তাহা হইলে কে বাধা প্রদান করিতে পারে?

পৃথিবীব্যাপী যে যুব আন্দোলন বা **Youth movement** এখন চলিতেছে ইহার স্বরূপ কী, উদ্দেশ্য ও কর্মপদ্ধতি কী— সে-বিষয়ে স্পষ্ট ধারণা সকলের নাই। যুবক ও যুবতীরা সংঘবদ্ধ হইয়া যে-কোনো আন্দোলন শুরু করিলে সে আন্দোলন যে "যুব-আন্দোলন" আখ্যার যোগ্য হইবে— এ কথা বলা যায় না। বর্তমান অবস্থা এবং বাস্তবের কঠিন বন্ধনের প্রতি প্রবল অসন্তোষ হইতেই যুব-আন্দোলনের উৎপত্তি। তরুণ প্রাণ কখনো বর্তমানকে, বাস্তবকে চরম সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে পারে না; বিশেষত যেখানে সে বর্তমানের মধ্যে, বাস্তবের মধ্যে অত্যাচার, অবিচার বা অনাচার দেখিতে পায় সেখানে তাহার সমস্ত প্রাণ বিদ্রোহী হইয়া উঠে— সে ঐ অবস্থার একটা আমূল পরিবর্তন করিতে সাহসী হয়। যুব-আন্দোলনের উৎপত্তি প্রবল অসন্তোষ হইতে— ইহার উদ্দেশ্য ব্যক্তিকে, সমাজকে, রাষ্ট্রকে নূতন আদর্শে নূতনভাবে গড়িয়া তোলা। সুতরাং আদর্শবাদই যুব-আন্দোলনের প্রাণ।

যুবকদের বর্তমান যুগে কী করা উচিত সে-বিষয়ে একটা বিস্তৃত তালিকা দিয়া আমি আপনাদের বুদ্ধিবৃত্তির অবমাননা করিতে চাই না। আমি কয়েকটা মূলকথা বলিয়া আমার বক্তব্য শেষ করিব। সমাজ বা রাষ্ট্রের উন্নতি নির্ভর করে— একদিকে, ব্যক্তিত্বের বিকাশের উপর এবং অপর দিকে, সংঘবদ্ধ হওয়ার শক্তির উপর। যদি নূতন স্বাধীন ভারত আমাদিগকে গড়িয়া তুলিতে হয় তাহা হইলে একদিক দিক দিয়া খাঁটি মানুষ সৃষ্টি করিতে হইবে এবং সঙ্গে সঙ্গে এরূপ উপায় অবলম্বন করিতে হইবে যাহার দ্বারা আমরা বিভিন্ন ক্ষেত্রে সংঘবদ্ধভাবে কাজ করিতে শিখি। ব্যক্তিত্বের বিকাশ হইলেই যে সামাজিক বৃত্তির (**social qualities**) বিকাশ হইবে— এ কথা মনে করা উচিত নয়। ব্যক্তিত্ব ফুটাইবার জন্য যেরূপ গভীর সাধনা আবশ্যক, সামাজিক বৃত্তির বিকাশের জন্যও সেরূপ সাধনা প্রয়োজন। ভারতবাসী যে আন্তর্জাতিক

প্রতিযোগিতায় পরাস্ত হইয়া স্বাধীনতা হারাইয়াছিল তাহার প্রধান কারণ আমাদের সামাজিক বৃত্তির অভাব। আমাদের সমাজে কতকগুলি anti-social (বা সমাজগঠন-বিরোধী) বৃত্তি প্রায় প্রবেশ করিয়াছিল, যাহার ফলে আমরা সংঘবদ্ধভাবে কাজ করিবার শক্তি ও অভ্যাস হারাইয়াছিলাম। উদাহরণস্বরূপ আমি বলিতে পারি যে সন্ন্যাসের প্রতি আগ্রহ যেদিন আমাদের মধ্যে দেখা দিল সেদিন সমাজের বা রাষ্ট্রের উন্নতি অপেক্ষা নিজের মোক্ষলাভই আমাদের নিকট অধিক শ্রেয়স্কর বলিয়া পরিগণিত হইতে লাগিল।

আমার নিজের মনে হয় যে স্বার্থপরতা, পরশ্রীকাতরতা ও উচ্ছৃঙ্খলতা প্রভৃতি সমাজগঠন-বিরোধী বৃত্তির (anti-social quality) জন্যই আমরা সংঘবদ্ধভাবে কাজ করিতে পারি না। সংঘবদ্ধভাবে কাজ করিতে না পারার জন্য— কী সামাজিক ক্ষেত্রে, কী ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে, কী রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে — আমরা কোনো দিকে উন্নতি করিতে পারিতেছি না। আমি চাই না যে আমাদের জাতীয় অধঃপতনের কারণ সম্বন্ধে আপনারা আমার অভিমত বিনা বিচারে গ্রহণ করেন। আমি বরং চাই যে আপনারা যেন সমস্ত জাতির ইতিহাস পাশাপাশি রাখিয়া আলোচনা করেন এবং ঐ আলোচনা হইতে আমাদের অধোগতির কারণ অনুসন্ধান করিয়া বাহির করেন। আমাদের চরিত্রের দোষগুলি সর্বদা যদি চোখের সামনে ধরিয়া রাখিতে পারি তাহা হইলে সমস্ত জাতি সে-বিষয়ে সাবধান হইয়া উঠিবে।

বিশ্বজগতের এবং মনুষ্যজীবনের ঘটনাপরম্পরার অন্তরালে যে একটা অদৃশ্য নিয়ম নিহিত আছে— এ কথা আমরা অনেকে জানি না বা মনে রাখি না। পাশ্চাত্য মনীষীরা কিন্তু কোনো ঘটনাকে সহজে 'আকস্মিক" বা "অদৃষ্টসম্ভূত" বা "দুর্দৈব-সংঘটিত" বলিয়া গ্রহণ করিতে চাহেন না। প্রত্যেক জাতির উত্থান ও পতনের অন্তরালে যে একটা অদৃশ্য কারণ বা নিয়ম আছে— এ কথা তাঁহারা প্রতিপন্ন করিয়াছেন। এই বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি লইয়া আপনারা আর-একবার ভারতের ইতিহাস পর্যালোচনা করুন ; anti-social বা সমাজগঠন-বিরোধী ও anti-national বা জাতিগঠন-বিরোধী কী কী বৃত্তি আমাদের মধ্যে প্রবেশ করিয়া আমাদের সর্বনাশ সাধন করিয়াছে তাহা সমস্ত জাতিকে বলিয়া দিন। তারপর জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সংঘবদ্ধ সাধনায় প্রবৃত্ত হউন। তখন দেখিবেন যে আত্মবিস্মৃত জাতির চৈতন্য একবার ফিরিয়া আসিলে — কী ব্যক্তিগত, কী সমষ্টিগত— আমাদের সকল সাধনাই জয়যুক্ত হইবে।

আমি আজিকার এই অভিভাষণে ব্যক্তিগত সাধনার উপর বেশি জোর দিতেছি না। তার কারণ এই যে ভারতবাসী কোনোদিনই ব্যক্তিগত সাধনা ভুলিয়া যায় নাই। ব্যক্তিত্ব-বিকাশের চেষ্টা আমরা কোনোদিনই ত্যাগ করি নাই। অবশ্য পাশ্চাত্য দেশের বা অন্যান্য দেশের ব্যক্তিত্বের আদর্শ এক নয়। কিন্তু আমাদের বর্তমান পরাধীনতা ও সকল প্রকার দুর্দশার মধ্যেও যে আমাদের দেশে কত মহাপুরুষ জন্মাইয়াছেন এবং এখনো জন্মাইতেছেন তাহার একমাত্র কারণ এই যে খাঁটি মানুষ সৃষ্টির প্রচেষ্টা আমাদের জাতি কোনোদিন ভুলে নাই। কিন্তু আমরা ভুলিয়া গিয়াছিলাম Collective Sadhana বা সমষ্টিগত সাধনা; আমরা ভুলিয়া গিয়াছিলাম যে জাতিকে বাদ দিয়া যে সাধনা— সে সাধনার কোনো সার্থকতা নাই। তাই সমাজগঠন-বিরোধী ও জাতিগঠন-বিরোধী বৃত্তি আমাদের মানসক্ষেত্রে জন্মিয়াছে এবং ঐরূপ প্রতিষ্ঠান পরগাছার মতো আমাদের জাতীয় জীবনকে ভারগ্রস্ত ও শক্তিহীন করিয়া তুলিয়াছে। আজ বাংলার তরুণ সমাজকে যুদ্ধের মতো বলিতে হইবে— জাতি-সমাজ-গঠন-বিরোধী বৃত্তিনিচয় আমরা কুসংস্কারজ্ঞানে বিষবৎ পরিত্যাগ করিব এবং জাতি-সমাজ-গঠনের প্রতিকূল সমস্ত প্রতিষ্ঠান আমরা একেবারে নির্মূল করিব।

ব্যক্তিত্ব বিকাশ সম্বন্ধে আমি আজ মাত্র একটি কথা বলিব। "সাধনা" বলিতে অনেকে অনেক রকম বুঝিয়া থাকেন এবং সাধনার বিভিন্ন প্রকার ব্যাখ্যাও শুনিতে পাওয়া যায়। আমার ধারণা এই যে সাধনার উদ্দেশ্য মনুষ্য-জীবনের রূপান্তর করা। রূপান্তর সাধন করিতে হইলে বাহির হইতে চেষ্টা করিলে চলিবে না— মানুষের জীবন নূতন আদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত করিতে হইবে। আদর্শের চরণে নিজেকে আত্মসমর্পণ করিতে হইবে— ঐ আদর্শের অনুসরণে নিজেকে নিঃশেষে বিলাইয়া দিতে হইবে। আদর্শের চরণে আত্ম-বলিদান করিতে পারিলে— মানুষের চিন্তা, কথা ও কার্য— একসুরে বাঁধা হইবে; তাহার ভিতর বাহির এক হইয়া যাইবে; তাহার সমস্ত জীবন এক আদর্শসূত্রে গ্রথিত হইবে; সে তখন তাহার জীবনে নূতন রস, নূতন আনন্দ, নূতন অর্থ খুঁজিয়া পাইবে। সমগ্র বিশ্বজগৎ তাহার নিকট নূতন আলোকে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিবে।

বর্তমানে যুগোপযোগী সাধনায় যদি প্রবৃত্ত হইতে হয় তাহা হইলে দেশাত্মবোধকেই জাতির আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। যাহা এই

আদর্শের অনুকূল তাহা শ্রেয়স্কর বলিয়া গ্রহণীয়; যাহা এই আদর্শের প্রতিকূল তাহা অনিষ্টকর বলিয়া পরিত্যাজ্য।

নূতন আদর্শের উপর যদি জীবন গঠন করিতে হয় তাহা হইলে গতানুগতিক পন্থা পরিত্যাগ করিতে হইবে। পাশ্চাত্য জাতিরা গতানুগতিক পন্থা বর্জন করিয়া সর্বদা নূতনের সন্ধানে ছুটিতে পারে বলিয়া তাহারা এত উন্নতি করিতে পারিয়াছে। কিন্তু আমরা যেন "অজানার" ভয়ে সর্বদা ভীত; বাহির অপেক্ষা আমরা যেন ঘরকেই ভালোবাসি, তাই আমাদের spirit of adventure এত কম। কিন্তু এই spirit of adventure— যাহার এত অভাব আমাদের মধ্যে— সকল জাতির উন্নতির এইটিই একটা কারণ। আমি বাংলার তরুণ সমাজকে তাই বলিতে চাই— বাহিরের জন্য, নূতনের জন্য, "অজানার" জন্য পাগল হইতে শিখিতে হইবে। ঘরের কোণে অথবা দেশের কোণে লুকাইয়া থাকিলে চলিবে না। সমস্ত পৃথিবীটা ঘুরিয়া নিজের চোখে দেখিতে হইবে এবং দেশদেশান্তর হইতে জ্ঞানাহরণ করিয়া আনিতে হইবে।

আমাদের অসীম শক্তি আছে— নাই আমাদের আত্মবিশ্বাস ও শ্রদ্ধা। নিজের উপর, নিজের জাতির উপর বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা ফিরাইয়া আনিতে হইবে। দেশবাসীকে অন্তরের সঙ্গে ভালোবাসিতে হইবে। মানুষ অন্তরের সহিত যাহা আকাঙ্ক্ষা করে তাহা সে একদিন পাইবেই পাইবে।

স্বাধীনতা লাভের জন্য আমরা যদি পাগল হইতে পারি তবেই আমাদের অন্তর্নিহিত অসীম শক্তির স্ফুরণ হইবে; আমরা নিজেরাই অবাক হইব এত শক্তি এত দিন কোথায় লুকাইয়া ছিল। এই নবজাগ্রত শক্তির বলে আমরা স্বাধীনতা অর্জন করিতে পারিব।

জাতিকে যদি মুক্ত করিতে হয় তাহা হইলে সর্বাগ্রে স্বাধীনতার আস্বাদ নিজের অন্তরে পাইতে হইবে। "আমি মুক্ত, স্বাধীন মানুষ"— এই কথা ধ্যান করিতে করিতে মানুষ সত্যসত্যই নির্ভীক হইয়া উঠে। নির্ভীক হইতে পারিলে মানুষ কোনো বন্ধনে আবদ্ধ হয় না; কোনো বাধা-বিঘ্ন তাহার পথরোধ করিতে পারে না।

যশোহর-খুলনার ভ্রাতৃবৃন্দ— এসো আমরা একসঙ্গে বলি— "আমরা মানুষ হব; নির্ভীক, মুক্ত, খাঁটি মানুষ হব। নূতন স্বাধীন ভারত আমরা ত্যাগ, সাধনা ও প্রচেষ্টার বলে গড়ে তুলব। আমাদের ভারতমাতা আবার জগজ্জেশ্বরী হবেন; তাঁর গৌরবে আমরা আবার গৌরবান্বিত হব। কোনো

বাধা আমরা মানব না ; কোনো ভয়ে আমরা ভীত হব না। আমরা নূতনের সন্ধানে, অজানার পশ্চাতে চলব। জাতির উদ্ধারের দায়িত্ব আমরা শ্রদ্ধার সঙ্গে, বিনয়ের সঙ্গে গ্রহণ করব। ঐ ব্রত উদ্‌যাপন করে আমরা আমাদের জীবন ধন্য করব, ভারতবর্ষকে আবার বিশ্বের দরবারে সম্মানের আসন বসাব।" এসো ভাই, আমরা আর ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়া শ্রদ্ধাবনত মস্তকে গললগ্নীকৃতবাসে মাতৃচরণে সমবেত হইয়া করজোড়ে বলি— "পূজার সমস্ত আয়োজন সম্পূর্ণ ; জনগণ জাগৃহি।" বন্দেমাতরম্।

স্বরাজ-সাধনায় সর্বত্যাগী দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন

৩ জুলাই ১৯২৯ অ্যালবার্ট হলে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের চতুর্থ মৃত্যুবার্ষিকী স্মরণসভায় প্রদত্ত ভাষণ।

দেশবন্ধুর সংস্পর্শে আসিবার সৌভাগ্য আমার হইয়াছিল। তারপর গবর্নমেণ্টের কৃপায় তাঁহার সহিত একই কারাগারে অনেকদিন বাসও করিতে হইয়াছিল। তাই তাঁহার সম্বন্ধে কিছু বলিতে বা লিখিতে সঙ্কোচ বোধ হয়, পাছে তাঁহাকে ছোটো করিয়া ফেলি। বাঙালীর চিত্ত এমন করিয়া আর কেহ জয় করিতে পারিয়াছেন কিনা জানি না। কোন্ গুণে ইহা তিনি পারিয়াছিলেন, তাঁহার বিবিধ কার্যাবলীর অন্তরালে এমন কোন্ শক্তি কার্য করিয়াছিল— এ-সমস্ত বিষয় বিশ্লেষণ করিয়া দেখিবার সময় আজ আসিয়াছে। ত্যাগ তিনি হঠাৎ একদিনে করেন নাই। সারা জীবন ধরিয়া ইহার জন্য প্রস্তুত হইতে ছিলেন। দেশবন্ধু খুব ভাবপ্রবণ ছিলেন। নিজেকে বাঙালী বলিয়া পরিচয় দিতে গৌরব অনুভব করিতেন। কিন্তু তাই বলিয়া তাঁর জাতীয়তাবাদ সংকীর্ণ ছিল না। তাঁর জীবনতন্ত্রের সহিত ভারতীয় জাতীয়তার একটা ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল। তাঁর মধ্যে কতকগুলি আপাতত বিরুদ্ধ বৃত্তির অপূর্ব সামঞ্জস্য হইয়াছিল। কর্ম, প্রেম ও জ্ঞানের অপূর্ব সমন্বয় তাঁহার অন্তরে আমরা দেখিয়াছি। স্নেহের বন্ধনে, প্রেমের বন্ধনে স্বরাজ্যদলকে বাঁধিয়াছিলেন। তরুণ বাংলার প্রতি তাঁহার গভীর স্নেহ ও শ্রদ্ধা ছিল। আজিকার যুব-আন্দোলনের উৎসই দেশবন্ধু। দেশবন্ধুর প্রতিভা ছিল সর্বতোমুখী। রাজনীতি ক্ষেত্রে না আসিলেও, সাহিত্য প্রভৃতি ক্ষেত্রেও তাঁহার প্রতিভা পূর্ণভাবে স্ফুরিত হইত। বাংলা সাহিত্যের মধ্যে এক নূতন ধারা তিনি প্রবর্তন করিয়া গিয়াছেন। শিল্প, বিজ্ঞান, ব্যবসা-বাণিজ্য, চিকিৎসা, সংবাদপত্র ইত্যাদি কোনো বিষয়ই তাঁহার দৃষ্টি এড়ায় নাই। তিনি যে একাধারে এত কাজ করিতে পারিয়াছিলেন, তাহার কারণ, তিনি দেশের কাজে নিজেকে বিলাইয়া দিয়াছিলেন। দেশবন্ধু এক অসাধারণ ব্যক্তিত্বশালী পুরুষ ছিলেন। তাঁহার ব্যক্তিত্বের শক্তি ছিল অফুরন্ত। সমস্ত আন্দোলনের ভিতর দিয়াই তাঁহার এই ব্যক্তিত্ব ফুটিয়া উঠিত। পরাধীনতার তীব্র জ্বালাই ছিল দেশবন্ধুর শক্তির উৎস। তিনি স্থির থাকিতে পারিতেন না— স্বাধীনতার জন্য তিনি পাগল হইয়াছিলেন। আজ প্রত্যেককেই অন্তরে অন্তরে পরাধীনতার তীব্র জ্বালা

অনুভব করিতে হইবে তবেই অফুরন্ত শক্তি আসবে। শক্তি আসিবে কর্মের ভিতর দিয়া, সংগ্রামের ভিতর দিয়া। বনে জঙ্গলে যাইয়া এই শক্তি মিলিবে না।

বৈদ্যশাস্ত্রপীঠে উৎসব

৩ জুলাই ১৯২৯ বৈদ্যশাস্ত্রপীঠে দেশবন্ধুর তৈলচিত্রের আবরণ উন্মোচন উপলক্ষে ভাষণ।

আমি দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে, বৈদ্যশাস্ত্রপীঠ সম্পর্কে আমরা আমাদের কর্তব্য উপযুক্তভাবে সম্পাদন করিতে পারি নাই। অসহযোগের শুরুতে দেশবন্ধু এই প্রতিষ্ঠানকে একবার মাত্র ৪ হাজার টাকা দান করিয়াছিলেন। তাহার পর হইতে আমরা ইঁহাদের আর কোনো সাহায্য প্রদান করি নাই। ইহার অধ্যক্ষ কবিরাজ শ্যামাদাস বাচস্পতি মহাশয় প্রায় একাকী ইহা পরিচালনার সমগ্র দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া নিজেই আবশ্যিক অর্থ ব্যয় করিতেছেন। এরূপ একটি প্রতিষ্ঠানকে সুদীর্ঘকাল বাঁচাইয়া রাখা কিরূপ কঠিন তাহা আমি জানি বলিয়াই কবিরাজ মহাশয়ের কার্যের প্রশংসা আমি না করিয়া থাকিতে পারি না। কর্পোরেশন যাহাতে সত্বর বৈদ্যশাস্ত্রপীঠকে জমি দান করে সেজন্য আমরা সকলে যথাসাধ্য চেষ্টার ত্রুটি করিব না।

শ্রমিক-ধর্মঘট

৬ জুলাই ১৯২৯ জামশেদপুর টিনপ্লেট শ্রমিকদের ধর্মঘট সম্বন্ধে বিবৃতি।

টিনপ্লেট কোম্পানীতে যে ধর্মঘট চলিতেছে তাহার মীমাংসা না করাইবার জন্য আমি টাটা আয়রন অ্যান্ড স্টীল কোম্পানিকে দায়ী করিয়াছি কেন এবং কেনই বা আমি প্রয়োজন হইলে টাটা আয়রন কোম্পানিতে সহানুভূতিসূচক ধর্মঘটের জন্য বলিয়াছি, তাহার কারণ সম্বন্ধে বোম্বাইয়ের অনেক বন্ধু আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। আমার কারণ খুবই স্পষ্ট। আমি যতদূর সংবাদ পাইয়াছি তাহাতে জানিয়াছি, টিনপ্লেট কোম্পানির শেয়ার সমূহের এক-তৃতীয়াংশের মালিক টাটা কোম্পানি; অবশিষ্ট শেয়ারসমূহের মালিক বর্মা অয়েল কোম্পানি। তাহা ছাড়া টিনপ্লেট কোম্পানির ডিরেক্টর বোর্ডে টাটার দুইজন ডিরেক্টর আছেন। টিনপ্লেট কোম্পানির অস্তিত্ব টাটা আয়রন

অ্যান্ড স্টীল কোম্পানির উপর নির্ভর করে। সুতরাং ধর্মঘটের মীমাংসার জন্য টিনপ্লেট কোম্পানির উপর টাটা যথেষ্ট চাপ দিতে পারেন। টিনপ্লেট কোম্পানি টাটার নিকট হইতে জায়গা ইজারা করিয়া লইয়াছেন। টাটাই টিনপ্লেট কোম্পানিকে ইলেকট্রিক ও পরিস্রুত জল সরবরাহ করেন। টিনপ্লেট কোম্পানির ইলেকট্রিক্যাল বিভাগের মেরামতি কাজ টাটা কোম্পানিই করেন। আরো আমি শুনিয়াছি যে, এই ধর্মঘটের সময় টাটা লোক দিয়া টিনপ্লেট কোম্পানিকে পরোক্ষে সাহায্য করিয়াছেন। এই সব কারণে টিনপ্লেট কোম্পানিকে ধর্মঘট মীমাংসায় বাধ্য করিতে টাটার দুই মিনিটও লাগে না। টাটাকে ইহা করাইবার জন্য সহানুভূতিজ্ঞাপক ধর্মঘট ঘোষণা করা আবশ্যক হইতে পারে। ইহা করাও শক্ত নহে, কারণ টাটার কর্মচারীগণ সন্তুষ্ট নহে। শ্রীযুক্ত মানেক হোমি শ্রমিকদিগকে যে আশা দিয়াছিলেন তাহা কার্যে পরিণত হয় নাই এবং তাঁহার প্রদত্ত প্রতিশ্রুতিও পালিত হয় নাই। তাঁহার উৎসাহ চরমে উঠিয়াছিল, কিন্তু তাঁহার শ্রমিক সংঘ যেমন কর্তৃপক্ষের অনুমোদিত হইল অমনিই তিনি হঠাৎ তাঁহার দাবি ত্যাগ করিলেন। শ্রীযুক্ত হোমি যদিও টাটা কারখানার কর্তৃপক্ষের অনুরক্ত হইয়াছেন, তথাপি শ্রমিকগণের উৎসাহ এখনও আছে এবং শ্রীযুক্ত হোমি যাহা তাঁহাদের নিকট প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন তাহা পাইবার জন্য শ্রমিকগণ এখনো আশা করিতেছে। সহানুভূতিজ্ঞাপক ধর্মঘট মীমাংসার জন্য টাটা কোম্পানি যদি তাঁহাদের সাধ্যমত চেষ্টা না করেন, তাহা হইলে উক্ত পন্থা যতই দুঃখজনক হউক-না কেন, তাহাই অবলম্বন করিতে হইবে।

সতীন সেনের অনশনব্রত ভঙ্গের জন্য অনুরোধ

"আপনার জন্য অতিশয় চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছি। দেশ আপনাকে হারাইতে পারে না। অসহায়ের মতো আপনার তিলে তিলে মরার দৃশ্য দেখা হইতে আপনি আমাদিগকে রক্ষা করুন। ইহাই আমার এবং আপনার অন্যান্য সহকর্মীদের একান্ত প্রার্থনা। সুতরাং অন্ন গ্রহণ করুন। আমরা দেশবন্ধুর নামে আপনাকে অনুরোধ জানাইতেছি।"

৭ জুলাই ১৯২৯

আগামী বৎসরের জন্য প্রস্তুত হও

৭ জুলাই ১৯২৯ যশোহর জেলা সম্মেলনে সভাপতির অভিভাষণ।

সমবেত বন্ধুগণ ও সহকর্মীবৃন্দ,

যশোহর জেলা সম্মেলনের সভাপতি পদে নির্বাচিত করিয়া আজ আমাকে আপনারা যে সম্মান প্রদান করিলেন, তজ্জন্য ভাষার জাল বুনিয়া আমি আর অতি-বিনয়ের জঞ্জাল সৃষ্টি করিব না। আজ আমি আপনাদের নিকট শুধু এই প্রার্থনাই করিব—আমাকে আপনারা যে সম্মান প্রদান করিলেন, আমি যেন সর্বতোভাবে তাহার যোগ্য হইতে পারি। আষাঢ়ের বর্ষা ও দুর্যোগ উপেক্ষা করিয়া আজ আপনারা দেশের হিতচিন্তায় ভবিষ্যৎ কার্যপন্থা নির্ধারণের জন্য সমবেত হইয়াছেন। যশোহরের নষ্ট গৌরব কিরূপে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা যায় তাহার পন্থা নির্ধারণে আপনারা ব্যাকুল হইয়াছেন। বর্তমান জেলা সম্মেলনের অধিবেশনে যদি ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আমাদের দৃষ্টি কিঞ্চিন্মাত্রও সুস্পষ্ট হইতে পারে এবং আমরা যদি অদূর ভবিষ্যতে সেই পন্থানুযায়ী কার্য আরম্ভ করিতে পারি, তাহা হইলে আপনাদের সকল আয়োজন, আমাদের সকল চেষ্টা অনেকাংশ সার্থক হইবে।

অতীতের জীর্ণ কঙ্কাল বক্ষে লইয়া বাংলার যে-সকল প্রান্তর এখনো দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিতেছে— যশোহর তাহারই অন্যতম। একদিন যে স্থানের যশঃগৌরব গৌড়ের গৌরব হরণ করিয়া ভারতময় খ্যাতি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল— যে যশোহরের প্রতাপাদিত্য, সীতারাম রায়ের নাম আজও বাংলার ঘরে ঘরে স্বদেশপ্রেম ও বীরত্বের উদ্দীপনাপ্রবাহ সৃষ্টি করে, যে যশোহরের মাইকেল মধুসূদন, বীর যতীন্দ্রনাথের স্মৃতি বাংলার ঘরে ঘরে আজও সাদরে পূজিত— বাংলার সেই অন্যতম গৌরবকেন্দ্র শৌর্য, বীর্য ও পাণ্ডিত্যের তীর্থক্ষেত্রের বর্তমান অবস্থা দেখিয়া কাহার মনে না হতাশার উদয় হয়? বর্তমানে যে অসহযোগ আন্দোলন ভারতের ঘরে ঘরে প্রচারিত হইতেছে, যে অস্ত্র প্রয়োগের ফলে এদেশে ব্রিটেনের সিংহাসন পর্যন্ত কম্পিত হইয়া উঠিয়াছে—নিরস্ত্র, শক্তিহীন, পরপদানত জাতির সেই একমাত্র ও অমোঘ অস্ত্র প্রায় শতবৎসর পূর্বে সর্বপ্রথম এই যশোহরেই প্রবর্তিত ও প্রচারিত হয়—এবং তাহার ফলেই অত্যাচারী বিদেশী বণিকগণের মনে ন্যায়-অন্যায় সম্বন্ধে নূতন জ্ঞান সঞ্চার হয়। আমি নীলকর ও তাহার অত্যাচার নিবারণের আন্দোলনের কথা

বলিতেছি। স্বর্গীয় দীনবন্ধু মিত্র মহাশয় তাঁহার 'নীলদর্পণ' গ্রন্থে যে মর্মান্তিক ঘটনার উল্লেখ করিয়া এবং যে গ্রন্থ অনুবাদ করিয়া লঙ্ সাহেব কারাদণ্ড পর্যন্ত স্বীকার করেন— তাহার কথা কাহারো অজ্ঞাত নাই।

নীলচাষীর অত্যাচার

এই নীলচাষের অত্যাচার যশোহরের চাষীগণকেই সর্বাপেক্ষা অধিক সহ্য করিতে হইয়াছিল— কারণ এই জেলাতেই নীলচাষ হইত সর্বাপেক্ষা অধিক। দিনের পর দিন বিদেশী বণিকগণের এ অত্যাচার সহ্য করিয়া যশোহরের কৃষকগণ একদিন যেমন অদ্ভুত কষ্টসহিষ্ণুতা দেখাইয়াছিলেন, পরবর্তীকালে সে অত্যাচার অহিংসভাবে প্রতিরোধ করিবার সময়ও ইঁহারা তেমনই অপূর্ব তেজস্বিতা ও সাহসিকতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। বস্তুত, বিগত মুসলমান রাজত্বের আরম্ভ হইতে যদি এই যশোহর জেলার ইতিহাস আলোচনা করা যায় তবে দেখা যাইবে, এ জেলার সকল স্তরের অধিবাসীর মধ্যেই বিবিধ গুণশালী ও ধীসম্পন্ন ব্যক্তির অভাব কখনো পরিলক্ষিত হয় নাই।

কিন্তু আজিকার যশোহরের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া আমরা কী দেখিতে পাই? বাংলার অন্যান্য জেলায় আজ যে দুর্দশা ও অভিযোগ, যশোহরেও তাহার অভাব নাই। সমগ্র দেশ যেন আজ শ্মশানে পরিণত হইবার উপক্রম হইয়াছে। দারিদ্র্য আজ দেশে মৌরসীপাট্টা বাঁধিয়া বসিয়াছে। রোগ আজ ঘরে ঘরে দোর্দণ্ড প্রতাপ প্রতিষ্ঠা করিয়াছে।

অতীতের ইতিহাসের সঙ্গে বর্তমানের অবস্থা আলোচনা করিলে সর্বপ্রথম এই প্রশ্নটিই মনে উদয় হয় যে, আমাদের এ দুর্দশা কেন হইল? উন্নতির উচ্চশিখর হইতে অবনতির এ গভীর পঙ্কে পতনের কারণ কি? পতনের এই কারণ সম্বন্ধে স্পষ্ট জ্ঞান থাকিলে আমরা নিশ্চয়ই উন্নতির পন্থা আবিষ্কার করিতে পারিব।

বিদেশীর শাসন ও শোষণ

আমাদের বর্তমান দুরবস্থার সর্বপ্রধান কারণ যে বিদেশীয় শাসন ও শোষণ, এ সম্বন্ধে আজ আর মতদ্বৈধ নাই। বরং এমনও বলা যাইতে পারে যে, বিদেশী শাসন অপেক্ষা শোষণই আমাদের বর্তমান দরবস্থার প্রধান কারণ। আমাদের দেশ ইংরেজ আগমনের পূর্বেও, বিদেশীর করায়ত্ত হইয়াছে, কিন্তু তাহাতেও দেশের সেরূপ অবনতি হয় নাই— যেরূপ হইয়াছে বর্তমান

শাসনাধিকারে। ইহার প্রধান কারণ হইল এই যে, সেকালে বিজয়ী বীর বিদেশীর বেশে প্রবেশ করিলেও রাজ্য প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে বেশ পরিবর্তন করিয়াছিলেন ; জন্মভূমির সংস্পর্শ সর্বতোভাবে ত্যাগ করিয়া এই দেশকেই আপনার করিয়া লইয়াছেন। সেজন্য মুসলমান আমলে বিদেশী-শোষণ চলে নাই— শাসক ও শাসিতগণ ভিন্ন সমাজ ও ভিন্ন ধর্মাবলম্বী হইলেও একই সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্য করিয়াছেন এবং উভয়ে ভিন্ন ভাণ্ডারে অর্থ সঞ্চিত করিলেও তাহা এদেশেই থাকিয়া গিয়াছে।

কিন্তু আজকাল আর তাহা হইবার উপায় নাই। এখন যাঁহারা সাগরপার হইতে এদেশে শুভাগমন করেন, পাঁচবৎসরের মধ্যে দুইবার স্বদেশে না গেলে তাঁহাদের মন চঞ্চল হইয়া উঠে, সঙ্গে সঙ্গে খালি পকেট ভর্তি করিয়া লইয়া না গেলেও আত্মীয়-স্বজন সন্তুষ্ট হন না। এইভাবে ইঁহারা শূন্য থলি স্কন্ধে লইয়া এদেশে প্রবেশ করেন, কিন্তু ফিরিবার বেলা শুধু যে থলি পূর্ণ করিয়াই দেশে ফেরেন তাহা নহে কোঁচা ও কাছার খুঁটকেও রেহাই দেন না। এইরূপে বর্তমান সুশাসনের ব্যবস্থায় আমরা দিন দিন ক্ষীণতনু হইয়া পড়িতেছি।

হাজামজা নদী

সমগ্র দেশ সম্বন্ধে সাধারণভাবে উপরি-উক্ত কথাগুলি সত্য হইলেও যশোহরের দুর্দশার কয়েকটি বিশেষ কারণ আছে। তন্মধ্যে নদ-নদী শুকাইয়া যাওয়া এবং সঙ্গে সঙ্গে ম্যালেরিয়ার প্রকোপ বৃদ্ধিই হইল প্রধান। সুজলা, সুফলা বাংলাদেশে শস্যসম্পদের অভাব নাই— কিন্তু তৎসত্ত্বেও যশোহরের সহিত অন্যান্য জেলার তুলনা হয় না। এ জেলার সর্বপ্রকার ফল মূল ও তরি-তরকারী এ জেলা হইতেই সরবরাহ হয়। ইহা ব্যতীত কোটাচাঁদপুরের গুড় ও চিনিও সুবিখ্যাত।

কিন্তু যশোহরের প্রধান নদী ভৈরব হাজিয়া যাওয়ায় জেলার সর্বনাশ সাধিত হইয়াছে— যে ভৈরবের কূলে কূলে শ্যামলশ্রী অপূর্ব শোভা বিস্তার করিত, আজ সেখানে বালুর স্তর বা সুনিবিড় জঙ্গল শোভা পাইতেছে— যে নদীর বক্ষে একদিন পণ্যসম্ভারপূর্ণ নৌকারাজি চলাচল করিত, আজ সে জলপথ সংকীর্ণ ও কচুরীপানায় পূর্ণ— অন্যান্য নদী ও খালবিলের অবস্থাও ঐরূপ! আজ তাই ম্যালেরিয়া, জলাভাব ও দারিদ্র্য দেশবাসীর নিত্যসহচর, মৃত্যুই একমাত্র কাম্য।

কিন্তু এ দুরবস্থার প্রতিকার কোথায়? কী শক্তিবলে আমরা মনুষ্যত্বের পূর্ণ অধিকার অর্জন করিয়া পৃথিবীর অন্যান্য অধিবাসীর সহিত একতালে পা ফেলিয়া অগ্রসর হইতে পারিব? এই প্রশ্ন সকল দেশবাসীর চিত্তকে উদ্বেলিত করিয়া তুলিয়াছে। আমাদের দুর্বলতার সীমা নাই, অভাবের সংখ্যা নাই সত্য তথাপি আজও আমাদের সে শক্তি আছে যার দ্বারা ইচ্ছা করিলে ও চেষ্টা করিলে আমরা সকল দিক দিয়া মনুষ্যত্ব লাভ করিতে পারি। কিন্তু ইহার মোচন না করিতে পারিলে মনুষ্যজন্মের সার্থকতাই বা কোথায়? দুর্বলতা জয়ের ও অভাব মোচনের একমাত্র পথ স্বরাজ লাভ। আমাদের সকল অভাবের প্রতিকার স্বরাজ লাভ করিলেই হইতে পারে— তাহার পূর্বে নহে। সুতরাং আমরা কিভাবে স্বরাজ লাভ করিতে পারি, তাহাই নির্ধারণ করিতে হইবে।

এ কথা আজ আমাদিগকে অন্তরের সহিত উপলব্ধি করিতে হইবে যে, পূর্ণ স্বরাজ লাভ ব্যতীত দেশের প্রকৃত উন্নতিবিষয়ক ক্ষুদ্র বৃহৎ কোনো কার্য সাধনই সম্ভব নহে— এবং এই সত্য উপলব্ধি করিয়াই আমাদিগকে কার্য আরম্ভ করিতে হইবে— সকল প্রকার বাধা দুই হস্তে সজোরে ছিঁড়িয়া আদর্শ সাধনে যত্নবান হইতে হইবে।

সাম্প্রদায়িক বিপদ

অনেকে বলেন, আমাদের সাধনার পথে যে-সকল বাধা বর্তমান, হিন্দু-মুসলমানে সম্প্রীতির অভাবই হইল তন্মধ্যে সর্বপ্রধান এবং এ-অভাব মোচন করিবার কোনো আশা নাই। কিন্তু আমি এ কথা বিশ্বাস করি না। আমাদের দেশের হিন্দু ও মুসলমান এই দুইটি প্রধান সম্প্রদায়ের মধ্যে বিরোধের কোনো চিরন্তন কারণ থাকিতে পারে না— ইহা নাই। কি ব্যক্তিগত জীবনে, কি সমাজগত জীবনে, উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে কোনো পার্থক্য তো নাই-ই বরং অনেক বিষয়েই আমাদের মধ্যে স্বার্থের সামঞ্জস্য বিদ্যমান। অন্নবস্ত্র বা শিক্ষা-স্বাস্থ্যের অভাব হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে সমভাবে বর্তমান। বর্তমান শাসন ও শোষণের চাপে উভয় সম্প্রদায়ের প্রাণই আজ ভারাক্রান্ত; বর্তমানে যে-সকল অত্যাচার ও অনাচারে দেশ মুমূর্ষু হইয়া পড়িয়াছে তাহা সমাজবিশেষের উপর নহে— সকল দেশবাসীর স্কন্ধে সমভাবে বর্তমান। অতএব অত্যাচারের প্রতিকারের প্রয়োজনীয়তা বা কেন যে উভয় সম্প্রদায়ের লোক মর্মে মর্মে

উপলব্ধি করিবেন না, তাহার কোনো সংগত কারণ নাই। আমাদের যে যে অভাব রহিয়াছে তাহা পূর্ণ করিতে হইলে উভয় সম্প্রদায়কেই একযোগে আত্ম-নিয়োগ করিতে হইবে। আসল কথা হইল এই যে, একশ্রেণীয় স্বার্থান্বেষী লোক ক্ষুদ্র ব্যক্তিগত স্বার্থলোভে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে কলহ ও মনোমালিন্য সৃষ্টি করিয়া বেড়াইতেছে—স্বাধীনতা সংগ্রামে এ-শ্রেণীর লোককেও শত্রুমধ্যে গণ্য করা প্রয়োজন।

সামাজিক অব্যবস্থা

একদিকে সাম্প্রদায়িক কলহ যেমন আমাদের মিলনপথে অন্তরায় সৃষ্টি করিয়াছে, অপরদিকে সমাজের আভ্যন্তরিক কলহ ও ভেদনীতিও আমাদিগকে কম দুর্বল করিয়া ফেলে নাই। আমরা হিন্দুসমাজের মধ্যে জাতিভেদের যে অচলায়তন সৃষ্টি করিয়াছি তাহার পাষাণকারায় আবদ্ধ হইয়া কত প্রাণবন্ত দেশবাসী যে ব্যর্থতায় ডুবিয়া মরিতেছে কে তাহার ইয়ত্তা করিবে? তদুপরি বিভিন্ন জাতির মধ্যে ঈর্ষা, প্রাধান্যলাভের প্রবৃত্তি, অস্পৃশ্যতা ইত্যাদি হিন্দু সমাজকে সম্পূর্ণভাবে নির্বীর্য করিয়া ফেলিয়াছে। আমাদের সমাজ তথা জাতিকে পুনরায় শক্তিশালী ও একতাবদ্ধ করিতে হইলে জাতিভেদের অচলায়তনকে ধূলিসাৎ করিতে হইবে— প্রত্যেক মানুষকে মনুষ্যত্বের পূর্ণ অধিকার দিতে হইবে। এ সম্বন্ধে গত প্রাদেশিক সম্মেলনের রংপুর অধিবেশনে যে প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে আমি তাহার প্রতি আপনাদের মনো-যোগ আকর্ষণ করি। বর্তমানে জাতিভেদ যে জাতির উন্নতির পথে বাধা সৃষ্টি করিতেছে এবং দেশের উন্নতিকল্পে অনতিবিলম্বে যে জাতিভেদ মুছিয়া দেওয়া প্রয়োজন, অধিকাংশেরই মতে ইহা তথায় স্বীকৃত হইয়াছে। আজ জাতিভেদ উঠাইয়া দিলে সঙ্গে সঙ্গে কত যে সামাজিক দুর্নীতি ও অনাচারের অবসান হইবে তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। প্রথমত, অস্পৃশ্যতা ও আনুষঙ্গিক সকল পাপ ইহাতে লোপ পাইবে। বর্তমানে কপিলমুনি মন্দিরে যে মর্মান্তিক ব্যাপার ঘটিতেছে, ভবিষ্যতে তাহার পুনরভিনয়ের কোনো সম্ভাবনা থাকিবে না।

আমি শুনিয়াছি, যশোহরের পাঁজিয়া, নড়াইল, কালিয়া, বাগুটিয়া, জঙ্গল-বাঁধাল— প্রভৃতি বর্ধিষ্ণু গ্রামগুলি সংস্কারবিরোধী বিভিন্ন জাতির কেন্দ্র-স্বরূপ। আমি আশা করি, এই সকল গ্রামের যে-সকল অধিবাসী আজিকার

সম্মেলনে উপস্থিত আছেন তাঁহারা সকলেই বর্তমান জাতিভেদ প্রথার বিষময় ফল আলোচনা করিয়া ইহার প্রতিবাদকল্পে সর্বতোভাবে চেষ্টা করিবেন। বর্তমানে আমরা জাতিভেদকে মাঝে মাঝে যে কিরূপ হাস্যকর ব্যাপারে পরিণত করি, তাহার দৃষ্টান্তের অভাব নাই। কলিকাতার ন্যায় বৃহৎ নগরে আমরা বিনা বাধায় সকল প্রকার "অনাচার"-এর অনুষ্ঠান করি; কিন্তু স্ব-গ্রামে, স্ব-সমাজে থাকিলেই বিপরীত ভাব অবলম্বন করি। ক্রমাগত অতিপ্রয়োজনীয় ব্যাপারেও এরূপ আত্ম-প্রবঞ্চনা করিয়া আমরা সকল দিক হইতেই দুর্বলচিত্ত ও আত্মবিশ্বাসহীন হইয়া পড়িতেছি।

সমাজ-সংস্কার আন্দোলন

এই সামাজিক আত্মপ্রবঞ্চনার বিষময় ফল অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। ইহাতে আশ্চর্য হইবার কিছুই নাই। কাগজ-পত্রে আমরা বিভিন্ন কর্মকেন্দ্রকে পরস্পর সংস্পর্শহীন বিভাগ বলিয়া প্রচারিত করিলেও এ কথা অস্বীকার করা যায় না যে, আমাদের মনোজগতে এরূপ কোনো ভাগ-বিভাগ নাই— যে ব্যক্তি সমাজ-সংস্কারের চিন্তা করেন তিনি রাষ্ট্রীয় সংস্কারের চিন্তাও করিতে পারেন। এইজন্য এক বিষয়ে হীন বা দুর্বলচিত্ত হইলে, অন্যান্য বিভাগেও আমরা দুর্বল হইয়া পড়ি এবং তজ্জন্য অনেকে মনে করেন, সামাজিক বর্ণ-বৈষম্য, অস্পৃশ্যতা, ভেদনীতি ইত্যাদির প্রচার ও প্রয়োগের ফলেই আজ জীবনের বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রে আমাদের এরূপ অসহায় অবস্থা। এই জন্যই আজ আমাদের নবজাগরণের প্রচেষ্টাকে মাত্র রাষ্ট্রীয় কেন্দ্রে আবদ্ধ রাখিলেই চলিবে না, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করিতে হইবে। যেখানে অত্যাচার, অবিচার বা নিপীড়ন দেখিব, সেইখানেই উহার প্রতিকারকল্পে, মনুষ্যত্বের পূর্ণ অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য সর্বতোভাবে চেষ্টা করিতে হইবে। স্বর্গীয় দেশবন্ধু যে বাধাপ্রদান নীতির প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন সকল কর্মক্ষেত্রেই তাহা প্রয়োগ করিতে হইবে। যেখানে নিপীড়িত মনুষ্যত্বের ক্রন্দন শুনিব— সেইখানেই তাহার প্রতিকারের চেষ্টা করিব, তাহার জন্য সর্বস্বপণ করিব— তবেই দেশে শক্তিমান নবজাতির সৃষ্টি সম্ভব হইবে।

এই আত্মপ্রতিষ্ঠার অভিযান আজ চারিদিকে আরম্ভ করা প্রয়োজন। যেখান হইতেই অত্যাচারের অভিযোগ আসিবে, সেইখানেই তাহার প্রতিকারের

চেষ্টা করিতে হইবে। এইভাবে চারিদিকেই দেশবাসীর মনে আত্মসম্মানবোধ বৃদ্ধি পাইবে এবং তাহা অর্জন ও রক্ষার ইচ্ছা সকলের মনে ফলবতী হইবে।

আগামী বৎসরের জন্য আয়োজন

বন্ধুগণ, আমি সাধারণভাবে আমাদের কর্তব্য সম্বন্ধে আপনাদিগকে নানা কথা জ্ঞাপন করিলাম। কিন্তু আগামী বৎসরের জন্য কতকগুলি বিশেষ কাজ এখন হইতেই আরম্ভ করা অত্যাবশ্যকীয় হইয়াছে। আপনাদের স্মরণ আছে যে, গত কলিকাতা কংগ্রেসে নির্ধারিত হইয়াছে, আগামী ৩১শে ডিসেম্বরের মধ্যে যদি ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট নেহরু রিপোর্ট-এর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী নূতন শাসন-সংস্কারের ব্যবস্থা না করেন তবে দেশময় আইন অমান্য শুরু করিতে হইবে। ইংরেজ যে নেহরু রিপোর্ট মানিয়া লইবে না— তাহার প্রমাণ ইতিমধ্যে নানাভাবে পাওয়া গিয়াছে। মাত্র সপ্তাহকাল পূর্বে বিলাতের প্রধান-মন্ত্রী যে বক্তৃতা দিয়াছেন তাহাতেও তিনি পুনরায় সদম্ভে ঘোষণা করিয়াছেন — সাইমন কমিশনের উপর সকল ইংরেজের পূর্ণ আস্থা বিদ্যমান। সুতরাং ভারতবাসী যদি এখনো কমিশনের সহিত সহযোগিতা করে, তবেই ভালো; নতুবা নানারূপ গোলমালের সৃষ্টি হইবে।

প্রধানমন্ত্রীর এরূপ উক্তির পর সরকার পক্ষের মনোভাব সম্বন্ধে আর কোনো সন্দেহ থাকিতে পারে না। স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, আগামী বৎসর সমগ্র দেশময় আইন অমান্য ও অসহযোগ আন্দোলন ব্যাপ্ত হইয়া পড়িবে।

এই আন্দোলনের সাফল্যসাধনকল্পে এখন হইতেই আমাদিগকে যত্নবান হইতে হইবে। ইহার জন্য সর্বপ্রথম কর্তব্য— কংগ্রেস কমিটিগুলির সংস্কার সাধন ও নূতন সভ্য সংগ্রহ। অদূর ভবিষ্যতে যে কার্যপন্থা নির্ধারিত হইবে দেশময় যাহাতে তাহা সুপ্রচারিত হইতে পারে, সার্থক হইতে পারে তজ্জন্য সর্বত্র কর্মকেন্দ্র গড়িয়া তোলা প্রয়োজন। বস্তুত, কংগ্রেস কমিটি ও সভ্যসংখ্যার আধিক্যের উপরই আমাদের আগত সংগ্রামের সাফল্য সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করিতেছে। আমার একান্ত অনুরোধ, সকল যশোহরবাসী ইহার গুরুত্ব অনুভব করিয়া নিজ নিজ কর্তব্য সম্পাদনে যত্নশীল হইবেন। কংগ্রেস কমিটি পুনর্গঠনের সঙ্গে সঙ্গে বিদেশীবস্ত্র ও বিলাতী পণ্যবর্জনের আন্দোলন এবং খদ্দর ও স্বদেশী প্রচারের ব্যবস্থা সুপরিচালিত করিতে হইবে। বর্তমান শাসনের প্রধান অঙ্গই হইল শোষণ— ইহা আমি পূর্বেই বলিয়াছি। এই

শোষণের পথ রোধ করিতে না পারিলে শাসনযন্ত্রকে কোনোরূপেই দুর্বল করা যাইবে না— তজ্জন্য সর্বাগ্রে বিদেশী বর্জন আন্দোলন শুরু করা প্রয়োজন।

এই কার্য পরিচালনের জন্য চাই উপযুক্ত কংগ্রেসকর্মীদল। সকল কার্যের সাফল্যের মূলে এই কর্মীদল— এইজন্য স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গঠন করা অত্যাবশ্যক। প্রত্যেক জেলায়, মহকুমায় ও গ্রামে সামরিক নীতি অনুসারে স্বেচ্ছাসেবকদল গঠন করিতে হইবে— তাহা হইলে সুশৃংখলায় সকল কার্য সম্পাদন সম্ভব হইবে।

কিন্তু অর্থ সংগ্রহের সুব্যবস্থা না করিতে পারিলে কিছুই সম্ভব হইবে না। আমাদের দেশে সৎকার্য সাধনের জন্য অর্থাভাব কখনো হয় নাই, আজও হইবে বলিয়া আমি বিশ্বাস করি না। অর্থসংগ্রহের জন্য সুসম্বন্ধ সেবক দল গঠন করিয়া ভবিষ্যতের কার্যপন্থা সকল দেশবাসীর মধ্যে বিস্তৃতভাবে প্রচার করিবার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। দেশবাসীকে যদি বর্তমানের দুরবস্থা সম্যক রূপে জ্ঞাত করানো যায়, তাহা হইলে ইহার প্রতিকারকল্পে সকলেই সর্বতোভাবে সাহায্য করিবেন, ইহা আমি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করি।

সমবেত ভদ্রমন্ডলী, আমাদের বর্তমান সমস্যাগুলির যথাযথ আলোচনা আমি করি নাই, উল্লেখ করিয়াছি মাত্র। আমি দেখাইয়াছি বর্তমান সকল দুরবস্থার মূলে রহিয়াছে রাজনৈতিক পরাধীনতা। সে পরাধীনতার পাশ ছিন্ন করিতে হইলে সকল অর্থনৈতিক ও সামাজিক বৈষম্যমূলক অনাচার দূর করিতে হইবে— আর সকল উন্নতিমূলক কার্য সাধনের যন্ত্রস্বরূপ দেশের যুবদলকে সুসম্বন্ধ ও সুগঠিত করিতে হইবে। এইসকল কার্য সাধন করিতে পারিলে আমাদের জয় অবশ্যম্ভাবী, ইহাতে আর কোনো সন্দেহ নাই।

বরিশাল জেলা রাষ্ট্রীয় সম্মেলন

সভাপতির অভিভাষণ।

মাননীয় অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি মহাশয়, সমবেত ভদ্রমহিলা ও ভদ্রমহোদয়গণ, বহু বৎসর পর আপনারা বরিশাল জেলা রাষ্ট্রীয় সম্মেলনের আয়োজন করিয়াছেন। আজ এই সম্মেলনের আবশ্যকতা বিশেষভাবে সকলের মনে উদিত হইয়াছে। আমরা সাধারণত যে-সব সভাসমিতি ও সম্মেলনের আয়োজন করিয়া থাকি সেখানে সব সময়ে আমরা একমত হইতে না পারিলেও দেশের প্রধান প্রধান কর্মী ও মনীষীবৃন্দকে সমবেত করিয়া যে আলোচনা হয় তাহার ফলে দেশের প্রভূত কল্যাণ হইয়া থাকে। এই আলোচনার ফলে ভাবের আদান-প্রদান হয়, অনেক অস্পষ্ট ধারণা পরিষ্কার হইয়া যায় এবং চিন্তা ও কর্মের নূতন পন্থা আবিষ্কৃত হয়।

১৯০৬ সনের সম্মেলন

১৯০৬ খ্রীস্টাব্দে আপনাদের এই বরিশাল নগরে যে সম্মেলনের অধিবেশন হইয়াছিল ৺সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ৺রসুল, ৺মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা, ৺অশ্বিনীকুমার দত্ত, শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল প্রমুখ সেই যুগের শ্রেষ্ঠ মনীষী ও নেতৃবৃন্দ সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তথাপি মাতৃপূজা সমাধা হইবার পূর্বে পুলিশের লাঠির আঘাতে মঙ্গলঘট চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া গেল। কিন্তু সভার কাজ বাধাপ্রাপ্ত হইলেও সভার উদ্দেশ্য যে সম্পূর্ণ সার্থক হইয়াছিল সে-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই। জাগ্রত জনশক্তি জাতীয় অপমান সহ্য না করিয়া মানুষের দাবি ও অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য যেভাবে বিপদকে আলিঙ্গন করিয়া নির্ভয়ে পুলিসের লাঠির সম্মুখীন হইয়াছিল তাহার ফলে সমগ্র বঙ্গবাসী তথা সমগ্র ভারতবাসী নূতন শক্তি ও সাহসিকতার প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হইয়াছিল। সেই গৌরবময় দিবস হইতে আজ পর্যন্ত বরিশাল, আমলাতন্ত্রের ঘরে ঘরে আতঙ্ক সৃষ্টি করিয়া আসিতেছে।

১৯২১-এর নূতন উন্মাদনা

১৯২১ খ্রীস্টাব্দে যখন অসহযোগের রণভেরী চারিদিকে বাজিয়া উঠিল এবং বাংলার বুকের উপর দিয়া নূতন ভাবের বন্যা প্রবাহিত হইল, সেই সময়ে

প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মেলনের অধিবেশন পুনরায় এখানে হইয়াছিল। স্বদেশী যুগের নবপ্রেরণায় পুনর্জীবন লাভ করিয়া বাঙালী জাতি অগ্নি-পরীক্ষা ও বিপ্লবের ঝঞ্ঝার ভিতর দিয়া ১৯২১-এর দ্বারদেশে যখন উপনীত হইল, তখন নূতন গুরু ও নূতন পন্থার প্রয়োজনীয়তা সে মর্মে মর্মে উপলব্ধি করতে লাগিল। পূর্বযুগের সারথি যাঁহারা ছিলেন তাঁহাদের মধ্যে সকলে এই প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন নাই এবং সেজন্য তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ অসহযোগের বন্যা প্রতিরোধ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। সেই চেষ্টা করিলেন বরিশাল সম্মেলনের সভাপতি, স্বদেশীযুগের চরমপন্থী নেতা শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল। কিন্তু বাঙালী শুষ্ক রসহীন ন্যায়শাস্ত্র ভালোবাসে না, তাই শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পালের লজিক-এ সাড়া দিল না। সভাপতি দুঃখে, ক্ষোভে সভাত্যাগ করিলেন ; সভার কার্য বিশেষভাবে বাধা পাইল বটে, কিন্তু সমগ্র বাঙালী জাতি নূতন তেজ, নূতন শক্তি, নূতন উদ্দীপনা লইয়া বরিশাল হইতে স্ব স্ব জেলায় প্রত্যাবর্তন করিল এবং উন্মাদনায় ভরপুর হইয়া কর্মের স্রোতে গা ভাসাইয়া দিল।

দেশবন্ধুর নেতৃত্ব

আরো এক দৃশ্য আমরা দেখিয়াছিলাম, ১৯২৩ খ্রীস্টাব্দে— যখন বরিশালে প্রাদেশিক রাষ্ট্রসমিতির বিশেষ অধিবেশন হইয়াছিল। সেই সভায় উপস্থিত ছিলেন এক দিকে পরিবর্তনবিরোধীদল এবং অপর দিকে পরিবর্তনকামী ও গতিশীল দল ও তাহার নেতা— বাংলার 'দেশবন্ধু'।

সভাপতি শ্রীশ্যামসুন্দর চক্রবর্তী ন্যায়ের দাবি ও দেশবন্ধুর মর্যাদা রাখিলেন না। দেশবন্ধু বাধ্য হইয়া তাঁহার সহকর্মীদিগকে লইয়া সভাস্থল ত্যাগ করিলেন। কিন্তু প্রাদেশিক রাষ্ট্রসমিতি তাঁহার মর্যাদা না বুঝিলেও বাহিরে যে বিপুল জনতা দেশবন্ধুর বাণী শুনিবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া আসিল তাহা দেখিয়াই প্রতীয়মান হইল যে, প্রকৃত মেজরিটি কাহার পক্ষে। সে দৃশ্য যে দেখিয়াছে তাহার মনে পড়ে, ইতিহাসের আর-একটি দৃশ্য— যেদিন রুশজাতির পরলোকগত নেতা লেনিন সভামধ্যে ভোটে পরাস্ত হইবার পর নির্ভীক নিষ্কম্পস্বরে বলিয়াছিলেন যে, তাঁহার জয়লাভ হইয়াছে, কারণ প্রকৃত মেজরিটি তাঁহার পক্ষে। দেশবন্ধুর যে পরাজয় বরিশালে ঘটিয়াছিল তাহাই প্রকৃতপক্ষে তাঁহার জয়যাত্রার প্রথম অধ্যায়, কারণ তিনি এবং তাঁহার

সহকর্মীগণ বরিশাল হইতে যে সংকল্প ও সংঘবদ্ধতা লইয়া ফিরিয়াছিলেন তাহারই বলে পদে পদে জয়লাভ করিয়া অবশেষে গৌরব ও সম্মানের উচ্চ শিখরে উঠিতে পারিয়াছিলেন।

বরিশালে বার বার ঝঞ্ঝা

বরিশাল জেলা বঙ্গোপসাগরের অতি নিকটে, তাই বুঝি বরিশালে বার বার এত ঝঞ্ঝা উঠিয়াছে। সেদিনও সরকারের একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী আমাকে বলিতেছিলেন যে বরিশাল বাংলার storm centre এবং বরিশালের stormy petrel— সতীন্দ্রনাথ সেন। প্রাতঃস্মরণীয় বালগঙ্গাধর তিলক মহাশয়কে কোনো ইংরেজ লেখক Father of the Indian Unrest বলিয়াছিলেন বলিয়া তিলক মহারাজ ক্রুদ্ধ ও মনঃক্ষুণ্ণ হইয়াছিলেন। জানি না stormy petrel আখ্যা পাইলে আমাদের সতীন্দ্রনাথ সুখী হইবেন, না দুঃখিত হইবেন — তবে বরিশালবাসী বোধ হয় আজও গৌরব করিতে পারেন যে ভারতবক্ষে যে কয়টি স্থানের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া আমাদের শাসক সম্প্রদায় অনাগত ঝঞ্ঝার দুঃস্বপ্ন দেখেন এবং হয়তো নিদ্রার মধ্যেও শিহরিয়া উঠেন, তাহাদের মধ্যেও বরিশাল অন্যতম। বরিশালবাসী! পরাধীন দেশে ইহা অপেক্ষা অধিক সম্মান আপনারা আর কী লাভ করিতে পারেন?

চাই বিদ্রোহ ঘোষণা

আমাদের শাসক সম্প্রদায় অনেক সময়ে গর্ব করিয়া থাকেন যে, তাঁহারা এই দেশে শান্তিস্থাপন করিয়াছেন। কিন্তু কী উপায়ে তাঁহারা এই শান্তি স্থাপন করিয়াছেন এবং ইহার পরিণামই বা কী হইয়াছে— তাহা চিন্তা করিলেই আমরা বুঝিতে পারিব যে, ইংরেজ-সংস্থাপিত শান্তি ভারতবাসীর পক্ষে কল্যাণকর হইয়াছে কিনা। আমাদের মতো পরাধীন জাতিকে নিরস্ত্র করিয়া সামরিক শিক্ষার সুযোগ হইতে বঞ্চিত রাখিয়া এবং আমাদের কর্মক্ষেত্রের সীমানা সংকুচিত করিয়া ইংরেজ গবর্নমেণ্ট যে ভারতবাসীকে ক্রমশ দুর্বল, ভীরু ও নিশ্চেষ্ট করিয়া ফেলিয়াছে সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই। যে শান্তি আমরা উপভোগ করিতেছি সে শান্তি কোথাকার? ধ্বংসের তাণ্ডবলীলার মধ্যে অথবা নবসৃষ্টির আনন্দের ভিতর যে শান্তি পাওয়া যায়— সে শান্তি কি আজ ভারতবাসী ভোগ করিতেছে? অথবা শ্মশানভূমিতে যে শান্তি ও নিস্তব্ধতা

পাওয়া যায়— তাহাই আজ আমাদিগকে মুহ্যমান করিয়া রাখিয়াছে ? এই মোহনিদ্রা ভাঙিতে হইলে চাই ঝঞ্ঝা ও তুফান, চাই রজোগুণের উদ্দীপনা ও কর্মের অবিরাম গতি, চাই বাহিরের আকর্ষণ ও নিত্য নূতনের সন্ধান, চাই সর্বোপরি বর্তমান ও বাস্তবের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা।

গত পঁচিশ বৎসরের ভিতর কত জোয়ার-ভাঁটা বাংলার বুকের উপর খেলিয়া গিয়াছে, মুক্তিপথযাত্রী বাঙালী কত অবস্থা-বিপর্যয়ের মধ্য দিয়া গন্তব্যের দিকে চলিয়াছে, কত অমানিশার নৈরাশ্য, কত পূর্ণিমার সাফল্য বাংলার উপর আলোছায়ার লীলাজাল বিস্তার করিয়াছে— কিন্তু বরিশালবাসী এতদিন ধরিয়া সমানভাবে অসন্তোষের বহ্নি প্রজ্বলিত রাখিয়াছেন এবং ঝঞ্ঝার পর ঝঞ্ঝা সৃষ্টি করিয়া আলস্য ও নিশ্চেষ্টতার প্রভাব হইতে বাঙালী জাতিকে রক্ষা করিয়াছেন। আজ তাই বরিশালবাসী বাঙালী মাত্রেরই কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন।

আপনারা আমাকে এই সম্মেলনের সভাপতি পদে বরণ করিয়াছেন। কেন করিয়াছেন এবং আমার কোনো যোগ্যতা আছে কিনা তাহার বিচার আমি করিব না— সে বিচারের ভার আপনাদের। আমি আপনাদের সেবক ; যেভাবে আপনারা আমার সেবার দাবি করিবেন সেইভাবে আমি আপনাদের সেবা করিতে বাধ্য। তবে আজ যখন আমাকে সুযোগ দিয়াছেন তখন অন্তরের কয়েকটি কথা আমি নিবেদন করিব।

স্বাধীন ভারতের স্বপ্ন

যেদিন প্রথমে দেশের সম্বন্ধে চিন্তা করিতে শিখি সেইদিন হইতে স্বাধীন ভারতের স্বপ্ন আমার চিত্তকে অধিকার করিয়াছে। কিন্তু একদিন যাহা আমার নিকট মাত্র নিশার স্বপনের মতো মনে হইত, তাহা আজ বাস্তব অপেক্ষাও সত্য। দিনের পর দিন, বৎসরের পরবৎসর ভাবিতে ভাবিতে আজ অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে এই প্রত্যয় জন্মিয়াছে যে, ভারত আবার স্বাধীন হইবে, স্বাধীন হইয়া কর্মে, জ্ঞানে ও ধর্মে মহীয়ান হইবে এবং বিশ্বদরবারে শ্রেষ্ঠ আসন গ্রহণ করিবে। এ কথা আর আমার নিকট তর্কের বিষয় নহে— অনুভূতির বিষয়। ভারত পরাধীন, এ কথা আমার নিকট যতটা সত্য— ভারত যে অদূর ভবিষ্যতে স্বাধীন হইবে— একথা আমার নিকট তদপেক্ষা কম সত্য নয়। যে স্বাধীনতার চিত্র আমার মানসপটে অঙ্কিত, তাহার মধ্যে কোনো সীমা বা সংকীর্ণতা

নাই। যে স্বাধীন ভারতের ধ্যান করি তাহার আমলে কেহ বলিবে না— 'আমি ইংরেজের অধীনে স্বাধীন হইয়াছি।' প্রত্যেকে বলিবে 'আমি মনুষ্যত্বের পূর্ণ অধিকার লাভ করিয়াছি। ইংরেজ তাহার দেশে যে অধিকার ভোগ করে, জার্মান জাতি তাহার দেশে যে অধিকার পাইয়াছে— আমিও আমাদের দেশে সেই অধিকার পাইয়াছি।'

যে স্বপ্ন, যে কল্পনা, যে সত্য তরুণ বাংলা তথা তরুণ ভারতকে উন্মাদনায় বিভোর করিয়াছে তাহা আমাকেও মুক্তিপথযাত্রীদের মধ্যে টানিয়া আনিয়াছে। এই স্বপ্নের আনন্দ ও মাধুরী সকল দুঃখ হরণ করে, সকল শ্রান্তি দূর করে, সকল বিপদ ও বাধা লঙ্ঘন করিবার শক্তি দেয় এবং ত্যাগের শূন্যপাত্র অমৃতে ভরিয়া দেয়। তাই মানুষ এই স্বপ্নের অলৌকিক প্রভাবে অসাধ্য সাধন করিতে পারে এবং তাই আমরাও বুকভরা আশা লইয়া স্বাধীন ভারতের সন্ধানে ছুটিয়াছি।

যে স্বাধীন ভারতের কল্পনা করি, সেথায় ব্যক্তি ও সমাজ— উভয়ই মুক্ত এবং সাম্য ও মৈত্রী সেথায় নিত্য বিরাজমান। প্রত্যেক মানুষ মনুষ্যত্বের পূর্ণ অধিকার ভোগ করিবে এবং স্বীয় অবস্থা উন্নত করিবার জন্য সকলের সহিত সমান সুযোগ পাইবে। যে দেশে প্রত্যেক মানুষ স্বাধীনভাবে চিন্তা করিতে পারিবে, স্বাধীনভাবে সংঘ গড়িতে পারিবে এবং অপরের স্বার্থহানি না করা পর্যন্ত নির্বিঘ্নে ও নির্বিবাদে চলাফেরা ও কাজকর্ম করিতে পারিবে, ব্যক্তি যেরূপ মুক্ত, সমাজও সেখানে তদ্রূপ মুক্ত হইবে। সমাজের ক্রমোন্নতি ও আত্ম-বিকাশের পথে কোনো বাধা আর থাকিবে না। কোনো বাধা বা বন্ধন উপস্থিত হইলে নবজাগ্রত সমাজ তাহা সজোরে অপসারিত করিবে।

স্বাধীনতার প্রকৃত স্বরূপ

স্বাধীনতার প্রকৃত ও পূর্ণ স্বরূপ কী তাহা অনেকে জানেন না বা চিন্তা করেন না। আমরা পরাধীন বলিয়াই রাষ্ট্রের কথা বেশি করিয়া চিন্তা করিয়া থাকি এবং রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে শাসক ও শাসিতদের মধ্যে যে বৈষম্য এখন বিদ্যমান তাহাই আমাদের চোখে বড়ো হইয়া উঠে। এই বৈষম্য নির্মূল হইলেই আমরা পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করিব— এ ধারণা অনেকের ছিল— হয়তো এখনো অনেকের আছে। সমাজ ও অর্থনীতির কথা না উঠাইয়া রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে সকল বৈষম্য দূর করিয়া রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার প্রতিষ্ঠা করিলেই আমাদের কর্তব্য শেষ

হইবে— এ-কথা অনেকদিন পর্যন্ত আমরা বিশ্বাস করিতাম। এমন-কি, অনেক চরমপন্থী নেতা মনে করিতেন যে, সমাজ ও অর্থনীতির কথা উঠাইলে যে মত-ভেদ ও মনান্তর সৃষ্টি হইবে তাহার ফলে স্বাধীনতা লাভের পথে অন্তরায় উপস্থিত হইবে; অতএব স্বরাজ ও অর্থনীতির সমস্যা উত্থাপন না করাই শ্রেয়। আমাদের দেশে এমন অনেক লোক আছেন যাঁহারা রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে পূর্ণ স্বাধীনতা দাবি করেন কিন্তু সমাজের বর্তমান জাতিগত ও অর্থনৈতিক বৈষম্য বজায় রাখিতে চান।

সব দিক দিয়া মুক্তি চাই

মানুষের জীবন যেরূপ খণ্ড-বিখণ্ড করা যায় না— স্বাধীনতাও সেইরূপ জীবনের একটা দিকে আবদ্ধ থাকিতে পারে না। অন্ধকারময় প্রকোষ্ঠে দীপ জ্বালিলে সমস্ত ঘরটি যেরূপ আলোকিত হয়— মুক্তির আকাঙ্ক্ষা সেইরূপ মানুষের অন্তরে জাগরিত হইলে জীবনের সকল দিকে ফুটিয়া বাহির হয়। যে মানুষ মুক্তিকামী, সে সব দিক দিয়া মুক্ত হইতে চায়। যে ব্যক্তি জাতিকে মুক্ত করিতে চায় সে সকল বন্ধন ছিন্ন করিয়া অন্তরে, বাহিরে সকল দিকে জাতিকে মুক্ত করিতে চায়। বস্তুত, প্রকৃত স্বাধীনতা যদি লাভ করিতে হয় তবে শুধু রাষ্ট্রীয় বৈষম্য দূর করিলে চলিবে না— সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্যও দূর করিতে হইবে।

সমাজ ও অর্থনীতির কথা তুলিলে আমরা প্রাচীনপন্থীদের অসন্তোষ-ভাজন হইতে পারি, হয়তো কেহ কেহ রাগ করিয়া কংগ্রেস ত্যাগ করিতে পারেন, কিন্তু আমরা যদি পাঁচজনকে হারাই তাহা হইলে সেখানে ১০০ জনকে পাইব এ-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই। জাতি বা অর্থের দিক দিয়া যাঁহারা অভিজাতবর্গীয়, বৈষম্য দূরীকরণের প্রস্তাবে তাঁহারা বিরুদ্ধাচরণ করিতে পারেন। কিন্তু অপর দিকে যে-সব লোক সামাজিক ও অর্থনৈতিক অত্যাচার ও অনাচারে নিপীড়িত, তাহাদের নিকট রাষ্ট্র অপেক্ষা সমাজ ও অর্থনীতি বড়ো সত্য। সামাজিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্য দূরীকরণ তাহাদের নিকট রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা-লাভ অপেক্ষা কম প্রয়োজনীয় নহে। তাই এরূপ স্বাধীনতা লাভ করিতে হইবে যাহা দ্বারা মানুষ সকল প্রকার বন্ধন ও বৈষম্য হইতে মুক্ত হইতে পারে। সেই স্বাধীনতা উপভোগ করিয়া ব্যক্তি ও সমাজ যেন নির্বিঘ্নে, অবাধে নিজের জীবন গড়িয়া তুলিতে পারে।

যে আদর্শের উল্লেখ করিলাম সে আদর্শ লাভ করা সময় ও সাধনা-সাপেক্ষ। এই আদর্শের পূর্ণ স্বরূপ আমাদের জাতির নিকট একদিনে বা এক বৎসরে প্রতিভাত হয় নাই। আদর্শের উপলব্ধির জন্য যেরূপ বহু সময় লাগিয়াছে— আদর্শের প্রতিষ্ঠার জন্যও সেইরূপ সময় লাগিতে পারে।

স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস

স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে ক্রমোন্নতি সর্বদা দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু এই ইতিহাসের এক অধ্যায়ের সূচনা যাঁহারা করেন তাঁহারা অনেক সময়ে পরবর্তী অধ্যায়ের নেতৃত্ব করিতে পারেন না, কারণ সেই অধ্যায়ের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহারাও জীবনীশক্তি হারাইয়া ফেলেন। অনেকে এই কারণে নেতাদের উপর দোষারোপ করিয়া থাকেন কিন্তু তাহা করিয়া কোনো লাভ নাই। নেতা আকাশ হইতে নামিয়া আসে না অথবা ভুঁইফোঁড় হইয়াও জন্মায় না। জাতির দোষগুণ লইয়া নেতারা জাতি-কর্তৃক সৃষ্ট হইয়া থাকে। সুতরাং নেতাকে গালি দিলে জাতিকেই গালি দেওয়া হয়।

১৯০৬ খ্রীস্টাব্দে ৺সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বজ্রনির্ঘোষে বাঙালীকে জাগাইয়াছিলেন। তাঁহার নেতৃত্বে বাঙালী বঙ্গভঙ্গ রদ করিবার জন্য অগ্রসর হইয়াছিল, এই অভিযানে অবশেষে জয়লাভও করিয়াছিল। কিন্তু বঙ্গভঙ্গ রদ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সুরেন্দ্রবাবু ও তাঁহার দল নিস্তেজ হইয়া পড়িলেন। তাঁহাদের অসমাপ্ত কাজের ভার তুলিয়া লইলেন— একদিকে শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ চক্রবর্তীর জাতীয় দল এবং অপরদিকে বাংলার বিপ্লবী তরুণ-সমাজ।

দ্বিতীয় অধ্যায়ের শেষে বিপ্লবীদের মধ্যে অনেকে শ্রান্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন; তাই অসহযোগের বান যখন ডাকিল তখন তাঁহারা সাড়া দিতে পারিলেন না। যাঁহাদের জীবনীশক্তি তখনো পর্যন্ত অক্ষুণ্ণ ছিল নন্-কো-অপারেশনের স্রোতে গা ভাসাইয়া দিয়া জাতীয় সংগ্রামের পুরোভাগে তাঁহারা চলিতে লাগিলেন। অপর দিকে শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ চক্রবর্তী ও তাঁহার জাতীয় দল অসহযোগের নীতি ও কর্মপদ্ধতি একেবারে অপছন্দ করিয়া দূরে সরিয়া দাঁড়াইলেন এবং বাংলার নেতৃত্বের ভার যেন আপনা-আপনি দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের হাতে চলিয়া গেল।

অসহযোগ আন্দোলন কিছুকাল চলিবার পর তাহার বেগ যখন মন্দীভূত হইল তখন নূতন কর্মপদ্ধতির প্রয়োজন হইল। দেশবন্ধু ঠিক এই সময়ে

স্বরাজ্যনীতির প্রবর্তন করিয়া নূতন উদ্দীপনা সৃষ্টি করিলেন। কোনো কোনো কর্মী স্বরাজ্য আন্দোলনে যোগদান করিয়া আমলাতন্ত্রের সহিত সংঘর্ষ চালাইতে লাগিলেন।

১৯২০ সালে প্রবর্তিত অসহযোগ আন্দোলন নানা পরিবর্তনের ভিতর দিয়া এখনো চলিতেছে। ইহার পরিণাম না দেখিয়া এই আন্দোলনের সার্থকতা অথবা ব্যর্থতা সম্বন্ধে কিছু বলা উচিত নয়। তবে আমার মনে হয় যে, এ আন্দোলন ব্যর্থ হইবে না; এত ত্যাগ, এত পরিশ্রম, এত আয়োজন, এত সাধনা কখনো ব্যর্থ হইতে পারে না। ষোলো-আনা সাফল্য হইবে কিনা— ইহাই একমাত্র সমস্যা।

মধ্যে মধ্যে ব্যর্থতার আশঙ্কা দেখিয়া কেহ কেহ বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন যে, গয়া-কংগ্রেসের পূর্বেকার অবস্থায় ফিরিয়া গেলে ভালো হয়; কারণ স্বরাজ্যনীতি নাকি বিফল হইয়াছে। কিন্তু যদি বিফলতার বিচার করেন তবে আমি বলিব যে, স্বরাজ্যনীতি যদি বিফল হইয়া থাকে তবে তাহার খাঁটি অসহযোগ নীতিও তদপেক্ষা অধিক বিফল হইয়াছে। কিন্তু বস্তুত বিচারের সময় এখনো আসে, নাই, কারণ সংগ্রাম এখনো চলিতেছে।

কাউন্সিল বর্জন সমর্থন করা উচিত

যাঁহারা স্বরাজ্যনীতি বর্জন করিয়া খাঁটি অসহযোগনীতি orthodox non-co-operation পুনরায় গ্রহণ করিতে চান এবং আশা করেন যে, তাহার দ্বারা স্বরাজলাভের অধিক সহায়তা হইবে তাঁহারা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। তাঁহারা এই সহজ কথা ভুলিয়া যান যে, মানুষকে সর্বদা সম্মুখের দিকে চলিতে হয়, যে অবস্থা অতিক্রম করিয়া আমরা অগ্রসর হইয়া আসিয়াছি সে অবস্থায় ফিরিয়া গেলে কোনো লাভ হইতে পারে না, বরং ক্ষতি হইবে। Back to the Vedas, Back to Gaya প্রভৃতি যাবতীয় 'Back' নীতির আমি বিরোধী; তাই নিখিল ভারতীয় কংগ্রেস কমিটির কার্যকরী সমিতি কাউন্সিল বর্জন ও সদস্যপদ ত্যাগ সম্বন্ধে যে প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন আমি তাহা সমর্থন করিতে পারি না। আমি মনে করি যে, উক্ত প্রস্তাব কার্যে পরিণত হইলে দেশের ইষ্ট না হইয়া অনিষ্টই হইবে। অসহযোগ নীতি এবং তার আনুষঙ্গিক স্বরাজ্যনীতি ব্যর্থ বলিয়া যেদিন প্রতিপন্ন হইবে সেই দিন নূতন পন্থা ও নূতন নীতির সন্ধান করিতে হইবে।

ডোমিনিয়ন স্টেটাস ও পূর্ণ স্বাধীনতা

এখনকার অসহযোগ নীতি অবলম্বন করিয়া প্রাণপণ পরিশ্রম করিলে আমরা যে গন্তব্যের দিকে অনেক দূর অগ্রসর হইবে— এমন-কি, ডোমিনিয়ান স্টেটাস-রূপী স্বরাজ লাভ করিতে পারিব সে-বিষয়ে আমার কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। কিন্তু একবার অসহযোগ নীতির দ্বারা পূর্ণ স্বাধীনতা যে লাভ হইবে সে ভরসা আমার নাই। পূর্ণ স্বাধীনতা লাভের জন্য যে বিপুল চেষ্টা ও তুমুল আন্দোলন আবশ্যক তাহা বর্তমান শত দোষযুক্ত সমাজের পক্ষে সাধ্য নয়।

আজ দেশের যে অবস্থা তাহা দেখিয়া মনে হয় যে, বর্তমান সংগ্রামের ফলে যখন দুই-এক বৎসরের মধ্যে আমরা স্বরাজের পথে আরো অগ্রসর হইব তখন কর্মী ও নেতাদের মধ্যে কেহ কেহ সরিয়া দাঁড়াইবেন এবং গবর্নমেণ্টের সহিত সহযোগিতা করিতে প্রস্তুত হইবেন। স্বরাজ বলিতে যাঁহারা Dominion Status বুঝেন তাঁহারা Dominion Status পাইলে সফলকাম হইয়া সংগ্রাম হইতে অবসর গ্রহণ করিবেন সে-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই। তখন একদল নেতা ও কর্মীর প্রয়োজন হইবে, যাঁহারা দেশবাসীকে পূর্ণ স্বাধীনতার দিকে পরিচালিত করিতে পারিবেন এবং Dominion Status লাভের পর জাতীয় দলের মধ্যে যে ভাঙন আরম্ভ হইবে সেই ভাঙনের সময়ে অবসাদের কবল হইতে দেশবাসীকে রক্ষা করিতে পারিবেন। এই উদ্দেশ্য সফল করিতে হইলে এখন হইতে পূর্ণ স্বাধীনতার আদর্শ সর্বত্র প্রচার করা আবশ্যক।

বর্তমানের সমস্যা

এ কথা সত্যের খাতিরে স্বীকার করিতে হইবে যে, ১৯২০ খ্রীস্টাব্দে যে উদ্দীপনার মধ্যে অসহযোগ আন্দোলনের জন্ম হইয়াছিল সে উদ্দীপনা আজ আর নাই। যদিও ১৯২০ বা ১৯২১-এর তুলনায় আমরা জাতি হিসাবে আজ অধিক শক্তিশালী হইয়াছি তথাপি যে উদ্দীপনা, যে একাগ্রতা, যে সংকল্প Diminion Status লাভের জন্যও দরকার তাহা এখনো আমরা সৃষ্টি করিতে পারি নাই। ১৯২১-এর মূলধন লইয়া আমরা এতদিন কাজ চালাইয়াছি। এই মূলধনের সাহায্যে নূতন শাসনপদ্ধতি বা Reforms লাভ করা সম্ভব হইতে পারে কিন্তু স্বরাজলাভ সম্ভবপর নয়। কী করিয়া সমগ্র দেশময় আমরা স্বাধীনতা লাভের জন্য একটা প্রবল আকাঙ্ক্ষা জাগরিত করিব তাহাই আজ সব চেয়ে বড়ো সমস্যা।

নূতন সমাজ গঠন

আমার মনে হয় যে, নূতন শক্তির উৎস খুঁজিতে হইলে সমাজের অন্তস্তলে আঘাত করা প্রয়োজন এবং আঘাত করিবার জন্য স্বাধীনতার বাণী প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে নূতন সাম্যবাদ প্রচার করিতে হইবে। সমাজের আমূল পরিবর্তন করিয়া সাম্য ও স্বাধীনতার উপর নূতন সমাজ গড়িবার চেষ্টা করিতে হইবে। সাম্য ও স্বাধীনতার আস্বাদ পাইলে সুপ্ত নারীশক্তি জাগিয়া উঠিবে, তরুণ সমাজ নূতন জীবন লাভ করিবে, ভারতের লাঞ্ছিত ও উপেক্ষিত সমাজ মনুষ্যত্বের গৌরবে সুপ্রতিষ্ঠিত হইবে এবং কৃষক ও শ্রমিকদের মধ্যে নূতন চেতনা ও কর্মশক্তি উদ্বুদ্ধ হইবে। আমি বিশ্বাস করি যে এই চারিদিক দিয়া আন্দোলন শুরু করিলে অনতিবিলম্বে সমস্ত জাতির মধ্যে অসীম শক্তির উৎস খুলিয়া যাইবে এবং এই শক্তিবলে আমরা অনায়াসে স্বরাজ লাভ করিতে পারিব।

নারীসমাজ, তরুণ সমাজ, উপেক্ষিত সমাজ এবং কৃষক ও শ্রমিক সমাজ —এই চারি সমাজে জীবনীশক্তি সঞ্চার করিতে হইলে তাহাদের সম্মুখে স্বাধীনতার অখণ্ড স্বরূপ তুলিয়া ধরিতে হইবে। তাহাদিগকে ভালো করিয়া বুঝাইয়া দিতে হইবে যে, যে স্বাধীনতা আমরা চাই তাহা প্রতিষ্ঠিত হইলে সমাজ পুনর্জীবন লাভ করিবে, সমগ্র জাতি নূতন বলে বলীয়ান হইবে, প্রত্যেক মানুষ মনুষ্যত্বের পূর্ণ অধিকার প্রাপ্ত হইবে এবং জাতিগত ও অর্থনৈতিক কোনো বৈষম্য আর দেশে থাকিবে না।

সমবেত ভদ্রমণ্ডলী। আমি এতক্ষণ আদর্শের কথা ও ভবিষ্যতের কথা বলিলাম। এখন বর্তমানের সম্বন্ধে কিছু বলিয়া আমার বক্তব্য শেষ করিব।

আইন অমান্য ও খাজনা বন্ধ

কলিকাতা কংগ্রেসের নির্দেশানুসারে ব্রিটিশ গবর্নমেণ্টকে যে এক বৎসর সময় দেওয়া হইয়াছে— সে সময়ের মধ্যে আমাদের জাতীয় দাবি গ্রাহ্য না হইলে আগামী লাহোর-কংগ্রেসে পূর্ণ-স্বাধীনতার প্রস্তাব গ্রহণ করিব বলিয়া আমরা সকলেই বোধহয় সংকল্প করিতেছি। সে প্রস্তাব গৃহীত হইলে আমরা নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকিতে পারিব না। সমস্ত শক্তি নিয়োগ করিয়া আমাদের শেষ অস্ত্র— আইন অমান্য ও খাজনা বন্ধ— প্রয়োগ করিতে হইবে। কিন্তু ১৯৩০ সালে আইন অমান্য অথবা খাজনা বন্ধের আন্দোলন যদি আরম্ভ

করিতে হয় তাহা হইলে এখন হইতেই দেশকে প্রস্তুত করিতে হইবে। দেশকে প্রস্তুত করিতে হইলে সর্বপ্রথমে কংগ্রেস কমিটিগুলি পুনর্গঠনের সঙ্গে সঙ্গে বিদেশী বস্ত্র বর্জন ও বিলাতী পণ্য বর্জনের আন্দোলন ব্যাপকভাবে চালাইতে হইবে। সঙ্গে সঙ্গে খদ্দর ও স্বদেশী প্রচারের আয়োজনও করিতে হইবে। এই কার্যতালিকা সফল করিবার জন্য যে দেশব্যাপী আন্দোলন প্রয়োজন ও যেভাবে কংগ্রেস কমিটির পুনর্গঠন আবশ্যক তাহা করিতে পারিলে আমরা আমাদের দেশকে আইন অমান্য ও খাজনা বন্ধের জন্য প্রস্তুত করিতে পারিব। আমি সেইজন্য এই দুইটি কর্তব্যের দিকে আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

বন্ধুগণ, বলিবার অনেক কথা ছিল কিন্তু কিছুই বলিতে পারিলাম না। আজ বাংলার সম্মুখে ভীষণ পরীক্ষা উপস্থিত। দিকে দিকে বিদেশী আমলা-তন্ত্র আজ চণ্ডনীতি প্রয়োগ করিতেছে। এই চণ্ডনীতির ফলে শ্রীযুক্ত সতীন্দ্র-নাথ সেন ও তাঁহার সহকর্মীবৃন্দ আজ আত্মসম্মান রক্ষার জন্য অনশনব্রত গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। আমরা অসহায়ের মতো দূর হইতে তাঁহাদের লাঞ্ছনার কাহিনী শ্রবণ করিতেছি কিন্তু প্রতিকারের কোনো উপায় দেখিতেছি না। বোধ করি স্বরাজ প্রতিষ্ঠা না হওয়া পর্যন্ত কোনো প্রতিকার সম্ভবপর নয়।

লাঞ্ছনার রক্ত-তিলক ললাটে ধারণ করিয়া আমরা দুঃখের অমানিশার মধ্যে অভিযান শুরু করিয়াছি। আমরা অমৃতের পুত্র— বিধাতার আশীর্বাদ আমাদের শিরে নিত্য বর্ষিত হইতেছে— তাই জয়লাভ আমাদের অবশ্যম্ভাবী। দুঃখ, দৈন্য, বেদনা ও লাঞ্ছনা আমাদের অন্তরের আনন্দকে কখনো কাড়িয়া লইতে পারিবে না। বন্ধুগণ, আমরা যে পথে চলিয়াছি— তাহা ত্যাগের পথ, কণ্টকর পথ, কিন্তু আনন্দের ও জয়যাত্রারও পথ। এই পথে আমি আপনাদের সকলকে আহ্বান করিতেছি। আসুন, আমরা বীরপদবিক্ষেপে এই পথ চলি। আমরা নিজেদের সাধারণ বলে নূতন স্বাধীন ভারত সৃষ্টি করিব এবং ভারত-জননীকে রাজরাজেশ্বরী পদে প্রতিষ্ঠিত করিব, ভারতের পুনরুদ্ধার সাধন করিয়া আমরা জন্ম সার্থক করিব, জীবন ধন্য করিব। আসুন, আজ ভগবানের চরণে আমরা সমবেতভাবে করজোড়ে শুধু এই প্রার্থনা করি— আশীর্বাদ করুন, আমাদের সাধনা সিদ্ধ হউক— আমাদের জীবন ধন্য হউক।

'বন্দেমাতরম্'

১১ জুলাই ১৯২৯

হুগলী জেলা ছাত্র সম্মেলন

২১ জুলাই ১৯২৯ হুগলী জেলা ছাত্র সম্মেলনে সভাপতির অভিভাষণ।

মাননীয় অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি মহাশয় ও সমবেত ছাত্রমণ্ডলী :

আপনারা আজ কিসের জন্য এই ছাত্রসভায় আমায় আহ্বান করিয়াছেন তাহা আপনারাই জানেন তবে এই সভায় আসিবার প্রবৃত্তি বা সাহস যে আমার হইয়াছে তাহার একমাত্র কারণ এই যে আমি মনে করি আমি আপনাদের মতোই একজন ছাত্র ; "জীবনবেদ" আমি অধ্যয়ন করিয়া থাকি এবং বাস্তব জীবনের কঠিন আঘাতে যে জ্ঞানের উন্মেষ হয় সেই জ্ঞান আহরণে আমি এখনও রত।

জাতির আদর্শ

প্রত্যেক ব্যক্তির বা জাতির একটা ধর্ম বা আদর্শ (ideal) আছে। সেই ideal বা আদর্শকে অবলম্বন ও আশ্রয় করিয়া সে গড়িয়া উঠে। সেই idealকে সার্থক করাই তাহার জীবনের উদ্দেশ্য, সেই ideal বা আদর্শকে বাদ দিলে তাহার জীবন অর্থহীন নিষ্প্রয়োজন হইয়া পড়ে। দেশ ও কালের গণ্ডীর মধ্যে আদর্শের ক্রমবিকাশ বা অভিব্যক্তি একদিনে বা এক বৎসরে হয় না। ব্যক্তির জীবনে সাধনা যেরূপ বহুবৎসরব্যাপী হইয়া থাকে, জাতির জীবনেও সেইরূপ সাধনার ধারা পুরুষানুক্রমে চলিয়া আসে। তাই মনীষীরা বলিয়া থাকেন যে আদর্শ একটা প্রাণহীন গতিহীন বস্তু নয়। তার বেগ আছে, গতি আছে, প্রাণ-সঞ্চারিণী শক্তি আছে।

আমাদের যুগধর্ম

যে আদর্শ আমাদের সমাজে গত একশত বৎসর ধরিয়া আত্মবিকাশের চেষ্টা করিতেছে আমরা তার পরিচয় সবসময়ে না পাইতে পারি। যে চিন্তাশীল, যাহার অন্তর্দৃষ্টি আছে শুধু সে ব্যক্তি বাহ্যঘটনা-পরম্পরার অন্তরালে অন্তঃসলিলা ফল্গুনদীরূপা এই আদর্শের ধারাকে ধরিতে পারে। এই আদর্শই আমাদের যুগধর্ম— the idea of the age. ইহার উপলব্ধি সব সময়ে হয় না বলিয়া আমরা প্রায়শ ভ্রান্ত পথের দিকে আকৃষ্ট হই— ভ্রান্ত গুরুর অনুবর্তী হই। হে ছাত্রমণ্ডলী, যদি জীবন গঠন করিতে চাও— তবে ভ্রান্ত গুরু ও

ভ্রান্ত পথের প্রভাব হইতে আত্মরক্ষা করো। নিজে আত্মস্থ হইয়া জীবনের প্রকৃত আদর্শ চিনিয়া লও।

১৫ বৎসর পূর্বে যে আদর্শ বাংলার ছাত্রসমাজকে অনুপ্রাণিত করিত তাহা স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শ। সে আদর্শের প্রভাবে তরুণ বাঙালী ষড়রিপু জয় করিয়া স্বার্থপরতা ও সকল প্রকার মলিনতা হইতে মুক্ত হইয়া আধ্যাত্মিক শক্তির বলে শুধু বুদ্ধ-জীবন লাভের জন্য বদ্ধপরিকর হইত। সমাজ ও জাতি গঠনের মূল— ব্যক্তিত্ব বিকাশ। তাই স্বামী বিবেকানন্দ সর্বদা বলিতেন "man making is my mission"— খাঁটি মানুষ তৈয়ারি করাই আমার জীবনের উদ্দেশ্য।

কিন্তু ব্যক্তিত্ব বিকাশের দিকে এত জোর দিলেও স্বামী বিবেকানন্দ জাতির কথা একেবারে ভুলিয়া যান নাই! কর্মহীন সন্ন্যাসে অথবা পুরুষকারহীন অদৃষ্টবাদে তিনি বিশ্বাস করিতেন না। রামকৃষ্ণ পরমহংস নিজের জীবনের সাধনার ভিতর দিয়া সর্বধর্মের যে সমন্বয় করিতে পারিয়াছিলেন তাহাই স্বামীজীর জীবনের মূলমন্ত্র ছিল এবং তাহাই ভবিষ্যৎ ভারতের জাতীয়তার মূলভিত্তি। এই সর্বধর্মসমন্বয় ও সকল-মত-সহিষ্ণুতার প্রতিষ্ঠা না হইলে আমাদের এই বৈচিত্র্যপূর্ণদেশে জাতীয়তার সৌধ নির্মিত হইতে পারিত না।

রাজা রামমোহনের যুগ

বিবেকানন্দ-যুগের পূর্বে যখন আমাদের দেশে নবযুগ প্রথম আরম্ভ হয় তখন আমাদের পথপ্রদর্শক ছিলেন রাজা রামমোহন রায়। ধর্মের নামে যে-সব অধর্ম চলিতেছিল, যে-সব আবর্জনা ও কুসংস্কার ধর্মের নামে সমাজ-দেহকে আচ্ছন্ন করিয়াছিল এবং হিন্দুসমাজকে শতধা বিভক্ত করিয়াছিল, তাহা ধ্বংস করিবার জন্য রাজা রামমোহন কৃতসংকল্প হইয়াছিলেন। বেদান্তের সত্য প্রচারিত হইলে হিন্দুসমাজ ধর্মের বহিরাবরণ বর্জন করিয়া সত্য ধর্ম আশ্রয় করিতে পারিবে এবং ভেদজ্ঞান ভুলিয়া আবার একতা-সূত্রে আবদ্ধ হইতে পারিবে এ বিশ্বাস তাঁহার ছিল। এবং ধর্মজগতে বিপ্লব আনিতে হইলে, আগে চিন্তাজগতে আলোড়ন সূচনা করা দরকার— তাই ভারতের চিন্তা-শক্তিকে জাগাইবার জন্য তিনি পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিয়াছিলেন।

কেশবচন্দ্রের যুগ

ভারতকে জাগাইবার জন্য মনোরাজ্যে যে বিপ্লব রামমোহন প্রবর্তিত করিলেন, পরবর্তী যুগে সে বিপ্লব সমাজের মধ্যে আসিয়া পড়িল। কেশবচন্দ্রের যুগে সমাজ-সংস্কারের কাজ দ্রুতগতিতে চলিতে লাগিল। ব্রাহ্মসমাজের নূতন বাণীর প্রভাবে সমগ্র দেশে নবজাগরণ আরম্ভ হইল। কিছুকাল পরে যখন ব্রাহ্মসমাজ হিন্দুসমাজ হইতে পৃথক হইয়া পড়িল এবং হিন্দুসমাজের মধ্যেও জাগরণের সূচনা হইল তখন ব্রাহ্মসমাজের প্রভাব ক্রমশ হ্রাস পাইতে লাগিল।

স্বামীজীর বাণী

রামমোহনের যুগ হইতে বিভিন্ন আন্দোলনের ভিতর দিয়া ভারতের মুক্তির আকাঙ্ক্ষা ক্রমশ প্রকটিত হইয়া আসিতেছে। ঊনবিংশ শতাব্দীতে এই আকাঙ্ক্ষা চিন্তারাজ্যে ও সমাজের মধ্যে দেখা দিয়াছিল কিন্তু রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে তখনো দেখা দেয় নাই— কারণ তখনো ভারতবাসী পরাধীনতার মোহনিদ্রায় নিমগ্ন থাকিয়া মনে করিতেছে যে ইংরেজের ভারত-বিজয় একটা দৈব ঘটনা বা divine dispensation। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে এবং বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে স্বাধীনতার অখণ্ড রূপের আভাস রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের মধ্যে পাওয়া যায়। "Freedom, Freedom is the Song of the Soul।" এই বাণী যখন স্বামীজীর অন্তরের রুদ্ধ দুয়ার ভেদ করিয়া নির্গত হয় তখন তাহা সমগ্র দেশবাসীকে মুগ্ধ ও উন্মত্তপ্রায় করিয়া তোলে। তাঁহার সাধনার ভিতর দিয়া, আচরণের ভিতর দিয়া, কথা ও বক্তৃতার ভিতর দিয়া— এই সত্যই বাহির হইয়াছিল।

স্বামী বিবেকানন্দ মানুষকে যাবতীয় বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া খাঁটি মানুষ হইতে বলেন, অপরদিকে সর্বধর্মসমন্বয় প্রচার ভারতের জাতীয়-তার ভিত্তিরূপে সংস্থাপন করেন। রামমোহন রায় মনে করিয়াছিলেন যে সাকারবাদ খণ্ডন করিয়া, বেদান্তের নিরাকারবাদ প্রতিষ্ঠা করিয়া তিনি জাতিকে একটা সার্বভৌমিক ভিত্তির উপর দাঁড় করাইতে পারিবেন। ব্রাহ্ম-সমাজও সেই পথে চলিয়াছিল কিন্তু ফলে হিন্দুসমাজ যেন আরো দূরে সরিয়া গেল। তারপর বিশিষ্টাদ্বৈতবাদমূলক বা দ্বৈতাদ্বৈতবাদমূলক সত্য প্রচারের দ্বারা এবং সকল-মত-সহিষ্ণুতার শিক্ষা দিয়া রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দ জাতিকে একতাসূত্রে গাঁথিবার চেষ্টা করিলেন।

অরবিন্দের বাণী

যে স্বাধীনতার অখণ্ড রূপ বিবেকানন্দের মধ্যে আমরা দেখিতে পাই তাহা বিবেকানন্দের যুগে রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে প্রবেশ করে নাই। অরবিন্দের মুখে আমরা সর্বপ্রথম রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার বাণী শুনিতে পাই। অরবিন্দ যখন বন্দেমাতরম্ পত্রিকায় লিখিলেন "We want complete autonomy, free from British control"— তখন স্বাধীনতাকামী তরুণ বাঙালী বুঝিল যে এতদিন পরে সে মনের মতো মানুষ পাইয়াছে। ভাবপ্রবণ বাঙালী স্বাধীন ভারতের স্বপ্ন দেখিয়া বিভোর হইল। এখনো কানে বাজে সেই বাণী যাহা অরবিন্দ কলিকাতার মুক্ত প্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া একদিন বলিয়াছিলেন ঃ—

"I should like to see some of you becoming great ; great, not for your own sake, but to make India great— so that she may stand up with head erect among the free nations of the world".

পরিপূর্ণ স্বাধীনতার প্রেরণা পাইয়া বাঙালী জাতি ঝড়তুফান অগ্রাহ্য করিয়া, বিপ্লবের ঝঞ্ঝার ভিতর ছুটিয়া আসিয়াছে।

মহাত্মাজীর নূতন বাণী

১৯২১ খ্রীস্টাব্দে আমরা যখন আসিয়া পৌঁছিলাম তখন অসহযোগের বাণীর সঙ্গে সঙ্গে আমরা আর-একটা কথা শুনিলাম মহাত্মা গান্ধীর মুখে— "জনসাধারণকে বাদ দিলে এবং তাহাদের মধ্যে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা না জাগাইতে পারিলে, স্বরাজ লাভ হইতে পারে না।" অসহযোগের পন্থা ভারতে বা বাংলাদেশে নূতন কিছু নয়। সেদিনও যশোহর জেলাবাসী এই পন্থা অবলম্বন করিয়া নীলকরের অত্যাচার হইতে আত্মরক্ষা করিয়াছিল। কিন্তু যে "গণবাণী" মহাত্মা গান্ধীর মুখে শোনা যায় তাহা ভারতের রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে নূতন কথা।

দেশবন্ধুর আদর্শ

এই বাণী আরো পরিস্ফুট হইয়াছিল দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের জীবনে। তিনি তাঁহার লাহোরের বক্তৃতায় অতি স্পষ্টভাবে ঘোষণা করেন যে যে-স্বরাজ তিনি লাভ করিতে চান— তাহা মুষ্টিমেয় লোকের জন্য নহে— তাহা সকলের জন্য,

জনসাধারণের জন্য। "Swaraj for the masses"— এই আদর্শ তিনি নিখিল ভারতীয় শ্রমিক সভায় দেশবাসীর সম্মুখে উপস্থাপিত করেন।

আর একটা বাণী আমরা দেশবন্ধুর জীবনে পাই। এই যে মানুষের জীবন— জাতির এবং ব্যক্তির জীবন— ইহা একটি অখন্ড সত্য। এই জীবনকে দ্বিধা বা বহুধা বিভক্ত করা যায় না। মানুষের প্রাণ যখন জাগে তখন তাহা সব দিক দিয়া জাগে, সর্বক্ষেত্রে তাহার নবজীবনের লক্ষণ পরিলক্ষিত হয়। বিশ্বজগৎ তথা মনুষ্যজীবন— বৈচিত্র্যপূর্ণ। এই বৈচিত্র্যের লোপ করিলে জীবনের বিকাশ হইবে না— বরং আমরা মরণের বা ধ্বংসের দিকে চলিব। তাই বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়া, "বহুর" মধ্য দিয়া ব্যক্তির এবং জাতির বিকাশ সাধন করিতে হইবে।

বর্তমান যুগে রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দ আধ্যাত্মিক জগতে "এক" এবং "বহুর" মধ্যে যে সমন্বয় স্থাপন করিয়াছিলেন— সে সমন্বয় দেশবন্ধু জাতির জীবনে এবং রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে সাধন করিয়াছিলেন বা করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন। দেশবন্ধু "শিক্ষার মিলনে" যেরূপ বিশ্বাস করিতেন "শিক্ষার বিরোধ"ও তদ্রূপ বিশ্বাস করিতেন— এক কথায় তিনি Federation of Cultures-এ বিশ্বাস করিতেন এবং ভারতের মৌলিক একতায় প্রগাঢ় বিশ্বাসী হইলেও বাংলার বৈশিষ্ট্যেও বিশ্বাসবান ছিলেন। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তিনি ভারতবর্ষের Centralised State অপেক্ষা Federal State বেশি পছন্দ করিতেন।

স্বাধীনতার অখন্ড রূপ

যে সর্বাঙ্গীণ বিকাশে দেশবন্ধু এত বিশ্বাসী ছিলেন তাহাই এই যুগের সাধনা। এই সাধনা সার্থক করিতে হইলে স্বাধীনতার অখন্ডরূপ আগে দর্শন করা চাই। আদর্শের পরিপূর্ণ উপলব্ধি না হইলে মানুষ কর্মক্ষেত্রে কখনো জয়যুক্ত হইতে পারে না। তাই আজ সারা ভারতকে এবং বিশেষ করিয়া ভারতের তরুণ সমাজকে বলিয়া দিতে হইবে যে, যে স্বাধীন ভারতের স্বপ্ন আমরা দেখি সে রাজ্যে সকলে মুক্ত— ব্যক্তি মুক্ত, সমাজও মুক্ত, সেখানে মানুষ রাষ্ট্রীয় বন্ধন হইতে মুক্ত, সামাজিক বন্ধন হইতে মুক্ত এবং অর্থের বন্ধন হইতে মুক্ত। রাষ্ট্র, সমাজ ও অর্থনীতি— এই ত্রিতাপ হইতে আমরা মানবজাতিকে, দেশবাসীকে মুক্ত করিতে চাই।

পরিপূর্ণ ও সর্বাঙ্গীণ মুক্তিলাভ

যাহারা মনে করে রাষ্ট্রীয় বন্ধন হইতে তাহারা দেশকে মুক্ত করিবে কিন্তু সমাজের পূর্বাবস্থা বজায় রাখিবে— অথবা যাহারা মনে করে যে সামাজিক বন্ধন সব চূর্ণ করিবে কিন্তু রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে কোনো বিপ্লব আনিবে না— তাহারা সকলেই ভ্রান্ত। বস্তুত শরীরে স্বাস্থ্য ফিরিয়া আসিলে প্রত্যেক অঙ্গে যেরূপ পূর্বশ্রী ফিরিয়া আসে— মুক্তির আকাঙ্ক্ষা যখন জাতির অন্তরে জাগিয়া উঠে তখন তাহা সব দিক দিয়া ফুটিয়া বাহির হয়। জাতি যখন সমস্ত বন্ধন হইতে মুক্ত হইতে চায় তখন কেহ বলিতে পারে না— thus far and no further.

আমাদের এই শতছিদ্রযুক্ত, পূতিগন্ধময় সমাজের দ্বারা পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ কোনোদিন হইবে না। পূর্ণ স্বাধীনতা (complete independence) লাভ করিতে হইলে সমস্ত জাতিকে মুক্তিলাভের জন্য ক্ষিপ্তপ্রায় হইতে হইবে। কিন্তু যে ব্যক্তি সামাজিক অত্যাচারে নিষ্পিষ্ট অথবা অর্থনৈতিক বৈষম্যে ভারাক্রান্ত, সে ব্যক্তি রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার জন্য পাগল হইবে কেন? যার কাছে সামাজিক ও অর্থনৈতিক অত্যাচারই সবচেয়ে বড়ো সত্য— সে ব্যক্তি এই-সব অত্যাচার হইতে মুক্ত হইতে না পারিলে রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা লাভের জন্য উদ্‌গ্রীব হইবে কেন?

আজ এই কথাটি আমি খুব বড়ো করিয়া এখানকার ছাত্রসমাজের মধ্যে বলিতে আসিয়াছি— যে যুগে আপনারা জন্মিয়াছেন সে যুগের ধর্ম— পরিপূর্ণ ও সর্বাঙ্গীণ মুক্তি লাভ। স্বাধীন দেশে স্বাধীন আবহাওয়ার মধ্যে আমাদের জাতি জন্মিতে চায়— বর্ধিত হইতে চায় এবং মরিতে চায়। 'পুরুষ অবরুদ্ধ আপন দেশে, নারী অবরুদ্ধ নিজ নিবাসে'— এ অবস্থা আর কতদিন চলিবে। আমাদের নারীসমাজের বর্ণনা করিবার সময়ে আমরা আর কতদিন বলিব—

'অচল হয়েও সচল সে যে
বন্যার চেয়েও ভারী।
মানুষ হয়েও সঙের পুতুল
বঙ্গদেশের নারী।'

স্বাধীনতার নামে অনেকের আতঙ্ক উপস্থিত হয়। রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার কথা ভাবিলে অনেকে স্বপ্ন দেখেন রক্ত-গঙ্গার এবং ফাঁসিকাঠের। সামাজিক

স্বাধীনতার কথা ভাবিলে অনেকে দেখিতে পান উচ্ছৃঙ্খলতার বিভীষিকা। কিন্তু আমি উচ্ছৃঙ্খলতার ভয়ে ভীত নহি। মানুষের মধ্যে যদি ভগবান বিরাজ করেন, অথবা মানুষের মধ্যে যদি মানবতা থাকে ; যদি ভগবান সত্য হন— যদি মানুষ সত্য হয়— তবে মানুষ চিরকাল পথভ্রষ্ট বা ভ্রান্ত হইতে পারে না। স্বাধীনতার মদিরা পান করিয়া যদি আমরা কিছু সময়ের জন্য অপ্রকৃতিস্থ হই তাহা হইলেও অচিরে আমরা আত্মস্থ হইব। আমাদের স্বাধীনতা প্রাপ্তির যে দাবি— তাহা ভুলভ্রান্তি করিবার অধিকারের দাবি বৈ আর-কিছু নয় (the right to make mistakes), অতএব উচ্ছৃঙ্খলতার বিভীষিকা না দেখিয়া মুক্তিপথে আগুয়ান হও ; নিজের মানবতায় বিশ্বাসী হইয়া মনুষ্যত্ব লাভের চেষ্টায় সর্বদা নিরত হও।

আজ দেশের মধ্যে তিনটি বড়ো সম্প্রদায় একপ্রকার নিশ্চেষ্ট হইয়া পড়িয়া আছে— নারী সমাজ, উপেক্ষিত তথাকথিত অনুন্নত সমাজ এবং কৃষক ও শ্রমিক সমাজ। ইহাদের নিকট গিয়া বলো— তোমরাও মানুষ ; মনুষ্যত্বের পূর্ণ অধিকার তোমরাও পাইবে। অতএব ওঠো, জাগো, নিশ্চেষ্টতা পরিহার করিয়া নিজের প্রাপ্য অধিকার করিয়া লও।

অখণ্ড মুক্তির উপাসক হও

হে বাংলার ছাত্র ও তরুণ সমাজ ! তোমরা পরিপূর্ণ ও অখণ্ড মুক্তির উপাসক হও। তোমরাই ভবিষ্যৎ ভারতের উত্তরাধিকারী ; অতএব তোমরাই সমস্ত জাতিকে জাগাইবার ভার গ্রহণ করো। তোমাদের প্রত্যেকের মধ্যে আছে— অনন্ত, অপরিসীম শক্তি। এই শক্তির উদ্বোধন করো এবং এই নবশক্তি অপরের মধ্যে সঞ্চার করো ; তোমাদের নিকট নূতন স্বাধীনতামন্ত্রে দীক্ষিত সমস্ত জাতি আবার বাঁচিয়া উঠুক !

যেদিন ভারত পরাধীন হইয়াছে— সেই দিন হইতে ভারত সমষ্টিগত সাধনা (Collective Sadhana) ভুলিয়া ব্যক্তিত্বের বিকাশের দিকে সমস্ত শক্তি নিয়োগ করিয়াছে ! ফলে কত শত মহাপুরুষ এই দেশে আবির্ভূত হইয়াছেন অথচ তাঁহাদের আবির্ভাব সত্ত্বেও জাতি আজ কিরূপ শোচনীয় অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে। জাতিকে আবার বাঁচাইতে হইলে সাধনার ধারা আবার অন্য দিকে পরিচালিত করিতে হইবে। জাতিকে বাদ দিয়া ব্যক্তিত্বের সার্থকতা নাই— এ কথা আজ সকলকে হৃদয়ংগম করিতে হইবে।

আমাদের জাতির বহু লোক— পুরুষানুক্রমে বহু জ্ঞান ও সম্পদ, আহরণ করিয়া আসিতেছে। এতদিন পর্যন্ত সমস্ত জাতি সে জ্ঞান ও সে সম্পদের অধিকারী হইতে পারে নাই। আজ হইতে তাহাকে অধিকারী করিয়া দিতে হইবে। সকলকে বুঝাইয়া দিতে হইবে, যে-ভারতের প্রতিষ্ঠা আমরা করিতে চাই— সেখানে জাতিধর্ম-নির্বিশেষে সকলের সমান অধিকার, সমান দাবি, সমান সুযোগ। যেদিন সমস্ত দেশ এ কথা বুঝিবে সেদিন সমস্ত সমাজ মুক্ত হইবার জন্য অধীর, উন্মত্ত হইবে।

অসবর্ণ বিবাহের প্রয়োজনীয়তা

আর একটি কথা বলিয়া আমার বক্তব্য শেষ করিব। জাতির রক্তস্রোত যেন ক্ষীণ হইয়া আসিতেছে। এখন চাই নূতন রক্ত। ভারতের ইতিহাস পড়িয়া দেখ— বহুবার রক্ত-সংমিশ্রণ ঘটিয়াছে। এই রক্ত-সংমিশ্রণের ফলে ভারতীয় জাতি বার বার মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া পুনর্জীবন লাভ করিয়াছে। যাঁহারা বর্ণসংকরে ভয় করেন তাঁহারা আমাদের জাতির ইতিহাস জানেন না এবং তাঁহারা মানব-বিজ্ঞান (anthropology) সম্পর্কে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। আজ অসবর্ণ বিবাহ প্রবর্তনের দ্বারা যথেষ্ট রক্ত-সংমিশ্রণ ঘটিবে এবং এই রক্ত-সংমিশ্রণের ফলে জীবনীশক্তি আমরা ফিরিয়া পাইব।

সকলকে জাগাও

ভ্রাতৃমণ্ডলী! আজ আমার বক্তব্য এইখানে শেষ করিব। সাম্যবাদ ও স্বাধীনতা-মন্ত্র প্রচার করিবার জন্য তোমরা গ্রামে গ্রামে ছড়াইয়া পড়ো। স্বাধীন ভারতের যে দৃশ্য তোমাদের সম্মুখে ধরিলাম তাহা সমগ্র দেশবাসীর সম্মুখে ধরো। স্বাধীনতার পূর্ব স্বাদ নিজের অন্তরে পাইলে সকলেই পাগল হইয়া উঠিবে। এই স্বাদ— এই অনুভূতি নিজের অন্তরে আগে অবশ্য পাওয়া চাই। নিজে অন্তরে এই আলোক জ্বালো— সেই দীপ হস্তে লইয়া দেশবাসীর দ্বারবর্তী হও। যাও চীনা ছাত্রদের মতো— রুশ তরুণদের মতো— চাষীর পর্ণ কুটীরে, মজুরদের আবর্জনাপূর্ণ ভগ্নগৃহে। তাহাদের জাগাও। আর যাও— মাতৃ-জাতির সমীপে। যাঁহারা শক্তিরূপিণী অথচ সমাজের চাপে আজ রহিয়াছেন 'অবলা'—তাঁদেরও জাগাও— বলো—

'আপনার মান রাখিতে জননী
আপনি কৃপাণ ধরো।'

সর্বোপরি যাও দলে দলে বাংলার উপেক্ষিত সমাজের কাছে। বলো— 'ভাই এতদিন পরে এসেছি তোমাদের কাছে নূতন মন্ত্র নিয়ে তোমাদের মুক্ত করতে — মনুষ্যত্বের পূর্ণ অধিকার তোমাদেরও প্রাপ্য, এই কথা তোমাদের বলতে। তোমরা ওঠো, জাগো— এ বীরভোগ্যা বসুন্ধরা তোমাদেরও ভোগ্যা।'

জিজ্ঞাসা করি— এ কাজ করতে পারবে? হ্যাঁ পারবে, অবশ্য পারবে। তোমরা পারবে এ কাজ করতে— এ কথা আমি আজ বলতে এসেছি। এগিয়ে চলো— জয় তোমাদের অবশ্যম্ভাবী। তোমাদের সাধনা সিদ্ধ হউক— ভারত আবার মুক্ত হউক— তোমাদের জীবনও সার্থক হউক।

বন্দেমাতরম্!

জামশেদপুর টিনপ্লেট কারখানায় ধর্মঘট

৩০ জুলাই ১৯২৯ জামশেদপুরে অনুষ্ঠিত এক বিশাল জনসভায় প্রদত্ত ভাষণ।

টাটা কোম্পানির ম্যানেজিং ডিরেক্টর মি. পিটার্সনের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হইয়াছে। ধর্মঘটজনিত পরিস্থিতি সম্পর্কে তাঁহার সঙ্গে আমার বিস্তৃত আলোচনা হইয়াছে। মি. পিটার্সন আমাকে বলিয়াছেন যে তিনি ধর্মঘটের মীমাংসা করার জন্য টিনপ্লেট কোম্পানির জেনারেল ম্যানেজারকে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন কিন্তু সফল হন নাই। তিনি বলিলেন, টিনপ্লেট কর্তৃপক্ষের বক্তব্য এই যে শ্রমিক কর্মচারীরা বিনা নোটিশেই হঠাৎ ধর্মঘট করিয়াছে এবং কোম্পানি উহার আবশ্যকমতো নূতন লোক নিয়োগ করিয়াছে। তাহার ফলে পুরানো লোকদের আর তাহারা ফিরাইয়া লইতে চায় না। কিন্তু টাটার শ্রমিকরা যখন ধর্মঘট করিয়াছিল তখনো পরিস্থিতি এ রকমই হইয়াছিল। সেখানেও নূতন লোক নিয়োগ করা হইয়াছিল। কিন্তু যখন মীমাংসা হইল, তখন এই-সব ওজর তোলা হয় নাই। টাটা কোম্পানি টিনপ্লেট কোম্পানির অন্যতম অংশীদার। তাহাদের উচিত ধর্মঘট মীমাংসা করার জন্য ম্যানেজমেণ্টের উপর চাপ সৃষ্টি করা। নতুবা টিনপ্লেট শ্রমিকদের টাটা ও বজবজের শ্রমিকদের নিকট হইতে নৈতিক ও বৈষয়িক সাহায্য লইতে হইবে।

আপনারা শেষ পর্যন্ত দৃঢ় থাকিবেন। টিনপ্লেট কোম্পানি যে শুল্কের রক্ষাকবচ (Tariff Protection) ভোগ করে তাহা প্রত্যাহার করার জন্য আমি ব্যবস্থাপক সভার সদস্যদের অনুরোধ করিব। বর্মা অয়েল কোম্পানি ও অন্যান্য বিদেশী কোম্পানির মধ্যে বিশেষ কোনো পার্থক্য নাই। বর্মা অয়েল কোম্পানিও উহার শ্রমিকদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করে। সুতরাং, ভারতের করদাতাদের স্বার্থের বিনিময়ে টিনপ্লেট কোম্পানি শুল্কের রক্ষাকবচ পাইতে পারে না। এই সংরক্ষণ-নীতি প্রত্যাহার করা হইলে টিনপ্লেট কোম্পানির কিভাবে চলে আমি তাহা জানিতে চাই।

ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে বর্মা অয়েল কোম্পানির যে শ্রমিক-কর্মচারীরা আছেন তাঁহাদের সক্রিয় সহানুভূতি পাইতে আমি চেষ্টা করিব। ২৮ জুলাই এক জনসভায় শ্রীহোমি যে উগ্র বক্তৃতা দিয়াছেন সেজন্য আমি দুঃখিত। তাঁহাকে কিছু করা হয় নাই। কিন্তু ভাবিয়া দেখুন বাবা গুরুদিৎ সিংয়ের মতো একজন শান্তিপূর্ণ মানুষকে আদালতে সোপর্দ করা হইয়াছে।

ম্যানেজমেণ্ট ও তাঁহদের সমর্থকরা বলিতেছেন যে টিনপ্লেট কোম্পানিতে কোনো ধর্মঘট হয় নাই। তবে এত ঘোড়সওয়ার বাহিনী, সশস্ত্র পুলিশবাহিনী কেন? কারখানার ভিতরে বিশেষ পাঠান রক্ষী কেন? গত বছর যখন টাটা কারখানায় ধর্মঘট হইয়াছিল তখনো এই-সব কথা বলা হইয়াছিল। আমি সুনিশ্চিত, আপনারা যদি দৃঢ়তার সঙ্গে আপনাদের সংগ্রাম চালাইয়া যান তবে ম্যানেজমেণ্ট তাহাদের মনোভাব পালটাইতে বাধ্য হইবেন।

একগুঁয়ে বর্মা অয়েল কোম্পানি

৩ আগস্ট সংবাদপত্রে প্রকাশিত বিবৃতি।

জামশেদপুরের গোলমুড়িতে অবস্থিত টিনপ্লেট কারখানায় ধর্মঘটের ফলে উদ্ভূত পরিস্থিতির কথা জনসাধারণ অনেকদিন যাবৎই অবগত আছেন। টিনপ্লেট কারখানার প্রকৃত মালিক হইলেন বর্মা অয়েল কোম্পানি। বর্মা অয়েল কোম্পানি এ দেশের সমৃদ্ধতম কোম্পানিগুলির অন্যতম। তবু পার্শ্ববর্তী টাটা কোম্পানির শ্রমিকদের তুলনায় টিনপ্লেট কোম্পানির শ্রমিকদের অবস্থা অনেক খারাপ। টিনপ্লেট কোম্পানির শ্রমিকদের দাবি বেশি নয়। বহু বছর যাবৎ টাটার শ্রমিকরা যাহা পাইতেছে তাহার অনেক কমে টিনপ্লেট শ্রমিকরা কাজ করে। কিন্তু টিনপ্লেট কোম্পানি একেবারেই অনমনীয়। মীমাংসার জন্য খোলাখুলি আলোচনায় নামিতে তাঁহারা নারাজ। যদিও তাঁহাদের বহু লোকসান হইতেছে তবু যতদিন সম্ভব শক্ত হইয়া বসিয়া থাকিয়া সম্ভবত তাঁহারা ধর্মঘট ভাঙিয়া দিতে চান। তাঁহারা আশা করিতেছেন যে বর্মা অয়েল কোম্পানির যে বিশাল অর্থসম্পদ রহিয়াছে তাহার জোরে তাঁহারা শেষ অবধি জিতিবেন। টিনপ্লেট কোম্পানি হয়তো ভুলিয়া গিয়াছে যে তাহাদের রক্ষাকবচ মঞ্জুর করা হইয়াছে বলিয়াই তাহারা এদেশে ব্যবসা করিতে পারিতেছেন। টিনপ্লেট কোম্পানি তাহাদের বর্তমান একগুঁয়ে মনোভাব অবিচলিত রাখিলে আমদানীকৃত টিনপ্লেটের উপর সংরক্ষণ শুল্ক তুলিয়া দিবার জন্য ব্যবস্থাপক সভার ভারতীয় সদস্যদের শীঘ্রই ব্যবস্থা লইবার সময় আসিবে। ভারতীয় শ্রমিকদের প্রতি সম্পূর্ণ সহানুভূতিবর্জিত ও

মমতাশূন্য একটি বিদেশী কোম্পানিকে সংরক্ষণের সুবিধা দেওয়া হইতেছে ও সেজন্য ভারতের জনগণকে মূল্য বহন করিতে হইতেছে— কেন এ অবস্থা চলিবে ? তাই আমি ব্যবস্থাপক সভার সদস্যদের অনুরোধ করিতেছি তাঁহারা যেন সভার আগামী অধিবেশনেই এই মর্মে প্রস্তাব পাস করেন যে ভারত-সরকার আমদানীকৃত টিনপ্লেটের উপর হইতে সংরক্ষণমূলক শুল্ক প্রত্যাহার করিয়া লউন। আমি সানন্দে বলিতেছি, কয়েকজন বন্ধু আমাকে আশ্বাস দিয়াছেন যে তাঁহারা ব্যবস্থাপক সভার আগামী অধিবেশনেই এই বিষয়টি উত্থাপন করিবেন।

আবেদন

কর্মীদের পক্ষে মামলা চালানো

জনসাধারণ অবগত আছেন যে গত বারো মাসে জনসেবার কাজে রত থাকাকালে কিছু কর্মীর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হইয়াছে। বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় সরকার যে সংখ্যাতথ্য দিয়াছেন তাহাতে দেখা যায় যে গত ছয় মাসে তৎ-পূর্ববর্তী ছয় মাসের তুলনায় দ্বিগুণসংখ্যক ব্যক্তির বিরুদ্ধে এইভাবে মামলা দায়ের করা হইয়াছে। সরকার ইহাও স্বীকার করিয়াছেন যে বৎসর শেষ হইবার আগে তাঁহাদের নীতি পালটাইবেন না। এই-সব অভিযুক্ত কর্মীর পক্ষে মামলা চালানোর ফলে আমাদের ক্ষুদ্র অর্থভাণ্ডারের উপর খুবই চাপ পড়িয়াছে। আমরা এ পর্যন্ত অতি কষ্টে মামলা চালাইবার বন্দোবস্ত করিয়া আসিয়াছি, কিন্তু এখন সাহায্য না পাইলে আর চালানো অসম্ভব হইয়া পড়িবে। বাংলায় যাঁহাদের বিরুদ্ধে মামলা চলিতেছে তাঁহারা ছাড়াও অন্যান্য প্রদেশেও কিছু কর্মীর বিরুদ্ধে মামলা চলিতেছে। তাঁহাদের পক্ষে মামলা চালাইবার জন্য টাকা পাঠানো দরকার। এই-সব কারণে আমাদের অভিযুক্ত কর্মীদের পক্ষে মামলা চালাইতে সাহায্য করার জন্য উদারচিত্তে জনসাধারণের নিকট আমি আবেদন জানাইতেছি।··

সু.র. ২।১২

রেল শ্রমিকদের আন্দোলন

১৬ আগস্ট ১৯২৯ লিলুয়া ময়দানে ইস্ট ইণ্ডিয়ান রেল ইউনিয়নের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত শ্রমিক সমাবেশে সভাপতির ভাষণ।

শ্রমিক আন্দোলন স্বরাজ আন্দোলনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। রেল প্রশাসন একটি বিকৃতমনা রেল বোর্ডের মাধ্যমে শ্রমিক-কর্মচারীদের অভিযোগগুলির বিচার করিতেছে। রেল বোর্ডে একজনও ভারতীয় সদস্য নাই। রেল প্রশাসনের জন্য দায়ী সহানুভূতিশূন্য সরকার। সরকারকে বাধ্য করিতে হইলে স্বরাজ আন্দোলন ও শ্রমিক আন্দোলনের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন করা অতি জরুরী। রেল হইতে অর্জিত মুনাফা প্রতিদিন বাড়িতেছে। অথচ গরিব শ্রমিকদের প্রতি পদে দণ্ড দেওয়া হইতেছে। রেলের বিদেশী প্রশাসকরা যতক্ষণ মুনাফায় ঘাটতি না পড়ে ততক্ষণ কোনোদিকে তাকাইয়া দেখে না—এমনই হৃদয়হীন। তৃতীয় শ্রেণীর রেলযাত্রীদের অভিযোগে তাহারা কর্ণপাত করে না। আপনারা অভিযোগ করিয়াছেন যে ছুটি সম্পর্কিত অন্যায় বিধি আপনাদের উপর চাপাইয়া দেওয়া হইতেছে। ইহাতে আশ্চর্য হইবার কিছু নাই। স্বরাজ লাভ করিলে তবেই আপনাদের অভিযোগগুলির মীমাংসা হইতে পারিবে। তাই স্বরাজের জন্য সংগ্রাম ও আপনাদের আন্দোলন একই সঙ্গে চালাইতে হইবে।

শ্রমিকদের অভিযোগগুলি আপাতদৃষ্টিতে বিচার করিয়া দেখার উদ্দেশ্যে ভারতে হুইটলি কমিশন আসিতেছে। কিন্তু তাহারা যে-ধরনের অনুসন্ধান করিবে তাহাতে আমার বিশ্বাস নাই। অপরপক্ষে আপনাদের কর্তব্য হইবে জগতের সামনে আপনাদের বক্তব্য তুলিয়া ধরা ও ক্রমাগত প্রচার চালাইয়া যাওয়া। আপনাদের অভিযোগগুলি পুস্তিকাকারে প্রকাশ করিতে হইবে এবং ঐ-সব পুস্তিকা সারা বিশ্বে পাঠাইতে হইবে। এইভাবেই আপনারা সভ্য জগতের সহানুভূতি লাভ করিতে পারিবেন। আপনাদের ন্যায্য লড়াই তাহার ফলে অনেক পরিমাণে সাহায্যপ্রাপ্ত হইবে।

শ্রমিক ইউনিয়নগুলির প্রতিদ্বন্দ্বী রূপে ওয়েলফেয়ার কমিটি গড়িয়া তোলা হইতেছে। উহার ফাঁদে আপনারা পা দিবেন না। এই ওয়েলফেয়ার কমিটিগুলি মধুর নামের আড়ালে আসলে সরকারী প্রতিষ্ঠান মাত্র। শ্রমিকদের দিক হইতে দেখিলে এগুলি অত্যন্ত আপত্তিকর সংগঠন। এগুলি বিশুদ্ধ

পুঁজিবাদী সংগঠন। উহাদের সংগে শ্রমিকদের কোনো সম্পর্কই থাকিতে পারে না। ঐগুলি হইতে আপনারা সর্বদাই দূরে থাকিবেন।

কোন্ পথ তবে আপনাদের পক্ষে সঠিক? আপনাদের আশু সমস্যা অবশ্য আপনাদের ছুটি সম্পর্কিত বিধির ব্যাপার। আপনারা মনে করেন যে এই বিধিগুলি অসংগত। কিন্তু এ সমস্যার আপনারা সমাধান করিবেন কিভাবে? ওয়েলফেয়ার কমিটির মাধ্যমে দরখাস্ত পেশ করিলেই আপনাদের সমস্যা নিশ্চয়ই মিটিবে না। রেল ইউনিয়নই আপনাদের একমাত্র আশাস্থল। আপনাদের স্থানীয় রেল ইউনিয়নে আপনারা যোগ দিন। কিন্তু দুঃখ হয় যে আপনাদের স্থানীয় ইউনিয়ন মৃতবৎ হইয়া পড়িয়াছে। উহার শূন্য তহবিল, অন্তর্কলহ, সদস্যসংখ্যা হ্রাস ও জনসাধারণের সহানুভূতির অভাবের দরুনই এই অবস্থা সৃষ্টি হইয়াছে। যদি আপনারা সত্যই চান যে কর্তৃপক্ষ আপনাদের অভিযোগ সমূহ বিচার করিয়া প্রতিকার করিবেন তবে আপনাদের নিজেদের ঘরটি আগে পাকাপোক্ত করিতে হইবে।

আপনাদের ইউনিয়নকে এইভাবে শক্তিশালী করিতে হইবে: ১. একটি শক্তিশালী কার্যনির্বাহ-কমিটি গঠন ২. নির্ভরযোগ্য রিজার্ভ ফান্ড গঠন ৩. আপনাদের ইউনিয়নকে স্বীকার করিতে কর্তৃপক্ষকে বাধ্য করা। ই. আই. রেল কর্তৃপক্ষ আপনাদের ইউনিয়নকে স্বীকৃতি দিতে দ্বিধা করিতেছেন কেন আমি তাহাই বুঝিতে পারি না। সরকার ট্রেড ইউনিয়ন আইন পাস করিয়াছেন। ঐ আইনের বিধান এই যে এই-সব ইউনিয়নকে স্বীকৃতি দিতে হইবে। ই. আই. রেল ঐ একই সরকারের মালিকানাধীন। আপনারা তাই ইউনিয়নের স্বীকৃতি আপনাদের অধিকার বলিয়া দাবি করিতে পারেন।

এই সূত্রে শ্রমবিরোধ আইনের কথা উল্লেখ করি। ঐ আইনে সালিসী বোর্ড গঠনের কথা আছে। শ্রমিক অসন্তোষ দেখা দিলে এই বোর্ড গঠন করিতে সরকার বাধ্য। গোলমুড়িতে টিনপ্লেট শ্রমিকরা ধর্মঘট করিয়াছে, কিন্তু সরকার এরকম কোনো বোর্ড গঠন করেন নাই। এই-সব ঘটনা হইতে ইহাই প্রমাণিত হয় যে সরকার পুঁজিপতিদের দিকে ঝুঁকিয়া আছেন, শ্রমিকদের প্রতি তাঁহার সহানুভূতি নাই। তাই আপনাদের ইউনিয়নের স্বীকৃতি আদায়ের জন্য আপনারা সর্বতোভাবে চেষ্টা করিবেন। আপনারা ব্যবস্থাপক সভায় ও রেল বোর্ডে এ প্রশ্ন তুলিবেন। প্রচার বাড়াইয়া চলুন। লক্ষ্য সাধন না হওয়া পর্যন্ত থামিবেন না। তবেই প্রত্যয়ের সংগে আপনারা

ইউনিয়নের মাধ্যমে বক্তব্য পেশ করিতে পারিবেন। আমিও দেখিতে চাই যে সে ক্ষেত্রেও সরকার আপনাদের দাবি উপেক্ষা করেন কিনা।

ধর্মঘট ঘন ঘন করা উচিত নয়। গুরুতর শিল্পবিরোধের ক্ষেত্রে চূড়ান্ত পন্থা রূপেই ধর্মঘটের ডাক দেওয়া উচিত। কিন্তু দেখা গিয়াছে, পর্যাপ্ত তহবিল ও ভালো সংগঠন না থাকার ফলে বহু ধর্মঘট ভাঙিয়া গিয়াছে। দীর্ঘদিন ধরিয়া ধর্মঘট চালাইয়া যাইবার মতো যথেষ্ট রসদ না থাকিলে ধর্মঘট আহ্বান করা অসংগত। পুঁজিপতিরা যদি জানিতে পারে যে ধর্মঘটীদের জমা তহবিল বিশেষ নাই, তাহাদের নতিস্বীকার করানো যাইবে, তাহা হইলে তাহারা অনমনীয় মনোভাব অবলম্বন করিবে। গত বৎসরের লিলুয়া ধর্মঘটই ইহার দৃষ্টান্ত। তহবিল ছিল না ও জনসাধারণের সমর্থন পায় নাই বলিয়া এই ধর্মঘট ব্যর্থ হয়। তাই আপনাদের প্রথম কর্তব্য ইউনিয়নের স্বীকৃতি আদায় করা ও স্থায়ী ভিত্তির উপর উহাকে গড়িয়া তোলা। প্রকৃতপক্ষে আপনারা যদি শক্তি সঞ্চয় করিতে পারেন তবে ধর্মঘট করার হয়তো প্রয়োজন হইবে না; ধর্মঘটের হুমকিতেই আপনাদের উদ্দেশ্য সফল হইতে পারিবে। ইংলণ্ডে ইস্পাত শিল্পের ইউনিয়ন খুব শক্তিশালী। সেখানকার শ্রমিকদের কখনো ধর্মঘট করার প্রয়োজন হয় নাই। তাহারা এত শক্তিশালী যে পুঁজিপতিরা তিক্ততা সৃষ্টি না করিয়াই তাহাদের দাবি-দাওয়া মানিয়া লওয়া সুবিবেচনার কাজ বলিয়া মনে করিয়াছে।

আপনারা হাজারে হাজারে ইউনিয়নে যোগ দিন। আমি যথাসম্ভব আপনাদের সাহায্য করিব।

প্রকৃত আদর্শ কী

১৭ আগস্ট ১৯২৯ রাজশাহী শহরে অনুষ্ঠিত জেলা ছাত্র সম্মেলনে প্রদত্ত ভাষণ।

সমবেত মহিলাবৃন্দ, ভদ্রমণ্ডলী ও বন্ধুগণ :

আপনাদের কাছে বক্তৃতা দিতে আমি আনন্দ বোধ করি। কারণ, প্রথমত, আমাদের জাতীয় সমস্যার সমাধান তরুণদের উপরই নির্ভর করিতেছে বলিয়া আমি মনে করি। যুগসমস্যা নির্ণয় করার ও উহার সমাধান সন্ধান করার দায়িত্ব ও সামর্থ্য উভয়ই তাহাদের আছে। আমার মনে হয় আত্মার বীর্যের প্রকাশই যৌবন। দ্বিতীয়ত, যদিও আমার ছাত্রজীবন কয়েক বছর আগেই শেষ হইয়াছে তবু বাঙালী ছাত্রের আশা-আকাঙ্ক্ষা কী তাহা আমি জানি। যে-সকল বিপদ ও বাধা তাহাকে প্রতিহত করে সে সম্বন্ধেও আমি সচেতন।

যেমন ব্যক্তির জীবনে তেমনি জাতির জীবনেও গতি ও আত্মপ্রসারের ধর্ম আছে। যতক্ষণ জীবন স্পন্দমান থাকিবে ততক্ষণই ঐ ধর্ম সক্রিয় থাকিবে। ঐ ধর্মের ক্রিয়া স্তব্ধ হওয়া মাত্র জাতি ও ব্যক্তি জড়বৎ বা মৃতবৎ হইয়া পড়ে। গতি ও প্রসার— এই দুই মাপকাঠিতে আমাদের জাতি আজ কোন্ অবস্থায় পৌঁছিয়াছে তাহা নির্ণয় করিয়া লইতে হইবে।

আবার জাতির উত্থান ও পতনের মূলে একটি রহস্যময় নিয়ম ক্রিয়াশীল থাকে। ভূপৃষ্ঠ হইতে কয়েকটি জাতি নিঃশেষে মুছিয়া গিয়াছে। পর্বতগাত্রে বা ইতিহাসের পৃষ্ঠাতেই একমাত্র উহাদের চিহ্ন পাওয়া যায়। অপর পক্ষে, এমন কয়েকটি জাতি আছে যাহারা ঐভাবে মুছিয়া যায় নাই ও যাহাদের অস্তিত্ব আজও আমরা অনুভব করিতেছি। ইহার কারণ কী। কেন এই পার্থক্য? এক দিনে বা এক মাসে এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু উত্তর আমাদের খুঁজিয়া বাহির করিতেই হইবে। যদি এই রহস্যের মীমাংসা করিতে আমরা না পারি তবে কেমন করিয়া আমরা একটি নূতন জাতি গঠন করিব? পাশ্চাত্য মনীষীরা বলিয়াছেন যে যে-জাতি এই রহস্যের মীমাংসা করিতে পারিবে সেই জাতিরই উত্থান ঘটিবে— উহার যতবারই পতন হউক-না-কেন ততবারই উহার উত্থান ঘটিবে। যে জাতির অবক্ষয়ের লক্ষণ দেখা দিয়াছে তাহারই মানস জীবনে এমন বৈপ্লবিক সংঘাত আসা দরকার যাহার ফলে উহা নূতনভাবে ভাবনা-চিন্তা করিতে উদ্বুদ্ধ হইবে।

সভ্যতার এই নিয়মের কবল হইতে চীন, জাপান ও ভারত যে অব্যাহতি পাইয়াছে তাহার প্রকৃত কারণ হইল যে এই দেশগুলিতে অন্ধকার যুগের শেষভাগে চিন্তা-বিপ্লব ঘটিয়াছে। অপর পক্ষে, বিদেশীদের সঙ্গে সাংস্কৃতিক মিশ্রণও ঘটিয়াছে। ইহার ফলও হয়তো তাহাদের বাঁচিয়া থাকিতে সাহায্য করিয়াছে।

ইহার মধ্যে কোন্‌টি সত্য ও কোন্‌টি গুরুত্বপূর্ণ তাহা আপনারাই নির্ধারণ করুন। প্রশ্নটি যতই জটিল হোক, আপনাদের যদি জানিবার ইচ্ছা থাকে তবে উত্তর সহজেই পাইবেন। নূতন জাতি কিভাবে গঠন করা সম্ভব তাহা যদি জানিতে পারি বা জানিতে চেষ্টা করি তবে জীবন ধারণ সার্থক। ছাত্র-সম্মেলনের সামনে ইহাই প্রকৃত সমস্যা।

প্রকৃত আদর্শ কী

জিজ্ঞাসা করা যায়, মানবজীবনের প্রকৃত আদর্শ ও সাধনা কী? ঐ আদর্শে পৌঁছাইতে হইলে ছাত্রজীবনের আচরণবিধি কী হওয়া উচিত? জার্মান জাতিকে মহান ও আদর্শস্থানীয় রূপে গড়িয়া তোলার উদ্দেশ্যে নীট্‌শে অতি-মানবের তত্ত্ব উত্থাপন করিয়াছেন। এই তত্ত্ব আমিও প্রাসঙ্গিক মনে করি। নীট্‌শে প্রচলিত চিন্তাপদ্ধতিতে কিছু পরিবর্তন ঘটাইতে বলিয়াছেন ও একটি আচরণবিধিও বাতলাইয়াছেন। তিনি বিশ্বাস করিতেন খ্রীস্টীয় নীতিবোধ মানুষকে তাহার প্রকৃত আদর্শ হইতে বিপথে চালিত করিয়াছে, এক নূতন শ্রেণীর মানুষ সৃষ্টি করিতে হইলে খ্রীস্টীয় নীতিবোধকে ঘৃণাভরে পরিত্যাগ করিতে হইবে। তাঁহার তত্ত্ব আজও মান্য রহিয়াছে। সক্রেটিস, প্লেটো, অ্যারিস্টটল, টমাস মুর ও আমাদের প্রাচীন ঋষিগণ এমন একটি উপায়ের অন্বেষণ করিয়াছিলেন যাহা দ্বারা মানুষকে মানবতার এক উচ্চতর সোপানে উন্নত করা যায়। ইহাই হইবে সমাজের পক্ষে আদর্শ অবস্থা।

আমাদের আদর্শ তাহা হইলে কী? কোনো বিদেশী বা বহিরাগত এ সম্পর্কে উপদেশ দিতে পারে না। উত্তর আসিবে আমাদেরই ভিতর হইতে— আমাদের দেশের মানুষই সে উত্তর দিবে। আমাদের দৃষ্টি স্বচ্ছ না হইলে আমরা তো আমাদের আদর্শ খুঁজিয়া পাইব না। প্রথমে আমাদের আদর্শ স্থির করিতে হইবে, তারপরই আমরা আমাদের কর্তব্য নির্ধারণ করিতে পারিব।

মানুষ আদর্শের প্রতীক। যখন সে নিজের মধ্যে আদর্শের পূর্ণ রূপ দিতে পারে তখনই সে প্রশংসা লাভের যোগ্য হয়।

যুগে যুগে আদর্শের পরিবর্তন ঘটে। মানুষের দৃষ্টির প্রসার ও লব্ধ জ্ঞান অনুসারে তাহার আদর্শ গঠিত হয়। নানা উপায়ে আমরা আমাদের আদর্শ সাধনের প্রয়াস পাইয়াছি ও পাইতেছি। রাজা রামমোহনের ধর্মান্দোলন ও তাহার পর ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়া তাঁহার আদর্শ অভিব্যক্ত হইয়াছিল। কেশবচন্দ্র মনে করিয়াছিলেন যে অতিপ্রাকৃত বিশ্বাস হইতে সমাজকে মুক্ত করিতে না পারিলে আদর্শ মানুষ গঠন সম্ভব হইবে না। আবার আমরা বিশ্বাস করি যে রাজনৈতিক পরাধীনতা ও তাহার ফলজাত দমন-পীড়ন হইতে নিজেদের মুক্ত করিতে না পারিলে খাঁটি মানুষ গঠন করা যাইবে না। সেইজন্যই এই রাজনৈতিক আন্দোলন। এই সকল আন্দোলনের ভিতরে একটি মহান সত্য অনুসৃত আছে। তাহা এই যে, মানুষ রাজনৈতিক, ধর্মীয়, সামাজিক ও অর্থনৈতিক বন্ধন হইতে মুক্তি লাভ করিতে চায়। কিন্তু মুক্তির স্বরূপ কী তাহা তাহাদের জানা নাই।

আমরা মুক্তি চাই। বন্ধন মৃত্যুর লক্ষণ। মানুষ অন্ধকারে থাকিতে থাকিতে উহাতেই অভ্যস্ত হইয়া যায়; উহা হইতে আর বাহির হইয়া আসিতে চায় না। যেমন ধরুন আমাদের নারী সম্প্রদায়। অনেক সময় দেখা যায় তাহারাই তাহাদের ঘোরতর শত্রু।

এতদিন আমরা এই ধারণা লইয়া চলিয়াছি যে শুধু ধর্মীয় বা অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভ করিলেই আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে। ইহা আংশিক সত্য। কিন্তু মূলতঃ সত্য এই যে ব্যক্তির জীবন পরম সত্য ও জীবন্ত মানুষের পক্ষে সর্বাঙ্গীন স্বাধীনতা লাভ করা দরকার। ইহা অতি উচ্চ আদর্শ। এই আদর্শ পোষণ করাও শক্ত, বাস্তবে রূপ দেওয়া আরো শক্ত। এই আদর্শ সফল করিতে হইলে যাহাযাহি না করিয়া সকলের সমান অধিকার স্বীকার করিয়া লইতে হইবে। বাংলার ছাত্র ও যুবকদের সেই আদর্শ লাভের জন্য ব্রতী হইতে হইবে। তাই ভবিষ্যতের সকল আশা ও অভীপ্সা তাহাদেরই কেন্দ্র করিয়া গড়িয়া উঠিবে।

যে ছাত্র এই আদর্শ অনুসরণ করিবে তাহাকে বহু ব্যক্তিগত ক্ষতি স্বীকার করিতে হইবে, বহু বিপদ বরণ করিতে হইবে। তাহাকে হয়তো স্কুল বা কলেজ হইতে বহিষ্কৃত হইতে হইবে। কিন্তু তবু তাহার মনুষ্যত্ব বিকশিত হইবে।

আমার ব্যক্তিগত জীবনে যখন আমাকে কর্তৃপক্ষের সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল তখন আমি নিজের মধ্যে বিশাল শক্তি অনুভব করিয়াছিলাম এবং সেই শক্তিই এখনো আমাকে পথ দেখাইতেছে। ব্যক্তির জীবনে সেই মুহূর্ত হয়তো একবারই আসে যাহা তাহার জীবনের মাহেন্দ্রক্ষণ, সেই তাহার জীবনের সমগ্র ধারা বদলাইয়া দেয়। কর্তব্যবোধ খড়্গবাহাদুরকে সাহসিক কার্য করিতে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল। সে জানিত ইহার ফলে তাহার মৃত্যু অনিবার্য হইয়া উঠিবে। সৌভাগ্যবশত তাহার জীবন রক্ষা পাইয়াছে। কিন্তু একদিকে মৃত্যু, আর-একদিকে পূর্ণ মনুষ্যত্ব— ইহার মধ্যে একটি তাঁহাকে বাঁছিয়া লইতে হইয়াছিল। হাজার হাজার বই পড়িয়া বা শত শত সম্মেলন ও সভা করিয়া এই পরিবর্তন আনা যায় না, বা আত্মার এই মুক্তি সাধন করা সম্ভব হয় না।

চিন্তা করুন আমাদের নারী জাতির উপর প্রত্যহ কী পাশবিক অত্যাচার হইতেছে। ইহার কি কোনো প্রতিকার নাই? এদেশে মুষ্টিমেয় ইংরেজ বাস করে। কিন্তু তাহাদের মেয়েরা কোনোভাবেই অত্যাচারিত হয় না। কয়েক বৎসর আগে সীমান্ত প্রদেশে কী ঘটিয়াছিল তাহা হয়তো আপনাদের মনে আছে। কিছু উপজাতীয় লোক একজন ইংরেজ মহিলাকে অপহরণ করিয়াছিল। বিশ্বের সকল ইংরেজ সেই মহিলার উদ্ধারের জন্য একত্রে রুখিয়া দাঁড়াইয়াছিল।

আমাদের আদর্শের সামগ্রিক রূপ চিন্তা করুন। সর্বাঙ্গীণ মুক্তির এই ধারণা আপনাদের জীবনে অনুসরণ করার চেষ্টা করুন। যে নিজের জীবনকে পূর্ণ প্রকাশ করিতে চায় বাধা-বিপত্তি তাহার সম্মুখে থাকিবেই। কিন্তু যাহা সত্য তাহা জয়যুক্ত হইবেই। স্বাধীনতা ও সত্যকে আমি সার্থক বলিয়া মানি। স্বাধীনতা জীবনের লক্ষণ। আপনারা ইহা যথার্থ বলিয়া বিবেচনা করিলে একদিন ইহা বাস্তবে রূপায়িত হইবেই।

আমাদের সংগ্রাম যেভাবে চালিত হইতেছে তাহাতে জাতি মুক্তিলাভ করিতে পারিবে না। অস্পৃশ্যতার কথাই ধরুন। আমরা তথাকথিত অনুন্নত শ্রেণীর লোকেদের মন্দির-প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিতে দিই না, যেন ঈশ্বর এক বিশেষ শ্রেণীর সম্পত্তি— উচ্চশ্রেণীর সম্পত্তি— আর তাঁহারই সৃষ্ট জীবের স্পর্শে তিনি কলুষিত হইয়া যাইবেন।

যখন একটি জাতি বা ব্যক্তি জাগিয়া ওঠে, সেই জাগরণ খাঁটি ও সর্বাঙ্গীণ হওয়া চাই। আমরা এমন একদল কর্মী চাই যাহারা সকল দুরতিক্রম্য

াধা-বিপত্তি উপেক্ষা করিয়া এই সর্বাংগীণ আদর্শের অনুসারী রূপে অগ্রসর ইবে। এই দুরূহ সাধনার শক্তি ও সামর্থ্য দেশে রহিয়াছে, কিন্তু আমরা তাহা ্যবহার করিতে পারিতেছি না। আমাদের জীবনশক্তির পর্যাপ্ত গতি ও প্রসার াটিতেছে না। দুঃখের বিষয়, আমাদের যুবকদের মধ্যে অ্যাডভেঞ্চারের মনো-ভাব, অজানার হাতছানিতে বাহির হইয়া পড়িবার প্রবৃত্তি দেখা যাইতেছে না।

শ্রমিকদের অভিযোগ

২১ আগস্ট ১৯২৯ জামশেদপুর হইতে আইনসভার সদস্যদের উদ্দেশে প্রেরিত লিপি।

জামশেদপুরের গোলমুড়িতে অবস্থিত টিনপ্লেট কারখানায় পাঁচ মাস যাবৎ যে ধর্মঘট চলিতেছে আপনি সম্ভবত সে-বিষয়ে অবগত আছেন। টিন-প্লেট কোম্পানির শ্রমিকরা তাহাদের দীর্ঘস্থায়ী কিছু অভিযোগের প্রতিকার দাবি করিয়াছিল। কিন্তু কোম্পানি এই-সব দাবি মানিয়া লয় নাই। দাবিগুলি সামান্য; পার্শ্ববর্তী কোম্পানি টাটা আয়রন অ্যান্ড স্টীল কোম্পানির শ্রমিকরা যে-সব সুযোগ-সুবিধা পায় তাহা অপেক্ষা ইহাদের দাবি অনেক কম।

বর্মা অয়েল কোম্পানিই টিনপ্লেট কোম্পানির প্রকৃত মালিক। আপনারা জানেন বর্মা অয়েল কোম্পানি এদেশের সমৃদ্ধতম কোম্পানিগুলির অন্যতম। কিন্তু অফুরন্ত ধনসম্পদ সত্ত্বেও শ্রমিকদের প্রতি তাহাদের ব্যবহার অত্যন্ত অসন্তোষজনক। বর্তমান বিরোধ আরম্ভ হইবার পর হইতে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ ও বর্মা অয়েল কোম্পানি উভয়েই সম্পূর্ণ অনমনীয় রহিয়াছেন এবং এমন-কি, মীমাংসার আলোচনা শুরু করিতেও তাঁহারা চান না। বিশিষ্ট শ্রমিকনেতা শ্রী ভি. ভি. গিরি মীমাংসা করিয়া দিবার জন্য এ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতে চাহিয়াছিলেন। স্থানীয় কর্তৃপক্ষ তাঁহার মতো নেতার সঙ্গেও দেখা করিতে রাজী হন নাই। বর্মা অয়েল কোম্পানি ও স্থানীয় কর্তৃপক্ষের বর্তমান মনো-ভাব এই যে তাঁহারা যতদিন সম্ভব চুপচাপ বসিয়া থাকিবেন, তাঁহাদের গুরুতর লোকসান ঘটিলেও তাঁহাদের বিপুল ধনরাশির বলে ধর্মঘট ভাঙিয়া দিবেন।

স্থানীয় সরকার, অর্থাৎ বিহার ও ওড়িশার সরকার এ পর্যন্ত অসংগত না হইলেও, অন্তত উদাসীন মনোভাব অবলম্বন করিয়াছেন। ধর্মঘটের গোড়ার দিকে টিনপ্লেট শ্রমিকরা স্থানীয় সরকারের নিকট শ্রমবিরোধ আইন অনুসারে হস্তক্ষেপ করার জন্য আবেদন করিয়াছিল। তাহার পর হইতে ব্যাপারটির দ্রুত নিষ্পত্তির বদলে টিনপ্লেট কোম্পানির হাত দৃঢ়সবল করাই হইয়াছে সরকারের সাধারণ মনোভাব। বস্ত্রশিল্পশ্রমিকদের ধর্মঘটের সময় বোম্বাই সরকার যে মনোভাব দেখাইয়াছিলেন বা সম্প্রতি পাটকল শ্রমিকদের ধর্মঘটের সময় বঙ্গ সরকার যে মনোভাব দেখাইয়াছেন, ইহা তাহার বিপরীত।

বিহার সরকারের মনোভাবের সঙ্গে আমরা ভারত ও ইংলণ্ডের জনসাধারণ

যে ঔৎসুক্য দেখাইয়াছে তাহার তুলনাত্মক বিচার করিতে পারি। অখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস ও নিখিলভারত কংগ্রেস শ্রমিকদের পক্ষ সমর্থন করিয়াছে ও পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু, বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ, ভি. ভি. গিরি, পণ্ডিত নীলকণ্ঠ দাস ও বাবা গুরুদিৎ সিংয়ের মতো নেতাগণ টিনপ্লেট কোম্পানির ধর্মঘট প্রসঙ্গে জামশেদপুর পরিদর্শন করিয়া গিয়াছেন। ইণ্ডিয়ান চেম্বার অফ কমার্স এই বিষয়টিতে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন ও ভারত সরকারকে এ সম্পর্কে লিখিয়াছেন। আমস্টার্ডাম ও ব্রিটিশ ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের নিকট হইতে সহানুভূতিজ্ঞাপক বাণী ও অর্থসাহায্য আসিয়াছে। ধর্মঘট ও ধর্মঘটীদের অভিযোগগুলি সম্পর্কে হাউস অফ কমন্সে প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হইয়াছে। বিহার প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি এই শ্রমবিরোধের বিষয়টিতে আগ্রহান্বিত হইয়াছে ও ধর্মঘটীদের ত্রাণ-তহবিলে অর্থসাহায্য দান করিয়াছে। এই বিশ্বজনীন সহানুভূতি সত্ত্বেও টিনপ্লেট কোম্পানি ও বর্মা অয়েল কোম্পানির একগুঁয়েমির দরুনই ধর্মঘট দীর্ঘস্থায়ী হইতেছে।

আইন সভার সদস্যদের কর্তব্য

আইন সভার সদস্যরা চাহিলে, তাঁহাদের হাতে যে-সকল উপায় আছে তাহারই সাহায্যে বর্মা অয়েল কোম্পানির উপর চাপ সৃষ্টি করিতে পারেন। প্রথমত ভারতীয় পণ্যক্রেতাদের মূল্যে টিনপ্লেট কোম্পানি "সংরক্ষণ"-এর সুবিধা ভোগ করিতেছে— কেননা সকল আমদানীকৃত টিনপ্লেটের উপর সংরক্ষণধর্মী শুল্ক চাপানো হইয়াছে। টারিফ বোর্ডের রিপোর্ট দেখিলে দেখা যাইবে যে ওয়েলস প্লেট ও সীট ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যাসোসিয়েশন এই শুল্ক আরোপ করার তীব্র বিরোধিতা করিয়াছিল। এই বিরোধিতা সত্ত্বেও এই শুল্ক আরোপ করা হইয়াছিল। তাহার ফলে আমরা দেখিতেছি, একটি বিদেশী কোম্পানি— ভারতীয় শ্রমিকদের প্রতি বিন্দুমাত্র যাহার সহানুভূতি নাই; তাহাদের সম্পর্কে সম্পূর্ণ উদাসীন— ভারতীয় পণ্যক্রেতাদের মূল্যে তাহারা সংরক্ষণের সুবিধা ভোগ করিতেছে।

আরো একটি বিষয়ে বর্মা অয়েল কোম্পানির মতো একটি বিদেশী কোম্পানি ভারতীয় পণ্যক্রেতাদের মূল্যে প্রকৃতপক্ষে সংরক্ষণের সুবিধা ভোগ করিতেছে। কেরোসিন ও আরো কয়েকটি খনিজ তৈলের ক্ষেত্রে বর্মা অয়েল কোম্পানির তৈল ও অপরাপর আমদানীকৃত তৈলের উপর ধার্য শুল্কের

ব্যাপারে গুরুতর বৈষম্য রহিয়াছে। বর্মা অয়েল কোম্পানির তৈলের উপর গ্যালন প্রতি এক আনা শুল্ক ধার্য করা আছে। কিন্তু অন্য আমদানীকৃত তেলে গ্যালন প্রতি আড়াই আনা ধার্য হইয়াছে। এই সুস্পষ্ট বৈষম্যের দরুন বর্মা অয়েল কোম্পানি বিপুল মুনাফা লুটিতেছে ও ভারতীয় ক্রেতাদের উহার জন্য চড়া মূল্য দিতে হইতেছে। বর্মা অয়েল কোম্পানি একটি বিদেশী সংস্থা, ভারতীয় শ্রমিকদের প্রতি উহার মনোভাবও যখন অমানবিক তখন উহার স্বার্থে ভারতের জনগণের উপর এ-হেন পরোক্ষ কর চাপানো আইন সভার পক্ষে আর সহ্য করার কোনো যুক্তি নাই।

ভারতের শ্রমিক ও বৃহত্তর জনসাধারণের পক্ষ হইতে আইন সভার সদস্যদের কাছে আমার আবেদন, আমদানীকৃত টিনপ্লেটের উপর শুল্ক তুলিয়া লইতে ও বর্তমানে বর্মা অয়েল কোম্পানির তেল ও আমদানীকৃত তেলের উপর ধার্য শুল্কের ক্ষেত্রে যে বৈষম্য আছে তাহা দূর করিতে আইন সভার সদস্যরা যেন অবিলম্বে ব্যবস্থা গ্রহণ করেন।

গোলমুড়িতে সম্পূর্ণ অচলাবস্থা

২৮ আগস্ট ১৯২৯ জামশেদপুর হইতে প্রদত্ত বিবৃতি।

টিনপ্লেট কোম্পানির পরিস্থিতিতে অচলাবস্থা দেখা দিয়াছে। গত শুক্রবার হইতে সেখানে সাধারণ ধর্মঘট শুরু হইয়াছে। নূতন ও পুরাতন কর্মীরা একসঙ্গে হাত মিলাইয়াছে। লোক-দেখানোর উদ্দেশ্যে কারখানা চালু রাখা হইয়াছে কিন্তু উৎপাদন একেবারে বন্ধ। কর্তৃপক্ষ অনমনীয়। তাঁহারা ইউনিয়নের সঙ্গে কথাবার্তা বলিতে চান না, কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে শ্রমিক-কর্মচারীদের কাজে যোগ দিতে প্রলুব্ধ করিতেছেন। কোম্পানির উচ্চপদস্থ অফিসাররা— স্বয়ং জেনারেল ম্যানেজারও শ্রমিকদের দলে টানিতে তাহাদের দরজায় দরজায় ঘুরিতেছেন।

শ্রমিক-কর্মচারীদের দাবি সামান্য কিন্তু স্থানীয় কর্তৃপক্ষের মনোভাব এতই অযৌক্তিক ও অনমনীয় যে আমরা যাহারা শ্রমিক-কর্মচারীদের পক্ষ সমর্থন

করিয়াছি আমাদের এখন শেষ পর্যন্ত না লড়িয়া উপায় নাই। টিনপ্লেট কোম্পানি ভয় দেখাইতেছে যে সংরক্ষণ প্রত্যাহৃত হইলে তাহারা চিরতরে কোম্পানি বন্ধ করিয়া দিবে, তখন বর্মা অয়েল কোম্পানি বিদেশ হইতে টিন-প্লেট আমদানী করিবে। যদি তাহারা তাই করে তবে এখনকার লড়াই বর্মা অয়েল কোম্পানির সংগে প্রত্যক্ষ লড়াইয়ে পরিণতি লাভ করিবে। সে ক্ষেত্রে ভারতে বর্মা অয়েল কোম্পানির যেখানে যত কারখানা আছে সর্বত্র আমরা বজবজের মতো পরিস্থিতি সৃষ্টি করিব। স্থানীয় কর্তৃপক্ষের অনমনীয় মনোভাবের ফলেই একটি স্থানাঞ্চলের বিষয় আজ সর্বভারতীয় বিষয় হইয়া উঠিয়াছে। আমরা যাহারা টিনপ্লেট কোম্পানির কর্মচারী নই কিন্তু উহাদের সাহায্য করিতেছি— আমরা এই লড়াইয়ে জড়াইয়া পড়িয়াছি টিনপ্লেট কোম্পানির শ্রমিকদেরই জন্য! কয়েক মাস অপেক্ষা করিয়া তারপর আমরা হস্তক্ষেপ করিয়াছি। যখন দেখিলাম, গরীব শ্রমিকরা প্রবল বাধা-বিপত্তির বিরুদ্ধে লড়িতেছে, কর্তৃপক্ষও অত্যন্ত জেদী, তখনই আমরা হস্তক্ষেপ করিয়াছি। আর, একবার যখন ইহাতে জড়াইয়াছি তখন শেষ অবধিই আমরা লড়িব।

২

২৮ আগস্ট ১৯২৯ জামশেদপুরে জনসভায় ভাষণ।

কর্তৃপক্ষ ভয় দেখাইতেছেন, অচলাবস্থা চলিলে তাঁহারা কারখানা বন্ধ করিয়া দিবেন। সে ক্ষেত্রে বর্মা অয়েল কোম্পানির সংগে আমাদের সরাসরি লড়াই বাধিয়া যাইবে। ভারতে বর্মা অয়েল কোম্পানির যেখানে যত কারখানা আছে সর্বত্র আমরা গোলমুড়ি শ্রমিকদের সমর্থনে আন্দোলন শুরু করিবার আবেদন জানাইব। বর্মা অয়েল কোম্পানির তৈল ও আমদানীকৃত তৈলের উপর ধার্য শুল্কে যে তারতম্য বর্তমানে আছে তাহা দূর করিবার জন্যও আইন সভায় আমরা ব্যবস্থা লইব।

মালিকপক্ষের ঔদাসীন্য

৫ সেপ্টেম্বর ১৯২৯ বজবজ শ্রমিক সভায় ভাষণ।

আপনাদের বহুবিধ অভিযোগের প্রতিকার করিতে, আপনাদের জীবন ধারণের মান ও চাকুরির শর্তের উন্নতি যদি করিতে চান তবে আপনারা শক্তিশালী শ্রমিক-সংগঠন গড়িয়া তুলুন। আপনারা যদি সংগঠিত উপায়ে আপনাদের অধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াই চালাইতে চান তবে আপনাদের হাতে একমাত্র হাতিয়ার হইল ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠন। আপনাদের মালিকরা বলিয়াছেন, তাঁহাদের অধীনস্থ কর্মচারীরা সকলেই তৃপ্ত আছে, আপনারা যে কেন ধর্মঘট করিয়াছেন তাহা তাঁহারা বুঝিতে পারেন না। কর্তৃপক্ষ এই যে মনোভাব দেখাইতেছেন তাহাতে আমি দুঃখিত। মালিকপক্ষের এই হৃদয়হীন ঔদাসীন্যের ফলেই দেশে আজ এত ধর্মঘট ঘটিতেছে। তাঁহাদের কর্মচারীদের তাঁহারা মানুষ বলিয়া গণ্য করেন না। তাহারা যে বিপুল পরিমাণ মুনাফা লুটিতেছেন তাহার সামান্যতম অংশও তাঁহারা শ্রমিক-কর্মচারীদের দিতে চান না। গরীব শ্রমিকদের যদি যথার্থই অভিযোগ না থাকিত তবে কি তাহারা ধর্মঘট করিয়া নিজেদের ও পরিবারবর্গকে অনশনের মুখে ঠেলিয়া দিত?— জীবনযাপনের ও চাকুরির অসহনীয় অবস্থার ফলেই শেষ অস্ত্র রূপে এই ধর্মঘট করিতে তাহারা বাধ্য হইয়াছে। যখন তাহারা দেখিল, তাহাদের সব আবেদন-নিবেদন ব্যর্থ হইয়াছে তখনই তাহারা এই পথে নামিয়াছে। ভারতে খুব কম কারখানাতেই এমন নিকৃষ্ট জীবনযাপন ও চাকুরির অবস্থা বিদ্যমান; জীবন-ধারণের পক্ষে যাহা একান্ত আবশ্যক, সেই ন্যূনতম সুখ-সুবিধা হইতেও শ্রমিকরা এখানে বঞ্চিত। তাই মালিকপক্ষই এই ধর্মঘটের জন্য দায়ী। এই ধর্মঘট যে চলিতেছে সেজন্যও তাঁহারাই দায়ী। দুর্ভাগ্যের বিষয়, অসন্তুষ্ট শ্রমিকদের লইয়া যে কারখানা চালানো যায় না এই কথাটিও তিক্ত অভিজ্ঞতা ছাড়া মালিকপক্ষ বুঝিতে চায় না।

সরকারেরও এ-বিষয়ে গুরুতর দায়িত্ব আছে। শ্রমিক-বিরোধের ক্ষেত্রে তাঁহাদের পুরাপুরি নিরপেক্ষ থাকিতে হইবে; শুধু তাহাই নয়, সন্তোষজনক মীমাংসার জন্য বাণিজ্য বিরোধ আইনের বিধান অনুসারে তাঁহাদের হস্তক্ষেপও করিতে হইবে।

পাটকল শ্রমিক

আজ ইউনিয়ন অফিসে পাটকল শ্রমিকনেতারা আমার সঙ্গে দেখা করিয়াছিলেন। তাঁহারা আমার পরামর্শ চাহিয়াছেন, আমাকে তাঁহাদের নেতৃত্ব গ্রহণের জন্য অনুরোধ করিয়াছেন। আমি তাঁহাদের বলিয়াছি, তাঁহাদের সংগ্রামে আমার পূর্ণ সমর্থন থাকিবে। সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও বলিয়াছি যে তাঁহারা লড়াইয়ে যাইবেন না বর্তমান অবস্থা মানিয়া লইয়া কাজে যোগ দিবেন সে কথা তাঁহাদেরই সবচেয়ে ভালো বিবেচনা করিতে পারার কথা। কিন্তু বজবজ পাটকলের ম্যানেজার তাঁহাদের সঙ্গে যে অপমানজনক আচরণ করিয়াছেন তাহাতে সম্মানজনক মীমাংসার সময় এখনো আসে নাই বলিয়াই আমার মনে হয়। সুতরাং লড়াই চালাইয়া যাওয়া ছাড়া গত্যন্তর নাই। আপনাদের অবিলম্বে একটি শক্তিশালী ইউনিয়ন গঠন করিয়া লড়াই চালাইতে হইবে।

তৈল ও পেট্রোল শ্রমিকদের ধর্মঘট চালাইয়া যাইবার ভারপ্রাপ্ত নেতা শ্রীযুক্ত এস. কে. প্রামাণিক আপনাদের ইউনিয়ন গঠনেও সাহায্য করিবেন। সর্বপ্রকার সম্ভাব্য সাহায্যও তাহার নিকট হইতে আপনারা পাইবেন। যখনই আবশ্যক হইবে আমি অন্যান্য শ্রমিক নেতা ও কর্মীদেরও আপনাদের এখানে পাঠাইব। আপনারা সকলে ইউনিয়নের সদস্য হোন। শান্তিপূর্ণ পিকেটিং চালাইবার জন্য আপনারা স্বেচ্ছাসেবক হোন। শান্তিপূর্ণ পিকেটিং করা আপনাদের আইনসম্মত অধিকার।

জাতীয় শোক-দিবস

বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভাপতির পক্ষ হইতে প্রচারিত আবেদন।

গতকাল যতীন্দ্রনাথ দাসের লোকান্তর হইয়াছে। তাঁহার অন্তিম ইচ্ছা অনুসারে তাঁহার মরদেহ কলিকাতায় লইয়া আসিবার প্রস্তুতি চলিতেছে— আশা করা যাইতেছে রবিবার রাত্রে হাওড়ায় আসিয়া পেঁছাইবে। বাংলার জনসাধারণের কাছে আমার আবেদন, ১৫ সেপ্টেম্বর রবিবার যেন তাঁহারা শোক দিবস রূপে পালন করেন। জনসাধারণকে তাঁহাদের কাজকর্ম সেদিন যথাসাধ্য বন্ধ রাখিতে, একদিনের জন্য অমশন করিতে ও জুতা পরিধান না করিতে অনুরোধ জানাইতেছি। সোমবার সকালে মরদেহ শ্মশানে লইয়া যাওয়া হইবে।

১৪ সেপ্টেম্বর ১৯২৯

আবেদন

ভারতের শ্রেষ্ঠ শহীদ

যতীন্দ্রনাথ দাসের পুণ্য স্মৃতির উদ্দেশে শ্রদ্ধা জানাইবার জন্য একটি উপযুক্ত স্মৃতিসৌধ নির্মাণ করার সিদ্ধান্ত লওয়া হইয়াছে। ভারতের তরুণ শহীদ যে মহান আত্মদান করিয়াছেন তাহার প্রতি এ দেশের সকল শ্রেণী ও সম্প্রদায়ের লোক শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করিয়াছেন। সকলেই স্বীকার করিতেছেন যে যতীন্দ্র-নাথের স্মৃতি রক্ষা করা ভারতীয় জাতির কর্তব্য। এ সম্পর্কে বিভিন্ন প্রদেশের নেতৃবৃন্দ-স্বাক্ষরিত আবেদন শীঘ্রই প্রচারিত হইবে এবং সন্দেহ নাই যে ভারতের সকল প্রান্ত হইতেই অর্থদান পাওয়া যাইবে। ইতিমধ্যে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি সময়াপচয় না করিয়া স্মৃতিরক্ষার অর্থসংগ্রহের কাজ শুরু করিয়া দিবেন ও এই উপলক্ষে যাহা আবশ্যক সম্পাদক তাহা করিবেন। জনসাধারণের কাছে আমার আবেদন, তাঁহারা যেন বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি, ১১৬ বৌবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা— এই ঠিকানায় তাঁহাদের অর্থসাহায্য পাঠান, তাঁহারা যেন সংগঠিতভাবে, পদ্ধতি মাফিক চাঁদা সংগ্রহ করেন। স্মৃতিসৌধের জন্য দু লক্ষ টাকার প্রয়োজন।

১৭ সেপ্টেম্বর ১৯২৯

সতীন্দ্রনাথ সেন ঃ ভারতের প্রিয় বীর

২১ সেপ্টেম্বর ১৯২৯ বরিশাল টাউন হলে প্রদত্ত ভাষণ।

ক্ষমতামদমত্ত আমলাতন্ত্র ও বরিশালে তাহাদের অনুগ্রহজীবীরা সতীন সেন কারাগারের বাহিরে থাকুন ও স্বরাজ লাভে দেশকে সাহায্য করুন ইহা চায় না। জনসাধারণের মৌল নাগরিক অধিকার রক্ষার সমর্থনে পটুয়াখালি-সত্যাগ্রহ হইয়াছিল। আমলাতন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রায় দুই বৎসর ব্যাপী কঠোর সংগ্রাম করিয়া সতীনবাবু নাগরিকদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। তাঁহার দৃঢ় আদর্শনিষ্ঠা, লক্ষ্যের প্রতি অবিচলিত দৃষ্টি, অসাধারণ সংগঠন-দক্ষতা কর্তৃপক্ষকে সন্ত্রস্ত করিয়া তুলিয়াছে। মি. ডোনাভান ও তাঁহার চেলা-চামুণ্ডারা দমন-পীড়নের যে বন্যা বহাইয়া দিয়াছেন তাহাতেও সতীন্দ্রনাথ ও তাঁহার বীর সহকর্মী-দল মাতৃভূমির সেবা-রূপ তাঁহাদের নির্দিষ্ট পথ হইতে বিচ্যুত হন নাই।

একমাত্র নিঃস্বার্থ কাজের মধ্য দিয়াই সতীন্দ্রনাথ আজ শুধু বরিশাল ও বাংলার নেতা নন, সারা ভারতের নেতা হইয়াছেন। ১৯২৪ সাল হইতে বিদেশী আমলাতন্ত্রের দায়িত্বহীন চেলারা অন্তরে অন্তরে বুঝিয়াছে যে বরিশাল পুলিশী তান্ডব ও সরকারী সন্ত্রাসের কাছে মাথা নত করিবে না। এই নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ আন্দোলনের স্রষ্টা সতীন্দ্রনাথ সেন। অহংকারী কর্তৃপক্ষকে তিনি নতি স্বীকার করাইয়াছেন।

সতীন্দ্রনাথ অনশন করিতেছেন। তাঁহার স্বাস্থ্যের অবস্থা এখন উদ্বেগজনক। সারা দেশ সেজন্য দুঃখে শোকে নিমগ্ন হইয়াছে। মাতৃভূমির আহ্বানে আমি বরিশালে আসিয়াছি, সতীন্দ্রনাথকে তাঁহার অনশন-ধর্মঘট প্রত্যাহার করিয়া লইবার জন্য বুঝাইতেছি। দেশের যাহাতে এক অপূরণীয় ক্ষতি হইয়া না যায় সেজন্যই এই চেষ্টা। আমি জেলে সতীন্দ্রনাথের সঙ্গে কয়েকবার দেখা করিয়াছি। মাতৃভূমির স্বার্থে অনশন-ধর্মঘট প্রত্যাহার করিয়া লইতে তাঁহাকে বহু যুক্তি দিয়াছি। দুঃখের বিষয়, আমার অনুরোধে তিনি রাজি হন নাই। তাঁহার মরণপণ সংকল্প ও সত্যের প্রতি অবিচলিত নিষ্ঠার কাছে আমার অনুরোধ ও কাতর মিনতি তুচ্ছ হইয়া গিয়াছে।

সতীন্দ্রনাথ সরকারের সঙ্গে যতবার সংঘর্ষে প্রবৃত্ত হইয়াছেন প্রতিবারই জয়লাভ করিয়াছেন। ইহাতে আমলাতন্ত্র এত ঘাবড়াইয়া গিয়াছে যে তাহারা

সতীন্দ্রনাথকে ক্রমাগত দমন করিতেছে, তাঁহাকে আইনের জালে জড়াইতেছে। কর্তৃপক্ষ ও তাহাদের উপদেষ্টারা জানে যে সতীন্দ্রনাথের সক্রিয়তা যদি বন্ধ করিয়া দিতে হয় তবে নানা নোংরা অপকৌশলের আশ্রয় লইয়া দীর্ঘকাল তাঁহাকে কারারুদ্ধ রাখিতে হইবে। ১১০ ধারার আইন দুষ্ট বদমাস লোকদেরই প্রতি প্রযোজ্য হইয়া থাকে। ঐ ধারা অনুসারে সতীন্দ্রনাথকে গ্রেপ্তার করিতে কর্তৃপক্ষের মনে কোনো কুণ্ঠা জাগে নাই।

সরকার যে সতীন্দ্রনাথকে সুদীর্ঘ তিন বৎসরের জন্য কারান্তরালে রাখিতে চাহিতেছে ইহা স্থূলবুদ্ধির লোকেরও বোধগম্য। দন্ডবিধির আর-কোনো ধারা অনুসারেই তাহা সম্ভব নয়।

বিবৃতি

সতীন্দ্রনাথ সেন

বরিশালের বাহিরে আমাদের দেশবাসীরা সম্ভবত অবগত নন যে কেন সতীন্দ্রনাথ সেন ও তাঁহার কয়েকজন সহকর্মী অনশন করিতেছেন। যে-সকল অভিযোগের বিরুদ্ধে তাঁহারা সংগ্রাম করিতেছেন সেগুলি মোটামুটি এই রকম :

১. ১৯২৮ সালের জুলাই মাসে পটুয়াখালি-বিবাদ-মীমাংসার সময় তাঁহাদের বিরুদ্ধে রুজু করা যে-সব মামলা প্রত্যাহার করা হইয়াছিল ফৌজদারী দন্ডবিধির ১১০ ধারা অনুসারে সেগুলিকে পুনর্বহাল করা হইয়াছে।

২. শ্রীযুত সতীন সেন ও তাঁহার সহকর্মীদের বিরুদ্ধে একটি ও কয়েকজন সহকর্মীর বিরুদ্ধে আর-একটি— এই দুইটি দাঙ্গার মামলা শুরু করা হইয়াছে।

১৯২৮ সালের জুলাই মাসে পটুয়াখালি সত্যাগ্রহ আন্দোলন বন্ধ করিয়া দিবার উদ্দেশ্যে বরিশালের জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের উদ্যোগে সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের মধ্যে একটি আপস মীমাংসা হইয়াছিল। দন্ডবিধির ১১০ ধারা অনুসারে যে-সব মামলা রুজু করা হইয়াছিল এই আপস মীমাংসার অঙ্গস্বরূপ সেই সবগুলি মামলাই তুলিয়া নেওয়া হয়।

১৯২৯ সালের মার্চ মাসের মাঝামাঝি সতীন্দ্রনাথ সেন ও তাঁহার কয়েকজন সহকর্মীকে হঠাৎ দন্ডবিধির ১১০ ধারা অনুসারে গ্রেপ্তার করা হয়। অল্পদিনের মধ্যেই জানা গেল যে এই মামলায় যে-সব সাক্ষ্য প্রমাণ দেওয়া হইবে তাহা সবই পটুয়াখালি বিরোধ-নিষ্পত্তির পূর্ববর্তী কালের। সরকার বিশ্বাস ভংগ করিয়া এই মামলাগুলি আবার রুজু করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত সেন ও তাঁহার সংগীরা স্বাভাবিক কারণেই ইহাতে বিরক্ত হইয়াছেন।

দাংগার মামলার কার্যকারণ এইরকম। বন্দীদের, বিশেষত তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা অসুস্থ তাঁহাদের যাতায়াতের ব্যবস্থা লইয়া একদিকে পুলিশ ও জেল-কর্তৃপক্ষ, অপরদিকে বন্দীদের মধ্যে বচসা হয়। বন্দীরা বলেন, আদালতে তাঁহাদের লইয়া যাইতে হইলে উপযুক্ত যানবাহনের ব্যবস্থা করিতে হইবে, নতুবা লইয়া যাওয়া চলিবে না। বন্দীদের অভিযোগ এই যে, যানবাহনের উপযুক্ত ব্যবস্থা না করিয়াই তাঁহাদের আপত্তিকর অবস্থায় আদালতে যাইতে বাধ্য করা হইয়াছে। এমন-কি পীড়িত বন্দীদেরও রেহাই দেওয়া হয় নাই। তাঁহারা যখন যাইতে চাহেন নাই তখন তাঁহাদের আক্রমণ করা হইয়াছে, আবার দাংগার মামলাও রুজু করা হইয়াছে। তাহার কারণ ১১০ ধারা অনুসারে দায়ের করা মামলাগুলি যদি না টেঁকে সে ক্ষেত্রে শ্রীযুক্ত সতীন সেন ও তাঁহার সংগীদের এই দাংগার মামলায় জড়ানো যাইবে। জেলার সকল মহকুমা ও সুদূর মফস্বল হইতে যুবা বৃদ্ধ সকল শ্রেণীর মানুষ রোজ দলে দলে কংগ্রেস অফিসে আসিতেছে শ্রীযুক্ত সেনের সর্বশেষ অবস্থা জানিবার জন্য। অন্যান্য জেলা হইতেও সত্যাগ্রহের প্রতি সহানুভূতিসূচক সাড়া মিলিতেছে।

অনশনব্রতিনীর নিকট পত্র

নদীয়া জেলার কয়ে গ্রামে মৃণালিনী দেবীকে লিখিত।

আপনাকে অনশন-ধর্মঘট প্রত্যাহার করিতে অনুরোধ জানাইতেছি। অসহায় বন্দীরা শেষ অস্ত্ররূপে অনশন ধর্মঘটের আশ্রয় লইয়া থাকেন। কিন্তু যাঁহারা জেলের বাহিরে আছেন তাঁহাদের এই পন্থা গ্রহণ করা উচিত নয়। বরং বন্দীদের অভিযোগ দূর করার উদ্দেশ্যে তাঁহারা আন্দোলন গড়িয়া তুলিবেন…

২৮ সেপ্টেম্বর ১৯২৯।

যৌবনের উচ্ছ্বাসই সৃষ্টির তরঙ্গ

হাওড়া জেলা যুব-সম্মেলনে পঠিত অভিভাষণ।

পূজনীয় শরৎদাদা,

আজ আপনাকে আমাদের মাঝে আমাদেরই একজন আপনার হিসাবে পেয়ে, আমরা যে কত বড়ো একটা শক্তি অনুভব করছি, তা মুখের কথায় বলতে যাওয়া ব্যর্থতার রূপান্তর মাত্র। হে মনস্তত্ত্বের ঋষি, সারা বাংলা আজ আপনাকে সশ্রদ্ধ অভিনন্দন জানাচ্ছে। কিন্তু দূরে থেকে শুধু আপনার পায়ে অর্ঘ্য ঢেলে বিদায় নিলে, আমাদের প্রাণের তৃষ্ণা মিটবে না। আপনার সু-উচ্চ বেদীর নীচে বসে, আপনার বুকের সত্যের আগুন আমাদের বুকে জ্বালিয়ে তুলতে চাই। তরুণের বুকে ভালোকে ভালো বলবার শক্তি ও অন্যায়কে অন্যায় বলবার জোর আপনিই দিয়েছেন, আপনার সত্যের নির্মম ছুরিকাঘাতে ধর্ম, সমাজ, রাষ্ট্রের মিথ্যা ও ছলনার আবরণ শতধা হয়ে সত্য উজ্জ্বল, সুস্পষ্ট হয়ে আমাদের চোখের সামনে ফুটে উঠেছে।

বয়স ও অভিজ্ঞতার দিক থেকে আমরা আপনার অনেক নীচে। তবুও আপনার ভিতরকার নবীনতা আপনাকে আমাদেরই একজন বলবার অধিকার দিয়েছে। আর এই অধিকারের জোরেই আমরা বলতে সাহস পাচ্ছি যে, আমরা হাওড়ার তথা সারা বাংলার তরুণের দল, এতদিনের পুঞ্জীভূত অত্যাচায়, উৎ-পীড়নকে পদদলিত ক'রে, এগিয়ে যেতে পারব।

মাননীয় সভাপতি মহাশয়,

আপনার নীরব আত্মত্যাগের অতীত কাহিনী বাংলা আজ ভালো করে জানে না। আজ প্রৌঢ়ত্বের শেষ সীমায় দাঁড়িয়েও আপনার নির্মম নিষ্ঠা ও অদম্য সাহসের কিছুমাত্র হ্রাস হয় নাই। বর্তমান সমস্যাগুলি, অতীতের তুলনায় অত্যন্ত জটিল ও দুরূহ, সন্দেহ নাই।

বর্তমান যুব-সংগঠন কার্যের দিক থেকে আপনার এবং আপনাদের, যুব-সমাজে বিশেষ প্রয়োজন না থাকলেও আপনার চরিত্রগত গুণাবলী প্রত্যেক স্বদেশবাসী বাঙালী যুবকের হৃদয়ে গেঁথে নেওয়া আজকের এই দুর্দিনে বড়োই প্রয়োজনীয়। আপনার অতীত কাহিনী হাওড়ার যুবকদিগের শ্লাঘার বিষয়।

প্রাণহীন সভা-সমিতি ও অর্থহীন শোভাযাত্রা করে আপনাকে ও আপনাদের স্নেহের একমাত্র প্রতিদান, স্মৃতির একমাত্র তর্পণ।

সমবেত ভাইবোন,

হাওড়া আজ আপনাদের, সাদর অভিনন্দন জানাচ্ছে। আমাদের এ কাজে দোষ-ত্রুটি অনেক আছে, কিন্তু এটা আমাদেরই কাজ এই ভেবে, এর সব দোষ-ত্রুটি আপনারা ক্ষমা করবেন। গোড়ায় একটা কথা আপনাদের ব'লে রাখছি— একটা মস্ত কিছুর ব্যবস্থা এখানে আমরা করতে চাই নি। বড়ো বড়ো কথা ব'লে, বড়ো বড়ো প্রস্তাব গ্রহণ ক'রে, লোকের চোখে ধাঁধা লাগিয়ে দেওয়া আমাদের উদ্দেশ্য নয়।

জাতির জীবনে যখন ভাঁটার টান ধরে, তখনই তাদের জীবনে জোয়ারের দরকার পড়ে। তাই, আমরা দেখতে পাই, অবসাদ হ'তে জাতিকে মুক্ত করবার জন্য যে-কোনো একটা কিছুকে আশ্রয় করে, সব সভা-সমিতিতেই খানিকটা উত্তেজনার সৃষ্টি করবার চেষ্টা চলে আসছে। এইভাবে একটার পর একটা ক'রে কত উত্তেজনারই সৃষ্টি হ'ল, কিন্তু এ চেষ্টা অবসাদের লাঘব কতটুকু করতে পেরেছে? আন্দোলন শোভাযাত্রারও দরকার আছে, কিন্তু তা ঐ স্বাধীন দেশে। যেখানে রাজশক্তি ও প্রজাশক্তি একই স্বাভাবিক অবস্থার সৃষ্টিমাত্র— প্রভু-ভৃত্য সম্বন্ধ নয়। যেখানে আন্দোলন করলে রাজশক্তি ভয় পায়, সাবধান হয় ও আপন কার্যপ্রণালীর পরিবর্তন করে। কিন্তু এদেশ তো তা নয়! সেই স্বদেশী আমলের কথাই ধরুন বা যুদ্ধের আমলের হোমরুলওয়ালাদেরই দেখুন, এমন-কি, মহাত্মাজীর অসহযোগ দর্শন একটু তলিয়ে দেখলেই বুঝতে পারবেন, আন্দোলন এদেশে কম হয় নাই। কিন্তু ফল তার কী হয়েছে? তথাকথিত রাজনীতিকের দল চেঁচিয়ে বলবে (এবং এটা তাদের সতিকারের ধারণা) যে চোখ রাঙালে ইংরেজ ভয় পায়। কিন্তু মনীষী বিপিনচন্দ্রের কথায় "tooth-less opposition"কে ইংরেজ গ্রাহ্যও করে না, বাংলার জেলায় জেলায় রাষ্ট্রীয় সম্মেলন, যুব-সম্মেলন (ছাত্রী ও তরুণী সম্মেলন এখনো বাকী আছে), ছাত্র-সম্মেলন প্রভৃতি কত সম্মেলনই তো হচ্ছে। অনেক জায়গায় বাচ্চাই সাঁকোকে ফাঁসি এবং আমানুল্লাকে রাজা করবার ব্যবস্থাও হয়ে গেছে। কিন্তু আমাদের প্রস্তাবের ফলে আমানুল্লা বেচারার কিছুমাত্র সুবিধা হয়েছে বলে

বোধ হয় না। বাচ্চার সংগীন এখনো তাকে দেশছাড়া করে রেখেছে। স্বাধীনতার প্রস্তাব তো কম হয় নাই? কিন্তু শুধু প্রস্তাব পাস ক'রে দেশ স্বাধীনতার পথে কতটুকু এগিয়েছে?— এটাই আজ বিশেষ করে ভাবতে হবে। মাদ্রাজ-কংগ্রেসের স্বাধীনতার প্রস্তাবে কলিকাতায় যা দুর্গতি হল!— এমন লজ্জাকর ব্যাপার কি, জগতের ইতিহাসের বুকে আর কোথাও দেখেছেন? তাই বলছি, যাঁরা বড়ো বড়ো প্রস্তাব পাস করতেই মজবুত, তারা তাঁদের রাজনীতি নিয়েই সন্তুষ্ট থাকুন। কিন্তু যুব-সমাজ যেন এই ভুল না করে। তারা যা করবে তা শুধু কথায় নয়। তাদের কথায় এবং কাজে সামঞ্জস্য থাকবে। দেশের এই অক্ষম প্রতিরোধ আর অর্থহীন আন্দোলন থেকে আমরা এই যৌবন-শক্তিকে পৃথক করে নিতে চাই। কোনো একটা ব্যাপারকে আশ্রয় করে হুজুকের সৃষ্টি করা আমাদের দেশে শক্ত নয়, এবং যুব সমাজকে যন্ত্রের মতো এই হুজুগে মাতিয়ে তোলাও কঠিন কথা নয়। কিন্তু উত্তেজনা যদি ভিত্তিহীন হয়, ওবে সেই কাজ আরম্ভ না করাই শ্রেয়। শক্তিকে সংহত না করে নিছক উত্তেজনায় উন্মত্ত হওয়ার মতো বিড়ম্বনা আর নাই, সে শুধু মৃত্যুর পূর্বলক্ষণ— বিকার মাত্র। অবশ্য আন্দোলনের ভাব-প্রচার ও ইংরেজকে ধাপ্পা দেওয়ার প্রয়োজনে খানিকটা দরকার আছে; (যদিও ইংরেজ এ খবর খুব ভালো করেই রাখে), তবুও যুব-সমাজ যেন এ কথা কখনো না ভোলেন যে, এ-কাজের জন্য প্রকৃতিগত হুজুকপ্রিয় লোকের অভাব কোনোদিন হয় নি, হবেও না। এজন্য, স্বরাজদল, হিন্দুমহাসভা, মুসলিম লীগ, কৌন্সিলের দাদারা, কংগ্রেস আরো কত সম্মেলন, সভাসমিতি পাল্লা দিয়ে রেস দিচ্ছে। ও আমাদের জন্য নয়। আমাদের কর্মক্ষেত্র একেবারে স্বতন্ত্র। তাই ওঁদের আন্দোলনের আড়ালে, আমাদের নীরব তপস্যার স্থান খুঁজে নিতে হবে। আমরা জন্মেছি আঘাতের বিরুদ্ধে প্রতিঘাত দিতে— যে-কোনো উপায়ে সমস্ত অন্যায় থেকে জাতিকে মুক্ত করতে— শুধু চেঁচিয়ে কাঁদতে নয়; আবেদন-নিবেদন জানাতে নয়। তা সে অন্যায় বিদেশী আমলাতন্ত্রেরই হোক, বা রাজা, মহারাজা, জমিদার ধনিক, বণিক, প্রেমহীন সমাজ বা প্রাণহীন ধর্মেরই হোক।

অনেকেই প্রশ্ন করেন, হাওড়ায় যুব-সম্মিলনী করবার প্রয়োজন কি? কংগ্রেস রয়েছে, আরো কত সভা-সমিতি রয়েছে, তবে এর কি নূতন কিছু দেবার আছে? উত্তরে আমরা বলব— আছে। যৌবনের উচ্ছ্বাসই— সৃষ্টির তরঙ্গ। আজ পর্যন্ত জগতে যা-কিছু সৃষ্টি হয়েছে তার পশ্চাতে রয়েছে ঐ

শক্তিমত্ত যৌবন। সব সময়ে এর রূপ বাইরে ফুটে না বলেই একে অস্বীকার করা যায় না। এই সৃষ্টিশক্তি বিভক্ত হলেই, পরস্পর আত্মঘাতী শক্তির উদ্ভব ক'রে জাতিকে বিনষ্ট করে। একটু তলিয়ে দেখলেই বোঝা যায়, যুবশক্তিকে মুঠোর ভিতর পুরে আপন কাজ হাসিল করতে সকলেই উন্মুখ। লক্ষ্যহীন এই শক্তি, পরস্বার্থে এ-ভাবেই আপন অস্তিত্ব নিঃশেষ করে আসছে। জগতের সমস্ত সাম্রাজ্যবাদ (imperialist) এবং রাজতন্ত্র শক্তি (aristocratic) এভাবেই যৌবনকে আপন স্বার্থে নিয়োজিত করে আসছে এবং যেদিন দেশের যুব-মণ্ডলী সূক্ষ্মদর্শী ও সজাগ হয়ে উঠে, সেদিন অত্যাচারী শাসকের সিংহাসন ধূলিসাৎ হতে আর বড়ো বিলম্ব হয় না। অধিক কি, বর্তমান চীন, রাশিয়া ও জার্মানীর কথা একটু আলোচনা করে দেখলেই এ সত্য উপলব্ধি করা শক্ত হবে না। এদের ছাড়া সাম্রাজ্য অচল। সৈন্য, রাজপুরুষ, সাম্রাজ্য পরিচালনার সমস্ত বিভাগই দাঁড়িয়ে আছে এদেরই উপর। এদের ভিতর বিদ্রোহের বীজ উপ্ত না হলে এ প্রাণহীন শোষণের শেষ কোথায় ? মুক্ত যজ্ঞের পুরোহিত ঋষি লেনিন, ডাক্তার সান-ইয়াৎ-সেন প্রভৃতি একথার মর্ম উপলব্ধি করেছিলেন বলেই তাদের চেষ্টা ব্যর্থ হয় নি। আমাদের তথাকথিত নেতার দল এ সত্য মোটেই বুঝতে চান না। নিজেরা যেমন হুজুক ভালোবাসেন, ছেলেদেরও তেমনি তাতেই মাতিয়ে রাখতে চান— নিজের স্বার্থসিদ্ধি করতে। সে স্বার্থ দেশের স্বার্থের সঙ্গে কত-টুকু জড়িত ? বড়ো বড়ো কথার ফাঁকে ছেলেরা শুধু exploited-ই হয়ে আসছে। নেতার আদেশ— তাই পালন করতে হবে, কেননা না বলবার অধিকার নেই ; তা হলেই তুমি দেশদ্রোহী, এ কথাই বারবার শুনে আসছি। বাংলার অন্য জায়গার কথা জানি না, শুধু হাওড়ার কথাই বলি। এখানে যে একটা তীব্র অভাব, আজ যুবসমাজকে অতিষ্ঠ করে তুলেছে, তার কারণ কি ? এতদিন তারা শুধু যন্ত্রের মতো খেটেই এসেছে। বোঝে নাই কেন ! এখন তারা দেখছে যে তাদের অতীতের আশা আজ ব্যর্থতার কালিমায় ভরে গেছে। তাই আজ তারা পুরাতনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে ; আজ তারা আপন অধিকার কড়ায়-গণ্ডায় হিসাব করে নিতে চায়— ধাপ্পায় আর তারা ভুলবে না। এই সম্মিলনী তারই একটু বহিঃপ্রকাশ মাত্র। হাওড়া জেলার বিচ্ছিন্ন যুবশক্তিকে সংঘবদ্ধ করে একটা কর্মপন্থার সৃষ্টি করা ও তাকে কাজে ফুটিয়ে তোলাই আমাদের উদ্দেশ্য।

এই সম্মিলিত যুবশক্তি কোন্ পথে চলবে, এই নিয়ে অনেকের মনে

নানা আশঙ্কার উদয় হয়েছে। এই কথাটা সকলকেই আমরা স্পষ্ট করে জানিয়ে দিচ্ছি যে, যে-কোনো একটা হুজুককে দেশের কাজ বলে মানতে আমরা আর রাজী নই। আমাদের একটা নির্দিষ্ট কর্মপন্থা ও লক্ষ্য রায়ছে। আমরা চাই ধর্ম, সমাজ ও রাষ্ট্রের নামে যে ভণ্ডামি চলছে, তাকে ভেঙে নূতন করে গড়তে। এই ভাঙনকে সফল করে তুলতে যতটুকু আয়োজন করা দরকার, তার রীতিমত ব্যবস্থা না করে আমরা বাতুলের ন্যায় কোনো কাজে ঝাঁপ দিতে প্রস্তুত নই। তাই কংগ্রেস প্রভৃতি জাতীয় প্রতিষ্ঠান থেকে আমাদের কর্মক্ষেত্র সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন ও পৃথক; প্রয়োজনে, আমরা একে ভাঙব, গড়ব ও এর কর্মপন্থা নির্দেশ করব।

এই হাওড়া জেলার মধ্যেই, আমাদের আয়োজন সম্পূর্ণ করবার অনেক কিছুই বাকী আছে। ৫৩০ বর্গমাইল নিয়ে এ জেলায় প্রায় ১০ লক্ষ লোকের বাস। বাংলার আর সমস্ত জেলা থেকে এই জেলাই সবচেয়ে ছোটো, কিন্তু প্রত্যেক বর্গমাইল হিসাবে লোকসংখ্যা প্রায় ১৯০০, অন্যান্য সব জেলার চেয়ে অধিক। এখানকার লোকের জীবনীশক্তিও সবচেয়ে বেশি, গড়ে প্রায় ২৫ বৎসর। স্বাস্থ্যের দিক দিয়ে চাষবাসের দিক দিয়ে কল-কারখানার দিক দিয়ে, এই জেলা বাংলার অন্যান্য জেলার চেয়ে অনেক বিষয়ে অগ্রণী, তবুও এই ক্ষুদ্র স্থানেও দুর্গতি, দুর্দশার অন্ত নাই। দেশের ছেলেরা যে দেশের উপর দরদী নয়, এই কথা বললে তাদের উপর অন্যায় করা হবে। ছেই স্বদেশী যুগ থেকে আরম্ভ করে, আজ পর্যন্ত ত্যাগ স্বীকার করতে ও নির্যাতন সহ্য করতে হাওড়ার ছেলেরা কোনোদিন পশ্চাদপদ হয় নাই, এ খবর দেশবাসী না জানলেও আমলাতন্ত্র খুব ভালো করেই জানে। তারা জেলও খেটেছে, তিলে তিলে আপন জীবন নিঃশেষও করেছে। দেশের ডাকে, এ-সমস্ত বিপদকে তো তারা কোনোদিন গ্রাহ্য করে নি। তবে আজ তাদের এ দুর্দশা কেন?— আজ এ-প্রশ্নটাই সকলের মনে বার বার ঘা দিচ্ছে।

এ কথাটা সবাই বাধ্য হয়ে স্বীকার করছে যে, তীব্র আত্ম-কলহ এখানেও যুবসমাজকে শতধা বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে। বিদেশী রাজশক্তি এর জন্য কতটা দায়ী? আর নেতৃবৃন্দ, ও দাদারাই বা এই বিচ্ছেদের মূলে কতখানি আছেন, তা আজ বিশেষ করে ভাবা দরকার। স্বদেশ-সেবার এই মহাব্রতের ভিতর যৌবনের আত্মকলহের মূল কোথায়— কে বলবে? যুব-সমাজ তো

নেতৃত্ব বা পদমর্যাদার কাঙাল নয়। তারা শুধু কাজেই আত্মসমাহিত, ত্যাগেই গৌরবান্বিত। যেখানে একই মত, একই পথ, একই লক্ষ্য— সেখানে একশক্তি শতধা বিভক্ত হয় কেন— এ সমস্যার সমাধান ও বিশ্লেষণ আজ আমাদেরই করতে হবে। বিভিন্ন দেশে দেখতে পাই, বিভিন্ন দল গড়ে ওঠে বিভিন্ন মত ও পথকে আশ্রয় ক'রে। সেখানে Liberal, Conservative, Labour,— Communist, Soeial Democrat, Fascist প্রভৃতি বিভিন্ন দলের সৃষ্টি হয়— বিভিন্ন মতকে আশ্রয় ক'রে। এর তবুও কতকটা অর্থ আছে। কিন্তু আমাদের এই হতভাগ্য দেশে প্রায় সমস্ত ব্যাপারই একটা অদ্ভুত ধরনের। এখানে দলাদলির সৃষ্টি হয় বিভিন্ন ব্যক্তিকে আশ্রয় করে। নূতন ও পুরাতন দাদার গণ্ডি ক্রমে ক্রমে বেড়েই চলেছে; এবং একই শক্তি পরস্পর-বিরোধী আবর্তের সৃষ্টি করেছে। মুখে এদের দেশোদ্ধারের বড়ো বড়ো বুলি। কিন্তু কাজে দেখতে পাই, এদের দেশের কাজ মানে— পরস্পরের কুৎসা রটানো ও পরস্পরের শত্রুতা সাধন। এর সর্বনেশে প্রভাব থেকে হাওড়া যে একেবারেই মুক্ত, আমি তা বলি না। বরং এখানেও আত্মপ্রতারণা যথেষ্ট রয়েছে। বিভিন্ন কর্তাদের যে কোনো পরিষ্কার মতবাদ রয়েছে, তার আবিষ্কার আজো পর্যন্ত হয় নি। "আমার ২৫ বছরের অভিজ্ঞতা, কাজেই আমাকে অনুসরণ করো—" কাকে রাখি, কাকে দেখি।

হাওড়ার কোনো C.I.D. officerকে বলতে শুনেছি, "যদি আরো দুই-চারটে Conference হাওড়ায় হয়, তবে আর আমাদের কাজ থাকে না।" যখন পুলিশের মুখে এও বড়ো বিদ্রূপের কথা বার হতে পারে, তখন দেশের আজ কতবড়ো দুর্দিন। এ কথা কি হাওড়ার ছেলেরা ভাববে না? নেতৃত্বের চাপে আজ আমাদের প্রাণ ওষ্ঠাগতপ্রায়? এ-সমস্ত দাদাদের প্রভাব থেকে যুবশক্তিকে আজ সম্পূর্ণরূপে মুক্ত করতে হবে। যে মত সত্য, যে পথ সত্য, সে মত এবং পথকে সমস্ত জাতি গ্রহণ করবেই। কিন্তু যদি ব্যক্তি-বিশেষ আপনার অভিজ্ঞতার বা অতীত গৌরবের দোহাই দিয়ে আপন মত জোর করে চালাতে চান, তবে তাঁর লাঞ্ছনার আর পরিসীমা থাকবে না।

যুব-সমাজ দিনের পর দিন সজীব হয়ে উঠছে। স্বামী বিবেকানন্দের বাণীর সত্যতা আজ মর্মে মর্মে অনুভব করছে! আমরা অনেক প্রবঞ্চিত হয়েছি। আর সময় নষ্ট করতে চাই না। স্বামীজির বাণী আজ ধ্বনিত হচ্ছে; "Begin with disbelief; realise, prove. test and then take it"।

কম্বলীর কবল হতে মুক্ত হবার জন্য আমরা প্রাণপণ চেষ্টা করছি। কিন্তু এ তো আমাদের মুক্তি দিচ্ছে না! লাহোর কারাকক্ষে যে মহাপ্রাণ মুকুলেই ঝরে গেল, সে যতীন্দ্রনাথ কি শুধু ৬৩ দিন অনাহারে প্রাণ দেবার জন্যই সৃষ্ট হয়েছিল। না, বেঁচে থাকলে বোধহয় তাঁকে দিয়ে জাতীয় জীবনের কোনো-এক বড়ো অধ্যায়ের উদ্‌ঘাটন সম্ভব হত। এ অকালমৃত্যুর জন্য শুধু কি বিদেশী আমলাতন্ত্রই দায়ী না অন্য কারুর দায়িত্ব এতে রয়েছে। তার সমাধির উপর বসে এখনো কি আমরা আমাদের ক্ষুদ্র স্বার্থ ভুলতে পারব না? অনেকে হয়তো একে আশ্রয় করে নিজের মহিমা বৃদ্ধির পথ খুঁজবে। সে পথের আগল আটকে আমাদেরই দাঁড়াতে হবে। এ দধীচির আত্মদান যেন বৃথাই না যায়।

এইবার আমরা কী করতে চাই তার একটু আলোচনা করে অভিভাষণ শেষ করব। প্রথমেই বলেছি "আমরা চাই সমাজ, ধর্ম, রাষ্ট্রের নামে যে ভণ্ডামি দেশে চলেছে, তাকে নির্মম আঘাতে গুঁড়ো করতে।" প্রথম আমাদের অনুসন্ধান করতে হবে এই-সমস্ত অন্যায়ের প্রতীকগুলি দাঁড়িয়ে আছে কিসের উপর। তার মানে দেশের বিভিন্ন বিষয়ের তন্ন তন্ন অনুসন্ধান আমাদের করতে হবে। জ্ঞান ও কর্মের প্রসার ঐ লক্ষ্যেরই বিষয়ীভূত করে আমাদের চালাতে হবে। আমাদের দেশের সমস্ত খবর আমলাতন্ত্রের নখাগ্রে, কিন্তু তার কতটুকু আমাদের নেতৃবৃন্দ জানেন বা জানবার চেষ্টা করেন। যৌবনের গতি ভিন্ন পথ খুঁজছে বলেই এ-সমস্ত খবরাখবরের প্রয়োজন তাদের সবার চাইতে বেশি। আর এরই সাথে সাথে চলবে আয়োজনের পালা। ইংরেজ আমলাতন্ত্রের শক্তি যতই সামান্য বলে নেতৃবৃন্দ প্রচার করুন-না কেন, আমাদের তুলনায় তাদের সুবিধা অনেক বেশি। অর্থবল, লোকবল, রেল, টেলিগ্রাফ— এমন আরো কত কি দিয়ে তারা আমাদের এমনি আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রেখেছে যে, এই বাঁধনের বাইরে চলবার পথ বড়োই সংকীর্ণ। প্রত্যেক বিভাগেই তাদের বড়ো বড়ো মাইনে করা, উচ্চশিক্ষিত লোক (Highly paid whole-time worker and specialists) দিনরাত অক্লান্ত পরিশ্রম করছে। আমাদের অবস্থা একবার ওদের সাথে তুলনা করে দেখুন। ওদের এক-একজন কর্মী দিবারাত্রি অবিশ্রাম কাজ করে মাথার চুল পাকিয়ে ফেলেছে। আর আমরা চাই ফাঁকে কাজ হাসিল করতে। ওরা দিনের পর দিন এই নিয়ে ভাবছে এবং এ কাজেই মেতে আছে। কিন্তু আমরা শুধু

দুটো বক্তৃতা ও একটু হুজুক হৈচৈ করেই কর্তব্য শেষ করতে চাই। ইংরেজ কিন্তু রক্তচক্ষু ও বক্তৃতাকে ভয় করে না। আমাদের ধৈর্য জিনিসটাকে নষ্ট করে ফেলা হয়েছে। সহ্যশক্তিও প্রায় লোপ পেয়েছে। আমরা শুধু মাতামাতিই করি, আর ছেঁড়াছেঁড়ি নিয়েই ব্যস্ত। কিন্তু আজ দ্বিধাহীন হয়ে জিজ্ঞাসা করছি "কাদের প্ররোচনায় আমরা এমনিতর করি?" আমাদের দেশসেবার এই মামুলী, ধরা-বাঁধা পথ বদলে নূতন পথ গড়তে হবে। এর জন্য চাই একদল (তা সে সংখ্যায় যত কমই হোক-না) সর্বত্যাগী কর্মী। পরিবর্তন আনতে হলে পেশাদার স্বদেশকর্মীর একান্ত প্রয়োজন। এরা শুধু বিকেলটুকু দেশের কাজে কাটাবে না, সমস্ত জীবন উৎসর্গ করবে। এই প্রসঙ্গেই রুশ বিপ্লবযজ্ঞের গুরু লেনিন বলে গিয়েছেন : "It is better to get hold of ten able men than hundred dullards. By able men I mean, men, who will devote to the revolution not only their free evenings but their whole life. I mean professional Revolutionaries. There must be division of work and each man must be trained to task.

স্বামী বিবেকানন্দও বলেছেন "দশটা মানুষ পেলে আমি ভারতবর্ষ উল্টে দিতে পারি। কিন্তু মানুষ চাই, পশু নয়। Give me ten men, I will revolutionise India. I want men not brutes."

আমাদের এইভাবে সর্বত্যাগী কর্মী সংগ্রহ করতে হবে। তাদের জীবনের ধ্রুবতারা হবে স্বদেশ-সেবা। এরা ধৈর্য ধরে নীরবে আপন কর্মক্ষেত্র বেছে নিয়ে একেবারে বিশেষজ্ঞ হয়ে যেদিন উঠতে পারবে, সেদিনই প্রকৃত কাজ আরম্ভ হবে। এদের অনন্ত কর্মশক্তি জনসাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে একটা প্রবল কর্মপ্রবাহ সৃষ্টি করবে। আর সেই স্রোত দেশ থেকে সমস্ত অন্যায় দূর করে এই দুরূহ কাজ সুসাধ্য করে তুলবে। যারা উদ্বুদ্ধ গণশক্তি বা Mass consciousness-এর স্বপ্ন দেখেন, তাঁদেরও আমরা বলি গণশক্তি আপনা হতে আজ পর্যন্ত কখনো উদ্বুদ্ধ হয়ে ওঠে নি, উঠবেও না। জনগণের মনস্তত্ত্ব (Mass Psychology) এ নয়। এ সম্পর্কে লেনিনের কথা প্রণিধানযোগ্য "All mass consciousness dries up on holidays and Sundays wage payment." হাতে কিছু পয়সা আর একটু আমোদ করবার সুযোগ পেলেই জনসাধারণ সব ভুলে যায়। সাধারণ শুধু হুজুক করতে পারে, স্থায়ীভাবে একটা কর্মপন্থা অবলম্বন করা এদের

ধাত নয়। তাই হুজুকে-মাতা নেতাদের হাতে পড়লেই এদের দুর্গতির সীমা থাকে না। বিগত ধর্মঘটগুলো এ সত্য কতকটা প্রমাণ করছে।

গণশক্তিই জাতির মূলশক্তি, দেশকে বড়ো করতে হলে এদের প্রকৃত পথে চালাতে হবেই। এদের নেতৃত্ব যারা গ্রহণ করবে, তাদের শৌভাযাত্রী, শখের স্বদেশী হলে চলবে না। যাঁরা চালাবেন তাঁরা হবেন সর্বত্যাগী বিশেষজ্ঞ (Specialist) কর্মীদল। তাঁরা নিভৃতে তপস্যা করবেন। এই দলের চিন্তাশক্তি হবে গভীর আর কর্মশক্তি হবে অসীম। একদিকে যেমন জগতের সমস্ত চিন্তাধারার সঙ্গে এদের যোগ থাকবে, অন্যদিকে তেমনি দেশের সমস্ত তথ্যই এদের নখদর্পণে বিরাজ করবে। আজ এমন একটা সংগঠনের অভাব দেশে বিশেষভাবে অনুভূত হচ্ছে; এখনো কি তা গড়বার সময় হয় নাই? আর কতকাল লক্ষ্যহারা হয়ে আলেয়ার পেছনে ছুটব? আমাদের মস্তিষ্ক কি এতই বিকৃত? যে, কোনো একটা কাজকে স্বদেশসেবার কথা বললেই তাতে ঝাঁপিয়ে পড়ব? আর নয়, অনেক হয়েছে, নূতন পথের আবিষ্কার আমাদের করতেই হবে। বন্দেমাতরম্।

১৯২৯

মুক্তি ! সকল প্রকার বন্ধন হইতে মুক্তি

২৮ সেপ্টেম্বর ১৯২৯ হাওড়া ময়দানে অনুষ্ঠিত হাওড়া জেলা রাজনৈতিক সম্মেলনে সভাপতির অভিভাষণ।

মাননীয় অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি মহাশয়,

সমবেত ভদ্রমহিলা ও ভদ্রমহোদয়গণ,

আজ আপনারা শুভমুহূর্তে ও উপযুক্ত সময়ে হাওড়া জেলা রাষ্ট্রসম্মেলনের আয়োজন করিয়াছেন। জটিল হইতে জটিলতর সমস্যা দেশের সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছে এবং এখনো হইতেছে ! চণ্ডনীতির প্রভাবে ভারতের রাজনৈতিক গগনঘনান্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়াছে। আসন্ন তুফানের আগমনী গাহিবার জন্য যেন মধ্যে মধ্যে দমকা হাওয়া উঠিতেছে এবং বিজলী অট্টহাস্যে হাসিতেছে। এই অবস্থার মধ্যে যাত্রী আমরা অনাগতের পানে দৃষ্টি রাখিয়া আশা-আকাঙ্ক্ষা ও ভয়-ভাবনা বুকে লইয়া মুক্তির পথে চলিয়াছি।

আপনারা আজ আমায় আহ্বান করিয়াছেন— মাতৃপূজার যে আয়োজন করিয়াছেন তাহাতে আমাকেও যোগদান করিতে হইবে। যোগ্যতার বিচার আপনারা করেন নাই কারণ ভাবপ্রবণ হাওড়াবাসী আপনারা, বিচার না করিয়াই আজ পর্যন্ত আমার উপর অপরিসীম স্নেহ বর্ষণ করিয়া আসিতেছেন, তাই আমিও নিজের যোগ্যতা নির্ণয় না করিয়া সাধ্যমত আপনাদের সকল আহ্বানে সাড়া দিয়া আসিতেছি।

মাত্র কয়েকদিন হইল এই ময়দানের নিকটেই আপনারা একজন মহাবীর, মহাত্যাগী, অমিততেজ শহীদ বাঙালী যুবকের প্রতি আপনাদের শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের জন্য বিপুল আয়োজন করিয়াছিলেন— সারা রাত্রি জাতি-বর্ণ-ধর্ম-নির্বিশেষে আবালবৃদ্ধবণিতা শত সহস্র ভারতবাসী দলে দলে আসিয়া আপন আপন শ্রদ্ধা ভক্তি পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করিয়া গিয়াছিলেন।

তরুণ কর্মী যতীন্দ্রনাথ দধীচির তপস্যায় সিদ্ধ হইয়া এই পরাধীন ভারতবর্ষে আবার স্বাধীনতার আগুন জ্বালাইবার জন্য নিজের অস্থিপুঞ্জ রাখিয়া গেলেন ; সেই অস্থিগুলি সুদূর লাহোর হইতে বুকে করিয়া আনিয়া ভারতবাসী কেওড়াতলা শ্মশানে গঙ্গার তীরে বজ্রানল জ্বালিয়াছিল, এবং সেই যজ্ঞ সমাপন করিয়া পবিত্র চিতাভস্ম মস্তকে ধারণ করিয়াছিল। হে যতীন্দ্রনাথ ! ঐ পুণ্য দিবসে যে মন্ত্রে তুমি আমাদের দীক্ষিত করিলে তাহা হইতে

কোনো দিনই আমরা যেন ভ্রষ্ট না হই। তোমার সংকল্প, তোমার তেজ, তোমার ত্যাগ, তোমার স্বদেশপ্রেম, তোমার কর্মক্ষমতা ও ভাবপ্রবণতা যেন আমাদের প্রত্যেক ভক্তবন্ধুর মধ্যে প্রবেশ করিয়া অচিরে আমাদের জীবনের একটা রূপান্তর ঘটাইতে পারে।

যতীন্দ্রনাথের অতুলনীয় আত্মবলিদানের ভিতর দিয়া বাঙালী তথা ভারতবাসী, আবার প্রমাণ দিয়াছে যে মানুষ হিসাবে আমরা অন্য কোনো স্বাধীন জাতি অপেক্ষা হীন নহি! গত দেড় শত বর্ষের মধ্যে আমরা পরাধীনতা ও যাবতীয় দুরবস্থা সত্ত্বেও এবং মনুষ্যত্ব অর্জনের সুযোগ-সুবিধা না পাইয়াও জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে-সব মহাপুরুষের পরিচয় দিতে পারিয়াছি— তাহাতে সমগ্র জগৎ বুঝিতে পারিয়াছে যে এই জাতি মৃতপ্রায় নয়, মরণেচ্ছুও নয়, এ জাতি মরিতে পারে না— কারণ তার জীবনীশক্তি এখনো অক্ষুণ্ণ আছে। এ জাতি বাঁচিতে চায় কারণ তার বাঁচিবার প্রয়োজন ও সার্থকতা আছে। ভারতের যে একটা বাণী আছে; ভারতের যে একটা বিশিষ্ট সাধনা ও শিক্ষা আছে; ভারতের যে বিশ্বদরবারে দিবার মতো কিছু সম্পদ আছে— ইহা কথার কথা নয়; ইহা ধ্রুব সত্য। ভগবান যেমন সত্য; এ জগৎ যেমন সত্য, ইহাও তেমনি সত্য।

কিন্তু ভারতের সবচেয়ে বড়ো দুঃখ এই যে, যে দেশে এত মহাপুরুষ জন্মিয়াছেন সে দেশে জনসাধারণের মধ্যে এত দুর্গতি, এত অবনতি, এত হতাশা। একদিকে মানবতার অতুলনীয় সম্পদ— অপরদিকে মানবরূপে পশুত্বেরই রাজত্ব; যেন একদিকে অপূর্ব কারুকার্যখচিত, নানারত্নমণ্ডিত মর্মর প্রাসাদ এবং তৎপার্শ্বে ভগ্নপ্রায় পর্ণকুটীর ও পূতিগন্ধময় আবর্জনাস্তূপ। এ অবস্থার প্রতিকার কি সম্ভব? যদি সম্ভব হয় তবে কিরূপে সম্ভব? আমি বলি প্রতিকার নিশ্চয়ই সম্ভব? যদি আমরা একবার আমাদের সাধনার ধারা বিপুলতার দিকে, সমাজের দিকে পরিচালিত করিতে পারি। আমাদের জাতীয় সাধনাকে— ব্যক্তিত্ববাদের উপর প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। তাহা হইলেই ভারতের ঘরে ঘরে এবং ভারতের পর্ণকুটীরেও লক্ষ লক্ষ মহাপুরুষের আবির্ভাব হইবে এবং শ্রেণীবর্ণনির্বিশেষে ভারতবাসী সম্পদে ও গৌরবে মহীয়ান হইয়া উঠিবে।

আমি যাহা বলিলাম তার অর্থ এই যে, আমরা যদি অন্তরের সঙ্গে সমগ্র জাতির নবজাগরণ দেখিতে চাই তাহা হইলে সমাজ হইতে সকল প্রকারের কৃত্রিম বৈষম্য (**man-made inequalities**) তুলিয়া দিতে হইবে এবং মনুষ্যত্বের

বোধনের জন্য সকলকে সমান সুবিধা ও সুযোগ প্রদান করিতে হইবে। সামাজিক অথবা অর্থনৈতিক, কোনোপ্রকার কৃত্রিম বৈষম্য আর রাখিলে চলিবে না এবং পুরুষের দাসত্ব হইতে নারীকে মুক্ত করিতে হইবে। আমাদের সমাজের অবস্থা দেখিয়া কোনো কবি যেন আর গাহিতে না পারেন—

"পুরুষ অবরুদ্ধ আপন দেশে
নারী অবরুদ্ধ নিজ নিবাসে।"

বিশ্বমানবতার যে আদর্শ আমাদের বৈষ্ণব কবি গাহিয়া গিয়াছেন (শুনহ মানুষ ভাই ! সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই) তাহা যেন আমরা আমাদের জাতীয় জীবনে সার্থক ও মূর্ত করিয়া তুলিতে পারি।

রাষ্ট্রের সহিত সমাজের যে অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ, তাহাতে আমার দৃঢ় বিশ্বাস এই যে আমাদের সমাজের একটা আলোড়ন, একটা আমূল পরিবর্তন না হওয়া পর্যন্ত আমরা কিছুতেই রাষ্ট্রশক্তি ফিরিয়া পাইব না বা রাষ্ট্র-স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা করিতে পারিব না। সমগ্র জাতি যে পর্যন্ত মুক্তিকামী না হইবে সে পর্যন্ত মুক্তিলাভ অসম্ভব। কিন্তু আপনারা বুকে হাত দিয়া বলুন তো — আমাদের অবরুদ্ধ নারী সমাজ, আমাদের উপেক্ষিত অনুন্নত সমাজ, আমাদের নিষ্পেষিত শ্রমিক ও কৃষক সমাজ কি ব্যাপকভাবে মুক্তিকামী হইয়াছে ? আর তাহারা মুক্তিকামী হইবেই বা কেন, যদি তাহারা সমাজের ও অর্থের দাসত্ব হইতে মুক্তি না পায় ? অর্থের বন্ধন যাহাকে অহোরাত্র নিষ্পেষিত করিতেছে— সমাজের শৃংখল যাহাকে নিরন্তর ক্লিষ্ট করিতেছে— সে ব্যক্তি রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার স্বপ্ন কি করিয়া দেখিবে যদি রাষ্ট্রীয় বন্ধন চূর্ণ করার সংগে সংগে সে অন্যান্য বন্ধন হইতে মুক্তি না পায় ? বন্ধন মানুষ কখনো চায় না— মানুষ চায় মুক্তি, সকল প্রকার বন্ধন হইতে মুক্তি. জাতির অন্ধকার-ময় জীবন-প্রকোষ্ঠে মুক্তির প্রদীপ জ্বালিয়াও যদি আশা করেন যে সমগ্র জীবন নূতন প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হইবে না— তাহা হইলে সে আশা দুরাশা মাত্র। একদিকে স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করিতে চান, কিন্তু অপর দিকে যদি "সার্দা বিলের" প্রতিবাদ করিতে চান— তাহা হইলে দুঃখের সহিত আমি বলিব, "হে বন্ধু, আপনার মনোভাব আমি বুঝিতে অক্ষম।" বর্তমান সময়ে আমাদের দেশে ভাবের ঘরে যে লুকোচুরি চলিতেছে তাহা চিরকালের তরে দূর করিবার জন্য স্বাধীনতার সর্বাংগীণ বিকাশের কথা, মুক্তির প্রকৃত স্বরূপের কথা দেশ-বাসীকে বুঝাইয়া দিতে হইবে।

আমাদের জাতীয় আন্দোলনের ক্রমবিকাশ ও ক্রমোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে স্বাধীনতার অর্থও ক্রমশ প্রসার লাভ করিয়াছে। স্বরাজ বলিতে আমরা এক সময়ে মনে করিতাম "ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন" ; কিন্তু আমরা এখন বুঝি "পূর্ণ স্বাধীনতা"। আমরা এক সময়ে মনে করিতাম যে রাষ্ট্রকে (State) দখল করিয়া স্বাধীনতা ঘোষণা করিব ; কিন্তু সমাজের জীর্ণ কাঠামোতে হাত দিব না। কিন্তু এখন আমরা বুঝিতে আরম্ভ করিয়াছি যে, পক্ষপাতদুষ্ট অচলায়তন-সদৃশ বার্ধক্যগ্রস্ত সমাজের দ্বারা রাষ্ট্র-বিপ্লব করা বা রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা লাভ করা সম্ভবপর নয়। সমাজের দেহে নবজীবন সঞ্চার করিতে হইলে সকলকে ডাকিয়া চিরকালের জন্য বলিয়া দিতে হইবে যে, যে নূতন সমাজ আমরা প্রতিষ্ঠা করিতে চাই সে সমাজে প্রত্যেক মানুষ— কি পুরুষ, কী নারী— মনুষ্যত্বের পূর্ণ অধিকার ভোগ করিবে। জাতিভেদের বৈষম্য সেখানে থাকিবে না ; নারী সেখানে পুরুষের সহধর্মিণী ও সমানাধিকারিণী হইবে ; অর্থের দিক দিয়াও মানুষের সহিত মানুষের বৈষম্য থাকিবে না। এবং যাহারা ধান উৎপাদন করে সেই চাষা ও মজুর সম্প্রদায় তাহাদের ন্যায্য দাবি লাভ করিবে। স্বাধীন দেশে স্বাধীন সমাজের আবহাওয়ার মধ্যে মানুষ স্বাধীনতার রক্ততিলক ললাটে লইয়া জন্মিবে এবং বর্ধিত হইবে। মনুষ্যত্ব-লাভের এবং আত্মোন্নতির জন্য সকলে সমান সুযোগ ও সুবিধা ভোগ করিবে। এই সাম্যবাদই ভারতের মূল্য। এই মূল্য দিতে কি প্রস্তুত আছেন ? যদি প্রস্তুত থাকেন, তবে বিশ্বাস করুন নিশ্চয়ই স্বাধীন হইবেন।

স্বাধীনতা লাভের জন্য আমাদের পথ ও পাথেয় কি, সে সম্বন্ধে আমাদের মতভেদ থাকিতে পারে ; কিন্তু পথ নির্ণয়ের একটা প্রধান উপায়— ইতিহাসের দ্বারস্থ হওয়া। বাঙালীর ও ভারতের গত ত্রিশ বৎসরের ইতিহাস পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ করিলে আমরা তিনটি রূপ দেখিতে পাই—১. স্বদেশী যুগ ২. বিপ্লবের যুগ এবং ৩. অসহযোগের যুগ।

প্রথম যুগে আমাদের প্রধান অস্ত্র ছিল বিলাতী দ্রব্য বয়কট— বিশেষত বিলাতী বস্ত্র ও লবণ বয়কট। স্বদেশী যুগের উদ্দাম আন্দোলনের ফলে বঙ্গভঙ্গ রদ হইয়াছিল এবং মিন্টো-মর্লে সংস্কারের (Minto-Morley Reforms) প্রবর্তন হইয়াছিল। উদ্ধত আমলাতন্ত্রের শির অবনত হইয়াছিল এবং তাহাদের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তও নাকচ হইয়াছিল। নূতন শাসনপদ্ধতি লাভ করিয়া অনেকে সন্তুষ্ট চিত্তে আন্দোলন ছাড়িয়া দিলেন— আমলাতন্ত্রও

আসন্ন যুদ্ধ দেখিয়া চরমপন্থীদের নির্যাতন আরম্ভ করিলেন। ইহার ফলে উৎসাহী কর্মী ও স্বদেশ-প্রেমিকরা প্রকাশ্য আন্দোলনের সফলতা সম্বন্ধে সন্দিহান হইয়া বিপ্লবের পথ গ্রহণ করিলেন। এই ভাবে বিপ্লবের যুগ আরম্ভ হইল। ১৯১৮ বা ১৯১৯ পর্যন্ত বিপ্লবীদের চেষ্টা চলিল। এই আন্দোলনে যোগদান করিয়া কত কর্মী হাসিতে হাসিতে জীবনের জয়গান গাহিয়া ফাঁসিকাষ্ঠে উঠিলেন। আরো কত কর্মী দেশে ও বিদেশে কারাগারে ও বাহিরে কত নির্যাতন ও লাঞ্ছনা ভোগ করিলেন। কিন্তু তাঁহাদের সাধনা ব্যর্থ হইল না। প্রধানত তাঁহাদেরই চেষ্টার ফলে ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট ১৯১৯ খ্রীস্টাব্দে নূতন শাসনপদ্ধতি প্রতিষ্ঠা করিতে বাধ্য হইলেন। কিন্তু নূতন শাসনপদ্ধতি পাইয়া মডারেট সম্প্রদায় সন্তুষ্ট হইলেও দেশের অধিকাংশ লোক সন্তুষ্ট হইল না। তাহারা চাহিয়াছিল স্বরাজ— Self-determination বা আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার— কিন্তু তাহারা পাইল মণ্টেগুর মাকাল ফল। যখন অসন্তোষের বহ্নি চারিদিকে জ্বলিতেছে, তখন জালিয়ান-ওয়ালাবাগের হত্যাকান্ড তাহাতে ঘৃতাহুতি প্রদান করিল এবং তাহা হইতে নির্গত হইল অসহযোগের ধূমরাশি। এই ধূমরাশির প্রভাবে আমলাতন্ত্রের চোখে এরূপ ধাঁধা লাগিয়াছে যে, সে আজও পর্যন্ত স্থির করিতে পারে নাই যে, ভারতের বর্তমান অবস্থায় তার কী করা উচিত।

অসহযোগের মূল নীতি— আমলাতন্ত্রের প্রভাব হইতে মুক্ত হইয়া জনতাকে সংঘবদ্ধ করা এবং জনতাকে সংঘবদ্ধ করিয়া যে সহায়তা ও সহযোগিতার উপর ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত তাহার ভিত্তি একেবারে ধ্বংস করা। মুষ্টিমেয় বিপ্লবী নিজেদের জীবনদান করিয়া যখন দেশকে মুক্ত করিতে পারিলেন না, তখন বুঝিতে হইবে যে ভারতের জনসাধারণ যে পর্যন্ত না মুক্তিকামী হইবে এবং মুক্ত হইবার উদ্দেশ্যে সংঘবদ্ধ হইবে— সে পর্যন্ত গুপ্ত উপায়ে বা বিপ্লবের দ্বারা দেশের স্বাধীনতা লাভ সম্ভবপর নয়।

জানি না দেশে এখনো এমন লোক আছেন কিনা যাঁহারা মনে করেন যে আড়াইখানা বোমা ও দেড়খানা পিস্তলের দ্বারা তাঁহারা ভারত উদ্ধার করিতে পারিবেন। কিন্তু ভারতের উদ্ধার সাধন অত সহজ নয়। আড়াইখানা বোমা ও দেড়খানা পিস্তলের দ্বারা Terrorism করা যায়, কিন্তু করা যায় না Revolution ; Terrorism ও Revolution এক কথা নয়। Terrorism মুষ্টিমেয় লোকের দ্বারা সংঘটিত হইতে পারে ; কিন্তু Revolution সম্ভব

হইবে শুধু সেই দিন, যেদিন সমগ্র জাতি জাগিবে। পৃথিবীর ইতিহাসে যেখানে যেখানে Terrorism বা Revolution হইয়াছে ইতিহাসের সে-সব অধ্যায়ের পর্যালোচনা করিলে এই কথাই প্রতিপন্ন হইবে। Revolution-এর সৃষ্টি মানুষের চিন্তাজগতে এবং জাতির সাহিত্যক্ষেত্রে। এ কথা জানে ইংরেজ— তাই আমাদের জাতীয় সাহিত্যের উপর তাহাদের এত নির্মম দৃষ্টি এবং তাই ভারতবর্ষে Sedition-এর এরূপ বিভিন্ন ব্যাখ্যা এবং Sedition দমনের জন্য এরূপ বিচিত্র আইন। Revolution অস্ত্রের দ্বারা সংঘটিত হইতে পারে অথবা বিনা অস্ত্রেও হইতে পারে এবং Revolution-এর সময়ে রক্তপাত হইতে পারে বা না হইতে পারে। পৃথিবীর ইতিহাসে কি একাধিকবার আমরা রক্তপাতবিহীন বিপ্লব বা Bloodless Revolution-এর দৃষ্টান্ত দেখিতে পাই না ?

Revolution কথাটি দেখিলে বা শুনিলে আমাদের প্রভুরা আতংকে শিহরিয়া ওঠেন। তাঁহারা সংগে সংগে রক্তগংগা ও ছিন্নমুন্ডের স্বপ্ন দেখিতে আরম্ভ করেন এবং ভয়-ব্যাকুল চিত্তে সকল প্রকার অস্ত্র ও উপায় অবলম্বন করিয়া স্বকপোল-কল্পিত বিপ্লব নিবারণের জন্য বদ্ধপরিকর হন। কিন্তু Revolution বস্তুটা কি এতই খারাপ ? Revolution-এর অর্থ— অল্প সময়ের মধ্যে একটা আমূল পরিবর্তন, যেমন Evolution-এর অর্থ বহুদিন-ব্যাপী ক্রমোন্নতি বা ক্রমবিকাশ। প্রকৃতিদেবীর কোলে আমরা ঝড়, তুফান, বন্যারূপ Revolution মধ্যে মধ্যে দেখিয়া থাকি। কিন্তু কই তাহাতে তো কোনো আপত্তি করি না ! ব্যক্তির এবং জাতির জীবনের প্রত্যেক ক্ষেত্রে আমরা Revolution-এর কথা শুনিতে পাই ; কিন্তু তাহাতে তো আমাদের নিদ্রাভংগ হয় না। Sir Hinders Petric মহাশয় Revolution of Civilization সম্বন্ধে পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছেন, কিন্তু সে বই তো Proscribed হয় নাই বা বে-আইনী সাব্যস্ত হয় নাই।

বস্তুত Revolution-এর সহিত রক্তপাতের বা অস্ত্রের অচ্ছেদ্য কোনো সম্বন্ধ নাই ; বিনা রক্তপাতে (অর্থাৎ Bloodless) Revolution যেরূপ সম্ভব Non-violent Revolution বা বিনা অস্ত্রে Revolution ঠিক সেইরূপ সম্ভব। এ কথা আমাদের কর্তৃপক্ষেরা ভুলিয়া যান। এবং আমরাও মধ্যে মধ্যে ভুলিয়া যাই ; কিন্তু এ কথা যদি আমরা সর্বদা স্মরণপথে রাখি তাহা হইলে কর্তব্য এবং পন্থা সম্বন্ধে কোনোদিন ভ্রান্ত হইব না।

আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে terrorism-এর যুগে চিরকালের জন্য কাটিয়া গিয়াছে। এখন আমাদের প্রধান অস্ত্র mass organisation। নিজেদের স্বার্থের জন্য, নিজেদের দাবির জন্য দেশবাসীকে একজোট করিতে হইবে, সংঘবদ্ধ করিতে হইবে। এই সংঘবদ্ধ আন্দোলন, বিশিষ্ট দাবি বা বিশিষ্ট অভিযোগকে আশ্রয় করিয়া গড়িয়া উঠিবে। যেখানে অত্যাচার, যেখানে vested interests-এর প্রতিকূলতা—সেখানে তার বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করিতে হইবে। হয়তো কখনো সমাজের উচ্চবর্ণদের বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহ আরম্ভ করিতে হইবে : হয়তো কখনো ধনিক সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে গরীব চাষী ও মজুরদের সংঘবদ্ধ করিয়া আন্দোলন চালাইতে হইবে ; হয়তো কখনো রাষ্ট্রীয় দাবি আদায় করিবার জন্য আইন অমান্য বা খাজনা বন্ধ করিতে হইবে। এই উপায়ে দেশবাসী স্বার্থপরতা ভুলিয়া দশের সঙ্গে মিশিবে এবং সংঘবদ্ধ হইয়া উঠিবে। ইংরেজ-জাতি এবং তাহাদের গবর্নমেণ্ট ভারতবর্ষে তাহাদের অস্তিত্বের জন্য আমাদের উপর এত বেশি নির্ভর করে যে, আমরা যেদিন জাতি হিসাবে সংঘবদ্ধ হইতে পারিব সেইদিনই আমরা আমাদের সহযোগিতা ও সহায়তা প্রত্যাহার করিয়া বন্দুক-কামান-বিশিষ্ট আমলাতন্ত্রকে বিনা অস্ত্রেই আমাদের পদানত করিতে পারিব।

আমি স্বাধীনতালাভের উপায় সম্বন্ধে যাহা বলিলাম, বর্তমান যুগে পাশ্চাত্য জাতির অবস্থা দেখিলে আমার কথা আরো সমর্থিত হইবে। আজ-কাল general strike-এর উপকারিতা ও অমোঘত্ব সম্বন্ধে পাশ্চাত্য দেশেও অনেকে বিশ্বাসভাজন হইয়া উঠিতেছে, এতদ্ব্যতীত আমরা দেখিতে পাই যে, রুশ জাতি বন্দুক-কামানের শক্তির অপেক্ষা propagandaর শক্তির উপর অধিক নির্ভরশীল ও বিশ্বাসী হইয়া উঠিতেছে। আমি তো মনে করি যে, ইংরেজ জাতি যে পৃথিবীতে এত উন্নতি করিতে পারিয়াছে—ইহার প্রধান কারণ তাহারা propaganda চালাইতে জানে। তাহারা জানে যে propaganda দ্বারা সত্য মিথ্যা হয় এবং মিথ্যা সত্য হয়—দুর্বল শক্তিমান হইয়া উঠে এবং যে শক্তিশালী সে দুর্বল হইয়া পড়ে। ইংরেজ জাতি বহুবার propaganda-র দ্বারা যাহা করিয়াছে অন্যান্য জাতি বন্দুক-কামান প্রভৃতির দ্বারাও তাহা করিয়া উঠিতে পারে নাই। এবং আজ যে বলশেভিকদের উপর ইংরেজরা এত ক্রুদ্ধ ও সন্দিহান তাহার একটা কারণ এই যে বলশেভিকরা এতদিন পরে propaganda-র কৌশল জানিয়া ফেলিয়াছে।

কিছুকাল যাবৎ বাঙলার কংগ্রেস কমিটি নূতন বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে propaganda চালাইবার চেষ্টা করিয়া আসিতেছে। ইহার ফলে তাহারা আমলাতন্ত্রের বিরাগভাজন হইয়া পড়িয়াছে। আমাদের বক্তা ও প্রচারকদের বিরুদ্ধে উপর্যুপরি কতকগুলি মামলা রুজু হইয়াছে তাহা আপনারা অবগত আছেন। যেদিন আমরা ইংরেজের নিকট propaganda-র রীতি ও কৌশল ভালোরকম শিক্ষা করিতে পারিব সেইদিন জানিবেন যে আমরা গুপ্ত মন্ত্রের অধিকারী হইয়াছি এবং আমাদের সিদ্ধিলাভের বিলম্ব নাই।

অসহযোগ নীতির উদ্দেশ্য সফল করিবার জন্য যে non-violent mass organisation আমরা গড়িয়া তুলিতে চাই, তাহার প্রধান উপায় ব্যাপকভাবে propaganda— এই propaganda-র দ্বারা দেশবাসীর মনোজগতে বিপ্লব আনিতে হইবে। তাহা হইলেই তাহারা স্বীয় স্বার্থরক্ষার ও দাবি প্রতিষ্ঠার জন্য সংঘবদ্ধ হইয়া উঠিবে। Scely Meredith Townshend প্রমুখ চিন্তাশীল ইংরেজ লেখক এই অবস্থার কল্পনা করিয়াছেন যে, সেইদিন ইংরেজের রাজত্ব আর মুহূর্তের জন্য টিকিতে পারিবে না।

স্বাধীনতার পরিপূর্ণ রূপের দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া নিঃস্বার্থভাবে গণ-আন্দোলনে আত্মনিয়োগ করিতে পারিবে এরূপ কর্মী সৃষ্টি করা চাই। ভবিষ্যতের কাজের জন্য যেরূপ শিক্ষা-দীক্ষা যোগ্যতা ও বিশিষ্ট কর্মী আমরা চাই সেরূপ অধিকসংখ্যক কর্মী আজ পাওয়া যায় না। এরূপ আদর্শকর্মী সৃষ্টি করিবার জন্য যুব-আন্দোলনের ও ছাত্র-আন্দোলনের আবশ্যক হইয়াছে; যুব-আন্দোলনের মূলে উদ্দেশ্য যুবসমাজকে সকল রকমে আত্মপ্রত্যয়ী, স্বাবলম্বী ও যোগ্য করিয়া তোলা। পরের উপর বা বৃদ্ধের উপর নির্ভর করিলে চলিবে না, যাহারা ভবিষ্যতের উত্তরাধিকারী সেই তরুণ সমাজকেই নূতন জাতি সৃষ্টির গুরুভার নিজের হাতে গ্রহণ করিতে হইবে।

ছাত্রজীবনেই মানুষের চরিত্র গঠন হইয়া থাকে— তাই ছাত্রসমাজকে সকল রকমে যোগ্য করিয়া তোলার জন্য ছাত্র-আন্দোলনের প্রয়োজন হইয়াছে। আমাদের ছাত্রেরা যদি শিক্ষাদীক্ষায় কৃতী হইয়া উঠে এবং চরিত্রবলে বলীয়ান হইতে পারে তাহা হইলে তাহারা অধ্যয়ন সমাপন করিয়া আদর্শকর্মী রূপে কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিতে পারিবে। বস্তুত ছাত্র-আন্দোলনের সহিত যুব-আন্দোলনের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। ছাত্র-আন্দোলন ও যুব-আন্দোলন—

উভয়ের প্রভাব ও চেষ্টার দ্বারা দেশে আবার মনুষ্যত্বের বোধন হইবে. ইহাই আমাদের একান্ত প্রার্থনা।

আমি প্রথমেই বলিয়াছি যে, ব্যক্তিত্বের দিক দিয়া ভারত কোনো দিন দরিদ্র হয় নাই— আজও দরিদ্র নয়। কিন্তু আমাদের সাধারণের অবস্থা অতীব শোচনীয়। আমাদের সাধনা বহু শতাব্দী ধরিয়া ব্যক্তিত্বমুখী হইয়া পড়িয়াছে— আমরা ব্যক্তিত্ব ফুটাইবার দিকে যতটা দৃষ্টি দিয়াছি— সমগ্র সমাজকে উন্নত করিবার জন্য সেরূপ চেষ্টা করি নাই : তাই আমরা সচরাচর মিলিয়া মিশিয়া কাজ করিতে পারি না— একজনের নিকট মাথা নত করিতে হইলে আমরা অপমান বোধ করি এবং আমরা স্ব স্ব প্রধান ও পরশ্রীকাতর হইয়া পড়িয়াছি। নিজের শ্রেষ্ঠত্বের চিন্তা করিতে করিতে আমরা অহংকারে মরি এবং আমাদের এরূপ বিচিত্র মনোভাব সৃষ্টি হইয়াছে যে, তাহার বর্ণনা করিতে হইলে বলিতে হয়—"দেশ উদ্ধার যদি হয় তবে আমার দ্বারাই হউক, নতুবা হইয়া কাজ নাই।"

জাতীয় চরিত্রে এই গলদ দূর করিবার জন্য চাই discipline এবং discipline শিখাইবার জন্য চাই—Volunteer movement। আমরা Volunteer movement-এর প্রসারের জন্য চেষ্টা করিতেছি। বাধা পাইয়াছি অসংখ্য— দেশী, বিদেশী কত লোকই ঠাট্টা করিয়াছে, বাধাও দিয়াছে। কেহ কেহ আবার বহু পরিশ্রম করিয়া দোষ ধরিয়া ছিদ্র অন্বেষণ করিয়াছে। কিন্তু আমরা জানি যে Volunteer movement যদি বাংলাদেশে সাফল্যমণ্ডিত হইয়া উঠে তাহা হইলে বাঙালীর চরিত্র হইতে একটি দুরপনেয় কলঙ্ক চিরকালের জন্য বিদূরিত হইবে। বাঙালী তখন ধর্মে-কর্মে, জ্ঞান-বিজ্ঞানে, শৌর্যে-বীর্যে, সর্ববিষয়ে গৌরবান্বিত হইয়া উঠিবে।

আপনাদের বোধ হয় স্মরণ করাইয়া দিতে হইবে না যে গত কলিকাতা-কংগ্রেসে জাতির পক্ষ হইতে একটি দাবি ঘোষণা করা হইয়াছিল এবং ঐ দাবি ব্রিটিশ গবর্নমেন্ট স্বীকার করিবেন কি না তাহা স্থির করিবার জন্য এক বৎসর সময় দেওয়া হইয়াছিল। দাবি যদি গ্রাহ্য না হয় তাহা হইলে ১ জানুয়ারি ১৯৩০ হইতে আমরা কী করিব তাহাও একরকম বলা হইয়াছে। আমি মনে করি— এ-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই যে ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে কংগ্রেসের দাবি স্বীকৃত না হইলে লাহোর-কংগ্রেসে পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব গৃহীত হইবে। এই প্রস্তাব গ্রহণ করিবার পর প্রস্তাবটা কার্যকরী করিবার

জন্য আমরা কী করিব তাহাই এখন চিন্তার বিষয়। কলিকাতা-কংগ্রেসের নির্দেশানুসারে এই বৎসর পূর্ণ অসহযোগের জন্য (অর্থাৎ আইন-অমান্য, খাজনা বন্ধ প্রভৃতির জন্য) দেশকে প্রস্তুত করিতে হইবে। দেশকে প্রস্তুত করিবার জন্য কংগ্রেস কমিটিগুলির পুনর্গঠন ও পুনঃসংস্কার করিতে হইবে। এবং সঙ্গে সঙ্গে বিলাতী দ্রব্য বর্জন এবং বিদেশী বস্ত্র বর্জনের জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করিতে হইবে। এখনো আমরা প্রতিবৎসর প্রায় ১১০ কোটি টাকার বিলাতী মাল খরিদ করিতেছি এবং তার মধ্যে প্রায় ৫০ কোটি টাকার বিলাতী বস্ত্র ক্রয় করিতেছি। সুতরাং আমাদেরই অর্থের দ্বারা প্রায় এক কোটি ইংরেজ নিজের ঘরে বসিয়া প্রতিপালিত হইতেছে। আমরা যদি নিরস্ত্র উপায়ে এবং কোনো প্রকার শান্তিভঙ্গ না করিয়া এই বিলাতিমাল ক্রয় বন্ধ করিতে পারি, তাহা হইলে বিলাতে এক কোটি ইংরেজের কি অবস্থা হইবে তাহা সহজেই কল্পনা করিতে পারেন। অসহযোগ অস্ত্র ঠিকমত প্রয়োগ করিতে পারিলে যে তাহা অব্যর্থ এবং অমোঘ তার আর-একটা কারণ এই যে ইংরেজ এ দেশে এবং নিজের দেশে নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখিবার জন্য আমাদের উপর নানাভাবে নির্ভরশীল এবং আমাদের সাহায্য ও সহযোগিতা ব্যতিরেকে কোটি কোটি ইংরেজ একদিনের জন্যও জীবন ধারণ করিতে পারে না।

সম্মুখে যে-সব সমস্যা পড়িয়া আছে তাহার সমাধান করিতে হইলে এবং সমস্ত দেশকে পূর্ণ স্বাধীনতার দিকে লইয়া যাইতে হইলে, অবিলম্বে দুইটি কাজে বিশেষভাবে মনোনিবেশ করিতে হইবে। প্রথম কাজ সামরিক প্রণালীতে স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গঠন এবং দ্বিতীয় কাজ শ্রমিক-আন্দোলনে অন্তরের সঙ্গে যোগদান। আমি এ কথা বলিতে বাধ্য যে, এখনো পর্যন্ত এই দুইটি কাজের দিকে নেতৃবৃন্দের দৃষ্টি তেমনভাবে আকৃষ্ট হয় নাই। দেশের বর্তমান অবস্থায় কোনো নেতা যদি নূতন programme বা কর্মপ্রণালী দিতে চান তাহা হইলে তাঁহাকে এই দুইটি কার্য কর্মতালিকার পুরোভাগে রাখিতে হইবে।

আর-একটি কথা বলিয়া আমার বক্তব্য শেষ করিব। দেশের অবস্থা ক্রমশ যেরূপ দাঁড়াইতেছে তাহাতে আমার মনে হয় যে, আগামী বৎসর আমরা আবার একটা বিপুল আন্দোলন সৃষ্টি করিতে পারিব। গভর্নমেণ্টের বর্তমান দমন-নীতির দ্বারা ইহার প্রতিরোধ হইবে না। এই উন্মাদপূর্ণ আন্দোলনের সময়ে

সহস্র সহস্র কর্মীর প্রয়োজন হইতে পারে। তাহা যদি হয়, তবে বাংলার ছাত্র-সমাজকে আর-একবার স্কুল-কলেজ ত্যাগ করিয়া কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে হইবে। তবে এবার অধ্যয়ন ত্যাগ করিতে হইবে চিরকালের জন্য নয়— শুধু এক বৎসরের জন্য। অন্যান্য স্বাধীন দেশে যুদ্ধের সময়ে ছাত্র-সমাজ যেরূপ স্কুল-কলেজ খালি করিয়া রণভূমির দিকে ধাবমান হন, প্রয়োজন হইলে আগামী বৎসর বাংলার ছাত্রসমাজকেও তদ্রূপ স্কুল-কলেজ খালি করিয়া কর্মক্ষেত্রের পানে ছুটিতে হইবে। তারপর যদি এক বৎসরের শেষেও সংগ্রাম চলে, তখন ১৯৩১ সালে আবার আর-এক নূতন দল আসিয়া কর্মক্ষেত্রে নামিবে এবং পুরাতন দল তখন ইচ্ছা করিলে কর্মক্ষেত্র হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া অধ্যয়ন-কার্যে পুনরায় মনোনিবেশ করিতে পারিবে। অভিভাবকবৃন্দ হয়তো আমার এ কথায় রুষ্ট হইবেন কিন্তু উত্তরে আমি বলিব—"যদি স্বাধীনতা চান— তবে নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়।"

সমবেত ভদ্রমন্ডলী। আমার অভিভাষণ শেষ হইয়াছে। নূতন কথা হয়তো কিছু বলি নাই— কিন্তু কাজের কথা বলিয়াছি— অভিজ্ঞতার কথা, অন্তরের কথা শুনাইয়াছি। দেশের কোনো কোনো স্থানে এখন দলাদলি দেখা যাইতেছে— ইহাতে যে আমরা সকলেই দুঃখিত ও মর্মাহত হইয়াছি সে-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই। দলাদলি করে তাহারা— যাহারা কাজ করে না, করিতে চায় না— অথবা যাহারা discipline মানিতে চায় না। কাজ করিলে বহু শৃংখলা মানিয়া চলিলে মানুষ দলাদলি করিতে পারে না— করিবার অবসরও পায় না। এই দলাদলিতে ভীত হইবার কোনো হেতু নাই। কারণ অদূর ভবিষ্যতে যদি সকলে আবার গাজার আতিথ্য গ্রহণ করিতে বাধ্য হয় তখন আপনি দলাদলি থামিয়া যাইবে। এবং আমরা যদি তরুণ সমাজকে discipline শিখাইয়া কর্মক্ষেত্রে নামাইতে পারি তাহা হইলে দলাদলির বীজ চিরকালের তরে বিনষ্ট হইয়া যাইবে।

আমলাতন্ত্রের দমন নীতি দিন দিন ভীষণতর রূপ ধারণ করিতেছে। একে একে আমাদের কর্মীরা লৌহকপাটের দিকে চলিতেছে। আমরা কি বসিয়া থাকিব? এই তো আমাদের মাহেন্দ্রক্ষণ! বৃথা তর্ক ও সমালোচনা ছাড়িয়া আসুন আমরা সকলে একসঙ্গে কর্মসমুদ্রে ঝাঁপ দিই। তীরে আমরা একদিন পৌঁছিবই পৌঁছিব— কারণ পার্থসারথি নিজেই যে আমাদের পথ-প্রদর্শক। ভারত আবার স্বাধীন হইবে— এ-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই; ভারতের সন্তান

আবার শির উন্নত করিয়া দেশ-বিদেশে পরিভ্রমণ করিবে এবং ভারতের জ্ঞান-বিজ্ঞান আবার বিশ্বদরবারে সমাদৃত হইবে। আজ বাঙালী, তথা ভারতবাসী, অন্তরের সহিত বিশ্বাস করে যে, সে মুক্ত হইবে, কারণ মুক্ত হইবার শক্তি সে নিজের অন্তরের মধ্যে পাইয়াছে। তাই আজ আর আমরা দুর্বল নই, কাঙাল নই— ভিখারী নই। আমরা আবার মানুষ হইয়াছি। পূর্ণ মানবতার গৌরবে আমরা আজ বলীয়ান। অতএব আসুন— সকলে ভেদ-বিসম্বাদ ভুলিয়া মাতৃপূজার জন্য সমবেত হই ; জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদকে অর্ঘরূপে লইয়া মাতৃচরণে উপস্থিত হই এবং গললগ্নীকৃতবাসে সকলে সমস্বরে প্রার্থনা করি—"জননী ! জাগৃহি !"

বন্দেমাতরম্ !

জাতীয় পতাকা উত্তোলন

১ অক্টোবর ১৯২৯ শ্রদ্ধানন্দ পার্কে জাতীয় পতাকা উত্তোলন উপলক্ষ্যে ভাষণ।

প্রত্যেক জাতীয় অনুষ্ঠানে জাতীয় পতাকা উত্তোলনের একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ স্থান আছে। কারণ এই ত্রিবর্ণরঞ্জিত পতাকা ভারতীয় জাতীয়তাবাদের প্রতীক। পৃথিবীতে প্রত্যেক জাতির নিজস্ব জাতীয় পতাকা আছে। সকলেই ইহাকে অতিশয় সম্মান দেন। নিজেদের জীবন দিয়াও তাহারা জাতীয় পতাকার গৌরব রক্ষা করেন। ভারতীয়দেরও জাতীয় পতাকাকে সম্মান করিতে হইবে ও প্রয়োজন হইলে ইহার মর্যাদা রক্ষায় জীবন দিতে হইবে। ভারতের আমলাতান্ত্রিক সরকারের কর্মচারীরা ভারতের জাতীয় পতাকার প্রতি শ্রদ্ধাপন্ন নয়। আমাদের পতাকার প্রতি সম্মান প্রদর্শনের উদ্যোগকে সর্বদাই তাহারা বাধা দিতেছে। কিন্তু আমলাতন্ত্রের ভ্রূকুটি সত্ত্বেও এই পবিত্র পতাকাকে আমরা উচ্চ মর্যাদা দান করিব, ও শিশু-কিশোরদের মধ্যেও ইহার প্রতি অনুরাগ ও সম্মানবোধ সঞ্চারিত করিয়া দিব।

বাংলায় অশান্তি

৩ অক্টোবর ১৯২৯ কলিকাতায় শ্রদ্ধানন্দ পার্কে শহীদ যতীন দাসের স্মরণে কংগ্রেস খাদি প্রদর্শনী কমিটির উদ্যোগে অনুষ্ঠিত এক সমাবেশে সভাপতির ভাষণ।

এইমাত্র আপনারা যে উদ্দীপনাময় ভাষণ শুনিলেন তাহার পর আমি আর আপনাদের বক্তৃতায় ভারাক্রান্ত করিব না। ড. আলম বলিলেন, বাংলা ও পাঞ্জাবকে নিবিড় যোগসূত্রে বাঁধিয়া দিয়াছেন শহীদ যতীন দাস। ড. আলম যথার্থই বলিয়াছেন, বিদেশী শাসনাধীন সর্বপ্রথম হইয়াছিল বাংলা আর সর্বশেষে পাঞ্জাব। এখন বিদেশী আমলাতন্ত্রের হাত হইতে স্বাধীনতা ছিনাইয়া লইবার জন্য আজ উভয় প্রদেশই সমান দৃঢ়সংকল্পবদ্ধ। আমার মনে পড়িয়া গেল আইন সভায় সরকারের একজন বিশিষ্ট সদস্যের কিছুদিন পূর্বের এক উক্তি। তিনি বলিয়াছিলেন, বাংলায় এত অসন্তোষ ও বৈপ্লবিক মনোভাব কেন? এই প্রদেশের পক্ষ হইতে শ্রী তুলসীচন্দ্র গোস্বামী এই প্রশ্নের যে উত্তর

দিয়াছিলেন তাহাও আমার মনে পড়িতেছে। তিনি বলিয়াছিলেন : আজ বাংলা মীরজাফর ও উমিচাঁদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে চায়, সেজন্যই বাংলায় এত অসন্তোষ জাগিয়াছে।

স্বাধীনতার সূর্য

ড. আলম যে মনোহর উপমা দিয়াছেন আপনাদের নিশ্চয়ই তাহা ভালো লাগিয়াছে। তিনি এইমাত্র বলিলেন যে পূর্বের সূর্য পশ্চিমে অস্ত গিয়াছে, তারপর চন্দ্রোদয় হইল, কলিকাতায় সেই চাঁদ আসিয়া পড়িয়াছে। এই চাঁদ দিব্য, ভাষায় ইহার বর্ণনা করা যায় না, ইহা আমাদের প্রেরণা দিতেছে। আমার বিশ্বাস, এই রাত্রে আজ যাঁহারা এখানে উপস্থিত আছেন তাঁহাদের সকলের মনের কথাটি এই যে পাঞ্জাবের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলাইয়া চলিতে বাংলাও আজ পণ করিয়াছে। আমি স্বীকার করিতেছি কোনো কোনো রাজনৈতিক সমস্যার ক্ষেত্রে ভারতের অপরাপর অংশ হইতে বাংলা পৃথক বক্তব্য পোষণ করে। কিন্তু আজ জানিয়া আশ্বস্ত হইলাম এবং উৎসাহ ও প্রেরণা পাইলাম যে পাঞ্জাব ও বাংলা একই লক্ষ্যের প্রতি সমদৃষ্টি লইয়া অগ্রসর হইতে সংকল্প করিয়াছে।

লাহোরে যৌবনের জয়

আমি জানি না আমরা সবাই লাহোর-কংগ্রেসে উপস্থিত থাকিতে পারিব কিনা। কিন্তু কলিকাতায় যৌবনের যে কণ্ঠ রোধ করা হইয়াছিল লাহোরে তাহারই জয় হইবে— আমলাতন্ত্র যতই নিপীড়ন চালাক-না কেন, বুদ্ধেরা যতই হুঁশিয়ার করুন-না কেন। ড. আলম, আপনাকে আমি অনুরোধ জানাইতেছি আপনি পাঞ্জাবে আমাদের প্রীতি ও সহানুভূতির বাণী পৌঁছাইয়া দিন। আমার মনে পড়ে, সুদূর ব্রহ্মদেশের এক কোণে পাথরের দেয়ালের অভ্যন্তরে, কারাপ্রাচীরের অন্তরালে পাঞ্জাব ও বাংলার মিলন হইয়াছিল। আন্দামানে দ্বীপান্তরিত অবস্থায় বাঙালী ও পাঞ্জাবী একত্রে বাস করিয়াছে, মান্দালয়ে ও ইনসিন জেলে বিনাবিচারে আটক বন্দী রূপে তাহারা বাস করিয়াছে, আমি বিশ্বাস করি, আজ পাঞ্জাব ও বাংলা যে দুঃখ ভোগ করিতেছে তাহার ফলে তাহারা স্বাধীনতা সংগ্রামের খাঁটি সৈনিক রূপে গড়িয়া উঠিতেছে।

সংগ্রামী কর্মসূচী

আমার নিশ্চিত বিশ্বাস, লাহোরে যৌবনের বাণী জয়ী হইবে। আমি জানি না সেখানে কোন্ কর্মসূচী গৃহীত হইবে। কিন্তু নিশ্চই অগ্রগামী তথা সংগ্রামী কর্মসূচী গৃহীত হইবে।

লাহোর-ষড়যন্ত্র মামলা ও যতীন দাসের মৃত্যু উপলক্ষে পাঞ্জাবের জনগণ বাংলার প্রতি যে প্রীতি ও সহানুভূতি দেখাইয়াছে, সেজন্য বাংলার হৃদয় কৃতজ্ঞতায় ভরিয়া উঠিয়াছে। বাংলার জনসাধারণের পক্ষ হইতে সেই কৃতজ্ঞতা আজ আমি প্রকাশ করিতেছি।

নিখিল বঙ্গ সতীন সেন দিবস

৪ অক্টোবর ১৯২৯ সংবাদপত্রে প্রচারিত বিবৃতি।

বরিশাল হইতে সর্বশেষ প্রাপ্ত সংবাদে জানা যাইতেছে যে বরিশাল জেলে অনশনব্রতী শ্রীযুক্ত সতীন্দ্রনাথ সেনের জীবন-দীপ দ্রুত নিভিয়া আসিতেছে। সরকার বলিয়াছেন যে তাঁহারা সতীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে যে মামলা দায়ের করিয়াছেন তাহা প্রত্যাহার করিবেন না। হাইকোর্ট শ্রীযুক্ত সতীন্দ্রনাথ সেন ও তাঁহার সহকর্মীদের বিরুদ্ধে যে মামলা ইতিপূর্বে বাতিল করিয়া দিয়াছিলেন বা পটুয়াখালি মীমাংসার সময় সরকার যে-সব মামলা প্রত্যাহার করিয়া লইয়াছিলেন সেইগুলি এখন পুনরুত্থিত হইয়াছে। তাঁহাদের কারারুদ্ধ করিয়া তাঁহাদের রাজনৈতিক কর্ম বন্ধ করিয়া দেওয়াই এই-সব মামলার একমাত্র উদ্দেশ্য। দণ্ডবিধির ১১০ ধারা অনুসারে একজন দেশপ্রেমিক কর্মীর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা একটি জঘন্য ব্যাপার; এবং সরকারের এই প্রয়াস যদি সফল হয় তবে সারা দেশের পক্ষে ইহা হইবে একটি বিপজ্জনক নজির। যখন তাঁহার দেশবাসী তাঁহাকে মুক্ত করিতে পারিল না, তখন সতীন সেন মহাশয়কে বর্তমান কর্মসূচী গ্রহণ করিতে হইল। তিনি ধীরে ধীরে মৃত্যুবরণ করিতেছেন। আমাদের এখন কর্তব্য হইল তাঁহার মুক্তি আদায় করার জন্য সারা দেশে প্রবল আন্দোলন গড়িয়া তোলা। এই উদ্দেশ্যে বাংলার প্রতিটি জেলায় স্থায়ী সতীন সেন মুক্তি কমিটি গড়িয়া তুলিতে হইবে। এই কমিটি-

গুলির কাজ হইবে সতীন সেনের মুক্তির দাবিতে আন্দোলন করা, যেখানে সম্ভব ও আবশ্যক সেখানে সত্যাগ্রহ করা। তবেই আমরা সরকারকে বলিতে পারিব যে বাংলার জনসাধারণ বরিশালে লাহোর-ট্রাজেডির পুনরাবৃত্তি ঘটিতে না দিবার জন্য কৃতসংকল্প। এবং তখনই আমরা সরকারকে তাঁহাদের অমানবিক নীতির ফলাফল সম্পর্কে হুঁশিয়ার করিয়া দিতে পারিব।

সারা বাংলায় আন্দোলনের প্রথম পদক্ষেপ রূপে ১৯২৯ সালের ৬ অক্টোবর রবিবার নিখিলবঙ্গ সতীন সেন দিবস পালনের জন্য আমি বাংলার কংগ্রেস কমিটিগুলির প্রতি আহ্বান জানাই। সভা, শোভাযাত্রা, মিছিল, সতীন সেনের স্বাস্থ্য ও মুক্তিকামনায় গণ-প্রার্থনা ইত্যাদি ঐদিন অনুষ্ঠিত হইবে।

২

৬ অক্টোবর ১৯২৯ নিখিলবঙ্গ সতীন সেন দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষে শ্রদ্ধানন্দ পার্কে অনুষ্ঠিত জনসভায় প্রদত্ত ভাষণ।

যখন আমি ভাবি আমরা কতখানি অসহায়, তখন আমার মুখে আর কথা জোগায় না। দেশসেবায় উৎসর্গীকৃত একজন পরম নিষ্ঠাবান কর্মী সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাইতে গিয়া তিলে তিলে মৃত্যু বরণ করিতেছেন আর আমরা তাঁহার জন্য কিছুই করিতে পারিতেছি না। ১১০ ধারা অনুসারে যখন তাঁহাকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল তখন তিনি অনশন করেন নাই, কেননা তখন তিনি ভাবিয়াছিলেন যে তাঁহার দেশবাসী সরকারের দমননীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাইবে। কিন্তু তাহাদের ঔদাসীন্য দেখিয়া তিনি নিজেই হাতে অস্ত্র তুলিয়া নিয়াছেন। সরকার যখন সতীন সেনের মতো মর্যাদাবান ব্যক্তিকে ১১০ ধারা অনুসারে গ্রেপ্তার করিতে দ্বিধা করেন নাই তখন যে-কোনো জাতীয় কর্মীকেই তাঁহারা ঐভাবে উৎপীড়িত করিতে পারেন। ইহাতে কেবল বাংলার নয় সারা ভারতেরই বিপদ হইবে।

সরকারের অভিপ্রায়, যেভাবেই হোক সতীন সেনকে কারাগারে আবদ্ধ রাখা। আরো কয়েকটি অভিযোগ তাঁহারা ঝুলিতে জমা রাখিয়াছেন, ১১০ ধারা অনুসারে দায়ের করা মামলায় ফল না ফলিলে ঐ অভিযোগগুলি ঝুলি হইতে বাহির করা হইবে।

যতীন দাস ও সতীন সেনের আত্মত্যাগের পিছনে যে মনস্তত্ত্ব রহিয়াছে তাহা বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে যে তাঁহারা বিদ্রোহের মনোভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া অনশন শুরু করিয়াছিলেন। পরাধীনতার বেদনা তাহাদের হৃদয়ের এমন অন্তস্তলে প্রবেশ করিয়াছে যে তাঁহাদের সংকল্প অতি দৃঢ়, যাহা আরম্ভ করিয়াছেন তাহা হইতে বিচ্যুত হইবার কোনো ইচ্ছাই তাঁহাদের নাই। শ্রীযুক্ত সেনগুপ্ত ও আমি যখন সতীনবাবুকে অনশন ভাঙিবার জন্য বুঝাইতেছিলাম, তিনি এমন পালটা যুক্তি দিলেন যে আমরা বুঝিলাম তিনি সত্যোপলব্ধি করিয়াছেন। তিনি আমাদের বলিলেন: "আমি আমার জীবনে কখনো কাহারো কাছে নতি স্বীকার করি নাই এবং কখনো কোনো অপমানজনক মুচলেকা দিই নাই। আজ যদি আমি আমার জীবন রক্ষার জন্য আপনারা যাহা বলিতেছেন তাহা করি তবে আমি এ পর্যন্ত যে মানসিক শক্তির অধিকারী হইয়াছি তাহা সকলই হারাইব।"

প্রকৃতই তিনি এমন শক্তিশালী ও দৃঢ়সংকল্পবদ্ধ, তাঁহার মনোভাব এমনই আপসবিরোধী যে এমন-কি সরকারও তাঁহাকে ভয় পান।

কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যরূপে আমি ঐ কমিটির সিদ্ধান্ত মানিয়া চলিতে বাধ্য। কিন্তু ব্যক্তিগত ভাবে আমার মত এই যে অনশন সম্পর্কে তাঁহারা যে ফতোয়া জারি করিয়াছেন তাহা যথার্থ হয় নাই। যতীন দাসের আত্মাহুতি দানের পর যদি কেহ ঐ একই পথ গ্রহণ করিয়া থাকেন তবে বুঝিতে হইবে যে সেই সিদ্ধান্ত যথেষ্ট চিন্তাভাবনা-প্রসূত, তাঁহাকে উহা হইতে প্রতিনিবৃত্ত করা উচিত নয়।

মানবতার স্বার্থে যতীন দাস ও সতীন সেনের আত্মাহুতি কখনো ব্যর্থ হইতে পারে না। খৃস্টানরাও সে কথা স্বীকার করিবেন। পরাধীনতার যে জ্বালা যতীন দাস ও সতীন সেনকে উদ্বুদ্ধ করিয়াছে সেই জ্বালা আমাদের প্রত্যেকের হৃদয়ে অনুভূত হোক।

অস্পষ্ট অভিযোগ

১০ অক্টোবর ১৯৪৯ সংবাদপত্রে প্রদত্ত বিবৃতি।

কিছুকাল যাবৎ শ্রীযতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত ব্যক্তিগতভাবে ও প্রকাশ্যে আমাকে ও বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির কর্মপরিষদকে আক্রমণ করিতেছেন। আমি এতদিন পর্যন্ত ইচ্ছা করিয়াই কোনো জবাব দিই নাই। কারণ আমি জানি সংবাদপত্রে ও সভামঞ্চে এই বিরোধকে টানিয়া আনা কত অসমীচীন। কিন্তু তাঁহার সর্বশেষ উক্তিগুলি পাঠের পর আমার পক্ষে আর নীরব থাকা সম্ভব নয়— বিশেষত শ্রীযুক্ত সেনগুপ্ত যখন শোভনতার সীমা লঙ্ঘন করিয়াছেন।

শ্রীসেনগুপ্ত ও তাঁহার গোষ্ঠীর প্রচারকার্য সম্পার্কে আমার অনেক কিছু বলার আছে, কিন্তু এখন উহা বলিব না, পরে কখনো বলিব। বর্তমানে আমি শুধু যতীন্দ্রনাথ দাস মেমোরিয়াল কমিটি ও চট্টগ্রাম বিরোধ সম্পর্কে তাঁহার মন্তব্য লইয়া কিছু বলিব।

মহান শহীদের যোগ্য স্মারক স্তম্ভ নির্মাণের জন্য ব্যবস্থা লইবার উদ্দেশ্যে যথাযোগ্য নোটিশ জারি করার পর বি. পি. সি. সি.-র কর্মপরিষদের একটি সভা আহ্বান করা হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত সেনগুপ্ত কর্মপরিষদের একজন সদস্য। কিন্তু তিনি ঐ সভায় যোগ দেন নাই— যদিও তাঁহার কয়েকজন সঙ্গী যোগ দিয়াছিলেন। আমি ঐ সভায় সভাপতিত্ব করিয়াছিলাম। আমার স্পষ্ট মনে আছে যে কর্মপরিষদ স্মারক কমিটির গঠন সম্পর্কে সবগুলি সুপারিশ গ্রহণ করিয়াছিল। সভার মনোভব ছিল এই যে পরে আর-কোনো নাম সুপারিশ করা হইলে সে নামগুলিও গৃহীত হইবে।

সভা ভাঙিয়া গেলে আধ ঘণ্টাও পার হয় নাই, এমন সময় বি. পি. সি. সি-র সম্পাদক শ্রীযুক্ত কিরণশঙ্কর রায় একটি টেলিফোন পাইলেন। টেলিফোনটি আসিয়াছে শ্রীযুক্ত সেনগুপ্তের বাড়ি হইতে। তাঁহারা জানাইলেন যে পরদিনের প্রভাতী কাগজে শ্রীযুক্ত সেনগুপ্তের নাম যেন বাহির না হয়। শ্রীযুক্ত সেনগুপ্তের বাড়ি হইতে অনুরূপ বার্তা "ফ্রী প্রেস"-এর সম্পাদকও টেলিফোনে পাইলেন। বি. পি. সি. সি-র সম্পাদক জবাবে বলিলেন, কর্ম পরিষদ যে ব্যক্তিকে নির্বাচিত করিয়াছেন তাঁহার নাম বাদ দিবার অধিকার তাঁহার নাই। আমি জানি না, এরকম সত্বর সিদ্ধান্ত লইবার আগে শ্রীযুক্ত সেনগুপ্ত কমিটির সদস্যদের নাম জানিতেন কিনা, বা স্মারক কমিটির কাজ কী হইবে তাহাও

জানিতেন কিনা। যাহা হউক, তাঁহার মতো মর্যাদাবান নেতার এ-হেন আচরণে আমরা বিস্মিত হইয়াছিলাম।

শ্রীযুক্ত সেনগুপ্তের তারবার্তা

স্পষ্টতই শ্রীসেনগুপ্ত তাহার ভুল বাঝিতে পারিলেন। কেননা কয়েকদিন পর লক্ষ্ণৌ হইতে তিনি আমাকে একটি তারবার্তা পাঠাইলেন। তাহাতে তিনি বলিলেন যে তিনি কমিটিকে সাহায্য করিবেন তবে কমিটির সদস্য হইতে পারিবেন না।

খোলাখুলি বলুন

শ্রীযুক্ত সেনগুপ্ত এখন সম্ভবত বুঝিতে পারিয়াছেন যে তাঁহার অবস্থা স্ব-বিরোধিতাপূর্ণ হইয়া পড়িয়াছে। তাই এখন তিনি কমিটির সদস্য পদ না লইবার হেতু দেখাইতে চেষ্টা করিতেছেন। ৮ তারিখের 'বসুমতী'তে তিনি বলিয়াছিলেন— তাঁহার কমিটির সদস্য না হওয়ার প্রধান হেতু, ঐ কমিটি শুধু চাঁদা তুলিবে না, সংগৃহীত টাকা কিভাবে খরচ করা হইবে তাহাও নির্ধারণ করিবে। আমি কি শ্রীযুক্ত সেনগুপ্তকে জানাইতে পারি যে-কমিটির কথা তিনি বলিয়াছেন সংগৃহীত টাকা কিভাবে খরচ করা হইবে তাহা স্থির করিবার অধিকার ঐ কমিটির নাই ?

শ্রীযুক্ত সেনগুপ্তের মতো মর্যাদাসম্পন্ন নেতার পক্ষে অশোভনভাবে— কিন্তু দুর্ভাগ্য বর্তমানে ইহাই তাহর স্বভাব লক্ষণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে— তিনি বলিয়াছেন : "অতীতে বাংলায় আমার যে অভিজ্ঞতা হইয়াছে তাহার ফলে এবং জনসাধারণের টাকা খরচ করার দায়িত্ববহনে আমার ব্যক্তিগত অসামর্থ্যবশতই আমি ঐ কমিটিতে থাকিতে চাই নাই। জনসাধারণের পক্ষে টাকা খরচ করার দায়িত্ব ঐ কমিটিরই থাকিবে।" শ্রীযুক্ত সেনগুপ্ত মহাশয়ের যদি যথেষ্ট সাহস ও স্পষ্টবাদিতা থাকে তবে আমি তাঁহাকে অনুরোধ করিব এরকম অপবাদ না দিয়া খোলাখুলি সব কথা বলুন। আর যদি জনসাধারণের টাকা খরচ করার দায়িত্ববহনে তাঁহার ব্যক্তিগত অসামর্থ্য থাকে তবে তিনি এমন একটি কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান হইলেন কী ভাবে— যে-কর্পোরেশন বছরে দুই কোটি টাকা ব্যয় করে। আমি ইহাতে আশ্চর্যবোধ করিতেছি।

শ্রীঅখিলচন্দ্র দত্ত, শ্রীযোগীন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্তী ও শ্রীবিজয়কৃষ্ণ বসুর প্রতি

শ্রীসেনগুপ্ত হঠাৎ অতিরিক্ত স্নেহপ্রবণ হইয়া উঠিয়াছেন। তাঁহারা স্মারক কমিটির সদস্য হোন ইহা যদি তিনি সত্যই চাহিতেন তবে তিনি কর্মপরিষদের সভায় আসিয়া উঁহাদের নাম সুপারিশ করিলেন না কেন? অপিচ, কমিটি হইতে ক্রুদ্ধভাবে পদত্যাগ করার আগে তিনি কি একবারও আমাদের কাছে জানিতে চাহিয়াছিলেন যে স্মারক কমিটিতে দত্ত, চক্রবর্তী ও বসুকে— বা তাঁহাদের চেয়ে কম খ্যাতিসম্পন্ন ব্যক্তিদেরও অন্তর্ভুক্ত করিতে আমাদের আপত্তি আছে কিনা? এই প্রসঙ্গে আমি বলিব যে উপযুক্ত ভদ্রমহোদয়দের কমিটিতে নির্বাচিত করার পক্ষে তিনি যে যুক্তি দিয়াছেন (যথা, ঐ তহবিলের বিশদ বিবরণ বাংলার জনসাধারণের নিকট প্রকাশ করিতে হইবে) তাহা অপ্রাসঙ্গিক, কেননা নির্বাচিত কমিটি কেবল চাঁদা সংগ্রহের কমিটি মাত্র। যাহা হউক, আমি স্বীয় অধিকারে বলিতে পারি শ্রীযুক্ত দত্ত— চক্রবর্তী ও বসুর মতো বিশিষ্ট ব্যক্তিদের কমিটির সদস্যরূপে গ্রহণ করিতে আমাদের কোনোদিনই আপত্তি ছিল না, থাকিবেও না।

পরিশেষে ৮ তারিখের 'বসুমতী'তে শ্রীযুক্ত সেনগুপ্ত বলিয়াছেন: "বাংলা কংগ্রেসের প্রধান কার্যালয় কর্তৃক অনুসৃত নীতির ফলে প্রতিটি জেলা-কংগ্রেস কমিটির যে শোচনীয় অবস্থা দাঁড়াইয়াছে তাহা যে-কোনো চক্ষুষ্মান নিরপেক্ষ কংগ্রেসসেবকই দেখিতে পাইবেন নাকি?"

এই বক্তব্যেরই ধারা ধরিয়া গতকালের 'বসুমতী' ও 'অমৃতবাজার পত্রিকা'য় চট্টগ্রাম বিরোধ সম্পর্কে শ্রীযুক্ত সেনগুপ্ত বলিয়াছেন:

"সকল তথ্য সযত্নে বিবেচনা করিয়া, পূর্ণ দায়িত্ব-সহকারে বলিতেছি যে বি পি. সি. সি. র কর্মপরিষদের গোষ্ঠীনীতির প্রত্যক্ষ ফল রূপেই এই কয়জন ব্যক্তির অযৌক্তিক মনোভাব দেখা দিয়াছে। বাংলার প্রতি জেলায় ঐ কর্মপরিষদ বিভেদ, বিবাদ ও গোলযোগের সৃষ্টি করিয়াছে।"

আমি বি. পি. সি. সি.-র কর্মপরিষদের সদস্যদের নামের তালিকা প্রকাশ করিলাম। ইহাতে সুস্পষ্টভাবে বোঝা যাইতেছে যে কর্মপরিষদ কতখানি প্রতিনিধিত্বমূলক। ইহাও মনে রাখিতে হইবে যে যখন ১৯২৮ সালের নভেম্বর মাসে বর্তমান কর্মপরিষদ নির্বাচিত হইয়াছিল তখন বি. পি. সি. সি-র সঙ্গে শ্রীযুক্ত সেনগুপ্তের কোনো বিরোধ ছিল না। বর্তমান কর্মপরিষদ যে সভায় নির্বাচিত হয় সেই সভায় তিনি উপস্থিত ছিলেন। এই নির্বাচন তিনি অনুমোদন করিয়াছিলেন, যেমন বি.পি.সি.সি.-ও উহা সাধারণভাবে অনুমোদন

করিয়াছিল। সে সময় ঐ নির্বাচন সমর্থন করিয়া আজ কর্মপরিষদের গঠন সম্পর্কে অভিযোগ করা তাঁহার পক্ষে শোভা পায় না। আমি তাঁহাকে আহ্বান করিতেছি, ইহা অপেক্ষা অধিক প্রতিনিধিত্বমূলক কর্মপরিষদের একটি সদস্য-তালিকা তিনি প্রকাশ করুন। শ্রীসেনগুপ্তকে আমি সেই দিনের কথাও মনে করাইয়া দিতে চাই যেদিন তিনি বি. পি. সি. সি-র কাছে এমন একটি কর্ম-পরিষদ "মনোনীত" করার ক্ষমতা চাহিয়াছিলেন যাহা সম্পূর্ণভাবে তাঁহার প্রতি অনুগত হইবে। সেই ক্ষমতা তাঁহাকে দেওয়া হইয়াছিল। কিন্তু বর্তমান কর্মপরিষদ-নির্বাচনী সভাতেও তো শ্রীযুক্ত সেনগুপ্ত ও তাঁহার সহযোগীরা উপস্থিত ছিলেন।

শ্রীযুক্ত সেনগুপ্ত বিভেদ, বিবাদ ও গোলযোগের কথা বলিয়াছেন। তাঁহার মতে বি. পি. সি. সি-র কর্মপরিষদের গোষ্ঠীনীতির ফলেই এ-সবের সৃষ্টি হইয়াছে। আমার প্রশ্ন এই যে শ্রীযুক্ত সেনগুপ্ত কি সে দিনের কথা ভুলিয়া গিয়াছেন যেদিন তাঁহার নেতৃত্ব সত্ত্বেও সারা বাংলা বহু দল-উপদল ও গোষ্ঠীতে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছিল ও এই প্রদেশে দুইটি প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির দুঃখজনক অস্তিত্বও দেখিতে হইয়াছিল। দেশবন্ধুর শিরোপা তাঁহার উপর বর্তাইবার পরই কি ইহা ঘটে নাই? দেশবন্ধুর যত ক্ষমতার প্রভাব ও মর্যাদা ছিল সবই তো তখন তাঁহার উপর বর্তাইয়াছিল। আমি জিজ্ঞাসা করি ১৯২৫ সালে দেশ-বন্ধুর কোন্ উত্তরাধিকার তিনি লাভ করিয়াছিলেন এবং ১৯২৭ সালে তাঁহার উত্তরসূরিকে কোন্ উত্তরাধিকার তিনি অর্পণ করিয়াছিলেন? ১৯২৮ ও ১৯২৯ সালে বি. পি. সি. সি. যাহা করিয়াছে ১৯২৬ ও ১৯২৭ সালের কাজের তুলনায় তাহা কি মন্দ? গত দুই বছরে নেতৃত্ব দ্বিধাবিভক্ত হইয়া পড়িয়াছে ও শ্রীযুক্ত সেনগুপ্ত বি. পি. সি. সি-র তহবিলে কোনো অর্থসাহায্যই করেন নাই।

শ্রীযুক্ত সেনগুপ্তের নিকট আবেদন

আমরা যখন এক অনমনীয় আমলাতন্ত্রের সঙ্গে কঠোর সংগ্রামে লিপ্ত তখন আমাদের সকল শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ করিয়া এক করিয়া তোলা দরকার। আমি তাই মাতৃভূমির নামে শ্রীযুক্ত সেনগুপ্তের কাছে আবেদন করি। প্রকাশ্যে বি. পি. সি. সি-কে আক্রমণ করিয়া এই প্রদেশের কংগ্রেস সংগঠনকে দুর্বল করিয়া তোলা কি তাঁহার পক্ষে সমীচীন হইতেছে? বাংলার কংগ্রেস বহু ঝড়ঝঞ্ঝা পার

হইয়াছে, বাহির ও ভিতরের সর্ববিধ আক্রমণ সহ্য করিয়াও বাঁচিয়া আছে। কিন্তু শ্রীযুক্ত সেনগুপ্তের শক্তি প্রভাব ও দক্ষতা বি. পি. সি. সি.-র উপর আক্রমণে ব্যয়িত হইতে থাকিলে আমাদের পক্ষে ও সমগ্র প্রদেশের পক্ষেই তাহা দুর্ভাগ্যজনক হইবে। বিদেশী আমলাতন্ত্রের স্বার্থ সিদ্ধ হওয়া ছাড়া উহাতে আর কিছু লাভ হইবে না।

শর্তসাপেক্ষ অনশন ধর্মঘট ভঙ্গ করা

১৩ অক্টোবর ১৯২৯ বরিশাল হইতে প্রচারিত বিবৃতি।

আমি যখন কলিকাতায় এই বিপদ সংবাদ পাইলাম যে বরিশাল জেলে শ্রীযুক্ত সতীন্দ্রনাথ সেনের অবস্থার দ্রুত অবনতি ঘটিতেছে, যে-কোনো মুহূর্তে তাঁহার জীবনাবসান ঘটিতে পারে, তখন আমি তাঁহার ভাই শ্রীহেমচন্দ্র সেনের মাধ্যমে তাঁহাকে এই খবর পাঠাই যে তাঁহার সকল হিতাকাঙ্ক্ষী ও জেলের বাহিরে তাঁহার যে-সব সহকর্মী আছেন তাঁহারা তাঁহাকে অনুনয় করিতেছেন, যেন অন্তত তাঁহাদের একবার সাক্ষাৎ লাভের সুযোগ দিবার আগে তিনি মৃত্যু বরণের মতো চরম কিছু না ঘটাইয়া বসেন। আমিও তাঁহাকে অনুরোধ জানাইয়াছিলাম যে আমরা যেন বরিশালে আসিয়া তাঁহার সঙ্গে একবার সাক্ষাৎলাভ করা পর্যন্ত তিনি বাঁচিয়া থাকেন। সৌভাগ্যবশত শ্রীহেমচন্দ্র সেন তাঁহাকে বুঝাইয়া আমাদের আসা পর্যন্ত কিছু পুষ্টি গ্রহণে সম্মত করান; তাই বরিশাল জেলে যখন তাঁহাকে দেখি তখন তাঁহার আসন্ন মৃত্যুসম্ভাবনা আছে বলিয়া মনে হয় নাই।

শ্রীসেনের অভিযোগ

আমি আগেও বলিয়াছি, সতীন্দ্রনাথ সেনের প্রধান অভিযোগ হইল, সরকার পটুয়াখালি মীমাংসার সময় যে-সব মামলা প্রত্যাহার করিয়াছিলেন সেগুলির পুনরুজ্জীবন ঘটাইয়া বিশ্বাস ভঙ্গ করিয়াছেন; ভারতীয় দণ্ডবিধির অপর

কোনো ধারার সাহায্যে ইহা করিতে না পারার ফলে তাঁহারা ১১০ ধারা অনুসারে ইহা করিয়াছেন। আরো একটি অভিযোগ আছে, তাঁহার বিরুদ্ধে আক্রমণ ঘটাইবার মামলা রুজু করা হইয়াছে এই অভিযোগ। আমলারা সতীনবাবু ও তাঁহার সহকর্মীদের প্রতি যে ধরনের আচরণ করিয়াছেন তাহাতে তাঁহারা যে কতখানি নীচমনা ও প্রতিশোধপরায়ণ হইয়া উঠিয়াছেন তাহা বোঝা যায়। তাঁহাদের মনোভাব, আচরণ সকলই কঠোর নিন্দার যোগ্য।

ব্রিটিশ শাসন— শপথভঙ্গের কাহিনী

যাহা হউক, আমি বরাবর সতীনবাবুকে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছি যে তাঁহার অভিযোগগুলি সংগত ও যথার্থ, কিন্তু অনশন-ধর্মঘট উহার প্রতিকারের একমাত্র পথ নয়। এ কথা সত্য যে অনশন-ধর্মঘট শুরু করার আগে তাঁহার পক্ষ লইয়া আন্দোলন করার পর্যাপ্ত সময় তিনি জনসাধারণকে দিয়াছেন। কিন্তু কয়েকমাস অপেক্ষা করিয়াও যখন তিনি দেখিলেন যে গণ-আন্দোলনের সাহায্যে বিশেষ কোনো ফল লাভ করা গেল না তখন নিজের হাতে ব্যাপারটি তুলিয়া লইয়া তিনি ঠিক কাজই করিয়াছেন। কিন্তু এখন যখন সারা প্রদেশে আলোড়ন সৃষ্টি হইয়াছে, গণক্ষোভ গণ-অসন্তোষ চরম অবস্থায় পৌঁছিয়াছে তখন কারাপ্রাচীরের বাহিরের জনসাধারণের হাতেই আবার বিষয়টি সঁপিয়া দিয়া অনশন-ধর্মঘট তাঁহার তুলিয়া লওয়া উচিত। শ্রীযুক্ত সতীন সেনকে যাঁহারাই জানেন তাঁহাদের কাহারো মনে সন্দেহ নাই, প্রয়োজন ঘটিলে হাসিমুখে মৃত্যু বরণ করার নির্ভীকতা তাঁহার আছে। কিন্তু আমি তাঁহাকে বলিয়াছি যে মৃত্যু বরণের মতো চরম প্রয়োজন ঘটে নাই, এ কথা তাঁহাকে বুঝাইতে আমি বিশেষভাবে দুইটি কথার উল্লেখ করিয়াছি : প্রথমত, তাঁহার বেলা সরকার যে বিশ্বাসভঙ্গের কার্য করিয়াছেন ব্রিটিশ-ভারতের ইতিহাসে তাহা নূতন নহে। বরং ভারতীয়দের চোখে ভারতে ব্রিটিশ শাসনের ইতিহাস বিশ্বাস-ভঙ্গেরই ইতিহাস। ফলত সরকার বিশ্বাস ভঙ্গ করিবে না ১৯২৯ খ্রীস্টাব্দে আসিয়া এরূপ প্রত্যাশা পোষণ করার অর্থ যে-প্রশংসা পাইবার যোগ্যতা তাঁহাদের নাই সেই প্রশংসা তাঁহাদের দান করা। দ্বিতীয়ত, দেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে তিনি মৃত্যু বরণ করিলে বিদেশী আমলাতন্ত্র ভিন্ন আর কাহাকেও সাহায্য করা হইবে না ; সতীনবাবুকে সরকার পথের কাঁটা বলিয়া মনে করেন ; সেই কাঁটা অপসারিত হইলে সরকার সানন্দে উহাকে স্বাগত জানাইবেন।

শর্তসাপেক্ষে অনশন ভঙ্গ

শ্রীযুক্ত সতীন সেনের সঙ্গে দীর্ঘক্ষণ কথাবার্তার সময় এই সকল যুক্তি এবং আরো কিছু যুক্তি দিয়াছি। অনেক কষ্টের পর অনশন ত্যাগ করিতেও তাঁহাকে সম্মত করাইয়াছি। কিন্তু তিনি স্পষ্ট বলিয়াছেন, ততটুকু খাদ্য ও পানীয় তিনি গ্রহণ করিবেন যাহাতে গণ-আন্দোলন চলার সময় পর্যন্ত তিনি প্রাণ ধারণ মাত্র করিতে পারেন। গণ-আন্দোলনের মাধ্যমে তাঁহার অভিযোগের প্রতিকার করা না গেলে তিনি আবার অনশন-ধর্মঘট শুরু করিবেন। তাঁহার সে অধিকার রহিল। আমি তাঁহাকে আশ্বস্ত করিয়াছি যে সত্বর যাহাতে তাঁহার অভিযোগ সমূহের প্রতিকার হয় সেজন্য আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করিব।

এই পরিস্থিতিতে সতীন সেন অনশন ভঙ্গ করিতে রাজি হইয়াছেন। যাহারা তাঁহার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা করিয়াছেন, যাঁহারা তাঁহার বিষয়ে উদ্বেগ বহন করিয়াছেন, তাঁহার পক্ষে আন্দোলন চালাইয়াছেন, তাঁহাদের প্রতি তিনি কৃতজ্ঞ। কিন্তু এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে আমি তাঁহাকে অনুরোধ করিব তাঁহারা যেন মনে রাখেন যে তাঁহার অভিযোগগুলি এখনো নিরাকৃত হয় নাই। বিচারকারী ম্যাজিস্ট্রেট যে রায়ই দিন-না কেন, সতীনবাবুর অভিযোগগুলির প্রতিকার করিতে হইবে। তাহা করিতে হইলে বৈধ ও শান্তিপূর্ণ যত উপায় আছে, সকলই অবলম্বন করিতে হইবে। তাই আসুন আমরা সংকল্প করি, সতীন-বাবুর মর্যাদা রক্ষায় আমরা আমরা আমাদের সাধ্যমতো সব-কিছুই করিব ও রাজ-নৈতিক উদ্দেশ্যে দণ্ডবিধির ১১০ ধারার প্রয়োগ চিরতরে বন্ধ করিয়া দিব।

একজন বীর

১৪ অক্টোবর ১৯২৯ বরিশাল টাউন হলে অনুষ্ঠিত জনসভায় ভাষণ।

যথার্থ অর্থেই শ্রীযুক্ত সতীন সেন একজন বীর। তাঁহার সমগ্র জীবন মাতৃ ভূমির রাজনৈতিক মুক্তি সাধনের জন্য দুঃখ ও ত্যাগ বরণের ইতিহাস। তিনি সর্বদাই হাসিমুখে মৃত্যুবরণের জন্য প্রস্তুত। কিন্তু জাতির এই সংকট মুহূর্তে আমরা তাঁহাকে হারাইতে চাই না।

বিদ্রোহের ঝড়

১৯ অক্টোবর ১৯২৯ লাহোরে অনুষ্ঠিত পাঞ্জাব ছাত্র সম্মেলনে সভাপতির অভিভাষণ।

পাঞ্জাবের ভ্রাতা ও ভগিনীগণ,

পঞ্চনদের এই পুণ্য প্রদেশে আমার প্রথম আগমন উপলক্ষে আপনারা আমাকে যে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানাইয়াছেন সেজন্য আমি আমার হৃদয়ের অন্তস্তল হইতে আপনাদের ধন্যবাদ জানাই। আমি জানি আপনারা আমাকে যে সম্মান ও অভ্যর্থনা দান করিয়াছেন আমি তাহার উপযুক্ত নই। এখানে আমি যে সৌজন্য ও আতিথ্য লাভ করিয়াছি আমি যেন তাহার যোগ্য হইয়া উঠিতে পারি ইহাই আমার আজিকার কামনা।

আপনারা আমাকে দূর কলিকাতা হইতে এখানে আসিয়া আমার কথা বলিতে বলিয়াছেন। আজ আমি এখানে আপনাদের আহ্বানে সাড়া দিব বলিয়া আপনাদের সামনে দাঁড়াইয়াছি। কিন্তু এত লোকের মধ্যে আপনারা আমাকেই বা ডাকিয়াছেন কেন? ভারতবর্ষের সমস্যা সমাধানের জন্য পশ্চিম ভারত ও পূর্ব ভারতকে একত্রে মিলিত হইতে হইবে— এই বোধ হইতেই কি আপনারা আমাকে ডাক দিয়াছেন? বিদেশী শাসনের অধীন সর্বপ্রথম হইয়াছিল বাংলা, সর্বশেষ হইয়াছিল পাঞ্জাব। এই দুই প্রদেশের পারস্পরিক প্রয়োজন দেখা দিয়াছে বলিয়া কি আমার ডাক পড়িল? না কি, আপনারা এবং আমি একই ভাবনার শরিক, আমরা একই আশা-আকাঙ্ক্ষা পোষণ করি— এই সমভাবের দরুনই কি আমাকে ডাকিয়াছেন?

আর নিয়তির কী পরিহাস— যে-আমি একদা ছাত্রাবস্থায় ভারতের এক বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বহিষ্কৃত হইয়াছিলাম— সেই আমাকেই লাহোরে ছাত্র-সমাবেশে ভাষণ দিতে ডাকিয়া আনা হইয়াছে। প্রবীণেরা যদি বলেন যে বেয়াড়া সময় আসিয়াছে, এখন অদ্ভুত লোককে ও অভিনব ভাবধারাকে জগতের লোক সমাদর করিতেছে— তবে কি আপনারা তাহা অস্বীকার করিতে পারেন? আমার অতীত জীবনের কথা সব জানিয়া শুনিয়া যদি আপনারা আমাকে আমন্ত্রণ জানাইয়া থাকেন তবে তো আপনারা বুঝিয়াই লইয়াছেন যে আপনাদের কাছে আমি কী ধরনের কথা বলিব।

বন্ধুগণ, আপনারা আমাকে ক্ষমা করিবেন যদি আরম্ভেই আমি পাঞ্জাব,

বিশেষত পাঞ্জাবের যুবকদের প্রতি আমার অন্তরের উদ্বেল কৃতজ্ঞতা প্রকাশ্যে ঘোষণা করি। যতীন্দ্রনাথ দাস ও তাঁহার বাঙালী সহযাত্রীরা পাঞ্জাবের জেলে যখন অবস্থান করিতেছিলেন তখন তাঁহাদের জন্য আপনারা যাহা করিয়াছেন তাহার জন্যই আমার এই কৃতজ্ঞতা। তাঁহাদের পক্ষে মামলা চালাইবার ব্যবস্থা করা, যতদিন তাঁহারা অনশন-ধর্মঘট চালাইয়াছিলেন যতদিন তাঁহাদের জন্য উদ্বেগ ও কাতরতা ভোগ করা, যতীন্দ্রনাথের জীবদ্দশায় ও মৃত্যুর পর যে সহানুভূতি, স্নেহ ও সম্মান আপনারা দেখাইয়াছেন তাহা বাঙালীর মর্মস্থলে আলোড়ন জাগাইয়াছে। লাহোরে বন্দী রক্ষা কমিটি যাহা করিয়াছেন তাহাতেও সন্তুষ্ট না হইয়া কমিটির সদস্যরা মহান শহীদের শবদেহ লইয়া কলিকাতা পর্যন্ত গিয়া আমাদের হাতে ঐ দেহ অর্পণ করিয়াছেন। আমরা আবেগপ্রবণ জাতি। আপনাদের হৃদয়ের বিশালতা দেখিয়া আমরা যে আপনাদের প্রতি কত-দূর অনুরক্ত হইয়াছি তাহা বর্ণনা করিতে পারি না। বাংলার এক ঘন তমিস্রার দিনে পাঞ্জাব তাহার জন্য যাহা করিয়াছে বাংলা তাহা চিরদিন মনে রাখিবে।

আপনাদে একজন বিশিষ্ট নেতা ডা. আলম একদিন কলিকাতায় যতীন্দ্রনাথের কথা বলিতে গিয়া আমাদের বলিয়াছিলেন যে সূর্য পূর্ব দিগন্তে উদিত হইয়া পশ্চিম দিগন্তে অস্ত যায় এবং সূর্যাস্তের পর চন্দ্র পশ্চিম দিগন্তে উদিত হইয়া পূর্ব দিগন্তের দিকে অগ্রসর হয়। যতীনের জীবন ও মৃত্যুকে ইহার সঙ্গে তুলনা করা চলে। তিনি জীবিতকালে কলিকাতা হইতে লাহোর গিয়াছিলেন। মৃত্যুর পর কলিকাতায় তাঁহার মৃত-দেহ আবার নীত হয়। মৃত মৃৎভাণ্ড রূপে নয়। পবিত্রতা, মহত্ত্ব ও দিব্যতার প্রতীকরূপেই তাঁহার দেহ কলিকাতায় ফিরিয়া গিয়াছিল। যতীন আজ মৃত নয়। অনাগত কালের গতি-নির্দেশক রূপে আকাশপটে শুভ্র শুকতারা রূপে তিনি বিরাজ করিতেছেন। তিনি জীবিত আছেন তাঁহার অমর আত্মত্যাগ ও অনৈসর্গিক দুঃখবরণে। তিনি বাঁচিয়া আছেন স্বপ্ন রূপে, আদর্শ রূপে, মানবতার মধ্যে যাহা পবিত্রতম ও মহত্তম তাহার প্রতীক রূপে। আমি বিশ্বাস করি, তিনি তাঁহার আত্মাহুতির মধ্য দিয়া শুধু ভারতের আত্মাকে উদ্বোধিত করেন নাই— যে প্রদেশে তিনি জন্মিয়াছিলেন ও যে প্রদেশে তিনি মৃত্যু বরণ করিয়াছিলেন এই দুই প্রবেশকে তিনি অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। অধুনিক যুগের এই দধীচির তপস্যাক্ষেত্র আপনাদের এই মহান নগরী; আমি তাই আপনাদের ঈর্ষা করি।

মুক্তির উষালগ্ন

ক্রমে ক্রমে মুক্তির উষালগ্ন যত আসন্ন হইয়া উঠিতেছে আমাদের দুঃখ ও বেদনার পাত্র ততই ভরিয়া উঠিতেছে। আমাদের শাসকরা যত দেখিতেছেন যে ক্ষমতা তাঁহাদের হাত হইতে ক্রমেই চলিয়া যাইতেছে ততই তাঁহারা অন্যান্য স্থানের স্বৈরতন্ত্রীদের মতোই কঠোর হইতে কঠোরতর হইয়া উঠিতেছেন। ইহা খুবই স্বাভাবিক। যদি তাঁহারা ক্রমশ সভ্যতার সব ভণিতা পরিহার করেন, দ্বিধাহীনভাবে পীড়ন চালাইতে ভদ্রতার মুখোশ খুলিয়া ফেলেন— তবে কেহ যেন বিস্মিত না হন। পাঞ্জাব ও বাংলা বর্তমান মুহূর্তে সবচেয়ে বেশি নিপীড়ন ভোগ করিতেছে। প্রকৃতপক্ষে ইহা অভিনন্দনযোগ্য এই কারণে যে আমরা স্বরাজ লাভের জন্য এইভাবে নিজেদের যোগ্য করিয়া তুলিতেছি। ভগৎ সিং ও বটুকেশ্বর দত্তের মতো বীরদের অনুপ্রেরণা দমননীতির সাহায্যে দাবাইয়া দেওয়া যাইবে না; বরং পীড়ন ও ক্লেশ, অপমান ও দুঃখবরণের ভিতর দিয়াই বীরচরিত্র গড়িয়া উঠিবে। তাই আসুন, আমরা সর্বান্তঃকরণে দমন-নিপীড়নকে স্বাগত জানাই। যখন উহা আসিবে তখন আমরা উহার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করিব।

আপনারা হয়তো জানেন না পাঞ্জাবের অতীত ইতিহাস হইতে কত কাহিনী লইয়া বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করা হইয়াছে। পাঠকদের এইভাবে মনোরঞ্জন করা হইয়াছে। আপনাদের বীরদের কাহিনী লইয়া কবিরা কবিতা রচনা করিয়াছেন, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও তাহা করিয়াছেন। প্রত্যেক বাঙালীর গৃহে সেই-সব কবিতা আজ সুপরিচিত। আপনাদের সন্তদের বাণী ললিত বাংলায় অনূদিত হইয়াছে। বাংলায় অগণিত মানুষ সেই-সব বাণীতে সান্ত্বনা ও প্রেরণা খুঁজিয়া পায়। এই সাংস্কৃতিক ভাব-বিনিময়ের অনুরূপ ঘটনা রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও ঘটিয়াছে। শুধু ভারতের জেলে নয়, সুদূর ব্রহ্মদেশের জেলে ও সমুদ্রপারে আন্দামান দ্বীপপুঞ্জে বাংলার ও পাঞ্জাবের রাজনৈতিক তীর্থযাত্রীরা পরস্পর মিলিত হইয়াছেন।

বন্ধুগণ, আজ এই আলোচনার সূত্রে আমি যদি কিঞ্চিৎ বিশদভাবে রাজনৈতিক প্রশ্ন উত্থাপন করিয়া উহার উত্তর দিবার চেষ্টা করি তবে সেজন্য আমি ক্ষমা চাহিব না। আমি জানি এদেশে এমন লোক আছেন, এমন-কি কিছু প্রসিদ্ধ ব্যক্তিও আছেন, যাঁহারা মনে করেন যে "পরাধীন জাতির কোনো রাজনীতি নাই" এবং ছাত্রদের রাজনীতির সঙ্গে জড়িত হওয়া উচিত নয়। কিন্তু

আমার নিজস্ব মত হইল পরাধীন জাতির রাজনীতি ভিন্ন আর কিছুই নাই। পরাধীন দেশে যে-কোনো সমস্যার কথাই আমরা ভাবি-না কেন, ঠিকভাবে বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে যে সব সমস্যারই মূলে আছে রাজনৈতিক সমস্যা। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ বলিতেন জীবন পূর্ণাঙ্গ এবং অর্থনীতি বা শিক্ষানীতি হইতে রাজনীতিকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না। খণ্ড খণ্ড ভাবে ভাগ করা যায় না। জাতীয় জীবনের সকল দিক ও পর্যায় পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত। ফলত পরাধীন জাতির সকল দোষ ও ত্রুটির মূল খুঁজিলে আমরা দেখিব যে রাজনৈতিক হেতুই সকলের মূলে— আর সেই হেতু হইল রাজনৈতিক দাসত্বের হেতু। ফলে ছাত্ররা, কিভাবে আমাদের রাজনৈতিক মুক্তিলাভ হইবে— এই সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের প্রতি অন্ধ থাকিতে পারে না।

গ্রন্থকীটের প্রয়োজন নাই

সাধারণভাবে জাতীয় কাজের উপর কোনো নিষেধাজ্ঞা নাই; তাহা হইলে রাজনীতিতে অংশগ্রহণের উপর নিষেধাজ্ঞা থাকিবে কেন তাহা আমরা বুঝি না। যদি সকল প্রকার জাতীয় কাজের উপর নিষেধাজ্ঞা থাকে তবে তাহা আমি বুঝিতে পারি, কিন্তু শুধুমাত্র রাজনৈতিক কাজের উপর নিষেধাজ্ঞা অর্থহীন। যদি পরাধীন দেশের সকল সমস্যাই মূলত রাজনৈতিক সমস্যা হইয়া থাকে তবে সকল জাতীয় কর্মই প্রকৃতপক্ষে রাজনৈতিক চরিত্রসম্পন্ন। কোনো স্বাধীন দেশেই রাজনীতিতে অংশগ্রহণের উপর নিষেধাজ্ঞা নাই, বরং রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ করিতে ছাত্রদের উৎসাহ দেওয়া হইয়া থাকে। এই উৎসাহ ইচ্ছা করিয়াই দেওয়া হয় কেননা ছাত্র-সম্প্রদায়ের মধ্য হইতেই রাজনৈতিক চিন্তানায়ক ও নেতা গড়িয়া উঠেন। যদি ভারতে ছাত্ররা রাজনীতিতে সক্রিয় অংশ গ্রহণ না করে তবে আমরা কোথা হইতে রাজনৈতিক কর্মী সংগ্রহ করিব, কোথায় তাহাদের রাজনৈতিক প্রশিক্ষণ দিব? তা ছাড়া ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে চরিত্র ও মনুষ্যত্বের বিকাশ সাধনের জন্য ছাত্রদের রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করা আবশ্যক। কর্মরহিত চিন্তা চরিত্র-গঠনের পক্ষে যথেষ্ট নয়, এবং এইজন্য রাজনৈতিক, সামাজিক, শৈল্পিক ইত্যাদি স্বাস্থ্যপ্রদ কর্মে অংশ গ্রহণ চরিত্র গঠনের পক্ষে একান্ত আবশ্যক। গ্রন্থকীট, স্বর্ণপদকধারী ও অফিস-কেরানী উৎপাদন করাতেই বিশ্ব-বিদ্যালয়ের প্রচেষ্টা সীমাবদ্ধ থাকিতে পারে না। বরং বিশ্ববিদ্যালয় প্রয়াসী

হইবে চরিত্রবান মানুষ সৃষ্টি করিতে যাহারা দেশের জন্য জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে মহত্ত্ব অর্জন করিবেন।

বর্তমান সময়ের অন্যতম আশার কথা এই যে সারা ভারতে একটি খাঁটি ছাত্র-আন্দোলন গড়িয়া উঠিয়াছে। আমি মনে করি ইহা বৃহত্তর যুব-আন্দোলনেরই একটি পর্যায়। গত দশকের ছাত্র-সম্মেলনগুলির সঙ্গে বর্তমানের ছাত্র-সম্মেলনগুলির অনেক পার্থক্য হইয়াছে। পূর্বেকার ছাত্র-সম্মেলনগুলি অনুষ্ঠিত হইত সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায়। ঐ সম্মেলনগুলির প্রবেশদ্বার উৎকীর্ণ থাকিত— রাজনীতির কথা মুখে আনিয়ো না।

এই সম্মেলনগুলির সঙ্গে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম পর্বের অধিবেশনগুলির তুলনা করা যাইতে পারে। ঐ-সব অধিবেশনে প্রথম যে প্রস্তাব গৃহীত হইত তাহা হইল সম্রাটের প্রতি আমাদের আনুগত্য জ্ঞাপক প্রস্তাব। সৌভাগ্যবশত শুধু ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সেই পর্বই নয়, ছাত্র-সম্মেলনের অনুরূপ পর্বও আমরা পার হইয়া আসিয়াছি। আজিকার ছাত্র-সম্মেলনগুলি অপেক্ষাকৃত মুক্ত পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয় এবং সম্মেলনে যাঁহারা যোগ দেন তাঁহারা ভারতীয় দণ্ডবিধি কর্তৃক আরোপিত শর্ত সাপেক্ষে ইচ্ছা-মতো চিন্তা করিয়াও কথা বলিয়া থাকেন।

অসন্তোষের অনুভূতি

আজিকার যুব-আন্দোলনের বৈশিষ্ট্য হইল অসন্তোষের অনুভূতি, প্রচলিত ব্যবস্থার প্রতি অসহিষ্ণুতা, নতুন ও উন্নততর ব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্য তীব্র আকুতি। দায়িত্ববোধ ও আত্মনির্ভরতার ভাব এই আন্দোলনকে পরিব্যাপ্ত করিয়া আছে। বর্তমান কালের তরুণেরা বয়োজ্যেষ্ঠদের হাতে সকল দায়িত্বভার তুলিয়া দিয়া তৃপ্ত থাকিতে পারে না। বরং তাহারা মনে করে, দেশ ও দেশের ভবিষ্যতে প্রবীণদের যতটা অধিকার তাহার চেয়ে তাহাদেরই অধিকার বেশি। তাই দেশের পূর্ণতম দায়িত্ব গ্রহণ করা ও সেই দায়িত্ব যথাযথভাবে পালনের জন্য নিজেদের যোগ্য করিয়া তোলা তাহাদের পরম কর্তব্য। ছাত্র-আন্দোলন বৃহত্তর যুব আন্দোলনেরই একটি পর্যায় ও অংশ। তাই যুব-আন্দোলনের যে দৃষ্টিভঙ্গি, মানসিকতা ও উদ্দেশ্য তাহা দ্বারাই ছাত্র-আন্দোলনও অনুপ্রাণিত।

আজিকার ছাত্র-আন্দোলন দায়িত্বহীন বালক-বালিকাদের আন্দোলন নয়, সবচেয়ে ফলপ্রদ উপায়ে দেশের সেবার জন্য নিজেদের চরিত্র ও ব্যক্তিত্ব গড়িয়া

তোলার আদর্শে উদ্বুদ্ধ, পূর্ণ তৎপর ও দায়িত্বশীল নরনারী এই আন্দোলনে যোগ দিয়াছে। এই আন্দোলন দুই প্রকার কর্মসূচী গ্রহণ করিয়াছে। কিংবা দুই প্রকার কর্মসূচী গ্রহণ করা ইহার কর্তব্য। প্রথমত, ছাত্রদের বর্তমান সমস্যার সমাধান করিতে হইবে ও তাহাদের দৈহিক, মানসিক ও নৈতিক পুনরুজ্জীবন ঘটাইতে হইবে। দ্বিতীয়ত, ছাত্ররাই ভবিষ্যৎ নাগরিক— এই কথা মনে রাখিয়া, যাহাতে তাহারা জীবন-সংগ্রামের যোগ্য হয় সেইরূপে তাহাদের গড়িয়া তুলিতে হইবে। জীবন-রণাঙ্গণে প্রবেশ করিলে তাহারা যে-সকল সমস্যার সম্মুখীন হইবে, যে-সকল কর্মে তাহাদের লিপ্ত হইতে হইবে, তাহার পূর্বাভাস তাহাদের দিতে হইবে।

বিশেষ প্রয়োজন

ছাত্র-আন্দোলনের প্রথম যে দিকটির কথা আমি বলিয়াছি ক্ষমতাসীনরা সাধারণত তাহা বিরূপভাবে গ্রহণ করিবেন না বলিয়া মনে হয়। কিন্তু আন্দোলনের অপর যে দিকটির কথা আমি বলিয়াছি তাহা নিরুৎসাহিত ও নিন্দিত করা হইবে, কখনো কখনো তাহা পণ্ড করিয়াও দেওয়া হইবে। প্রথমে কী করা আপনাদের কর্তব্য সে সম্পর্কে বিশদ কর্মসূচী দিবার চেষ্টা করা আমার পক্ষে বাঞ্ছনীয় নয়, তাহার প্রয়োজনও নাই। তাহা নির্ভর করিবে অংশত আপনাদের বিশেষ প্রয়োজন ও চাহিদার উপর, অংশত শিক্ষা-বিষয়ক কর্তৃপক্ষ ঐ-সব প্রয়োজন ও চাহিদা মিটাইবার কী ব্যবস্থা করেন তাহার উপর।

প্রত্যেক ছাত্রকেই সুঠাম স্বাস্থ্যোজ্জ্বল দেহ, উন্নত চরিত্র, প্রয়োজনীয় তথ্য জ্ঞান ও সুস্থ গতিশীল ভাবধারায় পূর্ণ মস্তিষ্কের অধিকারী হইতে হইবে। কর্তৃপক্ষ যে ব্যবস্থা করিবেন তাহাতে যদি ছাত্রদের দৈহিক, চারিত্রিক ও মানসিক বিকাশ যথাযথভাবে না হয় তবে সেই বিকাশ সম্ভব করিয়া তোলার উপযুক্ত ব্যবস্থা আপনাদেরই করিতে হইবে। কর্তৃপক্ষ যদি আপনাদের সেই প্রয়াসকে স্বাগত জানান উত্তম; যদি স্বাগত না জানান তবে তাঁহাদের অপেক্ষায় না থাকিয়া আপনারা আগাইয়া যান। আপনাদের জীবন আপনাদেরই, উহার বিকাশ সাধনের দায়িত্বও আপনাদের। অপর কাহারো অপেক্ষা এ-বিষয়ে আপনাদেরই উদ্যোগী হইতে হইবে।

এই প্রসঙ্গে একটি কথা বলি। উহার প্রতি আমি আপনাদের দৃষ্টি

আকর্ষণ করিতেছি। শুধুমাত্র ছাত্রসমাজেরই হিতার্থে ছাত্র-অ্যাসোসিয়েশন নিজ নিজ এলাকায় সমবায়মূলক স্বদেশী বিপণি খুলিতে পারে। ছাত্ররা যদি এই-সব বিপণি ভালোভাবে চালায় তবে একসঙ্গে দুইটি উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। একদিকে ছাত্ররা সুলভে স্বদেশী পণ্য পাইবেন ও তাহার ফলে আমাদের দেশী শিল্পের উপকার হইবে। অপর পক্ষে, ছাত্ররা সমবায় সমিতি চালাইবার অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিতে পারিবে এবং লব্ধ মুনাফা ছাত্র-সমাজের কল্যাণ-সাধনে ব্যয় করা যাইবে।

ছাত্রদের কল্যাণসাধনের জন্য আপনাদের কর্মসূচীতে— শারীরচর্চা সমিতি, ব্যায়ামাগার, পাঠচক্র, বিতর্কসভা, পত্রিকা, সংগীতচর্চা, লাইব্রেরি, ও রীডিং রুম, সমাজ-সেবা লীগ ইত্যাদি বিষয়গুলিরও স্থান হইতে পারে।

আদর্শ সমাজের স্বপ্ন

ছাত্র-আন্দোলনের আর একটি দিক— এবং সেইটাই অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ দিক— হইল ভবিষ্যৎ নাগরিকরূপে গড়িয়া তোলার জন্য ছাত্রদের প্রশিক্ষণ দান। এই প্রশিক্ষণ হইবে একই সঙ্গে বুদ্ধিগত বৌদ্ধিক ও বাস্তবধর্মী। ছাত্রদের সামনে আদর্শ সমাজের একটি স্বপ্ন রাখিতে হইবে। ছাত্রদের নিজ জীবনেই ঐ স্বপ্ন রূপায়িত করিতে হইবে। তাহাদের নিজেদেরই একটি কর্মসূচী নির্ণয় করিতে হইবে ও সাধ্যমতো সেই কর্মসূচী অনুসরণ করিতে হইবে। ছাত্ররূপে তাহাদের কর্তব্য পালনের সময় ছাত্র-পরবর্তী জীবনের জন্যও নিজেদের প্রস্তুত করিতে হইবে। কাজের এই ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সংঘর্ষ দেখা দিবার সম্ভাবনা। কিন্তু সত্যই সংঘর্ষ দেখা দিবে কিনা তাহা অনেকাংশে নির্ভর করিবে শিক্ষা-পরিচালক কর্তৃপক্ষের মনোভাবের উপর। দুর্ভাগ্যবশত সংঘর্ষ যদি দেখা দেয়ই তবে করিবার কিছুই নাই এবং ছাত্রদের চিরতরে মর্মস্থির করিয়া ফেলিতে হইবে যে শিক্ষা-পরবর্তী উত্তর-জীবনের জন্য চিন্তা ও কর্মের মাধ্যমে নিজেদের প্রস্তুত করিয়া তোলার বিষয়ে সম্পূর্ণ নিঃশঙ্ক আত্মনির্ভর তাহারা হইবে কি না।

যে আদর্শ আমাদের সকলের গ্রহণযোগ্য সে আদর্শ কী তাহা বলিবার আগে আপনাদের অনুমতি লইয়া আর একটি বিষয়ে বলিব— যাহা সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। বর্তমানে এমন কোনো এশিয়াবাসী নাই, ইউরোপের

পদতলে শায়িত এশিয়াকে দেখিয়া যিনি ব্যথা বা অপমান অনুভব না করেন। কিন্তু এশিয়া যে চিরদিন এমন হতমান অবস্থায় ছিল এহেন ধারণা আপনারা চিরতরে পরিহার করুন। আজ ইউরোপ সভ্যতার শীর্ষদেশে রহিয়াছে—কিন্তু এমন দিন ছিল যখন এশিয়াই ছিল সভ্যতার চূড়ায়। ইতিহাস বলিতেছে অতীত যুগে এশিয়া ইউরোপের বিরাট অংশ দখল করিয়া লইয়াছিল, সে সময় এশিয়ার নামে ইউরোপ ছিল আতঙ্কগ্রস্ত। এখন অবস্থা পালটাইয়াছে। কিন্তু নিয়তিচক্র আবার ঘুরিতেছে। তাই নৈরাশ্যের কোনো কারণ নাই। বর্তমান মুহূর্তে এশিয়া দাসত্বের নিগড় ভাঙিবার কাজে নিযুক্ত হইয়াছে। সেদিন দূরে নাই যখন নবজাগ্রত এশিয়া অতীতের তমিস্রালোক হইতে শক্তি ও গৌরবে সমুদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইবে, স্বাধীন জাতিসমূহের সভামধ্যে তাহার সঙ্গত স্থান গ্রহণ করিবে।

পশ্চিমী বাগ্‌বিশারদেরা অমর প্রাচীকে "পরিবর্তনহীন" বলিয়া দোষ দিতেছে:— একসময় যেমন তুরস্ককে তাহারা বলিত ইউরোপের রুগ্ন লোক। কিন্তু তুরস্ক সম্পর্কে আর এ কথা যেমন খাটে না, এশিয়া সম্পর্কেও ঐরকম সাধারণ মন্তব্য আর করা চলে না। জাপান হইতে তুরস্ক পর্যন্ত এবং সাইবেরিয়া হইতে সিংহল পর্যন্ত সমগ্র প্রাচী আলোড়িত হইতেছে। সর্বত্রই দেখা যাইতেছে পরিবর্তন, প্রগতি, প্রথা কর্তৃপক্ষ ও ঐতিহ্যের সঙ্গে সংঘাত। প্রাচী যতদিন পরিবর্তন কামনা না করে ততদিনই তাহার পরিবর্তন ঘটিবে না! কিন্তু সে যখন চলিষ্ণু হইবার সংকল্প করিবে তখন পাশ্চাত্য জাতি-গুলির চেয়ে দ্রুততর গতিতে সে আগাইয়া চলিবে। বর্তমানে এশিয়ায় তাহাই ঘটিতেছে।

আমাদের মাঝে মাঝে প্রশ্ন করা হয়, এশিয়ায়— বিশেষত ভারতবর্ষে— আমরা যে কর্মচাঞ্চল্য ও উত্তেজনা দেখিতেছি তাহা কি প্রকৃত জীবনের লক্ষণ, নাকি বহিরাগত প্রেরণার প্রতিক্রিয়া মাত্র। মৃত জীবনকোষও বহিরাগত প্রেরণায় সাড়া দেয়। মৃত মাংসপেশীর সংকোচন-প্রসারণের মতোই আমাদের আন্দোলনও উত্তেজনামাত্র কিনা সে বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া দরকার। আমার বিশ্বাস জীবনের লক্ষণ সৃষ্টিশীলতায়। এবং যখন আমরা দেখিতেছি বর্তমানকালের আন্দোলন-গুলির মধ্যে মৌলিকতার ও সৃজনশীল প্রতিভার স্বাক্ষর বর্তমান, তখন আমরা নিশ্চিত হইতে পারি জাতি হিসাবে সত্যই আমরা বাঁচিয়া আছি জাতীয় জীবনের নানা ক্ষেত্রে আমাদের নবজাগরণ যথার্থই আত্মার জাগরণ।

ভাবাবর্ত

বর্তমানে ভারতে আমরা ভাবধারার ঘূর্ণাবর্তের মধ্যে বাস করিতেছি। চারিদিক হইতে বিচিত্র বিরুদ্ধ ও অন্তঃসলিলা স্রোত বহিয়া আসিতেছে। এক বিচিত্র মিলন-মিশ্রণ চলিতেছে। ভাবধারার যে বিভ্রান্তি উপস্থিত হইয়াছে তাহার মধ্যে বসিয়া সাধারণ মানুষের পক্ষে ভালো ও মন্দ, ন্যায় ও অন্যায় স্থির করা সম্ভব নয়। আমরা যদি ইতিহাসের রায় অগ্রাহ্য না করি, স্যার ফ্র্যাংডার্স পেত্রির মতো চিন্তাবিদদের সুবিবেচিত মত উপেক্ষা না করি, তবে আমাদের স্বীকার করিতে হইবে যে পুরাতন ও জীর্ণ সভ্যতাগুলিরও পুনরুজ্জীবন ঘটানো সম্ভব। আপনারা যদি আমার এই মত সমর্থন না করেন তবে সভ্যতার উত্থান ও পতনের পিছনে কোন্ নিয়ম বর্তমান তাহা আপনাদেরই অনুসন্ধান করিয়া বাহির করিতে হইবে। এই নিয়ম আবিষ্কার করিতে পারিলে তবেই আমরা দেশবাসীকে বলিতে পারিব, দেখুন, আমাদের এই প্রাচীন দেশে নূতন, স্বাস্থ্যবান ও প্রগতিশীল জাতি সৃষ্টি করিতে হইলে আমাদের কী করিতে হইবে।

যদি আমাদের ভাবজগতে আমরা বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনিতে চাই তবে আমাদের সম্মুখে এমন আদর্শ স্থাপন করিতে হইবে যাহা আমাদের সমগ্র জীবনকে প্রাণচঞ্চল করিয়া তুলিবে। স্বাধীনতাই সেই আদর্শ। কিন্তু স্বাধীনতা কথাটির বিচিত্র অর্থ আছে, আমাদের দেশেও স্বাধীনতার ধারণা ক্রমবিবর্তিত হইয়াছে। স্বাধীনতা বলিতে আমি বুঝি সর্বাঙ্গীণ মুক্তি;— ব্যক্তির মুক্তি ও সমাজের মুক্তি; পুরুষের মুক্তি ও নারীর মুক্তি; ধনীর মুক্তি ও দরিদ্রের মুক্তি; সকল ব্যক্তির মুক্তি ও সকল শ্রেণীর মুক্তি। স্বাধীনতা বলিতে শুধু রাজনৈতিক স্বাধীনতা বুঝায় না। ধনের সম-বণ্টন, জাতিপ্রথা ও সামাজিক অন্যায়ের, সাম্প্রদায়িকতা ও ধর্মীয় অসহিষ্ণুতার অবসানও বুঝায়। কঠোর বাস্তবপরায়ণ পুরুষ ও নারীর কাছে এই আদর্শ হয়তো স্বপ্ন বলিয়া বিবেচিত হইবে— কিন্তু একমাত্র এই আদর্শই আত্মার ক্ষুধা মিটাইতে পারে।

আমাদের জাতীয় জীবনের যত দিক আছে স্বাধীনতারও তত দিক আছে। এমন অনেকে আছেন যাঁহারা স্বাধীনতার কথা যখন বলেন তখন স্বাধীনতার একটি বিশেষ দিকের কথাই বলেন। স্বাধীনতা সম্পর্কে সংকীর্ণ ধারণা কাটাইয়া উঠিয়া উহার পূর্ণাঙ্গ ও সর্বাঙ্গীণ ধারণা গ্রহণ করিতে আমাদের

কয়েক দশক সময় লাগিয়াছে। যদি সত্যই আমরা স্বাধীনতার পূজারী হই এবং কোনো স্বার্থসাধনের উদ্দেশ্যে নয়, স্বাধীনতার জন্যই স্বাধীনতা ভালোবাসি, তাহা হইলে আমাদের এ কথা বুঝিবার সময় আসিয়াছে যে প্রকৃত স্বাধীনতা বলিতে সর্বপ্রকার বন্ধন হইতে মুক্তি বুঝায় এবং শুধু ব্যক্তির স্বাধীনতা নয়, সমগ্র সমাজের স্বাধীনতাও বুঝায়। ইহাই এ যুগের আদর্শ এবং যে স্বপ্ন আমার আত্মাকে অধিকার করিয়াছে তাহা হইল পূর্ণ, স্বাধীনতা ও মুক্ত ভারতের আদর্শ।

স্বাধীনতা লাভের একমাত্র উপায় হইল স্বাধীন মানুষরূপে নিজেদের গণনা করা, অনুভব করা। আমাদের অন্তরে পূর্ণ বিপ্লব ঘটা চাই। মুক্তির মদে আমাদের মাতাল হইতে হইবে। মুক্তির মদে মাতাল নরনারীই মানবতার মুক্তি সাধন করিতে পারিবে। যখন "মুক্ত হইবার ইচ্ছা" আমাদের মধ্যে জাগিয়া উঠিবে তখনই আমরা কর্মসাগরে ঝাঁপ দিব। সাবধানী বাণী আর আমাদিগকে আটকাইয়া রাখিতে পারিবে না। সত্য ও গৌরবের আহ্বান প্রিয় লক্ষ্যের অভিমুখে আমাদের লইয়া চলিবে।

বন্ধুগণ, আমার জীবনের লক্ষ্য সম্পর্কে আমি যাহা ভাবি, অনুভব করি, স্বপ্ন দেখি, আমার সকল কর্মের পিছনে যে উদ্দেশ্য ও প্রেরণা বর্তমান, তাহা আমি আপনাদের কাছে বুঝাইয়া বলিবার চেষ্টা করিয়াছি। জানি না ইহা আপনাদের ভালো লাগিল কিনা। কিন্তু একটি বিষয় আমার নিকট খুব স্পষ্ট— জীবনের একটিই উদ্দেশ্য ও তাৎপর্য আছে— তাহা হইল সর্বপ্রকার বন্ধন হইতে মুক্তি। এই মুক্তির শুধাই হইল আত্মার সঙ্গীত। নবজাতকের প্রথম ক্রন্দনধ্বনি, যে বন্ধনের মধ্যে সে আসিয়া পড়িল উহার বিরুদ্ধে তাহার বিদ্রোহ ঘোষণা। আপনারা আপনাদের নিজেদের মধ্যে ও আপনাদের স্বদেশবাসীর মধ্যে মুক্তির এই তীব্র ইচ্ছা জাগাইয়া তুলুন— আমার নিশ্চিত বিশ্বাস, ভারত তাহা হইলে অচিরে স্বাধীন হইবে।

ভারত স্বাধীন হইবেই— সে বিষয়ে তিলমাত্র সংশয় নাই। নিশাবসানে যেমন দিবসের আবির্ভাব অনিবার্য ইহাও তেমনি অনিবার্য। পৃথিবীতে এমন কোনো শক্তি নাই যাহা ভারতকে আর বেশিদিন পরাধীন করিয়া রাখিতে পারে। কিন্তু আসুন, আমরা এমন এক ভারতের স্বপ্ন দেখি যাহার জন্য আমরা আমাদের সর্বস্ব— এমন-কি জীবনও— দান করিতে পারি। যাহার জন্য আমাদের প্রিয়জনদেরও ডালি দিতে হইতে পারে। স্বাধীনতা সম্পর্কে আমার

কী ধারণা তাহা আমি আপনাদের বলিয়াছি এবং কোন্ ভারতবর্ষ আমি গড়িয়া তুলিতে চাই তাহাও আমি আপনাদের বলিয়াছি। পূর্ণ মুক্ত ভারত বিশ্ববাসীর কাছে মুক্তির নববাণী প্রচার করুক।

আমাকে হয়তো উগ্র জাতীয়তাবাদী বলা হইবে, তবু আমি বলিব যে ভারতের একটি মিশন আছে যাহা তাহাকে উদ্‌যাপন করিতে হইবে, ঐ মিশনের জন্যই ভারত বাঁচিয়া আছে। এই 'মিশন' কথাটির মধ্যে কোনো রহস্য নাই। মানবজীবনের প্রায় সর্বক্ষেত্রে— বিশ্বের সংস্কৃতি ও সভ্যতায়, ভারতকে কিছু মৌলিক অবদান রাখিতে হইবে। তাহার বর্তমান অবনতি ও দাসত্বের মধ্যেও সে যে অবদান রাখিতেছে তাহাও তো কম নয়। একবার ভাবিয়া দেখুন আপন পথে ও আপন প্রয়োজনানুসারে বিকাশলাভের স্বাধীনতা যখন সে ফিরিয়া পাইবে তখন তাহার অবদান কত মহৎ হইবে।

এ দেশে এমন লোক আছেন— তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই প্রসিদ্ধ ও সম্মানী ব্যক্তি— মুক্তির আদর্শের সর্বাঙ্গীণ প্রয়োগে তাঁহারা সম্মতি দিবেন না। তাঁহাদের খুশি করিতে না পারিলে আমরা দুঃখিত হইব; কিন্তু কোনো পরিস্থিতিতেই আমরা সত্য, ন্যায় ও সাম্যের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত আদর্শ পরিত্যাগ করিব না। অন্যেরা আমাদের সঙ্গে যোগ দিক বা না দিক আমরা আমাদের পথে চলিবই। আপনারা নিশ্চিন্ত হোন, যদি মুষ্টিমেয় কিছু লোক আমাদের পরিত্যাগও করে তবু হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ লোক আমাদের মুক্তিবাহিনীর সঙ্গে যোগ দিবে। বলুন, অন্যায় ও অসাম্যের সঙ্গে আমরা কোনো-রকম আপস করিব না।

বন্ধুগণ, এখন সময় আসিয়াছে মুক্তিপ্রেমিক সকলের এক সুখী ঐক্যবন্ধনে আবদ্ধ হইয়া মুক্তি বাহিনী গড়িয়া তোলার।

এই বাহিনী শুধু মুক্তিযুদ্ধে শামিল হইবার যোদ্ধৃদল পাঠাইবে না: মুক্তির নূতন আদর্শ প্রচারের জন্য প্রচারকও পাঠাইবে। আপনাদের মধ্য হইতেই এই প্রচারক ও যোদ্ধার দল গড়িয়া তুলিতে হইবে। আমাদের কর্মসূচীতে একদিকে ব্যাপক ও নিবিড় প্রচারের ব্যবস্থা থাকিবে, আর-এক দিকে দেশব্যাপী স্বেচ্ছাসেবক সংগঠন গড়িয়া তোলা হইবে। আমাদের প্রচারকরা কৃষকদের মধ্যে ও কারখানার শ্রমিকদের মধ্যে যাইবে ও তাহাদের কাছে মুক্তির নূতন বাণী প্রচার করিবে। তাহারা তরুণ সমাজকে উদ্বুদ্ধ করিবে ও সারা দেশে যুবলীগ সংগঠিত করিবে। দেশের সমগ্র নারীশক্তিকে তাহাদের জাগাইয়া তুলিতে

হইবে, কেননা সমাজে ও রাষ্ট্রে পুরুষের সমান সহযোগিণী রূপে স্থান হইবার জন্য এখন তাহাদের আগাইয়া আসিতে হইবে।

বন্ধুগণ, আপনারা অনেকেই নিশ্চয়ই এখন ভারতীয় কংগ্রেসে যোগ দিবার জন্য নিজেদের প্রস্তুত করিতেছেন। আপনাদের দেশে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসই নিঃসন্দেহে বৃহত্তম জাতীয় সংগঠন। কিন্তু ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের শক্তি, প্রভাব ও ক্ষমতা নির্ভর করে শ্রমিক-আন্দোলন, যুব-আন্দোলন, কৃষক-আন্দোলন, নারী-আন্দোলন, ছাত্র-আন্দোলন ইত্যাদির উপর। যদি আমরা আমাদের শ্রমিক, কৃষক, অনুন্নত শ্রেণী, যুবগোষ্ঠী ছাত্রসমাজ ও নারী জাতিকে যুক্ত করিতে পারি তাহা হইলে আমরা এমন শক্তি জাগ্রত করিতে পারিব যে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস আমাদের স্বাধীনতা আনিয়া দিতে সক্ষম হইবে। অতএব, যদি আপনারা সকলে ফলপ্রদ উপায়ে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সেবা করিতে চান, তবে আমি যে সংশ্লিষ্ট আন্দোলনগুলির কথা এইমাত্র বলিলাম সেগুলিকে আপনারা একসঙ্গে জোরদার করুন।

চীন আমাদের পাশের দেশ। তাই সাম্প্রতিক চীনা ইতিহাস হইতে আমরা পাঠ নিব। চীনের ছাত্ররা তাহাদের মাতৃভূমির জন্য কী করিয়াছে তাহ লক্ষ্য করুন। আমরাও কি ভারতের জন্য ঐরূপ করিতে পারি না? আধুনিক চীনের নবজাগৃতি আনিয়াছে চীনের ছাত্রছাত্রীগণ। তাহারা একদিকে গ্রামে গ্রামে, শহরে শহরে, কলকারখানায় গিয়া নূতন মুক্তির বাণী প্রচার করিয়াছে, আর একদিকে এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত সারা চীনকে সংগঠিত করিয়াছে। ভারতেরও আমাদের তাহাই করিতে হইবে। মুক্তি লাভের কোনো সংক্ষিপ্ত পথ নাই। মুক্তির পথ নিঃসন্দেহেই কণ্টকাকীর্ণ, কিন্তু উহাই গৌরব ও অমরত্ব লাভেরও পথ। আসুন, আমরা অতীতের বন্ধন চূর্ণ করি, যুগ যুগ ধরিয়া যে-সকল বাধা আমাদের বন্ধ করিয়া রাখিয়াছে সেগুলিকে ধ্বংস করি এবং যথার্থ তীর্থযাত্রীর মতো কাঁধে কাঁধ মিলাইয়া মুক্তির লক্ষ্য অভিমুখে আগাইয়া চলি। স্বাধীনতাই জীবন, স্বাধীনতার জন্য মৃত্যু বরণ করিলে শাশ্বত গৌরব অর্জন করা যাইবে। সেজন্য আসুন আমরা স্বাধীন হইবার সংকল্প লই, স্বাধীনতা লাভের জন্য মৃত্যু বরণ করিতে প্রস্তুত হই। আমরা আমাদের আচরণ ও চরিত্রের দ্বারা এ কথা যেন প্রমাণ করিতে পারি যে আমরা মহান শহীদ যতীন্দ্রনাথ দাসের স্বদেশবাসী হইবার যোগ্য। বন্দেমাতরম্।

স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করো

২১ অক্টোবর ১৯২৯ লাহোরে অনুষ্ঠিত ছাত্র-সম্মেলনে প্রদত্ত ভাষণ।

অমৃতসরে অনুষ্ঠিত কংগ্রেস অধিবেশনের পর দশ বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। এবার আবার পাঞ্জাবে কংগ্রেস অধিবেশন বসিবে। এবার সারা ভারতের উদ্দেশ্যে এই অধিবেশন হইতে নূতন বাণী উচ্চারিত হইবে। ঘটনার এই যোগ কাকতালীয়বৎ নয়। অমৃতসর কংগ্রেস অসহযোগ আন্দোলনের জন্ম দিয়াছিল। অমৃতসর আমাদের স্বাধীনতার লক্ষ্যাভিমুখে অনেকদূর আগাইয়া দিয়াছিল। তেমনই লাহোর-কংগ্রেসও সমগ্র জাতিকে এমনভাবে অনুপ্রাণিত করিবে যে তাহার ফলে হয়তো আমরা স্বাধীনতার চূড়ান্ত লক্ষ্যেও পৌঁছাইতে পারিব।

তরুণ পাঞ্জাবের প্রতি

২২ অক্টোবর ১৯২৯ সংবাদপত্রে প্রচারিত বিবৃতি।

আমি লাহোরে থাকাকালে পাঞ্জাবের তরুণ বন্ধুদের কাছে একটি আন্তরিক আবেদন রাখিব। তাহাদের বহু স্বদেশবাসী দেশপ্রেমিক এখন কারা-অন্তরালে রহিয়াছেন। তাঁহারা নির্যাতন বরণ করিয়াছেন যাহাতে আমরা সমৃদ্ধি লাভ করিতে পারি; আমরা যাহাতে বাঁচি সেজন্য তাহারা মৃত্যু বরণও করিতে পারেন। যদি তাঁহাদের ত্যাগ ও নির্যাতন বরণের জন্য আমরা তাহাদের যথার্থ ভালোবাসি ও শ্রদ্ধা করি তাহা হইলে দেশের কাজে সর্বান্তঃকরণে আত্মনিবেদন করাই আমাদের কর্তব্য।

সরকার পূর্ণ উদ্যমে দমননীতি চালাইয়াছে। পাঞ্জাবের তরুণেরা যদি এখনই কর্তব্য পালনের উপযুক্ত না হয় তবে সরকার সাফল্য লাভ করিবে। এই দমননীতির একমাত্র যোগ্য জবাব হইল যুবকদের তরফ হইতে সরকারকে দেখাইয়া দেওয়া যে সরকার যদি একজন কর্মীকে গ্রেপ্তার করে, তাহার স্থল লইতে সহস্র যুবক আগাইয়া আসিবে। দেশের কাজের ভার তাহারাই মাথায় তুলিয়া লইবে। এ-বিষয়ে ছাত্রদের বিরাট দায়িত্ব রহিয়াছে, কেননা তরুণদের মধ্যে তাহারাই সর্বাপেক্ষা অগ্রগামী সম্প্রদায়।

পবিত্র কর্তব্য

ছাত্রদের স্বেচ্ছাসেবকরূপে নাম লেখাইবার পথে কলেজ কর্তৃপক্ষ বা সরকার যদি বাধা সৃষ্টি করেন তবে ঐ বিরুদ্ধতাকে অবজ্ঞা করাই হইবে ছাত্রদের পবিত্র কর্তব্য। নির্ভীকচিত্তে তাহারা তাহাদের কর্তব্য পালন করিবে। অন্যান্য দেশের ছাত্রদের মতো ভারতের ছাত্রদেরও দেশসেবার অধিকার আছে। রাজনীতিতে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করার অধিকারও তাহাদের আছে। উহা তাহাদের জন্মগত অধিকার এবং ঐ অধিকার হইতে কেহ তাহাদের বঞ্চিত করিতে চাহিলে তাহারা যেন তাহা মানিয়া না লয়। আমি যুবকদের কাছে, বিশেষত ছাত্রদের কাছে আবেদন করিতেছি তাহারা যেন সত্বর হাজারে হাজারে স্বেচ্ছাসেবক-তালিকাভুক্ত হয়। স্বেচ্ছাসেবক-প্রশিক্ষণের পুরা পাঠ তাহাদের লইতে হইবে ও কংগ্রেস-অধিবেশনের সময় দক্ষ ও সুশৃঙ্খল বাহিনীর মতো তাহাদের কাজ করিতে হইবে। এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই যে কংগ্রেস-অধিবেশনের সাফল্য স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর দক্ষতা ও শৃঙ্খলার উপর নির্ভর করিতেছে। যে গৌরবোজ্জ্বল সামরিক ঐতিহ্যের তাহারা উত্তরাধিকারী তাহাতে পাঞ্জাবের যুবকদের পক্ষে চেষ্টা করিলে একটি দক্ষ স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গড়িয়া তোলা কঠিন হইবে না। এখন হইতে ডিসেম্বর মাসের মধ্যে সময় আর বেশি হাতে নাই। অতএব ভারতীয় কংগ্রেসের সেবার্থে অবিলম্বে স্বেচ্ছাসেবক তালিকাভুক্ত হইয়া যুবকগণ ও ছাত্ররা শৃঙ্খলাবদ্ধ বীর ও অমর শহীদদের উদ্দেশে প্রকৃত শ্রদ্ধা নিবেদন করুক।

হিন্দুস্থানী সেবাদল

২২ অক্টোবর ১৯২৯ লাহোরে প্রদত্ত বিবৃতি।

হিন্দুস্থানী সেবাদল একটি সর্বভারতীয় স্বেচ্ছাসেবক সংগঠন। বহু বৎসর যাবৎ এই সংগঠন বর্তমান। স্বেচ্ছাসেবক সংগ্রহ করা ও তাহাদের প্রশিক্ষণ দান করা ইহার কাজ। এতদিন ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সংলগ্ন প্রতিষ্ঠানরূপে ইহা প্রতি বৎসর অখিল ভারত স্বেচ্ছাসেবক সম্মেলন অনুষ্ঠান করিয়া আসিতেছে। এ বৎসরও লাহোরে বার্ষিক স্বেচ্ছাসেবক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইবে।

দেশে স্বেচ্ছাসেবক সংগঠন গড়িয়া তোলার উদ্দেশ্যে প্রধান কার্যালয়-সহ একটি স্থায়ী সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে কোনো ভারতীয় প্রশ্ন তুলিবেন বলিয়া মনে হয় না। দেশের কোনো কোনো অংশে হিন্দুস্থানী সেবাদল মূল্যবান কাজ করিয়াছেন। এই দল যদি আরো লোকসম্পদ ও অর্থসম্পদ লাভ করে তবে আরো কাজ করিতে পারিবে। দল এখন আরো প্রশিক্ষণ শিবির ও প্রশিক্ষণ ক্লাস শুরু করার ভার লইয়াছে। এই মহৎ কর্মে যথাসাধ্য সাহায্য করিতে জনসাধারণের আগাইয়া আসা উচিত।

সেবাদলের প্রধান কার্যালয় বগলকোটে। স্বেচ্ছাসেবক ও স্বেচ্ছাসেবক অফিসার প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা সেখানে করা হইয়াছে। দল যে কাজ হাতে লইয়াছে তাহা আরো দক্ষতার সঙ্গে চালানো ও যেখানে স্বেচ্ছাসেবক সংগঠন নাই সেখানে কেন্দ্রস্থাপনই দলের এখন কর্তব্য। তাই আমি জনসাধারণ, বিশেষত যুবসমাজের কাছে আবেদন জানাইতেছি তাঁহারা যেন সর্বতোভাবে হিন্দুস্থানী সেবাদলের কাজে সাহায্য করেন।

পাঞ্জাব

২৪ অক্টোবর ১৯২৯ লাহোরে প্রদত্ত বিবৃতি।

আমার প্রথম পাঞ্জাব ভ্রমণ উপলক্ষে আমাকে যে উষ্ণ সাদর সম্বর্ধনা জানানো হইয়াছে তাহাতে আমি গভীরভাবে মুগ্ধ হইয়াছি। এই প্রদেশের জনসাধারণ আমাকে যে সদয় আতিথ্য দান করিয়াছেন সেজন্য আমি কিভাবে ধন্যবাদ জানাইব জানি না। পাঞ্জাব ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের বহু জেলা হইতে আমি পুনঃপুনঃ নিমন্ত্রণ পাইয়াছি। এই-সব নিমন্ত্রণের সঙ্গে এত উত্তাপ ও সাদর আহ্বান মেশানো যে এই প্রদেশে একটি সংক্ষিপ্ত ভ্রমণ-সূচী আমি মনে মনে স্থির করিয়া লইয়াছিলাম। এই প্রদেশের জেলাগুলির সঙ্গে আমার পরিচয় ইহার ফলে নিবিড়তর হইত। তাই আমাকে যে আকস্মিকভাবে পাঞ্জাব ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতে হইতেছে সেজন্য আমি দুঃখিত। ভারতীয় দণ্ডবিধির ১২৪ক ও ১২০খ ধারা অনুসারে আমার ও আমার সহকর্মীদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হইয়াছে। সেই সম্পর্কিত কারণে বিচারকারী ম্যাজিস্ট্রেট আমাকে হাজির হইতে বলিয়াছেন।

আগামী কংগ্রেস-অধিবেশনে যোগ দিতে আমি লাহোরে আসিতে পারিব কিনা জানি না। সে সময় আমি মুক্ত থাকিব কিনা জানি না। সে সময় আমি আসিতে পারি বা না পারি পাঞ্জাবে আবার আসিবার জন্য আমি ব্যাকুল হইয়া প্রতীক্ষা করিব। এবার আমার খুব ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও যে-সব স্থানে যাইতে পারিলাম না, আগামী বার আমি সে-সব স্থানে যাইব। এই একান্ত আশা লইয়া বাংলায় ফিরিয়া যাইতেছি যে গত বৎসর কলিকাতা-কংগ্রেসে যাহারা উপস্থিত ছিল তাহাদের অনেকেই যদি লাহোরে নাও আসিতে পারে, তবু পাঞ্জাবের জনসাধারণ, বিশেষত তরুণেরা— কলিকাতায় যে পতাকা আমরা নত করিয়াছি সেই পতাকাকে আবার সগৌরবে উচ্চে তুলিয়া ধরিবে। ১৯১৯ সালে অমৃতসরের যে নিদারুণ ঘটনার ফলে অসহযোগ আন্দোলনের জন্ম হইয়াছিল তাহা স্বরাজের দিকে আমাদের বহু দূর অগ্রসর করিয়া দিয়াছে। ১৯২৯ সালে লাহোর আরো বৃহত্তর আন্দোলনের জন্ম দিবে, যাহার ফলে আমরা ভারতের রাজনৈতিক মুক্তি লাভ করিতে পারিব।

গোয়েন্দা-অধ্যুষিত পাঞ্জাব

এখানে আসার পর হইতে সকৌতূহলে আমি এই প্রদেশে গোয়েন্দাদের কার্য-কলাপ লক্ষ্য করিতেছি। আমি দেশের বহু স্থানে ভ্রমণ করিয়াছি, কিন্তু এমন বাড়াবাড়ি রকমের এমন নির্বোধ পুলিশী গোয়েন্দা ও গুপ্তচর আর কোথাও দেখি নাই। আমি যেখানেই গিয়াছি সেখানেই তাহারা সাইকেলে করিয়া, লরিতে করিয়া আমাকে অনুসরণ করিয়াছে। আমি যে বাড়িতে উঠিয়াছি সেই বাড়ির সামনে ঘাসের উপর তাহারা বহু সংখ্যায় বসিয়া হুঁকা সেবন করিয়াছে। যখনই আমি বাড়ি হইতে বাহির হইয়াছি সঙ্গে সঙ্গে তাহারা সাইকেলে উঠিয়া আমার পিছন পিছন ধাওয়া করিয়াছে। তাহারা যদি সত্যই তাহাদের কারবার চালাইতে চায় তবে তাহারা আর-একটু বুদ্ধির পরিচয় দিক — এই আশাই আমি ব্যক্ত করিব।

দুষ্ট ব্যক্তিদের অপকৌশল

এই প্রদেশে অনুষ্ঠিত জনসভা ও সম্মেলন সম্পর্কিত বিষয়ে একটি অদ্ভুত ব্যাপার আমার নজরে আসিয়াছে। কিছু সংখ্যক দুষ্ট প্রকৃতির লোক ও গুন্ডাদের সভায় গোলযোগ সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে কোনো অজ্ঞাত সূত্রের

নির্দেশে পাঠাইয়া দেওয়া হইয়া থাকে। তাহাদের নেতা আর-এক প্রান্তে বসিয়া থাকে। গোলযোগ সৃষ্টি করার সংকেত সে-ই দেয়। ছাত্র-সম্মেলনে এ-হেন প্রয়াস করা হইয়াছিল। কিন্তু শ্রোতৃবৃন্দ "শেম শেম" ধ্বনি দেওয়া মাত্র তাহারা পলায়ন করে। আমি শুনিলাম এই প্রদেশে ইহা প্রায়ই ঘটিয়া থাকে। এই-সব গোলযোগ ঘটাইবার মূলে কোন্ শক্তি বর্তমান তাহা এখানকার জনসাধারণ জানে। আগামী কংগ্রেস-অধিবেশনের সময় এরূপ হীন প্রয়াস করা হইবে কিনা আমি জানি না। যদি হয় তবে আমি তাহাতে বিস্মিত হইব না।

পাঞ্জাবে নিপীড়ন

পাঞ্জাবে এখন নিপীড়নের তান্ডব চলিতেছে। শুধু অমৃতসর ও লাহোর নয়। ঝাঙের মতো নিভৃত স্থানও দমননীতি হইতে অব্যাহতি পায় নাই। সেজন্য আমাদের দুঃখ নাই। বরং ইহাকে আমরা স্বাগত জানাই। এই দমননীতি এই প্রদেশকে আগামী দিনের সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত করিয়া তুলিতেছে। আগামী ডিসেম্বরে কংগ্রেস-অধিবেশনে যোগ দিতে যাহারা আসিবে তাহাদের শিহরিত করিয়া তুলিবার মতো পরিবেশ তৈয়ারি হইয়া উঠিতেছে। এ বৎসর এখানে কংগ্রেস অধিবেশন বসাইবার আমন্ত্রণ জানানোর ফলে পাঞ্জাবের উপর গুরুতর দায়িত্ব বর্তিয়াছে। আমি দেখিয়া খুশি হইলাম যে এ দায়িত্ব সম্পর্কে জন-সাধারণ সম্পূর্ণ সচেতন। তাহারা সারা ভারতকে এখানে সম্বধ না জানাইতেই শুধু প্রস্তুত হয় নাই, কংগ্রেস-অধিবেশনের উপযুক্ত পরিবেশও গড়িয়া তুলিতেছে। এই পরিবেশ সৃষ্টিতে আমাদের কারান্তরালবর্তী সহকর্মীদের অবদানও কম নয়।

ভারত চায় স্বাধীন হইতে

২৬ অক্টোবর ১৯২৯ দিল্লীতে একটি জনসভায় ভাষণ।

ভারতের একটি মহান মিশন আছে। তাহার ভবিতব্যের নির্দেশে সেই মিশন তাহাকে উদ্‌যাপন করিতে হইবে। ১৯২১ সাল হইতে কী আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে কী আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে ভারতের শক্তি বৃদ্ধি পাইয়াছে, অপর পক্ষে উভয় ক্ষেত্রেই ব্রিটেন দুর্বল হইয়া পড়িয়াছে। তাই ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের সম্ভাবনা উজ্জ্বলতর হইয়াছে। আজ পশ্চিমী জাতিসমূহের মধ্যে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রাধান্যের জন্য তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুরু হইয়া গিয়াছে। শান্তির বুলি যতই উচ্চারিত হোক-না কেন, অস্ত্র সংগ্রহের দৌড়ও চলিতেছে। বিশ্বযুদ্ধও আসন্ন হইয়া উঠিয়াছে।

ভারতে ১৯২১ সালের সেই উন্মাদনা আজ আর নাই। অসহযোগ আন্দোলনের পর দেশে সাম্প্রদায়িকতা দেখা দিয়াছে। স্বাধীনতার সেই তীব্র পিপাসা সাম্প্রদায়িক উত্তেজনার মধ্যে ডুবিয়া গিয়াছে। তবু দেশে সুনিশ্চিত-ভাবে এক নূতন জাগরণ আসিয়াছে। দমন পীড়ন ও আমাদের মধ্যে বিভেদ থাকা সত্ত্বেও ১৯২১ সালের তুলনায় ভারত অধিকতর শক্তিশালী হইয়াছে। আমরা দেখিতেছি সারা দেশে কংগ্রেস-কমিটি গড়িয়া উঠিয়াছে ও খাদি প্রচার সংঘ ছড়াইয়া পড়িয়াছে।

অসহযোগ আন্দোলন সফল হইয়াছে কি ব্যর্থ হইয়াছে তাহা বিচার করার সময় এখনো আসে নাই। তবে আশা করি এ কথায় কেহ আপত্তি করিবেন না যে ঐ আন্দোলন স্থায়ী হইয়াছে ও আগামী ডিসেম্বরে লাহোরে উহার কর্ম-সূচীর বিশদ ও সম্পূর্ণ রূপ দেওয়া হইবে।

কলিকাতা প্রস্তাবের প্রতি বিশ্বস্ততা

লাহোরে কী ঘটিবে? আমরা কলিকাতা-কংগ্রেসে গৃহীত প্রস্তাব এখনো মানিতেছি। ঐ প্রস্তাব আমরা গুরুত্বসহকারে গ্রহণ করিয়াছি, উহার যুক্তিসিদ্ধ পরিণামও মানিয়া লইব। গত বৎসরের ডিসেম্বর মাসের পর হইতে এখন পর্যন্ত সরকার কোনো সাড়া দেন নাই। ভাইসরয় হয়তো কোনো ঘোষণা করিবেন, গোল টেবিল বৈঠকও অনুষ্ঠিত হইতে পারে। তবু আমি বলিব সরকারের সাড়া দিবার নমুনা দেশব্যাপী তাঁহাদের দমন-পীড়নের প্রসার।

সরকারের বর্তমান নীতি সম্পর্কে লাহোর-কংগ্রেসে যে প্রস্তাবই গৃহীত হোক-না কেন, বিদেশী পণ্যের ফলপ্রদ বয়কট ও আইন অমান্য আন্দোলনের প্রস্তাব তাহার মধ্যে থাকিবে। তাই আগামী দিনের সংগ্রামের জন্য আমাদের নিজ-দিগকে ও দেশকে প্রস্তুত করিতে হইবে। ভারতে ইংরেজের অস্তিত্ব, এমন-কি ইংলন্ডে কোটি কোটি ইংরেজের অস্তিত্ব ভারতের সহযোগিতার উপর নির্ভরশীল। "যে মুহূর্তে আমরা আমাদের সহযোগ প্রত্যাহার করিয়া লইব সেই মুহূর্তেই তাসের ঘরের মতো আমলাতন্ত্রের প্রাসাদ ভাঙিয়া পড়িবে।" অসহযোগের ফলে ভারতে ব্রিটিশ রাজ দুর্বল হইয়া পড়িবে। সরকার তাই অসহযোগ আন্দোলন দমন করিতে অভূতপূর্ব পীড়ন নীতি চালাইবেন। ইহা তাঁহাদের অস্তিত্ব বজায় রাখার লড়াই। লাহোরে বিচারাধীন বন্দীদের প্রতি সরকার যে আচরণ করিয়াছে তাহাতেই সরকারের মনোভাব বোঝা যাইতেছে। স্বাধীনতার অভিমুখে প্রথম পদক্ষেপ হইল কারাজীবন বরণের জন্য আমাদের প্রত্যেকের প্রস্তুত থাকা।

আত্মাহুতি গৌরব আনিবে

১৯৩০ সালে ভারতের সামনে সুবর্ণ সুযোগ আসিবে। যখন বন্যা আসে তখন যে তাহার সদ্ব্যবহার করিতে পারে সেই প্রকৃত জ্ঞানী ব্যক্তি। ভারত স্বাধীন হইতে বাধ্য। প্রশ্ন শুধু সময় লইয়া। সময়ও নির্ভর করিবে আমাদের উপর। রাশিয়া ও আয়ার্ল্যান্ডকে স্বাধীন করিয়াছিলেন কয়েকজন নেতা ও কয়েক সহস্র লোক। যতীন্দ্রনাথ দাস শহীদ হইয়া দেখাইয়া গিয়াছেন যে ভারত সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত আছে। ভারত যদি একজন যতীন দাসের জন্ম দিয়া থাকে তবে হাজার যতীনের জন্ম দিবার সামর্থ্য ভারতের আছে। যতীন আরো দেখাইয়া গিয়াছেন যে যদি প্রবীণ নেতারা সংগ্রাম বর্জন করেন তবে তরুণ সমাজ সংগ্রাম চালাইয়া যাইবে। তাহারা নিজেদের নেতা নিজেরা নির্বাচন করিয়া লইবে। তিনি বুঝাইয়া গিয়াছেন যে স্বাধীন হইতে সংকল্পবদ্ধ এবং জনসাধারণ সেজন্য যে-কোনো মূল্য দিতে প্রস্তুত। যতীন্দ্রনাথ দাসের আত্মাহুতি ভারতের অন্তরাত্মাকে নাড়া দিয়াছে। যে পাঞ্জাবে এত সাম্প্রদায়িক হানাহানি সেই পাঞ্জাবে আজ ধ্বনিত হইতেছে একটি মাত্র শ্লোগান: "বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক!" যতীন দাস দেখাইয়া গিয়াছেন আত্মাহুতির পথই গৌরবের পথ। আজ সারা ভারত তাঁহার প্রতি

শ্রদ্ধা নিবেদন করিতেছে। যদি যুবচিত্তে আমরা কঠোর সংকল্প জাগাইয়া তুলিতে পারি তাহা হইলে পৃথিবীতে এমন কোনো শক্তি নাই যাহা স্বাধীনতা হইতে আমাদের দূরে রাখিতে পারে। দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ মন ও জনগণের প্রতি প্রকৃত সহানুভূতিসম্পন্ন কিছু সংখ্যক লোকই দেশকে জয়ের পথে লইয়া যাইতে পারে। দমননীতির দ্বারা ভারতের আত্মাকে দমাইয়া রাখা যাইবে না — বিশ্বের কোথাও তা সম্ভব হয় না। যে মুহূর্তে আমরা জেলের ও ফাঁসির ভয় জয় করিব সেই মুহূর্তে আমরা স্বাধীন হইব।

স্বাধীনতার উষালগ্ন সমাগত

২৫ অক্টোবর ১৯২৯ লুধিয়ানা টাউন হলে প্রদত্ত ভাষণ।

১৯১৯ সালে পাঞ্জাব অমৃতসরের কংগ্রেস-অধিবেশনের আমন্ত্রণ-কর্তা ছিল। এই বৎসরও পাঞ্জাবেই আবার কংগ্রেস অধিবেশন বসিবে। পাঞ্জাবের ইহা সৌভাগ্য।

ছাত্রদের বলিব, তোমরা জেলে যাইবার জন্য প্রস্তুত থাকিও। জেলের কঠোর জীবনের জন্য ও ততোধিক কঠোরতা ও ক্লেশবরণের জন্য তোমরা প্রস্তুত হও। তোমরা নির্ভীক হও। তবেই তোমরা শান্তি পাইবে। তোমাদের দেখিয়া স্বাধীনতার মহান আদর্শের পথে চালিত জনসাধারণ অনুপ্রেরণা পাইবে। আমি জানি, স্বাধীনতার উষালগ্ন সমাগত।

শ্রমিক-আন্দোলন

২৭ অক্টোবর ১৯২৯ বজবজে শ্রমিক-সভায় সভাপতির ভাষণ।

গত দুই মাস যাবৎ তৈল ও পেট্রোল কোম্পানির ছয় হাজার শ্রমিক সাহসের সঙ্গে লড়াই চালাইতেছে। কিন্তু দালালরা চারদিকে ঘোরাফেরা করিতেছে, সে বিষয়ে সবাইকে সাবধান থাকিতে হইবে। নানা স্বার্থসম্পন্ন মহল বিষাক্ত প্রচার চালাইতেছে। সে সম্পর্কেও আপনারা হুঁশিয়ার থাকিবেন। বর্তমানে যে ধর্মঘট চলিতেছে সেজন্য দায়ী কোম্পানি কর্তৃপক্ষের আপসহীন উদ্ধত

মনোভাব। আমি তাঁহাদের স্পষ্ট ভাষায় বলিয়া দিতে চাই যে যদি তাঁহারা কারখানা চালাইতে ও মুনাফা অর্জন করিতে চান তবে শ্রমিকদের বঞ্চিত করিয়া তাহা করা সম্ভব হইবে না। তাঁহারা সে চেষ্টা করিলেও সফল হইবেন না। দেশের পরিস্থিতি আমূল পাল্টাইয়া গিয়াছে। যে মালিক যত সম্পন্নই হোন-না-কেন এরকম আগ্রাসী মনোভাব লইয়া চলিতে পারিবেন না। শ্রমিকদের ইউনিয়নকে তাঁহাদের স্বীকৃতি দিতেই হইবে, শ্রমিকদের সঙ্গে বোঝাপড়ায় আসিতে হইবে। নতুবা শোষকদের বিরুদ্ধে এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি হইবে যে এদেশে তাঁহাদের পক্ষে আর বেশিদিন ব্যবসা চালানো সম্ভব হইবে না। বিদেশীরা যদি এখানে বন্ধুর মতো থাকেন তবে তাঁহাদের আপত্তি হইবে না, তবে তাঁহাদের শ্রমিকদের প্রতি তাঁহাদের মানবিক আচরণ করিতে হইবে ও তাঁহারা যে বিরাট মুনাফা লুটেন তাহার যথেষ্ট পরিমাণ ভাগ দিতে হইবে। পক্ষান্তরে যদি তাঁহারা উহাদের সঙ্গে শত্রুর মতো আচরণ করেন তবে ঠিক ঐরূপ আচরণ ফেরত পাইবার জন্য তাহাদেরও প্রস্তুত থাকিতে হইবে।

ধর্মঘটীরা সংকল্পবদ্ধ

পরিস্থিতি হতাশাব্যঞ্জক নয়। আগে বর্মা অয়েল কোম্পানিই ছিল এক্ষেত্রে একমাত্র কোম্পানি। উহার পর নিউ ইয়র্কের স্ট্যান্ডার্ড অয়েল কোম্পানি, এশিয়াটিক পেট্রোলিয়াম কোম্পানি ও ইন্দো-বার্মা কোম্পানি তাহাদের কারখনো খুলিয়াছে। এখন আরো কিছু প্রভাবশালী কোম্পানি এই ক্ষেত্রে প্রবেশ করিতেছে। যদি ধর্মঘট চলে তবে পূর্বতন কোম্পানিগুলির সাংঘাতিক লোকসান হইবে ও ইতিমধ্যে নূতন কোম্পানি সহজে বাজার দখল করিতে পারিবে। যে মুহূর্তে কোম্পানিরা বুঝিতে পারিবে যে তাহাদের শ্রমিকরা আবশ্যক হইলে মাসের পর মাস ধর্মঘট চালাইয়া যাইতে প্রস্তুত রহিয়াছে তখনই তাহারা আর ধুরন্ধর দালালদের কথায় চলা ছাড়িবে ও শ্রমিকদের দাবি আর নস্যাৎ করিয়া দিবে না।

আপনাদের মধ্যে এমন কি কেহ আছেন যিনি এখনই কাজে যোগ দিতে চান। (সকলেই হাত তুলিয়া সমস্বরে জানায়: না)। আমি কোম্পানি-গুলিকে, বিশেষত বর্মা শেল কোম্পানিকে সাবধান করিয়া দিতেছি যেন তাহারা তাহাদের সংকীর্ণ দৃষ্টিপ্রসূত নীতি ছাড়িয়া দেয়। পুলিশ

যেভাবে শ্রমিক-আন্দোলনে হস্তক্ষেপ করিতেছে সে সম্পর্কেও আমি পুলিশ কর্তৃপক্ষ ও সরকারকে হুঁশিয়ার করিয়া দিতেছি। আমি পুলিশ অফিসারদের মনোভাব সম্পর্কে নানারকম অভিযোগ পাইয়াছি। বিশেষত স্থানীয় পুলিশ যে-কোনো লোকের কথা শুনিয়া অনেক শ্রমিককে গ্রেপ্তার করিয়াছে। এইভাবে শ্রমিকদের উপর পুলিশ নিপীড়ন চালাইতেছে। পুলিশের এইরকম মনোভাব দেখিয়া আমি দুঃখিত। শ্রমিকদের ঘর হইতে ধরিয়া আনিয়া কারখানায় হাজির করা পুলিশের দায়িত্ব নয়। কিন্তু হিন্দুস্থানী ও দালালকে শ্রমিকদের কারখানায় তাড়াইয়া লইয়া যাইতে পুলিশ লাঠি লইয়া সাহায্য করিয়াছে। শান্তিপূর্ণ ধর্মঘটীদের উপর পুলিশ হস্তক্ষেপ করিয়াছে। আমি কঠোর ভাষায় পুলিশের এই-সব কাজের নিন্দা করিতেছি। তাহাদের এই ধরনের কাজের ফলে উত্তেজনা সৃষ্টি হইতেছে। যদি সেজন্য শান্তি ভংগ হয় তবে পুলিশই তাহার জন্য পুরাপুরি দায়ী হইবে। শান্তিপূর্ণ পিকেটিং আমাদের বৈধ অধিকার এবং এই অধিকারে হস্তক্ষেপ আমি সহ্য করিব না। সে ক্ষেত্রে আমি নিজে কারখানার ফটকে দাঁড়াইয়া পিকেটিং করিব ও তাহাতে যাহাই ঘটুক আমি তাহার জন্য প্রস্তুত আছি। আমি শ্রমিক বন্ধুদেরও বলিতেছি, আপনারা জেলে যাইতে ভীত হইবেন না। আপনারা সব রকম বিপদের জন্য প্রস্তুত থাকুন। আমি এখনো আশা রাখি যে কর্তৃপক্ষ পরিস্থিতির গুরুত্ব-অনুধাবন করিবেন। সরকার যদি সত্যই এ বিরোধ মিটাইতে চান তবে শ্রমবিরোধ আইন অনুসারে তাঁহারা ব্যবস্থা লইতে পারেন।

যতীন্দ্রনাথ দাস : জীবন ও মৃত্যু

২৮ অক্টোবর ১৯২৯ যতীন্দ্রনাথ দাসের জন্মদিবস উপলক্ষে তরুণ সমিতি কর্তৃক ভবানীপুরে আয়োজিত সভায় সভাপতির ভাষণ।

যতীন্দ্রনাথের কথা বলিতে উঠিলে আমার পক্ষে আবেগ রোধ করিয়া রাখা অসম্ভব হইয়া পড়ে। কিন্তু এই সভার সভাপতি হিসাবে আমাকে কিছু কথা বলিতেই হইবে।

যতীন্দ্রনাথের আত্মত্যাগ পাঞ্জাবের রাজনৈতিক পরিবেশে আমূল পরিবর্তন আনিয়া দিয়াছে। কয়েক বছর আগে পাঞ্জাব কী ছিল, আর আজ কী হইয়াছে তাহার তুলনামূলক বিচার করিলে সেখানকার জনসাধারণের উপর এই আত্মত্যাগ কতদূর প্রভাব বিস্তার করিয়াছে তাহা বোঝা যায়। পাঞ্জাব ছিল সাম্প্রদায়িকতার অনল-ক্ষেত্র, সাম্প্রদায়িক হানাহানির ঝটিকা-কেন্দ্র। সেই পাঞ্জাব আজ সাম্প্রদায়িক ঐক্য ও শান্তির ক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে। সে প্রদেশের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত শুধু শিক্ষিত সম্প্রদায়ের উপর নয়, সাধারণ মানুষের উপরও তাঁহার আত্মাহুতি গভীর প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। এ কথা বলিলে অতিরঞ্জন হইবে না যে সেখানে এখন কেহ সাম্প্রদায়িকতা প্রচার করিতে সাহসই করে না। "বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক" ও "যতীন দাস অমর রহে" জনপ্রিয়তম এই দুটি শ্লোগান সারা প্রদেশে এখন ধ্বনিত হইতেছে। আমি কখনো কখনো ভাবি যতীন্দ্রনাথকে কে বেশি ভালোবাসে : বাংলা, না, পাঞ্জাব ?

অতীত জীবন

সে অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়াছিল ১৯২১ সালে। আমরাও ঐ সময়ে যোগ দিয়াছিলাম। আমার মনে পড়ে, ১৯২১ সালে পূজার ঠিক আগে রসা রোডের কাপড়ের দোকানগুলির সামনে আমাদের সঙ্গেই সে পিকেটিঙে যোগ দিয়াছিল। অনেকের মতোই সেও জেলে গিয়াছিল। কিন্তু কারামুক্ত হইবার পর অনেকেই যখন জাতীয় কাজ ছাড়িয়া দিল সে ছাড়ে নাই। কারণ তাহার জ্বলন্ত দেশপ্রেম নির্বাপিত হয় নাই। ১৯২৫ সালে অর্ডিনান্স বলে সে আবার গ্রেপ্তার হইয়া জেলে যায়। বর্মায় একদিন আমি একজন উচ্চপদস্থ গোয়েন্দা অফিসারের সঙ্গে কথা বলিতেছিলাম। কথা প্রসঙ্গে অফিসারটি যতীনের উচ্চ

প্রশংসা করিয়াছিলেন। পরবর্তী জীবনে যতীন প্রমাণ করিয়া গিয়াছে সত্যই সে প্রশংসা কতদূর সংগত ছিল।

দাসত্বের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ

কেহ কেহ বলিতেছেন রাজনৈতিক বন্দীদের অবস্থার উন্নতি সাধনের উদ্দেশ্যে যতীন আত্মাহুতি দিয়াছে। এ কথার মধ্যে আংশিক সত্য আছে, সমগ্র সত্য প্রতিবিম্বিত হয় নাই। সন্দেহ নাই যতীন্দ্রনাথ যখন অনশন শুরু করিয়াছিল তখন তাহার সামনে রাজনৈতিক বন্দীদের প্রতি সু-আচরণের দাবিটি ছিল। কিন্তু এরকম একটি ক্ষুদ্র দাবির জন্য কেহ নিজ জীবন বিসর্জন দিবে এ কথা আমি বিশ্বাস করি না। অনশন শুরু করিলে যদি দাবি না মেটে তবে কয়েকদিন পর মনের আমূল পরিবর্তন হইয়া যায়। যে দাবি লইয়া অনশন তাহা ব্যাপকতা লাভ করে। একটা সময় আসে যখন সমগ্র আত্মা দাসত্ব ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। রাজনৈতিক বন্দীদের উপর সরকার যে অমানবিক আচরণ করিতেছে তাহা ঐ দাসত্বেরই একটি ফল। বিদেশী আমলাতন্ত্রের শাসন যে দাসত্ব ও অত্যাচার চাপাইয়া দিয়াছে তাহার বিরুদ্ধে আত্মা যখন বিদ্রোহ ঘোষণা করে তখন ঐ দাসত্ব ও স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাইতে গিয়া মানুষ নিজ জীবন বিসর্জন দেয়। যখন যতীন্দ্রনাথের অন্তরে এই পরিবর্তন আসিয়াছিল তখনই সে হাসিমুখে মৃত্যুবরণ করিতে পারিয়াছিল। যাহারা মনের এই অবস্থায় পৌঁছায় নাই, ক্ষুদ্র দাবির প্রতিই শেষ পর্যন্ত আকৃষ্ট রহিল, তাহারা চরম মূল্য দিতে পারে নাই।

আপন কথা রক্ষা করা

আপনারা হয়তো জানেন না যে যতীন্দ্রনাথ দাস প্রথমে অনশন করিতে ইচ্ছুক ছিল না। সে বলিয়াছিল: "হাঁ, অনশন-ধর্মঘট কাকে বলে তা আমি জানি। তোমাদের সে সম্পর্কে কোনো অভিজ্ঞতা নাই। আমি যদি অনশন-ধর্মঘট শুরু করি তবে শেষ পর্যন্ত উহা চালাইয়া যাইব।" আমরা জানি ও সারা বিশ্ব জানে যে তাহার কথা সে কিভাবে রক্ষা করিয়াছে।

আমি ভাবিয়া অবাক হই যে এমন অতিমানবিক শক্তি সে পাইল কোথায়। নিখিল ভারত যুব-কংগ্রেসের বিগত কলিকাতা-অধিবেশনে আমি বলিয়াছিলাম,

বনে জঙ্গলে তপস্যা করিয়া নয়, আশ্রমে বসিয়া ধ্যান করিয়াও নয়, যুদ্ধ কর্ম ও সংগ্রামের মধ্য দিয়াই আমরা শক্তি অর্জন করিতে পারিব।

যতীন্দ্রনাথের জীবন হইতে আমরা এই শিক্ষাই পাই যে এ যুগে আমাদের একমাত্র সাধনা হইল তাঁহার মতো কর্ম ও সংগ্রামের মধ্য দিয়া মৃত্যুকে জয় করা।

নব জাগরণ

যতীন্দ্রনাথের আত্মনির্বাণ যে জাগরণ আনিয়াছে ভারতের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সব কয়জন নেতার সম্মিলিত প্রয়াসেও সেই জাগরণ আসা সম্ভব হইত না। প্রগতির পথে দুস্তর বাধাস্বরূপ যে সাম্প্রদায়িকতা বর্তমান ছিল আজ তাহাও একজন যুবকের আত্মনির্বাণ বরণে গলিয়া গিয়াছে।

দক্ষিণ কলিকাতা কী করিতে পারে

যতীন্দ্রনাথের একটি যোগ্য স্মারক নির্মাণে আমরা যে ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা করিতেছি সে কথা বলিয়াই আমি আমার বক্তব্য শেষ করিব। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য আমাদের দুই লক্ষ টাকা দরকার। বাংলার কথা ছাড়িয়া দিতেছি, এই দক্ষিণ কলিকাতায়ই এমন সব লোক আছেন যাঁহারা এই পুরা টাকাটাই সংগ্রহ করিয়া দিতে পারেন। যতীন্দ্রনাথ দক্ষিণ কলিকাতারই অধিবাসী ছিল। তাই আমি বলিব, আবশ্যক হইলে, এই সব টাকাই দক্ষিণ কলিকাতাকেই দান করিতে হইবে। আমার ইচ্ছা পাঞ্জাবে যে টাকা তোলা হইয়াছে তাহা পাঞ্জাবেই ব্যয়িত হোক। যতীন ছিল যুবক, ছাত্র ও স্বেচ্ছাসেবক। তাহার স্মারক তহবিলে যুবক, ছাত্র ও স্বেচ্ছাসেবকদের উদার হস্তে অর্থ দান করা উচিত। পাঞ্জাবের ছাত্রদের মধ্যে উৎসাহ প্রচুর। আমি দেখিয়াছি স্মারক তহবিলের টাকা সংগ্রহের বিষয়ে কলেজগুলির মধ্যে প্রতিযোগিতা শুরু হইয়া গিয়াছে।

তাঁহার অন্তিম ইচ্ছা

যতীন বেঙ্গল ভলান্টিয়ার কোরের অন্যতম সংগঠক। তাহার অন্তিম ইচ্ছা ছিল যে এই কোরটি যেন সুদৃঢ় ভিত্তি লাভ করে। আমার আশা এই যে আপনাদের সকলের হৃদয় ইহাতে সাড়া দিবে। তাঁহার জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত সে আর একটি জিনিস খুব চাহিত— তাহা এই যে, বাংলার নারীদের যেন উন্নতি হয়, তাহারা যেন মুক্ত হয়। আমি আশা করিব যে তাহার রাজনৈতিক আদর্শ অনুসারে চলিতে আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করিব।

ওয়ার্কিং কমিটি হইতে পদত্যাগ

২ নভেম্বর ১৯২৯ নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সভাপতিকে লিখিত।

ভাইসরয়ের ঘোষণা সম্পর্কে আমার বক্তব্য আজিকার সম্মেলনে আমি সুষ্ঠুভাবে জানাইয়াছি। পূর্ণ স্বাধীনতাবাদীদের মনোভাব ব্যাখ্যা করার জন্য আমার মতামত প্রকাশ্যে ব্যক্ত করা দরকার বলিয়া আমি মনে করিয়াছিলাম। কিন্তু আজ অপরাহ্নের অধিবেশনে মহাত্মাজীর মন্তব্য শুনিয়া আমার মনে হইল যে ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য থাকা কালে তাহা করা আমার উচিত নয়। তাই ওয়ার্কিং কমিটি হইতে আমি পদত্যাগ করিতে চাই। আশা করি আপনি আমার অসুবিধা ও যে উদ্দেশ্যে আমি পদত্যাগ করিতে বাধ্য হইতেছি তাহা অনুধাবন করিবেন। মহাশয়, আপনাকে আমি আশ্বস্ত করিতেছি যে পদত্যাগের পরও আপনি আমার সহযোগিতা সর্বদাই পাইবেন।

পূর্ণ স্বাধীনতা

৩ নভেম্বর ১৯২৯ দিল্লীতে সৈফুদ্দিন কিচলু ও মৌলানা আবদুল বারির সঙ্গে প্রদত্ত যুক্ত বিবৃতি।

মাননীয় ভাইসরয়ের ঘোষণা সম্পর্কে বিচার-বিবেচনা করার উদ্দেশ্যে দিল্লীতে যে সম্মেলন আহ্বান করিয়াছিলেন আমরা তাহাতে যোগ দিয়াছিলাম। কিন্তু মহাত্মা গান্ধী, পন্ডিত মতিলাল নেহরু ও অন্য নেতারা যে বিবৃতি প্রচার করিয়াছেন আমরা উহা মানিয়া লইতে পারি নাই। কেন পারি নাই সে কথা পরে বলিতেছি। আমরা দুঃখিত কেননা হাতে সময় না থাকার দরুন দেশের নানা অংশে আমাদের যে-সকল বন্ধু আছেন তাঁহাদের সঙ্গে আমরা যোগাযোগ করিয়া আলোচনা করিতে পারি নাই। এই প্রশ্নে তাঁহারা আমাদের সঙ্গে সমমত পোষণ করেন। কিন্তু আমরা নিঃসন্দেহ যে আমাদের এই বিবৃতিতে দেশবাসীর এক বিশাল অংশের মতামত প্রতিধ্বনিত হইবে।

ভাইসরয়ের ঘোষণা আমরা গভীর মনোযোগের সঙ্গে বিবেচনা করিয়াছি। আমরা বলিতে বাধ্য হইতেছি যে এই ঘোষণায় এখন কিছুই নাই যৎসম্পর্কে আমরাসাৎ হয়ে বোধ করিতে পারি। ভাইসরয় তাঁহার ঘোষণায় যে দুটি গুরুত্ব-

পূর্ণ বিষয়ে মত প্রকাশ করিয়াছেন। তাহা বিচার করিলেই আমাদের উক্তির যাথার্থ উপলব্ধ হইবে। ঐ বিষয় দুইটি হইল: ১. তিনি দায়িত্বশীল সরকারের সংজ্ঞা দিয়েছেন ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন, ২. তিনি বলিয়াছেন, এমন একটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হইবে যাহার একদিকে থাকিবেন ব্রিটিশ সরকারের প্রতিনিধিবৃন্দ, অপরদিকে থাকিবেন ব্রিটিশ-ভারত ও অন্যান্য রাজ্যগুলির প্রতিনিধিগণ।

ভাইসরয়ের ঘোষণায় যাঁহারা দারুণ উৎসাহ বোধ করিতেছেন তাঁহাদের আমরা প্রথম বিষয়টি সম্পর্কে বলিতে চাই যে, ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন কবে দেওয়া হইবে ভাইসরয়ের ঘোষণায় তাহার কোনো উল্লেখ নাই। আমরা স্বার্থহীনভাবে পূর্ণ স্বাধীনতা দাবি করিতেছি। তাহাও কোনো দূরবর্তী লক্ষ্য রূপে নয়। আমরা উহা অগৌণে লাভ করিতে চাই। যদি ১৯২৯ সালের ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন দান করা হয় তবুও আমরা নির্ভীকভাবে পূর্ণ স্বাধীনতা দাবি করিব। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের বিগত কলিকাতা-অধিবেশনে আমরা এই দাবি জানাইয়াছিলাম এবং আগামী ডিসেম্বর মাসে লাহোরে যে কংগ্রেস অধিবেশন অনুষ্ঠিত হইবে সেখানেও পুনরায় ঐ দাবি জানানোই হইবে আমাদের কর্তব্য।

ভাইসরয়ের ঘোষণায় যে দ্বিতীয় কথাটি বলা হইয়াছে সে সম্পর্কে আমরা মনে করি যে প্রস্তাবিত বৈঠকটি গোলটেবিল বৈঠক হইবে না এবং আমরা আমাদের স্বদেশবাসীদের কাছে এই অনুরোধ করিব যে তাঁহারা যেন ঐ বৈঠককে ঐরকম সম্মানিত নামে অভিহিত না করেন। ভারতের সংবিধান কিভাবে সংশোধন করা যাইবে তাহা স্থির করার যে ব্যবস্থা ও পদ্ধতি সাইমন কমিশন প্রসঙ্গে নির্ণয় করিয়া দেওয়া হইয়াছে তাহার কোনো পরিবর্তন করা হইবে না। তাহাই বজায় থাকিবে। প্রস্তাবিত বৈঠক একদিকে ব্রিটিশ সরকারের প্রতিনিধিবৃন্দ, অপরদিকে ভারতের জাতীয়তাবাদীদের প্রতিনিধিদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকিবে কিনা তাহা সুস্পষ্ট নয়। বৈঠকে যে-সব সিদ্ধান্ত হইবে সেগুলি উভয় পক্ষ মানিয়া লইতে বাধ্য থাকিবে কিনা তা জানা যায় নাই। এই পরিস্থিতিতে প্রস্তাবিত বৈঠককে কোনোমতেই গোল টেবিল বৈঠক বলা যাইতে পারে না।

এই যুক্তি দেওয়া যাইতে পারে যে যেহেতু শ্রমিক দল ক্ষমতায় নাই ও উদারনৈতিকরা তাহাদের প্রস্তাবগুলিকে নস্যাৎ করিয়া দিবে, তাই আমাদের কর্তব্য ভাইসরয়ের ঘোষণায় সাড়া দিয়া আমাদের সহযোগিতা দান করা যাহাতে শ্রমিক দলের হাত শক্তিশালী হয়। এই যুক্তি আমাদের হীনমন্যতাবোধের

পরিচায়ক। ইংলন্ডের একটি রাজনৈতিক দলের প্রতি আমাদের যেন অসংগত সমবেদনা থাকার কোনো হেতু নাই। কারণ আমরা স্বাধীনতা পাইব গ্রেট ব্রিটেনের দান রূপে নয়; আমাদের ত্যাগ, দুঃখবরণ ও সংগ্রামের মধ্য দিয়াই স্বাধীনতা অর্জন করিতে হইবে। ইংলন্ডের যে রাজনৈতিক দলই আজ ভারতের স্বাধীনতার বিরোধী হোক-না-কেন, শীঘ্রই এমন সময় আসিবে যখন ইংলন্ডের স্বার্থেই যে ভারতের স্বাধীন হইবার অধিকার তাহাদের স্বীকার করা ভালো, তাহা তাহারা বুঝিবে।

পরিশেষে দেশবাসীর কাছে আমরা বলিতেছি, ভাইসরয় ও ভারত সচিবের সদয় ভাষণে তাঁহারা যেন বিভ্রান্ত না হন। লাহোর-কংগ্রেসের সময় যে পরিস্থিতির মুখোমুখি হইতে হইবে তাঁহারা যেন তাহার জন্য প্রস্তুত হন। কলিকাতা কংগ্রেসে যে চরমপত্র দেওয়া হইয়াছিল ১৯২৯ সালের ৩১শে ডিসেম্বর উহার মেয়াদ শেষ হইবে। যদি ঐ সময়ের মধ্যে ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন না দেওয়া হয় তবে কংগ্রেসকে সংগঠন হিসাবে ঐ চরমপত্রের যুক্তিসিদ্ধ পরিণামের দিকে আগাইয়া যাইতে হইবে। অতএব দেশকে আসন্ন সংকটের জন্য প্রস্তুত করিয়া তোলার যে কাজ আমাদের হাতে রহিয়াছে তাহা হইতে আমাদের তিলমাত্র বিচ্যুতি চলিবে না।

শ্রমিক আন্দোলন

১৪ নভেম্বর বজবজে অনুষ্ঠিত জনসভায় ভাষণ।

কোম্পানির দালালরা (বজবজ অয়েল ও পেট্রোল কোম্পানির শ্রমিকরা ধর্মঘট করিতেছিল) নানা দুষ্টকার্য করিতেছে, আপনারা সে সম্পর্কে সতর্ক থাকিবেন। আপনাদের সংগ্রামের এই সংকটকালে আপনাদের সাহস অবলম্বন করিতে হইবে। এখন দুর্বলতা দেখাইলে আপনাদের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হইবে। যতক্ষণ পর্যন্ত আপনাদের নিম্নতম অভিযোগ না মিটানো হয় ততক্ষণ পর্যন্ত কাজে যোগ দিবার কথা আপনারা চিন্তাও করিবেন না। এখন যদি নতি স্বীকার করিয়া আপনারা কাজে যোগও দেন তবু আবার একদিন আপনাদের কাজ ছাড়িয়া বাহির হইয়া আসিতে হইবে। কারণ আপনাদের মনে অসন্তোষ ধূমায়িত হইতে থাকিবে। আবার ধর্মঘট করার সুযোগ আপনাদের খুঁজিতে হইবে।

মালিকপক্ষকেও বলিব, শ্রমিকদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করিয়া আপনারা আপনাদের স্বার্থসিদ্ধ করিতে পারিবেন, ইহা যদি আপনারা ভাবিয়া থাকেন তবে তাহা ভুল। অসন্তোষের প্রকৃত কারণ দূর না করিলে শুধু দমননীতি অনুসরণ করিয়া আপনারা অসন্তুষ্ট শ্রমিকদের নিকট হইতে ঠিকমতো কাজ পাইবেন না— ইহা রূঢ় সত্য। অসন্তুষ্ট শ্রমিক যথোপযুক্ত মুনাফা অর্জনের পক্ষে সহায়ক নয়। পরিস্থিতির গুরুত্ব আপনারা উপলব্ধি করুন এবং অবিলম্বে শ্রমিকদের দাবি মিটাইয়া দিন।

আমাদের শ্রমিকরা বলিয়াছে যে আজ এবং এই ধর্মঘট চলাকালে কয়েকটি দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে। অদক্ষ ও প্রায়-অদক্ষ শ্রমিকদের দ্বারা মেশিন চালাইবার চেষ্টা করার ফলেই এই-সব দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে। ফ্যাক্টরি ইন্সপেক্টরদের ও সরকারের দায়িত্ববোধ দেখিয়া আমি অবাক হইতেছি। ফ্যাক্টরি ইন্সপেক্টরগণ ও কর্তৃপক্ষ এই-সব দুর্ঘটনার পুনরাবৃত্তি রোধ করার জন্য কোনো ব্যবস্থাই গ্রহণ করেন নাই; শ্রম-বিরোধের ক্ষেত্রে সরকারী কর্তৃপক্ষ নিরপেক্ষতা অবলম্বন করেন নাই। তাঁহারা কর্তব্যভ্রষ্ট হইয়াছেন। এমন-কি, ফ্যাক্টরি আইন অনুসারেও তাঁহারা ব্যবস্থা গ্রহণ করিতেছেন না।

মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী

দানবীর মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর মৃত্যুতে কলিকাতা টাউন হলে অনুষ্ঠিত স্মরণ-সভায় প্রদত্ত ভাষণ।

সাম্প্রতিক রাজনীতি হইতে মণীন্দ্রচন্দ্র অবসর লইয়াছিলেন। কিন্তু স্বদেশী আন্দোলনের কালে প্রথম বয়কট সভায় তিনি সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন। বাংলা ইহা চিরকৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করিবে। তিনি দেশের সেবায় যথাসাধ্য করিয়াছেন। দেশহিতব্রতে তিনি সর্বস্ব দিয়াছিলেন। বড়োলাট যে ঘোষণা করিয়াছেন মণীন্দ্রচন্দ্র তাহাতে উৎসাহ বোধ করার মতো বিশেষ কিছু খুঁজিয়া পান নাই। তিনি যে মহৎ দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়া গিয়াছেন তাহা অনুসরণ করিলেই তাঁহার প্রতি সর্বোত্তম শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হইবে।

১৬ নভেম্বর ১৯২৯

সু.র. ২।১৭

মধ্যপ্রদেশ যুব-সম্মেলন

২৯ নভেম্বর ১৯২৯ নাগপুরে অনুষ্ঠিত যুব-সম্মেলনে প্রদত্ত সভাপতির অভিভাষণ।

বন্ধুগণ,

মধ্যপ্রদেশ যুব-সম্মেলনে আমাকে সভাপতিত্ব করিতে বলিয়া আপনারা আমাকে যে সম্মান প্রদর্শন করিয়াছেন সেজন্য আমি আপনাদের ধন্যবাদ জানাই।

আমাদের জাতীয় জীবনের এক অতি সংকটলগ্নের ভিতর দিয়া আমরা অতিক্রম করিতেছি। এখন সকল তরুণের কর্তব্য হইল আমাদের ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নির্ধারণের জন্য সকলে সম্মিলিত হওয়া। মধ্য প্রদেশের তরুণরা নেতৃত্ব বা পরামর্শের জন্য বয়োজ্যেষ্ঠদের মুখাপেক্ষী না থাকিয়া নিজেদের জাতীয় জীবনের সমস্যাগুলির সমাধানকল্পে একত্রিত হইয়াছেন। আমি ইহা উত্তম যুগলক্ষণ বলিয়া মনে করি। আপনাদের এই মহৎ প্রচেষ্টায় আমি যদি কিছুমাত্র সাহায্য করিতে পারি তবে আমি নিজেকে সৌভাগ্যবান ও আমার প্রয়াস সার্থক বলিয়া মনে করিব।

আমাদের দেশে এমন সব লোক আছেন— জনজীবনে খ্যাতনামা কিছু ব্যক্তিও তাঁহাদের মধ্যে রহিয়াছেন— যাঁহারা আজিকার যুব-আন্দোলনকে সুনজরে দেখেন না বা এই আন্দোলনের উদ্দেশ্য ও তাৎপর্য বুদ্ধিতে তাঁহারা অপারগ বলিয়া বলেন। অনেকে আছেন যাঁহারা যুব-আন্দোলনের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য বুঝেন না কিন্তু তবু এই আন্দোলনে যোগ দেন। তাঁহাদের মনোভাব এই যে তাঁহারা অংশ লইবেন না এমন কোনো আন্দোলন যেন না থাকে।

ভারতের বর্তমান নবজাগরণের ঊষাকাল হইতে আজ পর্যন্ত একের পর এক কত আন্দোলন ও চিন্তাধারা আসিয়াছে। এত সব আন্দোলনের পরও যে যুব-আন্দোলন রূপে আর-একটি আন্দোলন দেখা দিয়াছে ইহাতেই প্রমাণিত হইতেছে যে এই আন্দোলনের প্রয়োজন ছিল। নিশ্চয়ই ব্যক্তির ও জাতির অন্তরাত্মায় এমন কিছু মৌল আস্পৃহা বর্তমান যাহার পূরণকল্পে যুব-আন্দোলন সৃষ্ট হইয়াছে। কী সেই মৌল আস্পৃহা? তাহা স্বাধীনতা ও সার্থকতা লাভের বাসনা।

দেশের আজ তেমন একটি আন্দোলনের প্রয়োজন যাহা সকলপ্রকার বন্ধন হইতে ব্যক্তি ও জাতিকে পূর্ণ মুক্তি দিতে পারিবে, সার্থকতা লাভ ও আত্ম-

প্রকাশের পূর্ণ ক্ষমতাও দিতে পারিবে। এমন লোক আছেন যাঁহারা চান যুব-সম্মেলনগুলি ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সেজুড় করিয়া তুলিবে। কিন্তু যুব-আন্দোলনের উদ্দেশ্য ও তাৎপর্য তাঁহারা বুঝেন না।

ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস মুখ্যত একটি রাজনৈতিক সংগঠন। স্বভাবতই উহার পরিধি সীমাবদ্ধ। এমন-কি, রাজনৈতিক সমস্যা সম্পর্কেও ইহার লক্ষ্য পূর্ণ স্বাধীনতা বলিয়া ঘোষিত হয় নাই। তরুণ-তরুণীরা জীবনকে সমগ্রভাবে দেখে। জীবনের সকল ক্ষেত্রে তাহারা মুক্তি চায়। তাই তাহারা ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের মতো একটি বিশুদ্ধ রাজনৈতিক সংগঠন লইয়া তৃপ্ত থাকিতে পারে না। তাহারা এমন একটি আন্দোলনের জন্য সতৃষ্ণ যে-আন্দোলন মানবাত্মার সকল স্পৃহা ও জীবনের সকল প্রয়োজন মিটাইতে সক্ষম। তাই যুব-আন্দোলন যেমন নিছক রাজনৈতিক আন্দোলন তেমনি ইহা রাজনীতি বর্জিতও নয়। জীবন যেমন বিশাল এই আন্দোলনের পরিধিও তেমনি বিশাল। সমগ্রের মধ্যে সব অংশগুলিও থাকে। যুব-আন্দোলন তাই রাজনৈতিক বিকাশও ত্বরান্বিত করিবে।

বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে যে অসন্তোষ রহিয়াছে তাহারই প্রতীক এই যুব-আন্দোলন। কালাগত বন্ধন, অত্যাচার ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে যুবকদের বিদ্রোহ ঘোষণারই পরিণাম এই আন্দোলন। আমাদের জন্য ও বিশ্বমানবের জন্য এক নূতন ও সুন্দরতর বিশ্ব ইহা সৃষ্টি করিতে চায়। সেজন্য ইহা সকল বাধাবন্ধ দূর করিয়া মানবজাতির সৃজনশীলতাকে পূর্ণ মুক্তি দিতে চায়। তাই যুব-আন্দোলন আর-একটি আন্দোলন মাত্র নয়। আজিকার অন্যান্য আন্দোলনের উপর আরোপিত আর-একটি বাহারী আন্দোলনও ইহা নয়। ইহা প্রকৃতই একটি স্বাধীন আন্দোলন। মানব-প্রকৃতির মধ্যেই ইহার উৎসমূল নিহিত রহিয়াছে।

যুগের একটি আন্তরিক প্রয়োজন ও মানবাত্মার আস্পৃহা পূরণ করিতে চায় বলিয়াই এই আন্দোলনের সৃষ্টি হইয়াছে। যিনি এই আন্দোলনের অন্তর্নিহিত অর্থ ও উদ্দেশ্য বুঝেন না, তিনি এই আন্দোলনে যোগ দিলে বা যুব-সমিতিগুলি দখল করিলে কিছু লাভ হইবে না। যুব-সমিতির সবগুলি বৈশিষ্ট্য যাহাতে বর্তমান নাই তরুণীরা তেমন সমিতি গঠন করিলেই উহাকে যুব-সমিতি নাম দেওয়া চলে না। আমি ইতিপূর্বেই ইঙ্গিত দিয়াছি যে সব যুব-আন্দোলনেরই বৈশিষ্ট্য অস্থিরতার বোধ, বর্তমান ব্যবস্থার প্রতি অসন্তোষ

ও উন্নততর ব্যবস্থা গড়িয়া তুলিবার অভিলাষ, উহা চায় বন্ধন হইতে মুক্তি। প্রথা ও কর্তৃত্ব যেখানে মানুষের বিবেকের নির্দেশের বিরোধী সেখানে প্রথা ও কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে উহা বিদ্রোহ ঘোষণা করে। বয়োজ্যেষ্ঠদের প্রতি অল্প ভক্তি ও প্রশ্নহীন আনুগত্যের বদলে আত্মবিশ্বাস ও আত্মনির্ভরতাই তাহাদের ব্রত। এই পরিস্থিতিতে আমাদের বয়োজ্যেষ্ঠদের কেহ কেহ যদি এই আন্দোলনকে অপছন্দ করেন বা সুনজরে না দেখেন তবে তাহাতে বিস্ময়ের কিছু নাই।

যুব-আন্দোলনের উদ্দেশ্য আমাদের সমগ্র জীবনকে নূতন করিয়া গড়া ও জীবনে নূতন আদর্শ সঞ্চার করা। আমরা যে জীবন সৃষ্টি করিব তাহাকে নূতন অর্থ ও তাৎপর্যে মন্ডিত করিবে এই আদর্শ। পূর্ণ ও সর্বাঙ্গীণ স্বাধীনতা ও পূর্ণ সার্থকতা লাভই সেই আদর্শ। স্বাধীনতা ও সার্থকতা লাভ পরস্পর অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। স্বাধীনতা ব্যতীত সার্থকতা লাভ নয়, আবার সার্থকতা লাভ সম্ভব করিয়া তোলে বলিয়াই স্বাধীনতার মূল্য।

যুব-আন্দোলনের পরিধি জীবনের মতোই বিশাল তাই জীবনের যতগুলি দিক আছে যুব-আন্দোলনেরও ততগুলি বিভাগ থাকিবে। আমরা যদি শরীরকে সুস্থ রাখিতে চাই তবে খেলাধুলা ও ব্যায়াম দরকার। আমরা যদি মনকে মুক্ত ও সুশিক্ষিত করিতে চাই তবে আমাদের দরকার নূতন সাহিত্য, উন্নততর শিক্ষা ও নৈতিকতা সম্পর্কে স্বাস্থ্যকর ধারণা। যদি সমাজকে আমরা পুনরুজ্জীবিত করিতে চাই তবে পুরানো অচল ভাবধারা ও প্রথা নির্মমভাবে দূরে সরাইয়া দিতে হইবে ও তাহার স্থলে নূতন স্বাস্থ্যকর ভাবধারা ও প্রথা আনিতে হইবে। এবং যুগাদর্শের আলোয় বর্তমান সামাজিক ও নৈতিক মূল্যগুলির পুনর্বিচার করিতে হইবে ও সম্ভবত ভবিষ্যৎ সমাজের উপযোগী নূতন মূল্যমান সৃষ্টি করিতে হইবে।

নূতন ভাবধারা ও কর্মপন্থা অনুসরণ করিতে গেলে বর্তমান ভাবধারা, কায়েমী স্বার্থ ও ক্ষমতাধিষ্ঠিত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধাচরণ আমাদের করিতে হইবে ইহা স্বাভাবিক। কিন্তু সেজন্য ভীত হইলে আমাদের চলিবে না। বিরোধিতা ও বহু বাধাবিঘ্নের সম্মুখীন হইয়াই যুব-আন্দোলনের অগ্রগতি বজায় রাখা সম্ভব। চারদিক হইতে আমাদের ঘিরিয়া ধরা হইবে এবং কখনো কখনো মনে হইবে যে আমরা যেন জগৎ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছি। এরূপ সংকটের সময়ে আমরা সেই মহান আইরিশ দেশপ্রেমিকের উক্তি স্মরণ করিব। আসন্ন বিপদের মুখে দাঁড়াইয়া জয়োল্লাসে তিনি চীৎকার করিয়া বলিয়াছিলেন :

"একজন মানুষ যেমন জগতের উদ্ধারকর্তা হইয়াছিলেন, একজন মানুষই তেমনি আয়ার্ল্যান্ডকে ত্রাণ করিতে পারে।" যুব-আন্দোলনের প্রবক্তা রূপে যখনই আপনারা স্বাধীনতার নীতি জীবনের সর্বক্ষেত্রে প্রয়োগ করিতে উদ্যত হইবেন তখনই চতুর্দিকে শত্রু সৃষ্টি করিয়া বসিবেন ও আপনাদের প্রচারে ক্ষুব্ধ কায়েমী স্বার্থগোষ্ঠীরা আপনাদের চূর্ণ করিয়া ফেলার উদ্দেশ্যে ঐক্যবদ্ধ হইবে। একটি রণাঙ্গনে প্রবল শক্তিশালী শত্রুর সংগে যুদ্ধ করা সহজ কিন্তু একই সংগে চতুর্দিকের রণাঙ্গনে শত্রুদের সংগে যুদ্ধ করা শক্ত। তাই রাজনৈতিক কর্মীরা যে-সব শত্রুপক্ষের সংগে মোকাবিলা করিয়া থাকে তদপেক্ষা বহুগুণ বেশি শক্তিশালী শত্রুদের সংগে মোকাবিলা করার জন্য যুব-আন্দোলনের কর্মীদের আত্মপ্রস্তুতি করিতে হইবে।

আরো একটি বিপত্তির কথা যুব-আন্দোলনের কর্মীদের ভাবিতে হইবে ও আগে হইতেই সাবধান হইতে হইবে। রাজনৈতিক আন্দোলন কিংবা শ্রমিক-আন্দোলনের বিশাল জনতা লইয়া কারবার করিতে হয়। তাহাদের নিয়ন্ত্রণে রাখার উদ্দেশ্যে অনেক সময় তাহাদের মুখ চাহিয়া কথা কহিতে হয়। জনসাধারণের সংগে যোগাযোগ রক্ষা করার উদ্দেশ্যে তাহাদের স্তরে কখনো কখনো নামিয়া আসিতে হয়। কিন্তু জনপ্রিয়তা লাভের বাসনা থাকিলে যুব-আন্দোলনে তাহা পরিত্যাগ করিয়া আসিতে হইবে। জনমত সৃষ্টির দায়িত্ব আপনাদের স্বীকার করিয়া লইতে হইবে। কখনো কখনো জনমতকে ঘুরাইয়া দিবার দায়িত্বও আপনাদের বহন করিতে হইবে। যদি জাতীয় জীবনের মৌল সমস্যাগুলি সমাধান করিতে চান তবে সমকালীন ব্যক্তিদের তুলনায় বহু দূরে আগাইয়া গিয়া আপনাদের চিন্তা করিতে হইবে। জনসাধারণ বর্তমান পরিস্থিতি দ্বারা আচ্ছন্ন থাকে, তাহার ভবিষ্যৎ দেখিতে পায় না। আপনারা যদি ভবিষ্যতের সমস্যাসমূহ কল্পনা করিয়া লইয়া তাহার প্রতিকার উদ্ভাবন করিতে চান তবে জনসাধারণ হয়তো আপনাদের কথা শুনিতেই চাহিবে না। সে ক্ষেত্রে আপনাদের সাহস সঞ্চয় করিয়া প্রয়োজন হইলে কোটি কোটি জনগণের মধ্যে নিঃসংগ ও একাকী দাঁড়াইতে হইবে। বিশ্বের বিরুদ্ধেই লড়াই করিতে হইবে। যে ব্যক্তি সর্বদাই জনপ্রিয়তার তরংগে ভাসিতে চায় সে হয়তো সমকালের হাততালি পাইবে, কিন্তু ইতিহাস তাহাকে মনে রাখিবে না— সে ইতিহাস সৃষ্টিও করিতে পারিবে না। আমরা যদি ইতিহাস-স্রষ্টা হইবার অভিলাষী হই তবে আমাদের যে-কোনো পরিমাণ ভুল বোঝা ও নিপীড়নের শিকার হইবার

জন্য প্রস্তুত থাকিতে হইবে। আমাদের সবচেয়ে নিঃস্বার্থ কাজের জন্যও নিন্দা ও তিরস্কার আমাদের ভাগ্যে জুটিবে ; আমাদের প্রিয়তম বন্ধুদের নিকট হইতেও অযাচিত শত্রুতা পাইবার জন্য আমাদের প্রস্তুত থাকিতে হইবে।

কিন্তু মানব-প্রকৃতি স্বরূপে দিব্য। তাই ভুল বোঝা, নিন্দা ও উৎপীড়নের কাল যত দীর্ঘই হউক, একদিন তাহা শেষ হইবেই। আমাদের অন্তরতম বিশ্বাসের জন্য যদি আমাদের মৃত্যু বরণও করিতে হয় তবু মৃত্যুর মধ্য দিয়া আমরা অমরত্ব অর্জন করিব। তাই যে-কোনো বিপদের জন্য আমাদের প্রস্তুত হইতে হইবে। গোলাপে কাঁটা আছে বলিয়াই উহা এত সুন্দর। মানবজীবনও তেমনই। ত্যাগ, দুঃখবরণ ও নিপীড়ন ভিন্ন জীবন কি বীরত্ব ও নীরস হইয়া যাইবে না ?

মোটামুটি বলিতে গেলে যুব-আন্দোলনের পাঁচটি দিক আছে, যথা : রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, শারীরিক ও সাংস্কৃতিক। আন্দোলনের লক্ষ্য দ্বিবিধ— এই পঞ্চবিধ বন্ধন ছিন্ন করা ও সেই মুক্তির ফলে সার্থকতা লাভ ও আত্মপ্রকাশের উদ্দীপনা পাওয়া। এই আন্দোলন তাই ধ্বংসাত্মকও বটে, রচনাত্মকও বটে। ধ্বংস ভিন্ন নূতন সৃষ্টি সম্ভব নয়। তাই প্রকৃতির সর্বত্র আমরা দেখি ধ্বংসের পাশাপাশি সৃষ্টি চলিতেছে। আমরা যদি মনে করিয়া থাকি যে ধ্বংস মন্দ, সৃষ্টি ভালো ও আমরা যদি বিশ্বাস করিয়া থাকি যে ধ্বংস ছাড়াই সৃষ্টি করা সম্ভব তবে আমরা ভ্রান্ত। তেমনি যদি আমরা ধ্বংসই ধ্বংসের লক্ষ্য বলিয়া মনে করিয়া থাকি তবে তাহাও ভুল। জীবনের কোনো ক্ষেত্রে স্বাধীনতা-আন্দোলনের বিকাশ ও প্রসারের অর্থই হইল ধ্বংস ও নিরংকুশ ধ্বংস। অসত্য, ভন্ডামি, বন্ধন ও অসাম্যের সঙ্গে কোনো আপসই চলিতে পারে না। এই-সব বাধা পূর্ণ করিতে হইলে আমাদের কঠোর আঘাত হানিতে হইবে। আগাইয়া যাওয়াই যখন আমাদের কর্তব্য তখন আমাদের দ্বিধাগ্রস্ত হইলে বা পিছন ফিরিয়া তাকাইলে চলিবে না।

যদি আমাদের মধ্যে জীবন অবশিষ্ট থাকে— যদি আমরা আত্মাবিহীন মাটির ডেলা না হইয়া থাকি— তবে ধ্বংসের সঙ্গে সঙ্গে সৃজনশীল কার্যও আমরা করিয়া যাইব।

বর্তমানে ভারতে ও বিদেশে যে-সব আন্দোলন আমরা দেখিতেছি সেগুলি প্রকৃতিতে সংস্কারধর্মী। আন্দোলন আমাদের জীবনের প্রান্তভাগ স্পর্শ করে— জীবনের মৌল রূপান্তর ঘটায় না। কিন্তু আমরা সংস্কার চাই না— চাই

আমূল রূপান্তর। আমাদের সমগ্র জীবন— ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত— নূতন-ভাবে সৃষ্টি করিতে হইবে। এই পুনরুজ্জীবন সম্ভব করিয়া তোলার জন্য মুক্তির এমন একটি নূতন ধারণা চাই যাহা আমাদের প্রেরণা দেয়। মুক্তির অর্থ যুগে যুগে ও দেশে দেশে পালটায়। প্রকৃতপক্ষে অপরাপর দেশের মতো আমাদের দেশেও মুক্তির ধারণা ক্রম-বিকশিত হইয়াছে। এখন মুক্তি বলিতে আমরা সর্বাংগীন পূর্ণ মুক্তি বুঝি। অন্তত যুবকদের কাছে মুক্তির এই কল্পনাই আবেদন জাগায়। আমরা খন্ড বস্তু লইয়া সন্তুষ্ট থাকিতে পারি না। আমরা চাই মুক্তির পূর্ণতম রূপ ও জীবনের সর্বক্ষেত্রে তাহার প্রতিষ্ঠা। আমরা যদি মুক্তি ভালোবাসি বলিয়াই মুক্তি চাই তবে আমরা বন্ধন সহ্য করিতে পারি না, কোনোপ্রকার অসাম্যও সহ্য করিতে পারি না। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক বা সামাজিক যে ক্ষেত্রই হোক-না কেন, সব ক্ষেত্রেই আমরা মুক্তির নীতি প্রয়োগ করার জন্য প্রস্তুত থাকিব। প্রতিটি মানুষ— পুরুষই হোক আর নারীই হোক— সমান দাবি লইয়া জন্মিয়াছে, প্রত্যেকের আত্মবিকাশের সমান সুযোগ থাকিবে— ইহাই হইবে আমাদের নীতি। এই নীতির কথা মুখে বলা সহজ, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করা খুবই কঠিন। ইহা বাস্তবে রূপায়িত করিতে গেলে আমাদের বহু বাধাবিপত্তির সম্মুখীন হইতে হইবে।

বন্ধুগণ, যাঁহারা যুব-আন্দোলনের বিকাশ ও প্রসার ঘটাইতে চান তাঁহারা কোন্ কর্মসূচী লইয়া অগ্রসর হইবেন সে সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করিয়া আমি আপনাদের সময় নষ্ট করিব না। এই আন্দোলনের উদ্দেশ্য, লক্ষ ও নীতি লইয়া আলোচনা করা হইলেই আমার বক্তৃতা শেষ হইবে। আদর্শ খুবই বৃহৎ— ইহা অপেক্ষা বৃহৎ আদর্শ কল্পনা করা যায় না। আমরা চাই আমাদের সমগ্র জীবনের রূপান্তর সাধন করিতে, আমাদের জন্য ও সমগ্র মানবতার জন্য এক নূতন ও সুন্দরতম বিশ্ব গড়িয়া তুলিতে। ইহা সম্ভব করিয়া তুলিতে হইলে, আমাদের অন্তর্নিহিত শুভ শক্তিগুলিকে জাগাইয়া তুলিতে হইবে। মুক্তির জাদুস্পর্শই আমাদের সুপ্ত সম্ভাবনাগুলিকে জাগাইয়া তুলিয়া অবিচ্ছিন্ন কর্মোদ্যমে আমাদের প্রতিষ্ঠিত করিতে পারে। আমাদের প্রথম ও প্রধান সমস্যা হইল কিভাবে মুক্তির এই পিপাসা প্রথমে আমাদের নিজেদের মধ্যে ও অতঃপর দেশবাসীর মধ্যে আমরা জাগাইয়া তুলিতে পারি। যদি হৃদয়ের গভীর হইতে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা জ্বলিয়া উঠিতে হয় তবে দাসত্বের নিগড় ও বন্ধনের বেদনা তীব্রভাবে অনুভব করা চাই। এই জ্বালা যখন তীব্রভাবে অনুভূত হইবে

তখন আমরা বুঝিব যে মুক্তি ভিন্ন জীবনধারণ অর্থহীন। এই অভিজ্ঞতা যত বাড়িবে তত আমাদের সমগ্র আত্মা মুক্তির তৃষ্ণায় ব্যাকুল হইয়া উঠিবে।

তখন আমরা মুক্তির আদর্শের প্রচারক হইতে পারিব। তখন আমরা মুক্তি-পাগলের দল দ্বারে দ্বারে যাইব, গ্রামে গ্রামে শহরে নগরে যাইব, মুক্তির নূতন বাণী লইয়া। আমাদের প্রচারের ফলে জীবনের সকল ক্ষেত্রে প্রাণস্পন্দন জাগিবে। ধ্বংস ও সৃষ্টি একসঙ্গে আরম্ভ হইবে। আমাদের রাষ্ট্র ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ও সামাজিক জীবন মুক্তি ও সাম্যের আদর্শে প্রেরণায় আলোড়িত হইবে। ভ্রান্ত আদর্শ, সংকীর্ণ প্রথা ও কালাগত অবরোধসমূহ ভাঙিয়া পড়িবে ও তাহার স্থলে এক নূতন ব্যবস্থা জন্ম নিবে। যদি স্বাধীনতা, সাম্য ও মৈত্রীর উপর ভিত্তি করিয়া এক নূতন ব্যবস্থা আমরা গড়িয়া তুলিতে পারি তবে আমরা শুধু জাতীয় সমস্যারই সমাধান করিতে পারিব তাহা নয়, বিশ্ব-সমস্যারও সমাধান করিতে পারিব।

ভারত বিশ্বের এক ক্ষুদ্র সংস্করণ। ভারতের সমস্যাগুলি ক্ষুদ্রাকারে বিশ্বেরই সমস্যা। তাই ভারতের সমস্যা সমাধান করিতে পারিলে বিশ্ব-সমস্যারও আমরা সমাধান করিতে পারিব। ভারতের একটি মিশন আছে যাহা তাহাকে পূর্ণ করিতে হইবে। সেজন্য অবর্ণনীয় দুঃখ-কষ্ট ও বহু বহিরাক্রমণ সত্ত্বেও ভারত বাঁচিয়া আছে। ভারত আত্মরক্ষা করিবে, কেননা ভারত নিজেকে রক্ষা করিয়াই বিশ্বকে রক্ষা করিবে। ভারতকে স্বাধীন হইতে হইবে কেননা স্বাধীন ভারতবর্ষই বিশ্বের সংস্কৃতি ও সভ্যতাকে বাঁচাইতে পারে। বিশ্ব ভারতের অবদানের জন্য উন্মুখ হইয়া আছে। ভারতের অবদান না পাইলে বিশ্ব রিক্ততর হইবে।

বন্ধুগণ, আমাদের দায়িত্ব মহান। যুগে যুগে দেশে দেশে যৌবনই মুক্তির আলোক-বর্তিকা বহন করিয়াছে। বিশ্বের তরুণরা যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়াছে আমাদের তাহার যোগ্য হইতে হইবে। আমরা যোগ্য হইলে, বিশ্বের অন্যান্য প্রান্তে তারুণ্যশক্তি যাহা করিয়াছে ভারতেরও তরুণ-তরুণীরা তাহা করিতে পারিবে। আমরা এক ঐতিহাসিক মুহূর্তে জীবন ধারণ করিতেছি ও ভারতের ভাগ্য ভারতের তরুণদেরই হাতে রহিয়াছে। এদেশের তরুণদের স্কন্ধে যে দায়িত্বভার ন্যস্ত রহিয়াছে তাহারা যে সে সম্পর্কে সচেতন সে-বিষয়ে আমার মনে কোনো সংশয় নাই। আমি সংশয়শূন্য যে তাহাদের ত্যাগ, দুঃখবরণ ও শ্রমের মূল্যে ভারত অচিরেই এক স্বাধীন দেশে পরিণত হইবে।

সে দেশে নরনারী মুক্ত মানুষ রূপে জন্মিবে, তাহারা শিক্ষা ও আত্মবিকাশের সকল সুযোগ লাভ করিবে। ভারত স্বাধীন হইবে— সে বিষয়ে কণামাত্র সংশয় নাই। প্রশ্ন হইল কখন স্বাধীন হইবে। আমরা সকলেই জন্মিয়াছি দাস রূপে, কিন্তু শপথ করুন যে আমরা প্রত্যেকে মরিব মুক্ত মানুষ রূপে। আর যদি আমাদের জীবদ্দশায় ভারতকে স্বাধীন দেখিয়া যাইতে না পারি তবে অন্তত ভারতকে স্বাধীন করার প্রয়োজনেই যেন আমাদের জীবন সমাপ্তি লাভ করে।... স্বাধীনতার পথ কন্টকাকীর্ণ— কিন্তু ইহাই অমরত্ব লাভের পথ। হে আমার মধ্যপ্রদেশের ভ্রাতা ও ভগিনীগণ, এই মহৎ পথে চলিতেই আমি তোমাদের আহ্বান করিতেছি।

মধ্যপ্রদেশ ও বেরার ছাত্র-সম্মেলন

১ ডিসেম্বর ১৯২৯ অমরাবতীতে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে প্রদত্ত সভাপতির ভাষণ।

মধ্যপ্রদেশ ও বেরার ছাত্রসম্মেলনে অংশ গ্রহণ করিতে পারা আমার পক্ষে খুবই আনন্দদায়ক। এই ধরনের একটি ছাত্র সম্মেলনে যোগ দিতে পারা শুধু আনন্দেরই নয়, পরম সৌভাগ্যের বিষয়ও বটে। তোমাদের স্তুতির জন্য বলিতেছি না, ইহা আমার অন্তরের গভীরতম কথা। ইহাতে কোনো অতিরঞ্জন নাই। কেননা ছাত্রদের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসিলেই আমার মনের দুয়ার খুলিয়া যায়। সকল দ্বিধা-সংকোচ দূর হয়, আমার জীবনের চরম সত্যগুলিকে অকপটে প্রকাশ করিতে পারি। প্রায় এক দশক আগে আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের অঙ্গন ছাড়িয়া বাহির হইয়াছি। তবু আজও আমি নিজেকে ছাত্র ভিন্ন আর কিছু ভাবিতে পারি না। শুধু প্রভেদ এই তোমাদের বিশ্ববিদ্যালয় অপেক্ষা বর্তমানে এক বৃহত্তর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র আমি— উহাকে সহজভাবেই 'জীবনের বিশ্ববিদ্যালয়' বলা যাইতে পারে। আমি জীবন সংগ্রামে নিযুক্ত এবং তাহা হইতে নিত্যনূতন বাণী ও অভিজ্ঞতা আহরণ করিতেছি। আদর্শবাদ এবং কল্পনা-প্রসূত ভাবপ্রবণতা— যাহা ছাত্রদের বৈশিষ্ট্য— আমাকে এখনো সম্পূর্ণরূপে বর্জন করে নাই। সুতরাং তোমাদের অভাব ও ক্ষোভ, আনন্দ ও বেদনা, আশা ও আকাঙ্ক্ষা আমার পক্ষে অনুভব করা অসম্ভব নয়।

তবুও এই সম্মেলনে সভাপতিত্ব করার যোগ্যতা আমার আদৌ আছে কিনা সে সম্বন্ধে গুরুতর সংশয় রহিয়াছে। ছাত্রজীবনের আচরণের দিক হইতে আমাকে বিচার করিলে আশঙ্কা হয় আমাকে খুব সৎ কিম্বা নিষ্কলঙ্ক পাইবে না। সেদিনের কথা আমার সুস্পষ্ট মনে আছে, যেদিন অধ্যক্ষমহাশয় আমাকে তাঁহার সমক্ষে ডাকাইয়া আনিয়া কলেজ হইতে বহিষ্কারের আদেশ জানাইয়া দিলেন। তাঁহার কথাগুলি এখনো আমার কানে বাজিতেছে: তুমিই এই কলেজের ছাত্রদের মধ্যে সব চাইতে নষ্টের গোড়া।'

আমার জীবনের সে এক পরম স্মরণীয় দিন। নানাদিক দিয়া বিচার করিলে বলা যায় সেদিন হইতে আমার জীবনের এক নূতন অধ্যায় খুলিয়া গেল। সেদিন আমি প্রথম উপলব্ধি করিলাম কোনো মহান আদর্শের জন্য নির্যাতন ভোগের পর কী স্বর্গীয় আনন্দ আমাদের জন্য অপেক্ষা করিয়া

থাকে ! জীবনের অন্য কোন্ আনন্দ এই অপার আনন্দের সহিত তুলনীয় হইতে পারে ? ইহার সহিত তুলনীয় আর সকল অবস্থাই তুচ্ছ, অকিঞ্চিৎকর। ইতিপূর্বে সামাজিক নৈতিকতার এবং জাতীয়তাবাদের তত্ত্বগত ধারণার সহিত কিছুটা পরিচিত হইয়াছিলাম। কিন্তু সেই দিনই প্রায় সকল ধারণার পরীক্ষা হইয়া গেল— তাহা অগ্নিপরীক্ষাই বটে। সেই কঠিন পরীক্ষায় সাফল্যের সহিত উত্তীর্ণ হইবার পর আমি বুঝিতে পারিলাম আমার জীবনের গতি ও ভবিষ্যৎ কার্যক্রম চিরকালের জন্য নির্ধারিত হইয়া গিয়াছে।

বন্ধুগণ, তোমরা হয়তো ভাবিতেছ যে আমি এক অদ্ভুত ব্যক্তি, তোমাদের সমস্যার ভিতরে প্রবেশ করিয়া নিজের কথাই চর্চা করিতে আরম্ভ করিয়াছি। কিন্তু আমি এখানে কেন আসিয়াছি ? তোমরা কি আমার আসিবার উদ্দেশ্য অনুমান করিতে পারিয়াছ ? নিশ্চয়ই আমি নীতিজ্ঞান ও জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে নিছক দীর্ঘ তত্ত্বোপদেশ দিতে আসি নাই। আমার জীবনের অভিজ্ঞতা-লব্ধ সত্য তোমাদের সম্মুখে উপস্থাপনের জন্য আমি আসিয়াছি। ইহা কি সত্য নয় যে একমাত্র অভিজ্ঞতা ও দুঃখবরণের মধ্য দিয়া যাহা আমরা লিখিয়া থাকি তাহারই যথার্থ মূল্য আছে ?

ভারতের সর্বত্র আজ এক ব্যাপক আলোড়ন শুরু হইয়াছে। বিভিন্ন মত ও আদর্শের সংঘাত চলিতেছে। নানা প্রকৃতির আন্দোলনের উদ্ভব হইয়াছে। তাহার কতকগুলি সংস্কারমূলক। বর্তমান অবস্থার উন্নয়নই তাহাদের লক্ষ্য। অপর কতকগুলি বৈপ্লবিক ধরনের— বর্তমান অবস্থার আমূল পরিবর্তন করিয়া সম্পূর্ণরূপে নূতন ব্যবস্থার পত্তন করিতে চায়। এই সংঘাতের মধ্য দিয়া নূতন ভারতবর্ষ জন্মগ্রহণ করিতেছে। এই পরিস্থিতিতে ভবিষ্যতের দিকে তাকাইয়া তাহার গতিপ্রকৃতি নির্ণয় করা সহজ নহে। যাহারা সজীব ও তরুণ, মহান আদর্শের দ্বারা উদ্বুদ্ধ অথচ আত্ম-সংযত, যাহারা স্বীয় আদর্শের সহিত জাতির আদর্শের সার্থক সমন্বয় স্থাপন করিয়াছে, যাহারা ইতিহাস-পাঠ সম্পূর্ণ করিয়া শিক্ষণীয় বিষয় আত্মস্থ করিয়াছে, কেবলমাত্র তাহারাই এই প্রকার দায়িত্বশীল কাজের উপযুক্ত। বর্তমানের দুর্যোগপূর্ণ সময়ে একমাত্র তাহারাই ভবিষ্যৎ অগ্রগতির পথের সন্ধান আবিষ্কারের সুযোগ দিতে পারে।

ভারতে সম্প্রতিককালে উদ্ভূত বিভিন্ন আন্দোলনগুলি একটি একটি করিয়া বিশ্লেষণের পর সেগুলি সম্বন্ধে মত প্রকাশ করিতে হইলে, দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন এবং একদিনের বক্তৃতায় তাহা সমাধা করাও সম্ভব নয়।

সুতরাং সে চেষ্টা হইতে বিরত থাকিব। কিন্তু একটি কথা জোর দিয়া বলিতে চাই। আমাদের এই কালজীর্ণ দেশে যদি যৌবনের পুনরুজ্জীবন চাই, সমগ্র ভারতবর্ষকে যদি একটি মহান জাতিরূপে সংহত করিতে চাই, তবে আমাদের ভালোমন্দ বোধের নৈতিকতার মজ্জাগত পুরানো ধারণা ঢালিয়া সাজিতে হইবে। দার্শনিক পরিভাষায় বলিতে গেলে আমাদের পুরাতন অথচ বর্তমানেও প্রচলিত সামাজিক ও নৈতিক মূল্যগুলির পুনর্মূল্যায়ন করিতে হইবে।

গভীর বিচার ছাড়াই, আপাতদৃষ্টিতেই দেখা যাইবে যে আমাদের দেশের সাম্প্রতিক আন্দোলনগুলি দৃঢ়মূল নহে, একান্তই ভাসা ভাসা; মানুষের আত্মার গভীরে আবেদন সৃষ্টি না করিয়া, অভাব-অভিযোগের প্রান্তসীমা মাত্র স্পর্শ করিয়াছে। অবশ্য আমার বলার উদ্দেশ্য ইহা নয়। এগুলি কোনো উদ্দেশ্য সাধন করে না, করিতেও পারিবে না। আসলে ইহাদের উদ্দেশ্য সাধনের ক্ষমতা অত্যন্ত ক্ষীণ। সমগ্র জাতিকে জাগাইতে হইলে এইরূপ অগভীর আন্দোলন দৃশ্যত আমাদের কোনো কাজে আসিবে না। আমাদের চরম লক্ষ্য জাতির জাগরণ। কোনো অগভীর জাগরণ নহে। আত্মরক্ষার জাগরণ। সুতরাং সমগ্র জাতিকে জাগাইবার জন্য আমাদের উদ্যোগী হইতে হইবে। অনতিকালমধ্যে এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য উপায় খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে।

আমাদের এই প্রাচীন দেশের সভ্যতাও প্রাচীন। তৎসত্ত্বেও ইহার অন্তর্নিহিত শক্তি সম্পূর্ণরূপে নিঃশেষিত হয় নাই। জাতি হিসাবে আমরা অনেক ঘাত-প্রতিঘাত বীরোচিতভাবে অতিক্রম করিয়াছি। কখনো কখনো পর্যুদস্ত হইলেও আজও আমরা সম্পূর্ণরূপে লোপ পাই নাই। যদি কখনো শ্রান্ত বা অবসাদগ্রস্ত হইয়া থাকি, তাহাতে অবাক হইবার কিছু নাই। কারণ ঐ সব মুহূর্ত আমাদের বিশ্রামের সুযোগ আনিয়া দিয়া জীবনরক্ষার ব্যবস্থা করে। আজ আমরা ক্লান্ত এবং দ্বিধাগ্রস্ত হইয়া পড়িলেও জাতি হিসাবে আমরা মৃত নহি। জাতি ও ব্যক্তি হিসাবে, চিন্তা ও কর্মের ক্ষেত্রে, সৃজনীপ্রতিভার জন্য, আমাদের গৌরব বোধ করিবার সংগত কারণ রহিয়াছে। এইগুলিই প্রাণ-স্পন্দনের সুনিশ্চিত লক্ষণ। আমাদের মধ্যে এই ধরনের একজনও অবশিষ্ট না থাকিলে, জাতির জাগরণের সকল আশাই বিলুপ্ত হইবে।

কিন্তু প্রাণ-স্পন্দন আমাদের সংশয় করিবার নয়। জাতির পুনর্জাগরণের জন্য সকল উপাদানও সমভাবে বিদ্যমান। এই কারণেই গৌরবোজ্জ্বল ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখিবার উদ্দীপনা এখনো আমাদের অন্তরে রহিয়াছে।

এই অন্তরাত্মার জাগরণ চাই। একমাত্র এই জাগরণই আমাদের জীবনের মৌল রূপান্তর ঘটাইবে। আধাআধি সংস্কার কিম্বা বাহ্যিক পালিশে কোনো কাজ হইবে না। সম্পূর্ণ নূতন জীবনে উত্তরণের জন্য আমাদের চাই সর্বাঙ্গীণ পরিবর্তন। এই পরিবর্তনকে আমরা 'সম্পূর্ণ বিপ্লব' আখ্যায়িত করিতে পারি।

'বিপ্লব' কথাটি শুনিয়া আপনারা চমকিত হইবেন না। বিপ্লব কোন্ পথে প্রবাহিত হইবে সে সম্পর্কে আমাদের মতভেদ থাকিতে পারে; কিন্তু বিপ্লবে বিশ্বাস করে না, এমন একটি লোকেরও এ-যাবৎ সাক্ষাৎ পাই নাই। 'বিবর্তন' ও 'বিপ্লব' এর মধ্যে কোনো মৌলিক পার্থক্য নাই। অল্পসময়ের মধ্যে বিবর্তন বিপ্লব ছাড়া আর কিছু নয়, দীর্ঘতর সময়ের মধ্যে সম্পাদিত বিপ্লবকেই বলে বিবর্তন। এই দুইটি প্রত্যয়ের পশ্চাতে রহিয়াছে পরিবর্তনের ধারণা; দুইটি প্রত্যয়েরই নির্দিষ্ট স্থান রহিয়াছে। একটি আর-একটির বিকল্প হইতে পারে না।

আগেই বলিয়াছি, ভালো ও মন্দ সম্বন্ধে কতকগুলি প্রচলিত ধারণার পরিবর্তন আমাদের করিতে হইবে। আমি আরো বলিয়াছি আমাদের গতানুগতিক অস্তিত্বের কাঠামোকে ঢালিয়া সাজা প্রয়োজন। সেই পথেই জাতির প্রকৃত সংহতি সৃষ্টি হইয়া সভ্যজগতে আমাদের সম্মানের আসনে প্রতিষ্ঠা দান করিবে। যে জীবন প্রাত্যহিকতার ঊর্ধ্বে কোনো বৃহত্তর এবং মহত্তর আদর্শ দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়, তাহার কিছু মূল্য আছে। যে জাতির কোনো উচ্চাকাঙ্ক্ষা নাই, তার বাঁচিবারও অধিকার নাই। আমি সেজন্য এ কথা কখনোই বলিব না যে কেবলমাত্র সংকীর্ণ স্বার্থসিদ্ধির জন্যই কোনো জাতি উন্নতির চেষ্টা করিবে। মানবসমাজে ঔদার্য ও মাহাত্ম্য বৃদ্ধির জন্য জাতিকে অগ্রসর হইতে হইবে, যাহাতে শেষ পর্যন্ত এই পৃথিবী মানুষের পক্ষে মহত্তর ও সুন্দরতর আবাসযোগ্যস্থান হইয়া উঠে।

জাতির উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় সকল উপাদানই ভারতে রহিয়াছে— বৈষয়িক, নৈতিক, আত্মিক— যে-কোনো দিকেই তাকাই-না কেন, ইহার কোনো অভাব গোচরে আসে না। ভারতের ইতিহাস কত প্রাচীন তাহার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি না হইতে পারে, কিন্তু আসল কথা এই ভারতবর্ষ মৃত নয়, এখনো জীবিত। ভারতবর্ষ কেন বাঁচিয়া আছে? শুধু কি তাহার গৌরব ও মহত্ত্বের পুনরুজ্জীবনের জন্য? ভারতবর্ষ বাঁচিয়া রহিয়াছে এই কারণে যে

বিশ্বের ভাণ্ডারে এখনো বৃহত্তর ও গৌরবোজ্জ্বল কিছু তাহার দান করিবার রহিয়াছে।

ভারতবর্ষের চরম লক্ষ্য কী? তাহার জনসমাজের কার্যক্রম কী? প্রথমত তাহাদের আত্মরক্ষা করিতে হইবে, তারপর বিশ্বের সভ্যতার ভাণ্ডারে কিছু দান করিতে হইবে। অজস্র বাধা সত্ত্বেও, অতীতে ভারতবর্ষের অবদান অকিঞ্চিৎকর নহে। সুতরাং আমরা অনায়াসে অনুমান করিতে পারি, যদি বাধাহীনভাবে নিজের পথে বিকাশের স্বাধীনতা থাকিত, তবে মানব-জাতির সংস্কৃতি ও সভ্যতার ক্ষেত্রে ভারত কী পরিমাণ দান করিতে পারিত।

আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যদি আমাদের দেশবাসীর মনে অন্তহীন উদ্দীপনা ও অনুপ্রেরণা সঞ্চার করিতে পারিতাম ভারতবর্ষ অবিশ্বাস্য কর্ম-সাধন করিয়া বিশ্বে বিস্ময় সৃষ্টি করিতে পারিত। আমাদের এই সুপ্ত জাতি একবার জাগিয়া উঠিলে প্রথম সারির অগ্রসর পাশ্চাত্যজাতিসমূহকে অনায়াসেই পিছনে ফেলিয়া যাইবে। আমাদের প্রয়োজন একটি যাদুদণ্ড যাহার স্পর্শমাত্র একটি বিচ্ছুরিত শিহরণ জীবনের সকল ক্ষেত্রে সঞ্চারিত হইয়া আত্মিক প্রস্তুতির আহ্বান জানাইবে। ফরাসী দার্শনিক বের্গস 'এলান ভাইটাল' অর্থাৎ প্রেরণা-দায়িনী শক্তির কথা বলিয়াছেন, ইহা সেই প্রাণশক্তি যাহা পৃথিবীকে কর্ম-সাধনার ও প্রগতির পথে প্রবর্তিত করে। আমাদের জাতীয় জীবনের প্রাণশক্তি কী হইতে পারে? স্বাধীনতা, আত্মবিকাশ অথবা অন্মোন্নয়নের জন্য নিরবচ্ছিন্ন আকৃতি যাহা আমাদের মনের গভীরে নিহিত রহিয়াছে। সকল প্রকার বন্ধনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ, আত্মবিকাশের জন্য বেগবান প্রবণতার অপর একটি দিক মাত্র। যদি সত্যই তোমরা বন্ধনমুক্ত হইতে চাও, বন্ধনের শৃঙ্খল ভাঙিবার জন্য দ্বিধাহীনভাবে প্রস্তুত হইতে হইবে এবং স্বাধীনতার পথে সকল অন্তরায় চুর-মার করিয়া ফেলিতে হইবে। এই প্রকার বিদ্রোহে তোমাদের সাফল্য স্বাধীনতা অর্জনের মতোই প্রতিষ্ঠা পাইবে। যাহাদের আত্মসম্মানবোধ সর্বোতভাবে লুপ্ত হইয়াছে, তাহাদের কথা ছাড়িয়া দিলে অবশিষ্টেরা সর্বদাই দাসত্বের জ্বালা ও অবমাননা বোধ করে। বিভিন্ন ব্যক্তির নিকট সেই অনুভূতি যতই বিভিন্ন মাত্রায় অভিব্যক্ত হইয়া থাকুক-না কেন। এই অনুভূতি তীব্র হইয়া উঠিলে বন্ধন আর সহ্য করা অসম্ভব হইয়া উঠে। এই অবস্থায় পৌঁছাইলে সকল বন্ধনে অস্থির হইয়া পড়িতে হয় এবং যদি সেই অবসরে সামান্য মুক্তির স্বাদও আমরা পাই, বন্ধনমোচনের অস্থিরতা আরো বাড়িয়া উঠে। আমাদের মতো সাধারণ

মানুষ অপর কোনো স্বাধীন দেশের অর্জিত অভিজ্ঞতা হইতে অথবা সে দেশের ইতিহাস পাঠ করিয়া সেখানকার পরিস্থিতি ও পরিবেশের মননার দ্বারা স্বাধীনতার স্বাদ উপলব্ধি করিয়া থাকি। স্বাধীনতা অর্জনের পূর্বে যে-কোনো জাতিকে কঠিন পরীক্ষার মধ্য দিয়া অগ্রসর হইতে হইবে।

এই পরীক্ষার প্রকৃতি কী? একদিকে সকল প্রকার জাতীয় অবমাননার বিরুদ্ধে, জাতিধর্মের বৈষম্যের বিরুদ্ধে আমাদের ঘৃণা তীব্রতর করিয়া তুলিতে হইবে, অপরপক্ষে স্বাধীনতার জন্য আকাঙ্ক্ষা ক্রমশই প্রবলতর করিয়া তুলিতে হইবে। বাস্তবিকপক্ষে আমাদের স্বাধীনতা-সংগ্রামে এই কঠিন পরীক্ষা ও তপস্যার অনিবার্য প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে। এই সংগ্রামে উপযুক্ত উদ্দীপনা সঞ্চারের জন্য আমাদের শুরু করিতে হইবে ইতিহাস পাঠ দিয়া এবং ভারতবর্ষের জনগনের পতনের কারণ নির্ণয় করিতে হইবে। অতঃপর প্রকৃত আদর্শ সম্বন্ধে গভীরভাবে পর্যালোচনা করার সময় মনোযোগ সহকারে পরাধীন দেশের অবস্থার সহিত স্বাধীন দেশের অবস্থার তুলনা করিতে হইবে।

Baptism, মন্ত্রগুপ্তি অনুষ্ঠান বা দীক্ষার একটিই অর্থ: স্বাধীনতার বেদীতে আত্মনিবেদনের সংকল্প গ্রহণ। সম্পূর্ণরূপে আত্মনিবেদন একদিনে আয়ত্ত করা যায় না। স্বাধীনতার জন্য আমাদের আকাঙ্ক্ষা যত প্রবল হইবে ততই আমরা আমাদের হৃদয়ে স্বর্গীয় আনন্দ লাভ করিব। ভাষায় এই অনুভূতি ব্যক্ত করা যাইবে না। এই আনন্দের সন্ধান পাইলে জীবনের মহত্তর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আমাদের ধীরে ধীরে উপলব্ধি করিতে হইবে। এই উপলব্ধি আমাদের বিপ্লবের পথে পরিচালিত করিবে; আমাদের সকল অনুভূতি, আশা-আকাঙ্ক্ষার সম্পূণ্যরূপে রূপান্তর ঘটিবে। অতঃপর আমাদের জীবনে একমাত্র স্বাধীনতারই মূল্য থাকিবে এবং সকল অন্তর দিয়া, আর কাহারো নহে কেবল স্বাধীনতার পূজা করিয়া, জীবনের প্রতি আমাদের দৃষ্টিভঙ্গির, আমাদের মূল্যবোধেরও পরিবর্তন ঘটিবে। তখন আমরা একমাত্র সেই আদর্শকেই অনুসরণ করিব। এই রূপান্তরকালের অনুভূতির সঠিক বিবরণ ভাষায় ব্যক্ত করা অসম্ভব। কিন্তু এ কথা বলা যায় একবার এই রূপান্তর সম্পূর্ণ হয়ে গেলে আমরা নবজন্ম লাভ করিয়া প্রকৃত অর্থে 'দ্বিজত্ব' প্রাপ্ত হইব। তারপর আমাদের অন্তর সর্বদাই স্বাধীনতার স্বাদে সেই ভাবনায় ভরিয়া থাকিবে। আমরা তাহার স্বপ্ন দেখিতে থাকিব। স্বাধীন হইবার আকাঙ্ক্ষা, যাহা জীবনের সর্বোত্তম আকাঙ্ক্ষা— আমাদের সকল কর্মে তাহার অভিব্যক্তি হইতে থাকিবে।

এক কথায় বলিতে হয় : আমরা স্বাধীনতার ভাবনায় উদ্বেলিত হইয়া, সেই অমূল্য সম্পদ করায়ত্ত করিতে জীবনের সর্বস্ব পণ করিব।

স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা একবার হৃদয়ে জাগ্রত হইলে, তাহা তৃপ্ত না হওয়া পর্যন্ত আমাদের মনে কোনো শান্তি থাকিবে না। আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য আমাদের সকল প্রকার সংগত ও সম্ভাব্য পথ গ্রহণ করিতে হইবে। সেই উদ্দেশ্যে এই লক্ষ্য পূরণের জন্য আমাদের শারীরিক, মানসিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক সকল প্রকার শক্তি ও তেজ সংহত করিতে হইবে। এতকাল যাহা শিখিয়াছি তাহার অনেক কিছুই ভুলিয়া যাইতে হইবে। আর এতদিন যাহা শিখি নাই, তাহা নূতন করিয়া এখন শিখিতে হইবে। যেহেতু স্বাধীনতার গুরু দায়িত্ব আমাদের বহন করিতে হইবে, সে কারণে আমাদের শরীর ও মনের শক্তি নূতন উদ্যমে বৃদ্ধি করিতে হইবে এবং এই উদ্দেশ্যে যেমন পড়িতে হইবে নূতন পাঠ তেমনি সাময়িক উপভোগ এবং বিলাসব্যসনগুলির মতো জীবনের বহির্ভাগের মৃত খোলস ঝাড়িয়া ফেলিয়া দিতে হইবে। এক কথায়, পুরানো অভ্যাস বর্জন করিয়া আমাদের সম্পূর্ণরূপে জীবনের নূতন গতিপথ অবলম্বন করিতে হইবে। এইভাবে শক্তিমান ও কলুষমুক্ত হইয়া সামগ্রিকভাবে জীবন পূর্ণতার প্রতিচ্ছবি হইয়া উঠিবে এবং আমরা স্বাধীনতা লাভের উপযুক্ত হইয়া উঠিব।

আসলে ব্যক্তিমানুষ একটি সামাজিক সত্তা। তাহাকে সমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দিলে, তাহার ব্যক্তিত্বের বিকাশ রুদ্ধ হইয়া যায়। শরীরের ও আত্মার সর্বাঙ্গীন বৃদ্ধির এবং মানসিক পুষ্টির জন্য ব্যক্তিকে সমাজের উপর বহুলাংশে নির্ভর করিতে হইবে। আমাদের উপলব্ধি করিতে হইবে যে সমাজের অবাধ উন্নতি ব্যতিরেকে ব্যক্তি-মানুষের একক উন্নতির কোনো সার্থকতা বা ব্যবহারিক মূল্য নাই। কৃচ্ছ্রসাধক সন্ন্যাসীর জীবনাদর্শ সমাজে গ্রহণীয় নয়। আদর্শের সামাজিক কোনো তাৎপর্য নাই। আমার নিকট তাহার কোনো গুরুত্বও নাই, সুতরাং যদি স্বাধীনতাকে আমাদের জীবনের মৌলিক নীতিরূপে গ্রহণ করি এবং ইহাতেই আমাদের সকল উদ্যোগ ও কর্মের প্রেরণার উৎসমূল রূপে স্বীকার করি, তাহা হইলে এই মহান আদর্শের ভিত্তিপ্রস্তরের উপর সমাজ-সংস্কারের উৎসমূল স্থাপন করিতে হইবে। অচিরেই আমরা হৃদয়ংগম করিব, যে সক্রিয় নীতিটি স্বাধীনতার আদর্শের পিছনে নিহিত রহিয়াছে, তাহা সমাজ-বিপ্লব ছাড়া আর কিছু নয়। সমগ্র সমাজের স্বাধীনতার কথা বলিলে

বুঝিতে হইবে স্ত্রী-পুরুষের স্বাধীনতার কথাই বলা হইতেছে। উচ্চবর্ণের স্বাধীনতার সহিত তথাকথিত অনগ্রসর বর্ণের স্বাধীনতাকেও স্বীকৃতি দিতে হইবে। স্বাধীনতার সংজ্ঞায় বিত্তবান ও দরিদ্রের, নবীন ও প্রবীণের এবং সকল ধর্মাবলম্বীর স্বাধীনতাই স্বীকৃত। সকল শ্রেণীর ও ব্যক্তির, সংখ্যাগুরু বা সংখ্যালঘু যে-কোনো সম্প্রদায়েরই তাহারা হউক-না কেন, বলা বাহুল্য বিনা বৈষম্যে তাহাদের স্বাধীনতা স্বীকৃত হইবে। এই দৃষ্টিকোণ হইতে দেখিলে স্বাধীনতা ও সমতা একার্থক এবং আমরা জানি সমতাবোধ আমাদের সৌভ্রাত্রের অধিকারী করিয়া তোলে।

কোনো সমাজ বন্ধনমুক্ত হইবার পূর্বে, সেই সমাজে আইন ও সামাজিক বিষয়ে নারীদের প্রতি পুরুষের সমানাধিকার প্রসারিত হওয়া কর্তব্য। যে-সকল সামাজিক রীতি-নীতি ও ঐতিহ্য কোনো কোনো শ্রেণী ও ব্যক্তির স্থান সমাজে নামাইয়া দিয়াছে, নির্মমভাবে সেগুলি ধ্বংস করিতে হইবে। ধনী ও দরিদ্রের সামাজিক মর্যাদার প্রভেদের অবসান করিতে হইবে। সমাজ-প্রগতির পথে নির্বিশেষে সকল প্রকার অবরোধ বর্জন করিতে হইবে। শিক্ষা ও উন্নয়নের ক্ষেত্রে প্রতিটি ব্যক্তিকে সমান সুযোগ দিতে হইবে। যুবক বলিয়া যৌবনশক্তিকে তুচ্ছজ্ঞান করা চলিবে না। আমাদের দেশে শেষ পর্যন্ত তরুণ এবং তরুণীদের উপর সকল প্রকার সমাজ-সংস্কার এবং সরকার-পরিচালনার দায়িত্ব অর্জন করিতে হইবে। সামাজিক, রাজনৈতিক অথবা অর্থনৈতিক— প্রতি ক্ষেত্রে আমাদের সকলের সমানাধিকার থাকিবে, সামান্যতম বৈষম্যও অনুমোদন করা যাইবে না। সকলের জন্য সমান অধিকার ও সমান সুযোগ, সম্পত্তির সমান বণ্টন, বৈষম্যমূলক সকল সামাজিক আইনের পরিহার, জাতিভেদ প্রথা বিলোপ এবং বৈদেশিক শাসন হইতে দেশের মুক্তি-সাধন— এই মৌলিক ভিত্তিভূমির উপর আমাদের বাঞ্ছিত নূতন সমাজ গড়িয়া তুলিতে হইবে।

বন্ধুগণ, তোমাদের মনে হইতে পারে এগুলি আকাশ-কুসুমে পর্যবসিত হইবে। তোমরা কেহ কেহ আমাকে হয়তো বাস্তবসম্পর্কবিহীন দিবা-স্বপ্নে মশগুল বলিয়া ভাবিবে। যদি সেই কারণে আমাকে বর্জন কর তবে আমি অসহায়। এই অপরাধ আমাকে মানিয়া লইতে হইবে এবং প্রকাশ্যেই স্বীকার করিতে হইবে যে বাস্তবিকই আমি দিবাস্বপ্নবিলাসী। আমি কোন্ স্বপ্নে বিভোর একের পর এক তাহা তোমাদের সম্মুখে উদ্ঘাটিত করিয়াছি। আমার নিকট সেগুলি বাস্তবে মণ্ডিত বলিয়া প্রতিভাত হইতেছে। এই স্বপ্নগুলি

হইতেই আমার জীবনের প্রেরণা ও শক্তি আহরণ করিয়া থাকি। এই স্বপ্ন-বর্জিত হইলে আমার জীবন অর্থহীন মাধুর্যহীন হইয়া আমার পক্ষে অসহনীয় হইয়া উঠিত, শুধু তাই নয়, ইহা সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ এবং শূন্যগর্ভ দর্শনীয়রূপে পর্যবসিত হইত। আপন মহিমায় উজ্জ্বল, স্বাধীন ভারতের স্বপ্ন আমার অতি প্রিয় স্বপ্ন। আমি স্বপ্ন দেখি, ভারতবর্ষ আপন গৃহের অধিষ্ঠাত্রী দেবীরূপে সানন্দে ও অবাধ অধিকারে তাহার সন্তান-সন্ততিদের ভাগ্য পরিচালনা করিতেছেন। আমি স্বপ্ন দেখি স্থলে, জলে অন্তরীক্ষে প্রসারিত স্বাধীন ভারতে সেনাবাহিনীসহ একটি সার্বভৌম ভারতীয় কমন-ওয়েলথ্ গড়িয়া উঠিয়াছে। আমি স্বপ্ন দেখি স্বাধীন ভারত বিশ্বের বিভিন্ন দেশে তাহার দূত পাঠাইয়াছে। আমি মহৎ স্বপ্নে বিভোর হইয়া দেখিতে চাই যে আমাদের ধাত্রী ভারতবর্ষ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য জগতের শ্রেষ্ঠ গৌরবে উদ্ভাসিত হইয়া বিস্ময়-বিমুগ্ধ বিশ্বের সম্মুখে উচ্চশির হইয়া দাঁড়াইয়া আছেন। স্বপ্নও বটে, আমার ঐকান্তিক আকাঙ্ক্ষাও বটে যে, আমাদের এই ভারতবর্ষ সত্য ও স্বাধীনতার বাণী বিশ্বের সকল দেশে প্রেরণ করিবে।

আমার প্রিয় ছাত্র-বন্ধুগণ, আজ তোমরা নিছক ছাত্র হইতে পার, কিন্তু আমাদের দেশের ভবিষ্যতের আশা-আকাঙ্ক্ষা এবং কল্যাণ তোমাদের উপর নির্ভর করিতেছে এবং স্বাধীন ভারতের তোমরাই উত্তরাধিকারী। এইজন্যই আমার কিছু আশা, আকাঙ্ক্ষা ও স্বপ্নের শরিক হইবার জন্য হৃদ্যতার সহিত তোমাদের অভিনন্দন জ্ঞাপন করিয়াছ। তোমাদের উপহার দিবার মতো আমার আর কিছু নাই। তোমরা কি ইহা গ্রহণ করিবে না? তোমরা সতেজ এবং তরুণ, হৃদয় নূতন আশায় কানায় কানায় ভরপুর। জীবনের মহত্তর এবং উচ্চতর আদর্শসমূহ তোমাদের সম্মুখে উন্মুক্ত হওয়া উচিত। আদর্শ যতই উচ্চতর হইবে ততই তোমাদের সুপ্তশক্তিসমূহকে আরো উত্তমরূপে জাগ্রত করিয়া তুলিবে। অতএব প্রিয় ছাত্রগণ উত্তিষ্ঠ হও, জাগ্রত হও। আপন বৃত্তিতে নিজেকে জাগ্রত করিয়া তোলাই ছাত্রদের একমাত্র করণীয় নহে। আরো উচ্চতর এবং মহত্তর আদর্শ উদ্‌যাপনের জন্য তাহাকে প্রস্তুত হইতে হইবে। একমাত্র ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্যই তো মানুষ জীবনধারণ করে না। খাদ্য ও বস্ত্রের উদার সরবরাহ হইলেই জীবনের সকল সমস্যার সমাধান হয় না। আমি তোমাদের সম্মুখে ভবিষ্যতের চিত্র তুলিয়া ধরিয়াছি। স্বপ্নের এই চিত্র বাস্তবে পরিণত করিতে হইলে, তোমাদের সকলকেই কোনো-না কোনো কর্মে নিযুক্ত

হইতে হইবে। যত সামান্যই হউক-না কেন, তোমাদের কিছু পরিমাণে আত্ম-ত্যাগ করিতে হইবে। সেক্ষেত্রে আগামী দিনগুলিতে নিপীড়ন ও নির্যাতনের জন্য প্রস্তুত থাকো। আগামীকাল তোমাদের উপর যে কঠিন দাবি আসিবে তাহার মুখোমুখি দাঁড়াইবার জন্য শরীর ও মনে শক্তি সঞ্চয় করো। তোমাদের সকল প্রকার পাঠগ্রহণ এই আদর্শের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া নিয়ন্ত্রিত করিতে হইবে।

জীবনের যে চিত্র আমি এখানে তোমাদের নিকট উন্মোচিত করিয়াছি তাহাতে অন্তহীন দুঃখ নিপীড়ন নিহিত রহিয়াছে। তাহা অস্বীকার করিবার নয়। আমাকে বিশ্বাস করো তাহার ক্ষয়-ক্ষতি পূরণের জন্যে প্রচুর আনন্দও ইহাতে নিহিত রহিয়াছে। তোমাদের জন্য যে পথরেখা অনাবৃত করিয়াছি তাহা নিঃসংশয়ে কঠিন, কণ্টকাকীর্ণ। কিন্তু এই পথরেখাই কি গৌরবের একমাত্র পথ নহে? স্বাধীনতার এই তীর্থ-পরিক্রমায় ঐক্যবদ্ধভাবে হাতে হাত ধরিয়া অভিযানে যোগ দিবার জন্য তোমাদের আমন্ত্রণ জানাইতেছি। মানব-জীবনে এইভাবে আমরা সর্বোত্তম পুরস্কার লাভ করিব। যদি আকাশ ব্যর্থতা ও নিপীড়নে অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়া যায়, দুঃখ ও বেদনাবোধ প্রতিপদে প্রতিহত করে, তথাপি অন্তিম লক্ষ্যে পৌঁছিয়া বিধাতর বিধানে অপার আনন্দ এবং শাশ্বত জীবনের অধিকার আমরা লাভ করিবই।

'বন্দেমাতরম'।

ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস : দক্ষিণপন্থীদের প্রতি আবেদন

ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে আগেই আমার বিবৃতি দেওয়া উচিত ছিল। কিন্তু সব তথ্য জানিয়া লইবার উদ্দেশ্যে ইচ্ছা করিয়াই এতদিন বিবৃতিদান হইতে আমি বিরত থাকিয়াছি। ১ ডিসেম্বর নাগপুরে অনেক ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছে। সেদিন আমি ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলাম না। অমরাবতীতে প্রাদেশিক ছাত্র সম্মেলনে সভাপতিত্ব করার উদ্দেশ্যে ৩০ নভেম্বর আমি নাগপুর ত্যাগ করিয়া যাই। তাই যে-সব ঘটনার ফলে ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস দ্বিধাবিভক্ত হইয়াছিল তাহা আমি অপরের মুখে শুনিয়াছি। অমরাবতী হইতে ফিরিয়া আসিয়া ঐ-সকল ঘটনার কথা ও নতুন কর্মকর্তাদের নাম জানিতে পারি। দক্ষিণপন্থী ও বামপন্থী উভয় পক্ষের সঙ্গেই আমি কথা বলিয়াছি। ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের আভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি সম্পর্কে জওহরলাল নেহরু একটি চমৎকার বিবৃতি দিয়াছেন— উহাতে সব কথা বুঝাইয়া বলা হইয়াছে। আমি বিবৃতিটি পড়িয়াছি। এখন আমি বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা করিতে পারিয়াছি ও এ-বিষয়ে আমার নিজের কর্তব্যও নির্ধারণ করিতে পারিয়াছি।

প্রথমত, আমি খুব জোরের সঙ্গেই বলিব যে ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসে দক্ষিণপন্থী বনাম বামপন্থীদের যে পারস্পরিক বিবাদ চলিতেছে তাহাতে আমি আন্তরিকভাবে দুঃখিত। এ দেশে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে বামপন্থীদের আবির্ভাব ঘটিয়াছে ও সম্প্রতি তাহাদের শক্তি ও গুরুত্ব বাড়িতেছে। ইহা যেমন স্বাভাবিক, তেমনই আমার মতে, ইহা বাঞ্ছনীয়ও। আমি দক্ষিণপন্থীদের নিকট হইতে যাহা শুনিয়াছি তাহাতে আমার ধারণা জন্মিয়াছে যে তাঁহারাও ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসে বামপন্থীদের আবির্ভাবকে স্বাগত জানাইয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ— যাঁহাদের সম্পর্কে আমি গভীর শ্রদ্ধা পোষণ করি— এমনও বলিয়াছেন যে একদিন না একদিন বামপন্থীরা নেতৃত্ব দখল করিবে। তাই দক্ষিণপন্থীরা বামপন্থীদের প্রতি কেন অসূয়া পোষণ করিবেন আমি তাহা বুঝিতে অক্ষম।

ব্যক্তিগত বিবাদ ও বিতর্কের অন্তরালে দক্ষিণপন্থী ও বামপন্থীদের দৃষ্টিভঙ্গীগত পার্থক্য আছে। বামপন্থীদের সুনির্দিষ্ট নীতি ও বিশিষ্ট মানসিকতা আছে। দক্ষিণপন্থীদের বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত আক্রমণ না করিয়া

নিজেদের আদর্শের ভিত্তিতেই বামপন্থীরা জনসমর্থন চাহিবে। বস্তুত, দক্ষিণ-পন্থীদের বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত আক্রমণ না চালাইলেই বামপন্থীদের উদ্দেশ্য বেশি সফল হইবে। ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের কার্যনির্বাহক পরিষদে হুইটলি কমিশন সম্পর্কিত প্রস্তাবের উপর ভোট নিবার আগে আমি এই নৈর্ব্যক্তিক মনোভাব গ্রহণের সপক্ষে বলিয়াছিলাম। ব্যক্তিগত বিসম্বাদ অবাঞ্ছনীয়। তাহা ছাড়াও আমি খুব জোরের সংগে বলিতে চাই যে দক্ষিণপন্থীদের ব্রিটিশ সাম্রাজ্য-বাদের দালাল বলা যেমন ভুল, বামপন্থীদের মস্কোর দালাল বলাও তেমনি ভুল।

আমি জানি যে গিরনি কামগার ইউনিয়ন— যাহার সদস্য সংখ্যা ৪০ হাজার— স্বীকৃতি দান করার পরই এই ভুল বোঝাবুঝি সৃষ্টি হয়। দক্ষিণপন্থীরা মনে করিলেন যে এই স্বীকৃতি দানের ফলে বামপন্থীদের শক্তি অকস্মাৎ বাড়িয়া গিয়াছে ও তাহাতে তাহারা অসুখী হইলেন। এই স্বীকৃতি দানের জন্য বামপন্থীরা দোষভাজন হইতে পারেন না; তাঁহারা নিজ শক্তিতে কার্যনির্বাহী পরিষদে এই প্রস্তাব গ্রহণ করাইতে পারিতেন না। কয়েকজন দক্ষিণপন্থী অথবা কয়েকজন অ-কমিউনিষ্ট বামপন্থীর এমন ভোটদানের ফলেই ঐ প্রস্তাব গৃহীত হয়। ইহা সুস্পষ্ট যে কমিউনিষ্ট বামপন্থীরা অপ্রত্যাশিত স্থান হইতে সমর্থন পাইয়াছেন। গিরনি কামগার ইউনিয়ন সম্পর্কে ভোট গ্রহণের সময় আমি উপস্থিত ছিলাম না। কিন্তু গিরনি কামগার ইউনিয়নের পক্ষে ভোট দিয়াছেন এমন কয়েকজন অ-কমিউনিষ্ট ট্রেড ইউনিয়ন নেতার নিকট আমি শুনিয়াছি যে যেহেতু গিরনি কামগার ইউনিয়ন কর্তৃপক্ষের হাতে তীব্র উৎপীড়ন ভোগ করিতেছে তাই তাঁহারা ইহার সমর্থনে দাঁড়াইয়াছেন। তাঁহারা আরো বলিয়াছেন যে সব ব্যাপারেই তাঁহারা গিরনি কামগার ইউনিয়নের প্রতিনিধিদের সমর্থন করিবেন না। দক্ষিণপন্থীদের মধ্যে কেন হঠাৎ পরাজিতের মনোভাব দেখা দিল ও তাঁহারা কংগ্রেস পরিত্যাগ করিয়া গেলেন তাহা আমি জানি না। পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু তাঁহার বিবৃতিতে ইহা সুস্পষ্টভাবে বলিয়াছেন যে দক্ষিণপন্থীরা তাঁহাদের সমর্থকদের সমবেত করিতে পারিলে তাঁহারা সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করিতে পারেন: এবং যাঁহারা গিরনি কামগার ইউনিয়নের স্বীকৃতির সপক্ষে ভোট দিয়াছেন তাঁহারা সকলেই সব বিষয়ে একমতাবলম্বী নন। যেমন প্যান-প্যাসিফিক ট্রেড ইউনিয়ন সেক্রে-টারিয়েটের যোগদানের বিষয়ে তাঁহারা একমত নন। দক্ষিণপন্থীরা যদি

কংগ্রেস ছাড়িয়া না যাইতেন তাহা হইলে তাঁহারা দেখিতেন যে যাঁহাদের নিশ্চিতভাবে 'লাল' বলিয়া গণ্য করেন তাঁহাদের অনেকেই দক্ষিণপন্থীদের আপত্তিকর বহু বিষয়ে তাঁহাদের অনুকূলেই ভোট দিতেন। প্যান-প্যাসিফিক ট্রেড ইউনিয়নের সেক্রেটারিয়েটের সঙ্গে সংযুক্ত থাকার মতো প্রস্তাবের সপক্ষে দক্ষিণপন্থীরা ভোট দিয়া পরিস্থিতির অবনতি ঘটান, যদিও তাঁহারা নীতিগত-ভাবে এই প্রস্তাবের বিরোধী। এই অবস্থায় দক্ষিণপন্থীদের দায়িত্ব সমধিক। তাঁহারা যদি গণতন্ত্রে বিশ্বাসী হন তবে ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসে বামপন্থীদের প্রাধান্য বৃদ্ধিতে আপত্তি করিতে পারেন না। গিরনি কামগার ইউনিয়নকে স্বীকৃতিদানেও তাঁহাদের রুষ্ট হওয়া উচিৎ নয়। ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের কার্যনির্বাহী পরিষদে তাঁহারা উপস্থিত ছিলেন। কাজেই হুইটলি কমিশন বয়কট সম্পর্কে সেখানে যে প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে সংখ্যাধিক্যের সিদ্ধান্ত হিসাবে তাহাও তাহাদের খোলা মনে মানিয়া লওয়া উচিত।

আপাতত প্যান-প্যাসিফিক ট্রেড ইউনিয়ন সেক্রেটারিয়েটের সঙ্গে ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসকে সংযুক্ত করার প্রশ্নটি চাপা পড়িয়াছে। অতএব বিরোধের আসল বিষয়টি এখন অবর্তমান। সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী লীগের সঙ্গে সংযোগ দক্ষিণপন্থীদের আপত্তির হেতু হইতে পারে না। কেননা গত বৎসর ঝরিয়া অধিবেশনেই এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত লওয়া হইয়াছিল। জেনেভার আন্তর্জাতিক শ্রম সম্মেলনে অংশ গ্রহণের প্রশ্নে আমি নিশ্চিতভাবে বলিতে পারি যে অনেক দক্ষিণপন্থীও এখন উহার বিরুদ্ধে। তাঁহারা নীতিগতভাবে উহার বিরোধী নন কিন্তু তাঁহারা মনে করেন যে সরকারী খরচে ইউরোপে যাতায়াতের সুযোগ শ্রমিক দুনিয়ার কোনো কোনো অংশে অনৈতিক প্রভাব বিস্তার করিবে। ঐ রকম প্রলোভন না থাকাই সকল রকম শ্রমিকের পক্ষে মংগল। যাহাই হউক, যখন জেনেভার আন্তর্জাতিক শ্রম-সম্মেলনে যোগদানের বিরুদ্ধে সংখ্যাধিক্যের ভোটে প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে তখন ঐ যোগদান না করার সিদ্ধান্ত সম্পর্কে এখন আর আপত্তি উঠিতে পারে না। নেহরু রিপোর্ট, বড়লাটের ঘোষণা ও প্যান-এশীয় শ্রম-সম্মেলন সম্পর্কিত প্রস্তাব প্রসংগে একই কথা বলিব।

পরিশেষে, দক্ষিণপন্থী বন্ধু ও সাথীদের নিকট আমি তাঁহাদের বর্তমান মনোভাব পুনর্বিবেচনার জন্য আন্তরিক আবেদন জানাইতেছি। যাহা ঘটিয়াছে তাহার পর মূল সংস্থা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলে

তাঁহারা বিরাট দায়ে দায়ী হইবেন। তাঁহাদের এইরূপ কার্যক্রম অখেলোয়াড়-সুলভ, অগণতান্ত্রিক ও দ্রেশাত্মবোধহীন বলিয়া বিবেচিত হইবে। সংবাদপত্রে যাহাই প্রকাশিত হইয়া থাকুক-না-কেন ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসে কোনো ভাঙন ঘটিবে বলিয়া আমি মনে করি না। বর্তমানে দক্ষিণপন্থীদের সংখ্যাধিক্য সম্পর্কে সন্দেহ থাকিলেও এ-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই যে তাঁহারা একটি শক্তিশালী ও প্রভাবসম্পন্ন অংশ। তাঁহারা যদি বিশ্বাস করেন যে তাঁহাদের নীতি যথার্থ তবে অন্যদের তাঁহারা উহা বুঝান ও পরবর্তী সম্মেলনে তাঁহারাই সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করুন। বামপন্থীরা যখন একটি ক্ষুদ্র সংখ্যালঘু গোষ্ঠী ছিলেন তখন ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের অন্তর্ভুক্ত থাকিয়াই তাঁহারা কাজ করিয়াছেন। দক্ষিণপন্থীরা সংখ্যাগরিষ্ঠতা হারানো মাত্র ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস হইতে বাহির হইয়া যাইবেন কেন তাহা আমি বুঝি না। আমি আবেগবর্জিত হইয়া পরিস্থিতি অনুধাবন করিতে চেষ্টা করিয়াছি ও এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি যে ভাঙনের পক্ষে পর্যাপ্ত যুক্তি নাই। দেওয়ান চমনলাল সম্প্রতি যে বিবৃতি দিয়াছেন তাহা দুর্ভাগ্যজনক : কিন্তু তিনি বলিয়াছেন ও যে পরামর্শ দিয়াছেন তাহা পুনর্বিবেচনা করার আবেদন আমি তাঁহাকে জানাইব। বর্তমান পরিস্থিতিতে ভাঙনের নীতি অনুসরণ করিলে এই সন্দেহ দেখা দিবে যে হুইটলি কমিশন বয়কট করার সিদ্ধান্তই দক্ষিণ-পন্থীদের বিক্ষুব্ধ ও বিদ্বিষ্ট করিয়া তুলিয়াছে। হুইটলি কমিশন বয়কট লইয়া এই ভাঙন দক্ষিণপন্থীদের পক্ষে অপ্রয়োজনীয় ও ইহা তাহাদের স্বার্থের পক্ষে অনুকূল হইবে না।

ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস আমাকে আগামী বৎসরের জন্য সভাপতি নির্বাচিত করিয়াছেন। আমি এই দায়িত্ব বহন করার সিদ্ধান্ত লইয়াছি। যখন ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস গুরুতর সংকটের সম্মুখীন তখন এই দায়িত্ব বহন করিতে অস্বীকার করিলে তাহা আমার পক্ষে কর্তব্যবিমুখতা হইবে। কংগ্রেসের উভয় অংশে আমার বন্ধুবান্ধব আছেন। আমি যতদূর বুঝিয়াছি আমি তাঁহাদের সহানুভূতি, সহযোগিতা ও আস্থা লাভ করিব। মতবিরোধ দূর করিয়া যৌথ কর্মোদ্যোগের জন্য আমি প্রয়োজন বুঝিলে এই মাসেই উভয় পক্ষের এক সম্মেলন ডাকিব।

৬ ডিসেম্বর ১৯২৯

ছাত্র-আন্দোলন : রাজনীতির শিকার

১১ ডিসেম্বর ১৯২৯ সংবাদপত্রে প্রকাশিত বিবৃতি।

গত নভেম্বর মাসের মাঝামাঝি সময়ে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির বার্ষিক সভায় সদস্যদের মধ্যে শ্রীযুক্ত রীরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত-রচিত একটি পুস্তিকা বিতরিত হইয়াছিল। উহাতে আমার বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত আক্রমণ আছে। কিছুকাল আগে ঐ পুস্তিকার প্রতি আমার মনোযোগ আকর্ষণ করা হইয়াছিল। ঐ পুস্তিকায় যে-সব ভুল বর্ণনা আছে সে সম্পর্কে প্রতিবাদ জানাইবার জন্য আমি কয়েকজন ছাত্রবন্ধু কর্তৃক বারবার অনুরুদ্ধ হইয়াছি। দুইটি কারণে এতদিন আমি প্রতিবাদ জানাই নাই! প্রথমত, যদিও রাজনৈতিক বিতর্কে অংশগ্রহণ করিতে আমি অভ্যস্ত তবু যিনি আমার বয়ঃ-কনিষ্ঠ ও যাহাকে আমি ভ্রাতৃবৎ দেখি তাহার সঙ্গে বাদানুবাদে প্রবৃত্ত হওয়া আমার পক্ষে অশোভন বলিয়া আমি মনে করিয়াছি। দ্বিতীয়ত, আমাকে বিবৃতি দিতে হইলে আরো কয়েকজন তরুণ বন্ধুর সমালোচনা করিতে হয় — যাহাদের আমি চিরদিন স্নেহ করিয়াছি. যদিও তাহারা সম্প্রতি স্বার্থ-দুষ্ট ব্যক্তিদের প্ররোচনায় আমার বিরুদ্ধে নানা কথা বলিতেছে ও নানা কাজ করিতেছে। কিন্তু আমি শুনিলাম যে কেহ কেহ আমার নীরবতার ভুল ব্যাখ্যা করিতেছেন এবং ছাত্রসমাজের যে বৃহৎ অংশ আমার সঙ্গে সাধারণত প্রত্যক্ষ যোগাযোগে আসিতে পারেন না তাঁহাদের জন্য আমার কিছু বলা উচিত।

আমি ইহা দেখিয়া কৌতুক বোধ করিতেছি যে কতিপয় ব্যক্তি, যাঁহারা নিজেদের নেতা বলিয়া দাবি করেন, হঠাৎ ছাত্রসম্প্রদায়ের প্রতি স্নেহানুরাগ-সম্পন্ন হইয়া উঠিয়াছেন ও ছাত্র আন্দোলন বিষয়ে অন্যদের কর্তব্য সম্পর্কে উপদেশ দিতে শুরু করিয়াছেন। ১৯২৮ সালের গোড়ার দিকে ছাত্র-আন্দোলন শুরু হওয়ার সময় হইতে আজ পর্যন্ত ছাত্র-আন্দোলনের এই-নূতন বন্ধুরা এই আন্দোলন সম্পর্কে কদাচিৎ কোনো ঔৎসুক্য দেখাইয়াছেন ও ইহার শৈশবাবস্থায় ইহাকে তিলমাত্র সাহায্য করেন নাই। আমি এই প্রদেশের সেই কতিপয় সংখ্যক ব্যক্তির একজন, যাঁহারা ছাত্র-আন্দোলনকে যথাসাধ্য সাহায্য করিয়াছেন। যাঁহারা এখন আমাকে আক্রমণ করিতে ব্যস্ত তাঁহাদেরও এ কথা অজানা নাই। আমি কেন ছাত্র-আন্দোলনকে সাহায্য করিয়াছি ও ভবিষ্যতেও

যথাসাধ্য করিতে থাকিব তাহার কারণ সুস্পষ্ট। প্রথমত, বন্দীজীবন হইতে আমার মুক্তির পর হইতে আমি এদেশে যুব ও ছাত্র আন্দোলনের উপর জোর দিয়া আসিতেছি। কেননা আমার বিশ্বাস, এদেশের ভবিষ্যৎ ছাত্র ও যুবকদের হাতেই রহিয়াছে। দ্বিতীয়ত, আমি যখন ছাত্র ছিলাম তখন আমি ও আমার বয়োজ্যেষ্ঠ ও বয়ঃকনিষ্ঠ কয়েকজন ছাত্র কর্তৃপক্ষের হাতে লাঞ্ছনা সহিয়াছিলাম। সে সময় স্বর্গত বাবু মতিলাল ঘোষ ও দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ ব্যতীত খুব সামান্য সংখ্যক নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিই আমাদের সমর্থন করিতে আগাইয়া আসিয়াছিলেন। ফলত, এ দেশের ছাত্রদের কখনো কখনো যে বিরূপ অবমাননা ও লাঞ্ছনা সহিতে হয় তাহা আমার বিলক্ষণ জানা আছে। তাহা ছাড়া, সরকার ও জনসাধারণের দৃষ্টিতে ইংলন্ডে ছাত্রদের মর্যাদা কত দূর উচ্চ ও এ দেশে উহা কতদূর নিম্ন তাহা আমি দেখিয়াছি ও এই পার্থক্য আমার মনে গভীর রেখাপাত করিয়াছে। আমাদের দেশের ছাত্রদেরই মর্যাদা বাড়াইতে সাহায্য করা আমি আমার কর্তব্য মনে করি। এই সকল কারণে ভারতে ছাত্ররা যে-সব অপমান ও অবজ্ঞা সহ্য করিতে বাধ্য হয় তাহা আমি বুঝি ও উহা দূর করিতে ছাত্ররা যখনই আমার সাহায্য চাহিবে তখনই আমি সাহায্য করিতে আগাইয়া যাইব ইহাই আমার দৃঢ় সংকল্প। আমার জীবনে যদি পূর্বোক্ত অভিজ্ঞতা লাভ না হইত তবে হয়তো অপরাপর নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের মতোই আমিও ছাত্রদের স্বার্থের প্রতি সহানুভূতিশূন্য ও উদাসীন হইতাম।

পরিতাপজনক কৌশল

আমি স্বীকার করিতেছি যে কতিপয় ছাত্র সম্প্রতি যে-সব কৌশল অবলম্বন করিয়াছে তাহাতে আমি মর্মপীড়িত হইয়াছি। তাহারা ভালোভাবে জানে যে ছাত্রদের স্বার্থরক্ষায় অতীতে আমি কী করিয়াছি ও ব্যক্তিগত ভাবে তাহাদের প্রতি কী মনোভাব আমি সর্বদা পোষণ করি। কয়েকবারই ছাত্রদের পাশে দাঁড়াইতে গিয়া আমি কর্তৃপক্ষের ও জাতীয়তা-বিরোধী সংবাদপত্রগুলির কী কোপানলে পড়িয়াছি তাহা বাংলায় সুবিদিত। তাই আমি দেখিয়া কৌতুক বোধ করিতেছি যে এই সংবাদপত্রগুলিই এখন বর্তমান পরিস্থিতির চূড়ান্ত সুযোগ লইতেছে ও তাহারা ছাত্র-আন্দোলনের বন্ধু সাজিয়া আমাকে ছাত্র-আন্দোলনের শত্রুরূপে আক্রমণ করিতেছে। যদি বারংবার ছাত্র আন্দোলনকে

আক্রমণ করার পর ইহারা সত্য সত্যই ছাত্র-আন্দোলনের সামর্থ্য ও সম্ভাবনায় আস্থাশীল হইয়া থাকে তবে আমার পক্ষে তাহা প্রকৃতই সুখের কথা।

যে-সব ছাত্ররা এখন আমাকে আক্রমণ করিতেছে তাহাদের আমি পুরাপুরি দোষ দিই না, কেননা তাহারা জানে না যে তাহারা কী করিতেছে। এখন তাহার স্বার্থদুষ্ট রাজনৈতিক নেতাদের শিকারে পরিণত হইয়াছে, কিন্তু শীঘ্রই তাহারা তাহাদের ভুল বুঝিতে পারিবে। আমি তাহাদের আশ্বস্ত করিতেছি যে তাহাদের প্রতি আমার চিরকাল যে ভালোবাসা ছিল আজও তাহা আছে। তাহাদের প্রতি আমার মনোভাব রাতারাতি পাল্টাইতে পারে না— তাহারা ভুল করিলে বা আমাকে আক্রমণ করিলেও, না।

আড়ালে থাকিয়া স্বার্থদুষ্ট ব্যক্তিরা আমার সম্পর্কে যে-সব সমালোচনা করিতেছে তাহার সবটাই আমার পক্ষে জানা সম্ভব নয়। তাই সব সমালোচনার জবাব দিতে পারিব না। কিন্তু ছাত্রদের অধিকাংশই কোনো রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের সঙ্গে জড়িত নয়। আমি চাই তাহারা আমার অতীত কার্যকলাপ ও ছাত্রসমাজের প্রতি আমি বারংবার যে মনোভাব পোষণ করিয়া আসিয়াছি তাহা দ্বারাই আমাকে বিচার করুক। তাহাতে সন্তুষ্ট না হইলে আমি বলিব যে তাহারা অপেক্ষা করুক ও দেখুক যে আগামী দিনে কে ছাত্রদের যথার্থ বন্ধু বলিয়া প্রতিপন্ন হয়।

আমি যে পুস্তকটির কথা উল্লেখ করিয়াছি তাহাতে কয়েকটি অসত্য কথা আছে যাহার প্রতিবাদ করা দরকার। লেখক লিখিয়াছেন যে একটি ঘরোয়া সভায় আমি বলিয়াছি যে অ্যাসোসিয়েশনের একমাত্র লক্ষ্য হইল রাজনৈতিক। আমি প্রকাশ্য বা ঘরোয়া সভায় এরূপ কথা কখনো বলি নাই। ছাত্র-আন্দোলন সম্পর্কে আমার মতামত জনসাধারণ অবগত আছেন। আমি সব সময়ই বলিয়া আসিয়াছি যে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস যে রাজনৈতিক আন্দোলন পরিচালনা করেন তাহা হইতে স্বতন্ত্রভাবে একটি স্বাধীন আন্দোলন ছাত্রদের গড়িয়া তুলিতে হইবে। ১৯৩০ সালে ছাত্রদের কী কর্তব্য হইবে তাহা আমি হাওড়া রাজনৈতিক সম্মেলনে বলিয়াছি। আমি বলিয়াছিলাম যে পরিস্থিতি যদি ছাত্রদের ত্যাগস্বীকার দাবি করে তবে জাতির আহ্বানে ছাত্রদের লেখাপড়া মুলতুবী রাখিয়া বাহির হইয়া আসিতে হইবে— যেমন অন্যান্য দেশের ছাত্ররা করিয়াছে। কিন্তু এবার অনির্দিষ্টকালের জন্য তাহাদের শিক্ষা মুলতুবী রাখিতে হইবে না— নির্দিষ্ট কালের জন্য, ধরুন এক বছরের জন্য। আমি এই

প্রসঙ্গে বলিব যে ছাত্র অ্যাসোসিয়েশনের লক্ষ্য কিংবা ১৯৩০ সালে ছাত্রদের কর্তব্য সম্পর্কে গত কয়েক মাসের মধ্যে উক্ত পুস্তিকার লেখকের সঙ্গে কোনো আলোচনা হইয়াছে বলিয়া আমার মনে পড়ে না।

পুস্তিকায় বলা হইয়াছে যে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা-পদ্ধতি ও অন্যান্য ছাত্র-কল্যাণ প্রকল্প সম্পর্কে নিখিল বঙ্গ ছাত্র অ্যাসোসিয়েশনের কাজকর্ম আমার সহকর্মীদের উপহাসের বিষয় হইয়াছে। 'আমার সহকর্মী' বলিতে কী বুঝায় তাহা আমার জানা নাই। নিজের কথা শুধু এইটুকু বলিতে পারি যে নিখিল বঙ্গ ছাত্র অ্যাসোসিয়েশনের ঐ-সব কাজকর্ম সম্পর্কে আমি অবহিত নই ও তাই ঐ বিষয়ে আমার মতামত গঠনের কোনো সুযোগই হয় নাই।

ময়মনসিংহ সম্মেলন : প্রকৃত তথ্য

ময়মনসিংহ সম্মেলনের সভাপতিত্ব সম্পর্কে প্রকৃত তথ্য এই যে আমার উদ্যোগে ও আমার ঘরে উভয় পক্ষকে (নিখিল বঙ্গ ছাত্র অ্যাসোসিয়েশন ও সম্মেলনের অভ্যর্থনা সমিতি) ড. আলমকে সভাপতি নির্বাচিত করিতে রাজি করাই। আমার কথার প্রতিবাদ করিতে আমি চ্যালেঞ্জ জানাইতেছি। আমি এ কথাও বলিতে পারি যে আমার হস্তক্ষেপ ভিন্ন ময়মনসিংহ সম্মেলন ড. আলমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হইতে পারিত না এবং ড. আলম সভাপতিত্ব না করিলে ঐ সম্মেলন সাফল্য লাভও করিত না। ড. আলম কলিকাতায় অবস্থানকালে সদয় হইয়া আমার আতিথ্য স্বীকার করিয়াছিলেন। তাঁহার উপস্থিতির সুযোগ লইবার উদ্দেশ্যে আমি ময়মনসিংহের বন্ধুদের কাছে আবেদন জানাইয়াছিলাম যে সম্মেলনকে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য তাঁহারা যেন সর্বতোভাবে প্রযত্ন করেন। পরবর্তী ঘটনা প্রমাণ করিয়াছে যে আমার আবেদন ফলপ্রসূ হইয়াছিল। ছাত্ররা বিবাদের বিষয়টি আগেই আমার গোচরে আনে নাই সেজন্য আমি তাহাদের ভর্ৎসনা করিয়াছি। আগেই জানিতে পারিলে সমগ্র পরিস্থিতি আমি গোড়াতেই সহজ করিয়া দিতে পারিতাম। ১৯২৮ সালে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুকে সভাপতিত্ব করিতে অনুরোধ জানাইয়া এই ব্যবস্থাই আমি করিয়াছিলাম।

কিভাবে গোলযোগের সূত্রপাত ঘটিল

নিখিল বঙ্গ ছাত্র অ্যাসোসিয়েশনের গঠনতন্ত্র অনুসারে জেলা অ্যাসোসিয়েশনগুলি সভাপতির নাম সুপারিশ করিয়া পাঠাইবে ও সেই-সব সুপারিশ পাইবার

পর অভ্যর্থনা কমিটি চেয়ারম্যানদের নামের একটি প্যানেল প্রস্তুত করিবে। অভ্যর্থনা কমিটির যে-কোনো ব্যক্তিকে নির্বাচন করার বৈধ অধিকার আছে। সাধারণ কার্যনির্বাহী পরিষদের কয়েকজন সদস্য তাঁহাদের রাজনৈতিক গোষ্ঠীর একজনকে সভাপতি করিতে চাহিয়াছিলেন ও ড. আলমের নামের আড়াল তাঁহারা এই উদ্দেশ্যে ব্যবহার করিতে চাহিয়াছিলেন। গোলযোগের উৎপত্তি এইখানে। যে ব্যক্তিকে তাঁহারা সভাপতি করিতে চাহিয়াছিলেন ছাত্র-আন্দোলনের সংগে কস্মিনকালেও তাঁহার কোনো সম্পর্ক ছিল না এবং বহুকাল আগেই তাঁহার ছাত্রাবস্থা ঘুচিয়াছে। তাঁহাকে সম্মেলনের সভাপতি করিয়া বসাইবার একমাত্র উদ্দেশ্য হইল দলীয় প্রাধান্য বিস্তার করা— দলীয় ব্যক্তিকে সেইজন্যই এই গুরুত্ব দিবার চেষ্টা। বলা হইতেছে যে ময়মনসিংহ সম্মেলনে আমি সভাপতিত্ব করিতে চাহিয়াছিলাম। আমি ছাত্র আন্দোলনের সংগে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। বাংলায় ও বাংলার বাহিরে আমি প্রায়ই ছাত্র সমাবেশ ও সম্মেলনে সভাপতিত্ব করিয়া থাকি, ভাষণও দিয়া থাকি। এবৎসর অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ আরো বহু সম্মেলনে আমি সভাপতিত্ব করিয়াছি। কাজেই ময়মনসিংহ সম্মেলনে সভাপতিত্ব করার জন্য আমি ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিলাম, আমার ঘোরতর শত্রুরাও এ কথা বিশ্বাস করিবে না। তরুণ লেখক যে এইভাবে সুকৌশলে ও ধূর্ততার সংগে আমাকে হেয় করিতে চাহিয়াছেন আমি তাঁহার দক্ষতার প্রশংসা করি। কিন্তু অল্প বয়সে তাঁহার এই নীতিবোধ বিসর্জনের অপচেষ্টায় আমি দুঃখিত।

নিখিল বঙ্গ ছাত্র অ্যাসোসিয়েশনের কিছু সংখ্যক সদস্য যে অভ্যর্থনা সমিতির সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করিয়াছেন তাহার মূল কারণ তাঁহারা তাঁহাদের নিজের লোককে নির্বাচিত করিতে পারেন নাই। কয়েক মাস যাবৎ তাঁহারা ঐ ব্যক্তির নির্বাচনের জন্য প্রাণপাত পরিশ্রম করিয়াছেন। ড. আলমের নাম প্রস্তাব করার কথা তাঁহারা পরে চিন্তা করিয়াছেন— নিজের পরাজয় ঢাকার উদ্দেশ্যে। নিখিল বঙ্গ ছাত্র অ্যাসোসিয়েশনের কার্যনির্বাহী কমিটির বিরোধীরা ড. আলমের প্রার্থীপদের বিরোধিতা করেন নাই। আমি যখন তাঁহার নাম প্রস্তাব করি অভ্যর্থনা সমিতি সংগে সংগে উহাতে রাজি হন।

গন্ডগোলের মূল হেতু

বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির বিবাদের সংগে যুক্ত ছাত্রদের মধ্যে যে-সব বিরোধ দেখা দিয়াছে তাহার মূল হেতু এখন খুলিয়া বলা আমি উচিত মনে

করি ছাত্রদের মধ্যে বিরোধ দেখা দিবার মূল হেতু বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটিতে বিভিন্ন গোষ্ঠীগুলির মধ্যে যে বিরোধ বর্তমান তাহাতেই নিহিত আছে। আমার কারামুক্তির সময় হইতেই আমি সর্বদা এইকথা বলিতেছি যে কর্মক্ষেত্রে আমাদের এক হইতে হইবে ও কংগ্রেসের বিভিন্ন দল-উপদলের মধ্যে ঐক্য সাধন করা দরকার। আমার আবেদনে কিছুদিন ভাল ফল পাওয়া গিয়াছিল। একটি সাধারণ কর্মসূচীকে রূপায়িত করিতে গিয়া অধিকাংশ গোষ্ঠীই হাতে হাত মিলাইয়াছিল। সম্প্রতি তাহাদের মধ্যে বিরোধ দেখা দিয়াছে। একটি গোষ্ঠী অন্যান্য গোষ্ঠী হইতে আলাদা হইয়া গিয়াছে। যেহেতু সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ আমার নীতি, কৌশল ও কর্মসূচী সমর্থন করিয়াছে অতএব বিরোধী দলটি বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সংখ্যাগরিষ্ঠ বিরোধী গোষ্ঠীর সঙ্গে যোগ দিয়াছে। তাহারা আমার বিরুদ্ধে একযোগে কাজ করিতেছে। নিখিল বঙ্গ ছাত্র সমিতির যে সদস্যরা আমার বিরুদ্ধে প্রচার চালাইতেছে তাহারা বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির এই বিশেষ গোষ্ঠীটির প্রভাবাধীন। এই গোষ্ঠীটি ঐ ছাত্রদের নিজ স্বার্থের বিরুদ্ধে ও ছাত্র সম্প্রদায়ের স্বার্থের বিরুদ্ধে ব্যবহার করিতেছে। অতীতে যেমন আমি ঐ ছাত্রদের ভালোবাসিতাম, আজও তেমনই ভালোবাসি। তাই উহাদের জন্য আমি দুঃখ অনুভব করি। যদি বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটিতে বিরোধ দূর হয় তবে পরদিনই ছাত্রদের মধ্যেকার বিসম্বাদ দূর হইয়া যাইবে। আমি আগেই বলিয়াছি, এই রাজনৈতিক গোষ্ঠীটি তাহাদের গোষ্ঠীভুক্ত একজনকে ছাত্র সম্মেলনের সভাপতি করিতে চাহিয়াছিল। নিখিল বঙ্গ ছাত্র অ্যাসোসিয়েশনের কয়েকজন সদস্য ঐ ব্যক্তির প্রার্থীপদ যাহাতে গৃহীত হয় সেজন্য ষড়যন্ত্র করিয়াছিল। সেই উদ্দেশ্যে বিভিন্ন জেলায় তাহারা তাহাদের লোক পাঠাইয়াছিল ও নিখিল বঙ্গ ছাত্র অ্যাসোসিয়েশনের এই বিশেষ গোষ্ঠীর প্রাধান্য মানিয়া লইতে যাহারা প্রস্তুত একমাত্র সেই-সব সমিতিকেই তাহারা স্বীকৃতি দিয়াছিল। যে-সব সমিতি স্বাধীন মতামত পোষণ করে তাহাদের তাহারা স্বীকৃতি দেয় নাই। সব ছাত্রদের উপর নিজেদের অভিমত চাপাইয়া দিবার উদ্দেশ্যে এই রাজনীতিক গোষ্ঠীর লোকেরা স্বৈরাচারী পদ্ধতির আশ্রয় পর্যন্ত লইয়াছে। এই কৌশলের অনিবার্য প্রতিক্রিয়া জাগিয়াছে ও বাংলার ছাত্রদের মধ্যে ব্যাপক বিক্ষোভ দেখা দিয়াছে। ময়মনসিংহ সম্মেলনে এই বিক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়াছিল। ড. আলম আমাকে বলিয়াছেন যে তিনি সহানুভূতিশীল

আচরণ ও কৌশলের সাহায্যে সম্মেলনে অনাস্থা প্রস্তাব উত্থাপন এড়াইয়া গিয়াছেন। কিন্তু অধিকাংশ প্রতিনিধিই যে নিখিল বঙ্গ ছাত্র অ্যাসোসিয়েশনের কার্যনির্বাহী কমিটির প্রতি আস্থা হারাইয়াছে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। তাই তিনি কার্যনির্বাহক কমিটিকে প্রতিনিধিদের সঙ্গে একটা বোঝাপড়ায় আসিতে পরামর্শ দেন। আমি যতদূর জানি তাঁহারা সে পরামর্শ এখন পর্যন্ত গ্রহণ করেন নাই।

আসল খেলোয়াড়রা

আমি বিস্মিত হইলাম যে আমি নাকি ছাত্রদের বা উহাদের কোনো অংশকে ঘুঁটির মতো ব্যবহার করিতেছি। ছাত্র-আন্দোলনের শৈশবাবস্থা হইতে আমি উহার পরিচর্যা করিয়াছি। কেন করিয়াছি তাহার কারণ আগেই বলিয়াছি। একটি বিশেষ রাজনৈতিক গোষ্ঠীর দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া এখন যাহারা আমার বিরোধিতা করিতেছে তাহারা অন্যদের চেয়েও ভালো জানে যে ছাত্র-স্বার্থ রক্ষায় আমি কী করিয়াছি। ছাত্র আন্দোলনের জন্মকাল হইতে উহার জন্য যাহারা কিছুই করে নাই তাহারাই এখন নিজ স্বার্থে আমার বিরোধিতা করিতেছে ও সেই উদ্দেশ্যে ছাত্রদের ঘুঁটির মতো ব্যবহার করিতে পারিতেছে।

আরো একটি প্রমাণ

নিখিল বঙ্গ ছাত্র অ্যাসোসিয়েশনের কার্যনির্বাহী কমিটি ও অভ্যর্থনা কমিটির মধ্যে যে বিবাদ ঘটিয়াছে সে সম্পর্কে আমি বলিতে চাই যে যে-সব চিঠির আদানপ্রদান হইয়াছে তাহা ও নিখিল বঙ্গ ও ছাত্র অ্যাসোসিয়েশনের গঠনতন্ত্র আমি পড়িয়াছি ও আমি দেখিয়াছি যে গঠনতন্ত্রের দিক হইতে অভ্যর্থনা কমিটিই ঠিক করিয়াছেন। পুস্তিকায় শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রমোহন ঘোষ ও শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার সম্পর্কে কিছু নিন্দাসূচক মন্তব্য আছে। তাঁহাদের উক্তি বলিয়া এমন কয়েকটি কথাও আছে যাহা তাঁহারা বলিতে পারেন না। এই দুজন ভদ্রলোক ইহার যথোচিত প্রতিকার করার সামর্থ্য রাখেন। আমি শুধু এইটুকু বলিব যে নিখিল বঙ্গ ছাত্র অ্যাসোসিয়েশনের সেক্রেটারি যে পুস্তিকা প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে আমার সঙ্গে এই দুই ভদ্রলোককেও যে জড়িত করা হইয়াছে তাহাতে ইহা আরো প্রমাণিত হইল যে এই পুস্তিকা সম্পূর্ণই রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত ও এই অপকৌশলের পশ্চাতে রাজনৈতিক ব্যক্তিরাই প্রচ্ছন্ন আছেন।

আমি আরো বলিতে চাই যে ড. আলম কলিকাতায় আমাকে বলিয়াছেন যে ময়মনসিংহে নিখিলবঙ্গ ছাত্র অ্যাসোসিয়েশনের কার্যনির্বাহী কমিটির কয়েকজন সদস্য তাঁহাকে জানায়াছিলেন সকলে চাহিলে তাঁহারা পদত্যাগ করিতে প্রস্তুত আছেন। ঐ কথাগুলি গোপন হইয়াছিল বলিয়া ড. আলম সংবাদপত্রে উহা প্রকাশিত হইতে দেন নাই। পুস্তিকাটির লেখক বলিয়াছেন উহা সত্য নয়। তাই আমি ঘটনাটি জনসাধারণের গোচরে আনিলাম।

পরিশেষে, বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটিতে বর্তমানে আমার বিরোধিতা করিতেছে এমন একটি রাজনৈতিক গোষ্ঠীর ক্রীড়নকে পরিণত হইয়াছে নিখিল বঙ্গ ছাত্র অ্যাসোসিয়েশনের কার্যনির্বাহী কমিটির কয়েকজন সদস্য— এজন্য আমি গভীর দুঃখ প্রকাশ করিতেছি। আমি নিজের জন্য চিন্তিত নহি, এবং আমার যে ক্ষতি তাহারা করিতে পারে তাহাও খুব সামান্য। কিন্তু ছাত্র-আন্দোলনের বিরাট ক্ষতি তাহারা করিতে পারে ও করিতেছে। শ্রীবীরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত কর্তৃক প্রকাশিত পুস্তিকা বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সদস্যরা শিয়ালদহ স্টেশনে আসিয়া পেঁাছিলে তাঁহাদের মধ্যে বিতরণ করা হইয়াছে। প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির বার্ষিক নির্বাচনের সময় কংগ্রেস কার্যালয়ের সম্মুখে উহা বিতরণ করা হইয়াছে। এই পুস্তিকা হাজারে হাজারে ছাপা হইয়াছে ও বহু স্থানে বিতরিত হইয়াছে। কাহারা পিছন হইতে কলকাঠি নাড়িতেছে ও শক্তি জোগাইতেছে তাহা অজানা থাকার কথা নয়। সারা পুস্তিকায় কোনো ছাত্রের উপর বা ছাত্রগোষ্ঠীর উপর আক্রমণ নাই। আমার মতো কয়েকজন কর্মীর বিরুদ্ধেই আক্রমণ পরিচালনা করা হইয়াছে। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এই ধরনের কলাকৌশলে আমি অভ্যস্ত। কিন্তু ইহা দেখিয়া আমি দুঃখ পাইতেছি যে আমাদের কয়েকজন প্রতিশ্রুতিসম্পন্ন ছাত্র, প্রাক্তন ছাত্র, বহিরাগত ও রাজনীতিবিদদের প্ররোচনায় আত্মবিস্মৃত হইয়াছে ও আমাদের অন্দোলনকেও এতদূর ভুলিয়া গিয়াছে যে তাহারা এই-সব অপকৌশলের সাহায্য লইয়াছে। কিন্তু আমি আশা করি যে তাহারা শীঘ্রই তাহাদের ভুল বুঝিতে পারিবে ও কে তাদের বন্ধু ও কে তাদের শত্রু তাহাও তাহারা বুঝিতে দিবে। ইতিমধ্যে আমি আশ্বাস দিতেছি ছাত্রদের প্রতি ও তাহাদের আন্দোলনের প্রতি আমার মনোভাব ও প্রীতি পূর্বের মতোই থাকিবে।

মেদিনীপুর জেলা যুব-সম্মেলন

সভাপতির অভিভাষণ।

অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি মহাশয় ও সমেবত বন্ধুবর্গ :

আজকাল দেশ-বিদেশে এত প্রতিষ্ঠান ও আন্দোলন থাকিতে—যুব-আন্দোলন আবার আরম্ভ হইল কেন ? ইহার কারণ নির্দেশ করা খুবই সহজ। সর্বদেশে তরুণ সমাজ অসন্তুষ্ট ও অসহিষ্ণু হইয়া পড়িয়াছে। তাহারা যাহা চায়, তাহা পায় না, যে আদর্শকে ভালবাসে সে আদর্শকে বাস্তবের মধ্যে মূর্ত করিয়া তুলিতে পারে না। তাই তাহারা বিদ্রোহী হইয়া উঠিয়াছে এবং যে মানুষ বা যে ব্যবস্থা তাহাদের কর্মপথে অন্তরায় হইয়াছে তাহা আপসারিত করিবার জন্য তাহারা বদ্ধপরিকর হইয়াছে। পারিপার্শ্বিক অবস্থার চাপ, বয়োজ্যেষ্ঠ নেতৃবৃন্দের উপর বীতশ্রদ্ধ ভাব এবং নূতন কর্মের ও নূতন সৃষ্টির আকাঙ্ক্ষা —এই-সব কারণের সংমিশ্রণের ফলে যুব-আন্দোলনের উৎপত্তি।

যুব-সমিতি গঠনের কাজে আজকাল অনেকে নিরত। কিন্তু যুব-আন্দোলনের আদর্শ, উদ্দেশ্য ও কর্ম পদ্ধতি বোঝেন কয় জন ? যুব-সমিতিকে সেবা-সমিতির নামান্তর বলিয়া মনে করিলে চলিবে না। কংগ্রেস কমিটির নাম ও label বদলাইয়া যুব-সমিতি গঠন করিলেও চলিবে না। প্রকৃতপক্ষে যুব-আন্দোলন একটা স্বতন্ত্র আন্দোলন, ইহার বিশিষ্ট আদর্শ আছে—বিশিষ্ট কর্মপ্রণালী আছে। সুতরাং কংগ্রেসের মধ্যে নেতৃত্ব বা মোড়লী করিবার আশা না থাকার দরুন যাঁহারা অনন্যোপায় হইয়া যুব-আন্দোলনের পান্ডা সাজেন তাঁহাদের দ্বারা যুব-আন্দোলনের কোনো সেবা বা উন্নতি হইবে না এবং চোখের সম্মুখে নূতন একটা আন্দোলন গড়িয়া উঠিতেছে দেখিয়া যাঁহারা স্থির থাকিতে না পারার দরুন যুব আন্দোলনের পৃষ্ঠপোষক হইয়া পড়েন তাঁহাদের দ্বারাও কোনো বড়ো কাজ হইবে না।

আমি আপনাদের জিজ্ঞাসা করিতেছি— বাংলার একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলুন, এই আন্দোলনে কয়জন খাঁটি কর্মী আছেন— যাঁহারা প্রকৃতপক্ষে যুব-আন্দোলনের উদ্দেশ্য ও সার্থকতা উপলব্ধি করিয়া নিষ্কামভাবে এই কর্মে যোগদান করিয়াছেন, অবশ্য যুব-আন্দোলনের উদ্দেশ্য, অর্থ ও কর্মপ্রণালী যতই প্রচারিত হইতেছে ততই আন্দোলন ক্রমশ প্রসার লাভ করিতেছে। কিন্তু গোড়ায় একটি কথা বার বার

বলা প্রয়োজন— সেটা এই যে, যুব-সমিতি কংগ্রেসের বা সেবা-সমিতির শাখা বিশেষ নয়। যুব-আন্দোলনের উদ্দেশ্য— নূতনের সন্ধান আনা, নূতন সমাজ, নূতন রাষ্ট্র, নূতন অর্থনীতির প্রবর্তন করা, মানুষের মধ্যে নূতন ও উচ্চতর আদর্শ উদ্বুদ্ধ করিয়া তাহাকে মনুষ্যত্বের উচ্চতর সোপানে লইয়া যাওয়া, এই আকাঙ্ক্ষা যাহার মধ্যে জাগিয়াছে, সে ব্যক্তি নূতনের জন্য, মহত্তর জীবনের জন্য পাগল হইয়াছে— সে বর্তমান ও বাস্তবের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী না হইয়া পারে না! এই অশান্ত, অসন্তুষ্ট, বিদ্রোহী মন যাহার আছে— যে ব্যক্তি বর্তমান ও বাস্তবের অবগুণ্ঠন সরাইয়া মহত্তর জীবনের দৃষ্টি ও আস্বাদ পাইয়াছে— সেই ব্যক্তি যুব-আন্দোলনের অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিয়াছে এবং যুব সমিতি গঠনের অধিকারী হইয়াছে।

পূর্বেকার সব আন্দোলনের দ্বারা যদি আমাদের অন্তরের ক্ষুধা মিটিত এবং জাতীয় জীবনের সব প্রয়োজন সিদ্ধ হইত তাহা হইলে যুব-আন্দোলন কোনদিন জন্মিত না। কিন্তু দৃষ্টির সংকীর্ণতার দরুনই হউক অথবা প্রচেষ্টার অভাবের দরুনই হউক— তাহা হয় নাই। তরুণ প্রাণ বহুদিন যাবৎ অপরের স্কন্ধে আপনার ও আপনার জাতির সব দায়িত্ব চাপাইয়া যখন শেষে দেখিল যে তাহার আকাঙ্ক্ষা ও উদ্দেশ্য পূর্ণ হইল না, তখন সে আর নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিল না। সব ক্লৈব্য ত্যাগ করিয়া সে তখন স্থির করিল, একবার সমস্ত দায়িত্ব নিজের হাতে লইয়া দেখিবে ফলাফল কি হয়। এ বিশ্বাস তাহার হইল যে কল্যাণকৃৎ কখনো দুর্গতি-প্রাপ্ত হইবে না ("নহি কল্যাণকৃৎ কশ্চিৎ দুর্গতিং তাত গচ্ছতি") এবং সঙ্গে সঙ্গে এ বিশ্বাসও তাহার হইল যে ভরসা করিয়া এই ভার গ্রহণ করিলে পরিণাম কখনো অশুভ হইবে না; জয়লাভ করিলে সে বসুন্ধরা ভোগ করিতে পারিবে এবং জয়ের পূর্বে মৃত্যুমুখে পতিত হইলে স্বর্গরাজ্যে স্থান পাইবে— (হতো বা প্রাপ্স্যসি স্বর্গং, জিত্বা বা ভোক্ষ্যসে মহীং)।

যুব-আন্দোলন— যুবক-যুবতিদেরই আন্দোলন। এ আন্দোলন মানুষকে, মনুষ্য সমাজকে ও মনুষ্য-সভ্যতাকে জরা ও বার্ধক্যের হাত থেকে রক্ষা করতে চায় এবং মানুষের তারুণ্যকে অমর করিয়া রাখিতে চায়, প্রকৃতির বুকে যেরূপ ever green পাদপ পাওয়া যায়— মানুষের প্রাণকে তদ্রূপ নিত্য সবুজ করিয়া রাখা একান্ত প্রয়োজন। তাই যুগে যুগে তরুণের প্রাণ বার্ধক্যের বিরুদ্ধে, অনুকরণেচ্ছার বিরুদ্ধে, ভীরুতার বিরুদ্ধে, ক্লৈব্যের

বিরুদ্ধে, বিজ্ঞতার বিরুদ্ধে এবং সর্বপ্রকার বন্ধনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়া আসিতেছে। আমি গত বৎসর নাগপুরে তরুণদের একটি সভায় বলিয়াছিলাম —The voice of Krishna was the voice of immortal youth— গীতার মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের যে বাণীর ঝঙ্কার আমরা শুনিতে পাই, তাহা অমর তরুণাত্মারই বাণী।

যাঁহারা মনে করেন যে যুব-আন্দোলন সাগরপারের সামগ্রী— তার জন্ম ১৮৯৭ খ্রীস্টাব্দে এবং তাহার জন্মদাতা জার্মানীর Karl Fisher (কার্ল ফিসার) তাঁহারা কিছুই জানেন না এই পৃথিবীতে জরা বার্ধক্য যতদিন আছে— যুব-আন্দোলনও ততোদিন আছে। তবে বর্তমান যুগে যুব-আন্দোলন বিরাট ও বিশিষ্ট রূপ ধারণ করিয়াছে এ বিষয় কোনো সন্দেহ নাই। যুব-আন্দোলনের পশ্চাতে একটা মহান্ আদর্শবাদ আছে। এ আদর্শবাদ নূতন হইলেও বহু পুরাতন, যুগে যুগে এই আদর্শবাদই মানুষের প্রাণকে সঞ্জীবনী সুধায় ভরপুর করিয়া নূতন জীবন ও নূতন শক্তি দান করিয়াছে। অতি প্রাচীনকালে আমাদের এই দেশে মানুষ "ধর্ম-রাজ্যের" স্বপ্ন দেখিত। মানুষ তখন চাহিত— তখনকার সমাজ ও রাষ্ট্র ভাঙিয়া "ধর্ম-রাজ্য" স্থাপন করিতে। প্রাচীনকালে গ্রীস দেশে সেখানকার ঋষিরা স্বপ্ন দেখিত— Ideal Republic-এর— আদর্শ প্রজাতন্ত্রমূলক সমাজের। তার পর যুগের পর যুগ কত দেশে কত মনীষী কত utopia-র স্বপ্ন দেখিয়া আসিতেছেন। কেহ লিখিতেছেন। New age-এর (নূতন যুগের) কথা— কেহ লিখিতেছেন great society-র (বৃহত্তর সমাজের) কথা— কেহ লিখিতেছেন millenium-এর কথা—কেহ লিখিতেছেন অনাগত সত্য যুগের কথা— কেহ লিখিতেছেন Socialist State (সাম্যবাদ মূলক রাষ্ট্রের) কথা। নানা দিক দিয়া, নানা ভাবে, নানা রূপের মধ্যে তরুণের প্রাণ যুগের পর যুগ একটা আদর্শ সমাজের এবং আদর্শ মানুষের স্বপ্ন দেখিয়া আসিতেছে এবং সাধ্যমত তাহা বর্ণনা করিবার চেষ্টা করিয়া আসিতেছে। বর্তমান যুগে কী প্রাচ্যে, কী পাশ্চাত্যে আমরা Superman (অতিমানুষ)-এর কথা শুনিতে পাই। Superman-এর মতবাদ অনেকে উপহাস করিয়া উড়াইয়া দেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইহা উপহাস করিবার বিষয় নয়— কারণ ইহার মধ্যে একটা মহান্ সত্য নিহিত আছে। Superman-এর যে রূপ জার্মান দার্শনিক Nietzsche (নীট্‌শে) দিয়াছেন অথবা ভারতের কোনো মনীষী দিবার চেষ্টা করিয়াছেন, তাহা

আপনারা অখন্ড সত্য বলিয়া গ্রহণ না করিতে পারেন— কিন্তু তাঁদের উদ্দেশ্য যে সাধু ও মানবজাতির পক্ষে কল্যাণকর এবং তাঁদের প্রচেষ্টা যে প্রশংসনীয় সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই। যে জাতির শ্রেষ্ঠ মনীষীগণ Superman-এর (অতিমানুষের) স্বপ্ন দেখেন না— সে জাতির কি idealism বা আদর্শবাদ আছে? এবং যে জাতির আদর্শবাদ নাই সে জাতি কি জীবন্ত— সে জাতি কি মহত্তর সৃষ্টির অধিকারী হইতে পারে?

মানুষের সমস্ত প্রাণ যদি উদ্বুদ্ধ করিতে হয়— তাহার প্রত্যেক রক্তবিন্দুর মধ্যে যদি মৃতসঞ্জীবনী সুধা ঢালিতে হয়— তাহার অন্তর্নিহিত সমস্ত শক্তির স্ফুরণ যদি ঘটাইতে হয়— তাহা হইলে একটা মহত্তর আদর্শের আস্বাদ তাহাকে দেওয়া চাই। খ্রীস্টীয়দের 'বাইবেল'-এ (Bible) একটা কথা আছে— man does not live by bread alone— শুধু উদর পূরণের দ্বারা মানুষ বাঁচিয়া থাকিতে পারে না। তার জীবন ধারণের জন্য অন্যরকম খোরাকেরও প্রয়োজন আছে। মানুষ জানিতে চায় তার জীবনের উদ্দেশ্য কি— সে কেন বাঁচিয়া আছে— তার জীবন ধারণের সার্থকতা কিসে। এ প্রশ্নের উত্তর সে যদি ঠিকমতো না পায়, তাহা হইলে সে জীবনে শান্তি পায় না— নিজের জীবন ব্যর্থ বলিয়া মনে করে— এবং অন্তরের সব শক্তির উন্মেষ সাধন করিতে পারে না। কিন্তু এ আদর্শের অনুভূতি ও আস্বাদ জোর করিয়া কেহ দিতে পারে না। অনুভূতি ও আস্বাদ যে নিজে পায় নাই— সে অপরকে তাহা কি করিয়া দিবে?

স্বপ্ন অনেকের ছিল, অনেকের আছে, আমাদের স্বর্গীয় নেতা দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয়েরও একটা স্বপ্ন ছিল। সে স্বপ্ন ছিল তাঁর শক্তির উৎস, তাঁর আনন্দের নির্ঝর। তার স্বপ্নের উত্তরাধীকারী আজ আমরা হইয়াছি। আমাদেরও তাই একটা স্বপ্ন আছে এবং এই স্বপ্নের প্রেরণায় আমরা উঠি, বসি, চলাফেরা করি, লিখি ও বলি এবং কাজকর্ম করি। সে স্বপ্ন বা আদর্শ কি? আমি চাই একটা নূতন সর্বাংগীণ মুক্তি-সম্পন্ন সমাজ এবং তার উপরে একটা স্বাধীন রাষ্ট্র। যে সমাজে ব্যক্তি সর্বভাবে মুক্ত হইবে এবং সমাজের চাপে আর নিষ্পিষ্ট হইবে না— যে সমাজে জাতিভেদের অচলায়তন আর থাকিবে না— যে সমাজে নারী মুক্ত হইয়া, সমাজে এবং রাষ্ট্রে, পুরুষের সহিত সমান অধিকার ভোগ করিবে এবং সমাজ ও রাষ্ট্রের সেবায় সমানভাবে আত্মনিয়োগ করিবে, যে সমাজে অর্থের বৈষম্য থাকিবে

না, যে সমাজে প্রত্যেক ব্যক্তি শিক্ষা ও উন্নতির সমান সুযোগ পাইবে, যে সমাজে শ্রমের এবং কর্মের পূর্ণ মর্যাদা থাকিবে এবং অলসের ও নিষ্কর্মার কোনো স্থান থাকিবে না, যে রাষ্ট্র বিজাতীয় প্রভাব ও প্রতিপত্তির হস্ত হইতে সর্ব-বিষয়ে মুক্ত হইবে, যে রাষ্ট্র আমাদের স্বদেশী সমাজের যন্ত্রস্বরূপ হইয়া কাজ করিবে, সর্বোপরি যে সমাজ ও রাষ্ট্র ভারতবাসীর অভাব মোচন করিয়া বা ভারতবাসীর আদর্শ সার্থক করিয়া ক্ষান্ত হইবে না পরন্তু বিশ্বমানবের নিকট আদর্শ সমাজ, আদর্শ রাষ্ট্র বলিয়া প্রতিভাত হইবে— আমি সেই সমাজ ও সেই রাষ্ট্রের স্বপ্ন দেখিয়া থাকি। এই স্বপ্ন আমার নিকট একটা অখণ্ড সত্য, এই সত্য প্রতিষ্ঠার জন্য সব-কিছু করা যায়, সর্বপ্রকার ত্যাগ বরণ করা যায়, সর্বপ্রকারের কষ্ট স্বীকার করা যায় এবং এই স্বপ্ন সার্থক করিবার চেষ্টায় প্রাণ বিসর্জন করিলেও "সে মরণ স্বরগ-সমান!" হে তরুণ ভ্রাতৃমন্ডলী। তোমাদের দিবার মতো সম্পদ আমার কিছু নাই— আছে শুধু এই স্বপ্ন— যাহা আমাকে অসীম শক্তি ও অপার আনন্দ দিয়াছে যাহা আমার ক্ষুদ্র জীবনকেও সার্থক করিয়াছে। এই স্বপ্ন আমি তোমাদের উপহার স্বরূপ দিতেছি— গ্রহণ করো।

আজকাল রাজনীতি ক্ষেত্রে আমরা অনেক প্রকার গালাগালি ও অনেক মজার সমালোচনা শুনিতে পাই— তার মধ্যে একটা অভিযোগ এই যে, আমরা নাকি "যুব-সমিতি" গুলি Capture বা দখল করিবার চেষ্টা করিতেছি। এ অভিযোগ শুনিয়া হাসি পায়। যাহারা কোনো প্রতিষ্ঠান বা আন্দোলনের সহায়তা করিয়া আসিতেছে— তাহাদের বিরুদ্ধে Capture-এর অভিযোগ হাস্যাস্পদ বটে; আমি জিজ্ঞাসা করি, যুব-সমিতির ও ছাত্র-আন্দোলনের এই নবাগত বন্ধুরা এতদিন কোথায় ছিলেন? যাহারা গোড়া থেকে এই আন্দোলনের সৃষ্টির ও ক্রমোন্নতির সহায়তা করিয়া আসিতেছে তাহারা আজ Capture অপরাধে অপরাধী এবং যাঁহারা প্রারম্ভ হইতে আজ পর্যন্ত কিছুই করেন নাই এবং এখন Capture করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছেন —তাঁহারা হইলেন নিঃস্বার্থ হিতৈষী। গত কলিকাতা-কংগ্রেসের পর বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্র সমিতির সাধারণ সভায় আমি এই বৎসরের জন্য আমাদের কর্মপদ্ধতি নির্দেশ করি। সেই বিস্তৃত কর্মপদ্ধতির মধ্যে একটি বিষয়ের উল্লেখ ছিল— "To assist students' movement, youth movement and Physical Culture movement"— অর্থাৎ ছাত্র-আন্দোলন, যুব-

আন্দোলন ও ব্যায়াম সমিতি প্রতিষ্ঠার সহায়তা করিতে হইবে। এই কর্মপদ্ধতি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল এবং প্রত্যেক জেলা কংগ্রেস কমিটির নিকট পাঠানো হইয়াছিল। তখন কোনো আপত্তি শোনা যায় নাই; বরং সকলে অনুমোদন করিয়াছিলেন। কিন্তু বৎসর শেষে যখন দলের স্বার্থপোষণের জন্য অপরকে গালাগালি দেওয়ার দরকার হইল তখন এই অভিযোগ আবিষ্কৃত হইল যে, আমরা নাকি যুব-সমিতিগুলি অধিকার করিবার চেষ্টা করিতেছি। আমাদের যদি কোন অপরাধ হইয়া থাকে তাহা এই যে আমরা যুব-আন্দোলনের যথেষ্ট সেবা ও সহায়তা করি নাই। ফলে নিখিল বঙ্গীয় যুব-সমিতি নামে যে প্রতিষ্ঠান আছে তাহা দিন দিন নিষ্কর্মা হইয়া পড়িতেছে। বাংলার অনেক জেলায় স্থানীয় যুব-সমিতিগুলি যথেষ্ট কাজ করিতেছে কিন্তু যাঁহারা এই যুব-আন্দোলনের কর্ণধার বলিয়া পরিচয় দেন— সেই নিখিল বঙ্গীয় যুব-সমিতির কর্তৃপক্ষেরা— এ কয় বৎসর যাবৎ কি করিলেন? বঙ্গীয় যুব-সমিতির মধ্যে কেহ কেহ অবশ্য যুব-আন্দোলনের বিষয়ে অনেক প্রোপাগান্ডা (propaganda) করিয়াছেন তাঁহাদের সম্বন্ধে আমার এই উক্তি প্রযোজ্য নয়। কিন্তু অধিকাংশ সভ্যেরা কি করিয়াছেন? কোনো কোনো প্রদেশে সেখানকার প্রাদেশিক যুব-সমিতি খুব কর্মঠ ও উৎসাহ-পরায়ণ, কিন্তু বাংলা দেশে যুব-আন্দোলনের উৎসের মুখে যেন বাধা পড়িয়াছে। এবং এই উৎস হইতে মধ্যে মধ্যে যে বাণী নির্গত হয় তাহা অনেক সময়ে কংগ্রেসের অথবা প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির বিরোধী।

আর-এক প্রকার সমালোচনা আমরা মধ্যে মধ্যে শুনিতে পাই—আমরা নাকি অপরকে কাজ করিবার সুযোগ দেই না। কাজ করিবার সুযোগ কে কাকে দেয়? আমাদেরই কাজ করিবার সুযোগ কে দিয়াছে? যার ভিতরে মনুষ্যত্ব আছে সে নিজ শক্তিবলে কর্মক্ষেত্র সৃষ্টি করিয়া লয়, মাতা যেরূপ শিশুর মুখে অন্ন তুলিয়া দেন— তার জন্য সেরূপ কর্মক্ষেত্র সৃষ্টি করিয়া দিতে হয় না, কিন্তু আমরা সময়ে সময়ে রাজনৈতিক নাবালক সাজিয়া বলি যে আমরা কাজ করিবার সুযোগ পাইতেছি না— আমাদের কর্মক্ষেত্র কেহ আমাদের জন্য সৃষ্টি করিয়া দিতেছে না। যে ব্যক্তি ক্রমাগত অভিযোগ করে যে, যে কাজ করিবার সুযোগ অথবা কর্মক্ষেত্র পাইতেছে না— সে কস্মিনকালেও তাহা পাইবে না। এবং যে ব্যক্তি অভিযোগ না করিয়া কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয় তাহার সুযোগ বা কর্মক্ষেত্রের অভাব কোনো দিন হয় না। বাংলার

যুব-আন্দোলনের কর্ণধাররূপে যাঁহারা কয়েক বৎসর যাবৎ দায়িত্ব লইয়া বসিয়া আছেন তাঁহারাও কি কাজ করিবার সুযোগ-সুবিধা ও কর্মক্ষেত্র পান নাই ?

বাংলাদেশে আজকাল তুমুল বাদ-বিসম্বাদ, ভোটাভুটি ও ঝগড়া-বিবাদ লাগিয়া আছে। বর্তমানে দলাদলি যে নিতান্ত শোচনীয় ব্যাপার সে-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই। এই দলাদলিতে সর্বাপেক্ষা অধিক ভুগিয়া থাকি আমরা, কারণ সহানুভূতির জন্য, অর্থসাহায্যের জন্য আমাদের বার বার জনসাধারণের দ্বারস্থ হইতে হয়। ঝগড়া-বিবাদ থাকিলে আমরা সাধারণের নিকট সহানুভূতি পাই না— অর্থ তো পাই-ই না— পাই শুধু অনাবিল গালাগালি। বিবাদ-কলহ যতদিন চলিবে ততদিন আমাদের কাজকর্ম একরকম বন্ধ থাকিবে— এ কথা অত্যুক্তি নয়। সুতরাং বিবাদ মিটাইবার আগ্রহ আমাদেরই সর্বাপেক্ষা অধিক অথচ কেহ কেহ মনে করিয়া থাকেন যে, আমাদের পেশা বুঝি ঝগড়া করা এবং আমরা কাজকর্ম ফেলিয়া ইচ্ছা করিয়াই কোমর বাঁধিয়াছি ঝগড়া করিতে। কংগ্রেস একটা রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান— কংগ্রেস Social Service League-এর নামান্তর নহে। রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে বিভিন্ন লোকের বিভিন্ন আদর্শ থাকা স্বাভাবিক এবং কর্ম-পদ্ধতি সম্বন্ধে বিভিন্ন লোকের বিভিন্ন মত থাকা অনিবার্য। মত ভিন্ন হইলে অনেক সময়ে পথও ভিন্ন হইয়া থাকে। অথএব ব্যক্তিগত ঝগড়া না থাকিলেও রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে মতানৈক্য প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায়। মতানৈক্য অনেক সময়ে মতান্তরে পরিণত হয় এবং তার উপরে যখন ব্যক্তির আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভের আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠে তখন দলাদলি আরো তিক্ত ও বিষাক্ত হইয়া উঠে। কিন্তু দলাদলির জন্য প্রকৃতপক্ষে কে দায়ী তাহা অনুসন্ধান না করিয়া কাহারো উপর দোষারোপ করা ঠিক নয়— ঝগড়া-বিবাদের জন্য যাহারা দায়ী তাহাদের অনর্থক বদনামের ভাগী করা কাহারো উচিত নয়। রাজনীতিক্ষেত্রে মধ্যে মধ্যে মতান্তর হওয়া অনিবার্য এবং মতান্তরের জন্য ঝগড়া-বিবাদ হওয়াও বোধ হয় তদ্রূপ অনিবার্য। কিন্তু মতান্তর যেন মনান্তরে পরিণত না হয় এবং ব্যক্তিগত নিন্দা ও গালাগালি যেন আমাদের অস্ত্র না হইয়া দাঁড়ায়— এ বিষয়ে আমাদের সাবধান ও সতর্ক হওয়া উচিত। তারপর গণ-আন্দোলনে যোগদান করিয়া আমরা যদি এতটা অসহিষ্ণু হইয়া পড়ি যে, ভোটের পরিবর্তে লাঠি ও ছোরা ব্যবহার করিতে আমরা দ্বিধা বোধ না করি, তাহা হইলে দেশের দুর্দিন আসিয়াছে বুঝিতে হইবে। সেদিন কলিকাতার ছাত্র-

সভার কাজ পণ্ড করিবার জন্য বাহিরের লোক ও কতিপয় ছাত্র যেরূপভাবে আসিয়া আক্রমণ করিয়াছিল তাহা অতীব নিন্দনীয়। তার পূর্বে চট্টগ্রামে যে শোচনীয় দুর্ঘটনা ঘটিয়াছিল, যার ফলে শ্রীমান সুখেন্দুবিকাশ দত্তের মতো চতুর্দশ বৎসর বয়সের আদর্শ বালককে নিজের জীবন দিতে হইল— তাহা ভুলিবার নয়। সব গুণ্ডামির জন্য দায়ী কে, তাহা আমাদের অনুসন্ধান করা উচিত এবং অনুসন্ধানের পর আমাদের কর্তব্য স্থির করা উচিত। যেখানে এরূপ পাশবিকতা দেখা দিয়াছে সেখানে একতার নামে এ-সব ব্যাপারে ধামা-চাপা দিয়া কোনো লাভ নাই। সমাজের দেহে গলদ যাহা আছে তাহা শোধন করিয়া ফেলা উচিত।

দুঃখের বিষয় এই যে, যাহারা ভণ্ডামির আশ্রয় দেয়— তাহারা একবার ভাবিয়াও দেখে না যে ইহার পরিণাম কি। প্রথমত যে ব্যক্তি অপরের উপর গুণ্ডামি করে তাহার জানা উচিত যে একদিন তাহার উপরও গুণ্ডামি হইতে পারে— কারণ সব মানুষ সমানভাবে সহিষ্ণু ও অহিংস নয়। তারপর আর-একটি কথা তাহার মনে রাখা উচিত যে, দেশের জনসাধারণ এ গুণ্ডামি অনুমোদন করে না— সুতরাং গুণ্ডামি যে করিবে সে যে সাধারণের সহানুভূতি ও ভালোবাসা হারাইবে সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই। সুতরাং গুণ্ডামি আপনাকেই ব্যর্থ করিয়া থাকে।

আজকাল যুব-আন্দোলন সম্বন্ধে যত লেখা বাহির হয়, তার মধ্যে কখনো কখনো কেবল সমালোচনাই পাওয়া যায়— পথ-নির্দেশ পাওয়া যায় না। ফলে, তরুণ-সমাজের মধ্যে একটা অর্থহীন বিশৃঙ্খলার ভাব যেন আসিয়া পড়িয়াছে। মানুষ সবের মধ্যে কেবল দোষ এবং খুঁত দেখিতে শেখে কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে স্পষ্ট কোনো নির্দেশ পায় না— কোন্ পথে চলা উচিত বা কাহাকে অনুসরণ করা উচিত। এ সম্পর্কে "দাদা কোম্পানির" খুব উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। আমি নিজে এই কোম্পানির সভ্য কোনোদিন ছিলাম না— আশা করি কোনোদিন হইব না। কিন্তু আমি বুঝিতে পারি না যে, যাঁহারা একদিন এই কোম্পানির সভ্য ছিলেন তাঁহারা কেন দাদা কোম্পানির প্রতি এত বিরূপ হইয়াছেন? তাঁহাদিগের নিজেদের কোম্পানি এখন liquidation-এ গিয়াছে অথবা তাঁহারা এখন promotion লাভ করিয়া ঠাকুর-দাদার সোপানে উঠিয়াছেন— ইহাই কি তাঁহাদিগের অসন্তোষের কারণ? তাহা যদি হয় তবে তার জন্য দায়ী কে?

আজ বাংলার রাষ্ট্রীয় রংগমঞ্চে দলাদলি ভীষণ আকারে দেখা দিয়াছে— ইহাতে দুঃখিত ও ব্যথিত হয় নাই এমন মানুষ বাংলা দেশে নাই। যদি কেহ থাকে তবে সে মনুষ্যপদবাচ্য নয়। কিন্তু ইহাতে হতাশ হইবার কোনো কারণ আমি দেখি না। আমার গত ৮/৯ বৎসরের অভিজ্ঞতার ভিতরে তৃতীয়বার এই দলাদলি বাংলার রাষ্ট্রীয় গগন কালিমাময় করিয়া তুলিয়াছে। প্রথম ধাক্কা স্বয়ং দেশবন্ধুকে খাইতে হইয়াছিল, আমরা অবশ্য তাঁর পার্শ্বে ও পশ্চাতে ছিলাম এবং ধাক্কা খানিকটা আমাদের গায়েও লাগিয়াছিল। তখন শুনিতে হইয়াছিল দেশবন্ধুর শত্রুপক্ষের মুখে যে মাসিক ৫০,০০০ টাকার আয় পরিত্যাগ করিয়া তিনি পাঁচ হাজারি মন্ত্রীত্ব গ্রহণের জন্য ব্যাকুল হইয়াছেন ; এবং এ কথাও শুনিতে হইয়াছিল যে চিত্তরঞ্জনকে তাঁহারা দেশছাড়া করিবেন। দেশছাড়া তাঁহারা চিত্তরঞ্জনকে করিয়াছেন এ বিষয়ে সন্দেহ নাই— কারণ দেশবাসীর সংগে লড়াই করিতে করিতে তাঁহাকে অকালে ইহলোক ত্যাগ করিতে হইল।

দ্বিতীয় ধাক্কা খাইয়াছিলেন শ্রীযুক্ত সেনগুপ্ত প্রমুখ নেতৃবৃন্দ, তখন আমরা অনেকে কর্মক্ষেত্র হইতে বহু দূরে ; কিন্তু প্রাচীরের অন্তরালে থাকিয়াও আমরা যে ফলাফলের জন্য অত্যন্ত ঔৎসুক্যের সহিত প্রতীক্ষা করিতেছিলাম এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই। ফলে কংগ্রেসের জয় হইল। এবার তৃতীয় ধাক্কা আমরা নিজেরা সামনাসামনিভাবে খাইতেছি। ফল যে পূর্ববৎ হইবে এবং কংগ্রেসের জয় যে অবশ্যম্ভাবী সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই। তবে দুঃখের বিষয় এই যে বিরোধের মীমাংসা হইবার পূর্বে অনেক গালাগালি আমাদের খাইতে হইবে এবং অনেক কষ্ট আমাদের সহিতে হইবে। এই বিরোধের মূলে যদি তৃতীয় পক্ষের কোনো হাত না থাকিত তাহা হইলে আমরা এত কষ্ট পাইতাম না।

আর একটা তীব্র সমালোচনা মধ্যে মধ্যে আমাদের কানে আসে সেটা এই যে কংগ্রেস এতদিন ঝগড়া-বিবাদ ছাড়া আর কি করিল ? আমাদের দেশে যাঁহারা Political minded— যাঁহাদের রাষ্ট্রীয় বুদ্ধি আছে তাঁহারা কিন্তু এ প্রশ্ন করেন না। এই প্রশ্ন করেন তাঁহারা, যাঁহারা মনে করেন যে দেশসেবার একমাত্র উদ্দেশ্য— হাসপাতাল নির্মাণ করা, সেবাসমিতি গঠন করা এবং বন্যা ও দুর্ভিক্ষের সময়ে আর্তের সেবা করা। তাঁহারা হাসপাতালের জন্য লক্ষ টাকা দিবেন কিন্তু স্বরাজ-লাভের জন্য ১৩০ টাকাও সানন্দে দিবেন না, তাঁহারা বলেন অমুক হাসপাতালে এতগুলি bill হইয়াছে, এতগুলি রোগীর চিকিৎসার আয়োজন

হইয়াছে— কিন্তু তোমাদের কংগ্রেসে কি হইয়াছে ? এরূপ প্রশ্ন শুনিলে কাহার ক্ষমতা আছে যে তাঁহাদের বুঝাইতে পারে যে কংগ্রেসের উদ্দেশ্য সকল রোগের মূলে যে মহাব্যাধি (—যে মহাব্যাধির বিরাম না হইলে অন্য কোনো রোগ নির্মূল হইতে পারে না) সেই মহাব্যাধি নিরাকরণ করা। আমাদের যাবতীয় দুর্দশার মূল কারণ যদি আমাদের পরাধীনতা হয় তাহা হইলে যে পর্যন্ত আমরা পরাধীনতা ঘুচাইতে না পারিব সে পর্যন্ত আমরা সুস্থ সবল ও কর্মঠ জাতি হইতে পারিব না। অতএব আমাদের সমস্ত শক্তি, উদ্যম, সম্পদ ও সময় স্বাধীনতা লাভের জন্য ব্যয় করা উচিত। কিন্তু মুস্কিল এই যে আমরা শক্তি ও সম্পদ ব্যয় করিয়া স্বাধীনতার পথে কতদূর অগ্রসর হইতে পারিলাম তাহা বাহিরের কোনো মাপকাঠির দ্বারা অপরকে বুঝানো যায় না। হাসপাতালের বা বিদ্যালয়ের উন্নতি যত সহজে অপরকে বুঝানো যায় রাষ্ট্রীয় উন্নতি সেভাবে বুঝানো যায় না— তাই বিষয়াত্মিকা বুদ্ধি যাঁহাদের তাঁহারা মনে করেন যে আমরা স্বরাজ বা কেবল অর্থের অপব্যয় করি এবং বাজে কাজে সময় নষ্ট করিয়া থাকি। জাতির মধ্যে আদর্শবাদ আরো সঞ্চারিত না হইলে রাষ্ট্রীয় বুদ্ধি জাগিবে না— রাষ্ট্রীয় বুদ্ধি না জাগিলে রাষ্ট্রীয় সংগ্রামের অর্থ তাঁহারা বুঝিবেন না— রাষ্ট্রীয় সংগ্রামের সার্থকতা উপলব্ধি না করিলে তাঁহারা রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার জন্য অকাতরে অর্থ ও সময় ব্যয় করিবেন না এবং সর্বস্বপণ করিতে না পারিলে জাতি কোনোদিন স্বাধীন হইবে না।

তাই আমার অনেক সময়ে মনে হয় যে আমাদের দেশবাসীর মধ্যে Political-mentality-র বড়োই অভাব। এই রাষ্ট্রীয় মনোভাব বা রাষ্ট্রীয় বুদ্ধি সৃষ্টি করাই কংগ্রেসের অন্যতম উদ্দেশ্য। জাতির মধ্যে সূক্ষ্ম বুদ্ধি ও সূক্ষ্ম বিচারশক্তি না আসিলে সে জাতি বহু বৎসর ধরিয়া সর্বস্ব বিলাইয়া আদর্শের পশ্চাতে ছুটিবার সামর্থ্য পাইবে না। এই বুদ্ধি ও বিচারশক্তি আনিবার একমাত্র উপায় সেই জাতির মধ্যে আদর্শবাদ সঞ্চার করা। এই আদর্শবাদ সঞ্চার করিতে হইলে জাতির প্রাণের অন্তরতম প্রদেশে আঘাত করিতে হইবে— তাহার স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা— আত্মবিকাশের স্পৃহা জাগাইতে হইবে। স্বাধীনতার জন্য তীব্র ক্ষুধা জাগিলে সে জাতি তখন জীবনপণ করিয়া সাধনায় প্রবৃত্ত হইবে। আপ্রাণ চেষ্টা ও ব্যাকুল সাধনা জাতি যেদিন করিতে পারিবে জাতি সেদিন মুক্ত হইবে।

জনৈক বন্ধু আমাকে সেদিন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন— গত দুই বৎসর

ধরিয়া আপনি কী করিলেন ? এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হইলে সঙ্গে সঙ্গে একটু তুলনা করা দরকার। গত দুই বৎসরের আগে দুই বৎসর কী হইয়াছিল এবং গত দুই বৎসর অন্য প্রদেশেই বা কী কাজ হইয়াছে এ কথা জিজ্ঞাসা করিলে বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। গত দুই বৎসর বেশি কাজ হউক আর নাই হউক— এ-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই যে রাষ্ট্রীয় সংগ্রাম বলিতে যাহা বুঝা যায় তাহা যদি ভারতবর্ষে কোথাও থাকে, তবে আছে বাংলায় ও পাঞ্জাবে এবং গত দুই বৎসর বাংলাদেশে জোরের সঙ্গে একটা আন্দোলন যদি না চলিয়া থাকিত তাহা হইলে আজ বাঙালী সরকার বাহাদুরের ক্রুদ্ধ দৃষ্টি আকর্ষণ করিত না।

তথাপি এ কথা কৈফিয়ৎ স্বরূপ আমি বলিতে চাই না যে আমরা গত দুই বৎসর যাহা করিয়াছি তার জন্য আমরা খুব প্রশংসার্হ। আমি শুধু বলিতে চাই এ কথা যে, যে অবস্থায় আমরা কংগ্রেস হাতে লইয়াছিলাম তাহা বিবেচনা করিলে এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থার কথা চিন্তা করিলে স্বীকার করিতেই হইবে যে আমরা সাধ্যমত কর্তব্য সম্পাদন করিবার প্রয়াস পাইয়াছি। ১৯২৭ সালে বাংলার কংগ্রেস কমিটির অবস্থা ভাঙা হাটের মতো। একে সমগ্র ভারতবর্ষে তখন অসহযোগের স্রোতে ভাঁটা পড়িয়াছে— তার উপর আবার বাংলাদেশে ভীষণ দলাদলির ফলে তখন কংগ্রেস কমিটি নির্জীব হইয়া পড়িয়াছে! দেশের বহু কর্মী তখনো কারারুদ্ধ। এই দুর্যোগের মধ্যে আমরা অবতীর্ণ হই এবং ধীরে ধীরে আবার উৎসাহ ও শক্তি সঞ্চার করিবার চেষ্টা করি।

আমরা আজ যে যুগসন্ধিস্থলে দাঁড়াইয়া আছি সে অবস্থায় যদি কাহাকেও কংগ্রেসের দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হয় তবে একদিকে তাহাকে জোড়া-তালি দিয়া পুরানো প্রোগ্রাম অনুসারে কাজ করিয়া যাইতে হইবে এবং সঙ্গে সঙ্গে ভবিষ্যতের জন্য এবং ভবিষ্যতের সংগ্রামের জন্য দেশকে প্রস্তুত করিয়া যাইতে হইবে। যে প্রোগ্রাম লইয়া ১৯২১ সাল হইতে এতদিন আমরা চলিয়াছি সে প্রোগ্রাম যথেষ্ট নয়। আমরা এ কয় বৎসরের চেষ্টার ফলে যত লোকের অন্তরে জাতীয় ভাব উদ্বুদ্ধ করিতে পারিয়াছি তাহাও যথেষ্ট নয়। এখন আমরা নূতন প্রোগ্রাম চাই— কিন্তু নূতন প্রোগ্রাম চাইবার পূর্বে, চাই নূতন মানুষ— যাহারা নূতন প্রোগ্রাম গ্রহণ করিতে পারিবে। এখনকার কংগ্রেসে আপনি নূতন প্রোগ্রাম লইয়া যান— কেহ তাহা গ্রহণ করিবে না— গ্রহণ করিলেও তাহা কাজে লাগাইবে না— অর্থাৎ অন্তরের সহিত করিবে না।

আমাদের মধ্যে একদল লোক আছেন যাঁহারা "প্রোগ্রাম প্রোগ্রাম" বলিয়া কেবল চীৎকার করেন কিন্তু তাঁহারা তলাইয়া দেখেন না যে নূতন মানুষ তৈয়ারি না করিলে সে প্রোগ্রামের মূল্য বুঝিবে কে ?

১৯২৭ সাল হইতে এই প্রশ্নই আমার চিত্তকে আলোড়িত করিয়া আসিতেছে। নূতন প্রোগ্রাম আমারও একটা আছে— কিন্তু সে প্রোগ্রাম দিবার সময় এখনো আসে নাই— আসিবে সেইদিন, যেদিন নূতন মানুষ প্রস্তুত হইবে যাঁহারা সেই কর্মপদ্ধতি গ্রহণ করিয়া তাহা কাজে লাগাইতে পারিবে। নূতন মানুষ তৈয়ারি করিবার চেষ্টায় আমি এখন নিরত। তাই গত দুই বৎসর ধরিয়া আমি ছাত্র-আন্দোলন, যুব-আন্দোলন, নারী-আন্দোলন প্রভৃতি বিষয়ে এত জোর দিয়া বলিয়া আসিতেছি। এই-সব আন্দোলনের সাহায্যে যদি নূতন মানুষ— পুরুষ ও নারী— প্রস্তুত হয় তখন নূতন প্রোগ্রাম দিলে তার সার্থকতা হইবে।

এই-সব আন্দোলনের ভিতর প্রাণসঞ্চার করিতে হইলে নূতন আদর্শ চাই। আমার আদর্শ— দেশের ও সমাজের সর্বাংগীণ মুক্তি। সর্বাংগীণ মুক্তির বাণী গ্রামে গ্রামে, নগরে নগরে, ঘরে ঘরে প্রচার করিতে হইবে। স্বাধীনতার প্রকৃত স্বরূপ কী তাহা সকলকে বুঝাইয়া দিতে হইবে। স্বাধীনতার অখন্ড রূপ আমরা অনেকেই আজও উপলব্ধি করি নাই। অখন্ড রূপের উপলব্ধি জাতির মানসক্ষেত্রে একদিনে আসে না। বহু দিনের সাধনার ফলে, এবং বহু বৎসর খন্ড খন্ড রূপ দেখিবার পর আমরা আজ অখন্ড রূপের উপলব্ধি পাইতেছি। সমগ্র জাতিকে এখন বুঝাইয়া দিতে হইবে স্বাধীনতার অখন্ড রূপ কী। যেদিন জাতি এই অখন্ড রূপের উপলব্ধি লাভ করিবে সেইদিন জাতি পূর্ণভাবে মুক্ত হইবার জন্য পাগল হইয়া উঠিবে।

পূর্ণ সাম্যবাদের উপর নূতন সমাজকে গড়িয়া তুলিতে হইবে। জাতি-ভেদের অচলায়তনকে একেবারে ধূলিসাৎ করিতে হইবে। নারীকে সর্বভাবে মুক্ত করিয়া সমাজে ও রাষ্ট্রে পুরুষের সহিত সমান অধিকার ও দায়িত্ব প্রদান করিতে হইবে ; অর্থের বৈষম্য দূর করিতে হইবে এবং বর্ণ-ধর্ম-নির্বিশেষে প্রত্যেকে (কী পুরুষ কী নারী) যাহাতে শিক্ষার ও উন্নতির সমান সুযোগ ও সুবিধা পায় তার ব্যবস্থা করিতে হইবে। সমাজতন্ত্রমূলক সম্পূর্ণ স্বাধীন রাষ্ট্র যাহাতে স্থায়ী ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয় তার জন্য সচেষ্ট হইতে হইবে।

এক কথায় আমরা চাই ভারতের পূর্ণ ও সর্বাংগীণ স্বাধীনতা। এই নূতন স্বাধীন ভারতে যাহারা জন্মিবে তাহারা মানুষ বলিয়া জগৎসভায় পরিগণিত হইবে। ভারত আবার জ্ঞানে, বিজ্ঞানে— ধর্মে-কর্মে— শিক্ষায়-দীক্ষায় শৌর্যে বীর্যে জগৎবরেণ্য হইবে।

আমাদের কর্তব্য কী তাহা আর খুলিয়া বলার প্রয়োজন নাই। আমরাই তো নূতন ভারতের স্রষ্টা। অতএব এসো আমরা সকলে মিলিয়া এই পবিত্র মাতৃযজ্ঞে যোগদান করি। মা আমাদের আবার রাজরাজেশ্বরীর সিংহাসনে অধিষ্ঠিতা হইবেন। এখনকার কাঙালিনী মাকে ষড়ৈশ্বর্যসম্পন্না দশভুজারূপে দেখিয়া আমাদের চক্ষু সার্থক হইবে। অতএব এসো ভ্রাতৃবৃন্দ, আর মুহূর্ত-মাত্র বিলম্ব না করিয়া সর্বস্ব বলিদানের জন্য মাতৃচরণে সমবেত হই।

২৭ ডিসেম্বর ১৯২৯

লাহোর-কংগ্রেসে ভাষণ : প্রতি-সরকার গঠনের প্রস্তাব

৩১ ডিসেম্বর ১৯২৯ লাহোরে অনুষ্ঠিত জাতীয় কংগ্রেস অধিবেশনে প্রদত্ত ভাষণ।

সভাপতি মহাশয়, ভদ্রমহিলা ও ভদ্রমহোদয়গণ,

আমার নামে যে সংশোধনীটি রহিয়াছে, এখন আমি তাহা উত্থাপন করিতেছি। সংশোধনীটি এইরূপ :

"কলিকাতায় অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের বিগত অধিবেশনে গৃহীত প্রস্তাব অনুসারে এই কংগ্রেস এখন ঘোষণা করিতেছে যে কংগ্রেসের আদর্শে বর্ণিত "স্বরাজ" বলিতে পূর্ণ স্বাধীনতা বুঝায়। ব্রিটিশ সম্পর্ক সম্পূর্ণ ছিন্ন করাই ইহার তাৎপর্য।

"ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ও তাহার ভারতীয় অনুচরদের অপসারিত করিয়া পূর্ণ স্বাধীনতা লাভের উদ্দেশ্যে বর্তমান কংগ্রেস একদিকে ভারতে একটি প্রতি-সরকার প্রতিষ্ঠার জন্য স্বাধীনতার পক্ষে অবিরাম প্রচার চালাইবার ও অপর দিকে, যখন যেখানে সম্ভব কর বন্ধ ও সাধারণ ধর্মঘটসহ আইন-অমান্য আন্দোলন পরিচালনার প্রস্তাব গ্রহণ করিতেছে।

"উপরোক্ত দ্বিমুখী কর্মসূচী কার্যকর করার উদ্দেশ্যে এই কংগ্রেস অবিলম্বে ভারতের যুবক, শ্রমিক, কৃষক ও অন্যান্য নিপীড়িত শ্রেণীগুলিকে সংগঠিত করিতে দেশের জনসাধারণের প্রতি আহ্বান জানাইতেছে।

"উপরোক্ত কর্মসূচীর রূপায়ণে প্রযত্নশীল হইতে ও নূতন কংগ্রেস আদর্শের অনুসরণক্রমে, এই কংগ্রেস কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইনসভাসমূহ, সরকার কর্তৃক নিযুক্ত কমিটিগুলি, বন্দর ট্রাস্টের মতো সংস্থাগুলি সহ যাবতীয় আঞ্চলিক সংস্থা, ও আদালতগুলি সম্পূর্ণ বয়কটের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করিতেছে ও কংগ্রেসসেবীদের ভবিষ্যৎ নির্বাচনসমূহ বয়কট করিতে, আইনসভা, কমিটি ও আঞ্চলিক সংস্থাসমূহের বর্তমান সদস্যদের নিজ নিজ পদত্যাগ করিতে এবং আইনজীবীদের আইন ব্যবসায় ত্যাগ করিতে আহ্বান জানাইতেছে।

"এই কংগ্রেস নিখিল ভারতে কংগ্রেস কমিটিকে দেশের সমকালীন পরিস্থিতি অনুযায়ী উপরোক্ত কর্মসূচী রূপায়িত করিতে ও ঐ রূপায়ণের পথে উদ্ভূত অবস্থা আয়ত্তে আনিতে ক্ষমতা অর্পণ করিতেছে।"

মহাশয়, আপনার ও এই সভার সমক্ষে আমার প্রস্তাব সমর্থন করার আগে

মহাত্মা গান্ধীকে আমার হার্দ্য ও আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি কারণ তিনি এমন একটি প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছেন যাহাতে বলা হইয়াছে অতঃপর স্বরাজ বলিতে বুঝাইবে পূর্ণ স্বাধীনতা। তথাপি আমি তাঁহার প্রস্তাবের সংশোধনী আনিয়াছি এই কারণে যে আমার মতে তাঁহার প্রস্তাবে যে কর্মসূচী সংযোজিত আছে পূর্ণ স্বাধীনতার লক্ষ্যের অভিমুখে তাহা আমাদের লইয়া যাইবে না। আমি আমার সাধ্যমতো আপনাদের সমক্ষে একটি পূর্ণ সুসমঞ্জস সংশোধনী রাখিয়াছি যাহা বর্তমান ভাবধারার পরিপোষক এবং যাহা অন্ততপক্ষে দেশের তরুণ সমাজের সমর্থন লাভ করিবে। ইহাতে আমার কোনো সন্দেহ নাই। মহাশয় আপনি লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন যে আমার সংশোধনী প্রস্তাবটি কয়েকটি অনুচ্ছেদে বিভক্ত। স্বরাজ বলিতে আমরা এখন হইতে কী বুঝিব তাহা প্রথম অনুচ্ছেদে বলা হইয়াছে এবং পূর্ণ স্বাধীনতা বলিতে ব্রিটিশ সম্পর্কের পূর্ণচ্ছেদ বুঝাইবে, তাহা পুনরাবৃত্তি করিয়াছি। ২য় অনুচ্ছেদে আমি একটি কর্মসূচীর কথা বলিয়াছি, দেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে যাহা সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য মনে হয়। যে কর্মসূচী আপনারা এখনই শুনিয়াছেন তাহার একটি গঠনাত্মক দিক আছে অপর একটি ধ্বংসাত্মক দিক বলা যাইতে পারে। ঐ কর্মসূচীর প্রথমাংশে সংশোধনীতে বলা হইয়াছে : "ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ও তাহার ভারতীয় অনুচরদের অপসারিত করিয়া পূর্ণ স্বাধীনতা লাভের উদ্দেশ্যে এই কংগ্রেস একদিকে ভারতে একটি প্রতি-সরকার প্রতিষ্ঠার জন্য স্বাধীনতার অনুকূলে অবিরাম প্রচার অভিযান চালাইবার…প্রস্তাব গ্রহণ করিতেছে।" মহাশয়, এই দেশের মানুষের খাঁটি শুভেচ্ছার উপর ভিত্তি করিয়া একটি প্রতি-সরকার প্রতিষ্ঠা ব্যতিরেকে স্বাধীনতার লক্ষ্যে আমরা কিভাবে পৌঁছিব তাহা আমি বুঝিতেছি না। আমি কেবলমাত্র আপনাদের আয়ার্ল্যান্ডের সিন্‌ফিন্‌ আন্দোলনের দৃষ্টান্ত স্মরণ করাইয়া দিব। তাহারা তখন আমাদের দেশের মতোই এক পরিস্থিতির সম্মুখীন হইয়াছিলেন তখন তাহারা স্বদেশেই এক প্রতি-সরকার স্থাপন করিয়া সংগ্রাম শুরু করিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু আমি প্রতি-সরকারের কথা বলিতেছি এই উদ্দেশ্যে নয় যে, আমার দেশবাসী আয়ার-ল্যান্ডের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করুক। আয়ার্ল্যান্ডে সিন্‌ফিন্‌ মতাবলম্বীরা প্রতি-সরকার গঠনের দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন—কিন্তু তাহা ছাড়াও যুক্তিবিচারে প্রতিপন্ন হইবে যে এ দেশে প্রতি-সরকার স্থাপনই বর্তমান পরিস্থিতিতে

স্বাধীনতার লক্ষ্যে পৌঁছাইবার একমাত্র উপায়— আমার কর্মসূচীর সেজন্য ইহাই গঠনাত্মক অংশ। অপর অংশে আছে সংগ্রামের কর্মসূচী। সেই অংশে আমি বলিয়াছি : "অপর দিকে যখন যেখানে সম্ভব কর বন্ধ ও সাধারণ ধর্মঘট সহ আইন অমান্য আন্দোলন পরিচালনার প্রস্তাব কংগ্রেস গ্রহণ করিতেছে।" মহাশয়, আমার বিনীত অভিমত এই যে যত দিন অহিংসার প্রতি নিষ্ঠা কংগ্রেসের আদর্শ থাকিবে ততদিন আইন অমান্যই হইবে একমাত্র পন্থা। আইন অমান্য বলিতে শুধুমাত্র কর বন্ধই নয়, সাধারণ ধর্মঘটও বুঝাইবে। পরের অনুচ্ছেদে দ্বিমুখী কর্মসূচীকে রূপায়িত করিতে হইলে অবিলম্বে কী করিতে হইবে তাহা উল্লেখ করিয়া আমি বলিয়াছি : "উপরোক্ত দ্বিমুখী কর্মসূচী কার্যকর করার উদ্দেশ্যে এই কংগ্রেস অবিলম্বে ভারতের যুবক, শ্রমিক, কৃষক ও অন্যান্য নিপীড়িত শ্রেণীগুলিকে সংগঠিত করিতে দেশের জনসাধারণকে আহ্বান জানাইতেছে।" মহাশয়, আমি বিশ্বাস করি যে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসকে জাতীয় ও সংগ্রামশীল প্রতিষ্ঠানে পরিণত করিতে হইলে দেশের সেই-সব বৃহৎ অংশকে ইহার আওতায় আনিতে হইবে যাহারা এখনো দূরে সরিয়া রহিয়াছেন। আমাদের কিষাণ, শ্রমিক, শিল্প-শ্রমিক ও যুবকরা আছে, যাহাদের অনেকেই মধ্যবিত্ত শ্রেণীভুক্ত, আবার অনেকেই সমাজের দরিদ্র শ্রেণীভুক্ত। ইহারা ও ভারতের জনসাধারণের নিপীড়িত আরো অনেক অংশ আমাদের সঙ্গে একত্রে মিলিয়া স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগ দেয় নাই, এই সত্য আমরা আজ উপেক্ষা করিতে পারি না। এই সব অংশের নিজস্ব বিশেষ বিশেষ অভিযোগ আছে : তাহাদের কোনো কোনো অভিযোগ প্রকৃতিতে অর্থনৈতিক, আবার কোনো অভিযোগ সামাজিক। তাহাদের সংগঠিত না করা পর্যন্ত কীভাবে স্বাধীনতা সংগ্রামে যুক্ত করা যাইবে তাহা জানি না। কংগ্রেস কেবলমাত্র রাজনৈতিক অভি-যোগগুলিতে নিজ কর্মতৎপরতা সীমাবদ্ধ না রাখিয়া যখন দেশের বর্তমান সামাজিক ও অর্থনৈতিক অভিযোগগুলি সম্পর্কেও কর্মতৎপর হইবে এবং যতদিন না আমরা উহাদের আমাদের আওতায় টানিয়া আনিতে পারিব, ভারতবর্ষের রাজনৈতিক মুক্তি কী করিয়া সম্ভব হইবে তাহা আমি বুঝি না। তাই আমার মনে হয়, এখন এমন একটি কর্মসূচী আমাদের প্রয়োজন যাহাকে তরুণ সম্প্রদায় অন্তরের অন্তস্থল হইতে স্বাগত জানাইবে, কিষাণরা যাহাকে নিজেদেরই কর্মসূচী বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিবে, আমাদের শিল্প-শ্রমিকরাও যাহাকে নিজেদের কর্মসূচী বলিয়া মনে করিবে। আমি আরো অগ্রসর হইয়া বলিব যে

ভারতে আরো অনেক সম্প্রদায় আছে যাহাদের মনে সামাজিক, অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিক বিক্ষোভ রহিয়াছে। তাহাদেরও আমাদের আওতায় টানিয়া আনিতে হইবে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, ভারতের অনুন্নত শ্রেণীর উল্লেখ করিতে পারি। যতক্ষণ কংগ্রেস তাহাদের অভিযোগের সমর্থনে না দাঁড়ায় ও তাহাদের স্বার্থের সংগে একাত্ম না হয় ততক্ষণ তথাকথিত অনুন্নত শ্রেণীর ব্যাপক অংশকে কিভাবে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের পতাকাতলে আনা যাইবে তাহা আমি বুঝি না।

মহাশয়, আমি এইমাত্র যে কাজের কথা বলিলাম যে অবস্থায় তাহা আরম্ভ করা সহজ, পরের অনুচ্ছেদে আমি তাহার উল্লেখ করিয়াছি এবং আমি বলিতে চাই "উপরোক্ত কর্মসূচীর প্রতি গভীরতর মনঃসংযোগ সুনিশ্চিত করিতে এবং নূতন কংগ্রেস-আদর্শের সহিত সংগতিক্রমে, এই কংগ্রেস কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইনসভাসমূহ, সরকার কর্তৃক নিযুক্ত কমিটিগুলি, বন্দর ট্রাস্টের মতো সংস্থাগুলি সহ যাবতীয় আঞ্চলিক সংস্থা ও আদালতগুলি সম্পূর্ণ বয়কটের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করিতেছে।" ইহা সম্পূর্ণ ও সর্বাংগীণ বয়কটের কর্মসূচী। আমি বিশ্বাস করি যে যদি বয়কটকে ফলপ্রদ করিতে হয়, সফল করিতে হয়, বুদ্ধিগ্রাহ্য করিতে হয়, তবে সামগ্রিক বয়কটের কর্মসূচী লইতে হইবে এবং এই সকল সংস্থা হইতে সরিয়া আসিবার পর আমাদের সকল সময় ও শক্তি ভারতের স্বাধীনতা-লাভের কাজে নিয়োগ করিতে হইবে। মহাশয়, আমি মনে করি না যে এই বয়কট কর্মসূচীর এক অংশ গ্রহণ করিয়া বাকি অংশগুলি বর্জন করিলে কোনো ফল পাওয়া যাইবে। প্রথমত, আদালতে গিয়া আইন ব্যবসা করা আমাদের স্বাধীনতার আদর্শের সংগে সংগতিপূর্ণ হইবে না; অন্তত কয়েকটি স্বায়ত্তশাসিত সংস্থায় প্রবেশ করাও সংগতিপূর্ণ কার্য হইবে না, যে-সকল সংস্থায়, যেমন, কলিকাতা কর্পোরেশনে, বিধি অনুযায়ী আইন সভা ও আইন পরিষদের মতো রীতিতেই আনুগত্যের শপথ লইতে হয়। অতএব যদি আমাদের স্বাধীনতার আদর্শের সহিত যথার্থ সংগতিপূর্ণ আচরণ করিতে হয় তবে যে-সকল সংস্থায় অনুগত্যের শপথ লইতে হয় সে-সকল সংস্থা বর্জন করিতে হইবে। মহাশয়, ইহা ছাড়া আর-একটি কারণেও এই সকল সংস্থা আপনাদের পরিহার করা বাঞ্ছনীয় বলিয়া আমি মনে করি। আমাদের সম্মুখে কর্তব্য এত কঠোর ও আমাদের দায়িত্ব এত বৃহৎ যে, যে কর্মসূচী আমরা গ্রহণ করিব তাহাতেই আমাদের সকল সময় ও শক্তি নিয়োগ করিতে হইবে। সুতরাং কর্মসূচীর উপর সমগ্র মনোযোগ

সুনিশ্চিত করিবার জন্য এই সকল সংস্থা পরিত্যাগ করিয়া আমাদের কর্মসূচী লইয়া সর্বান্তঃকরণে অগ্রসর হইতে হইবে! এই দুই কারণে, আমি বর্তমান পরিস্থিতিতে এই সকল সংস্থার সামগ্রিক ও সর্বাঙ্গীণ বয়কটের কথা বলিতেছি। এই পর্যায়ে আমি এ কথাও বলিতে চাই যে যদি সম্পূর্ণ বয়কটের পথ গ্রহণ করিতে আপনারা প্রস্তুত না থাকেন তবে শুধু আইন পরিষদ বর্জন করিয়া ও আদালত ও স্বায়ত্তশাসিত সংস্থাগুলি যেমন আছে তেমনই রাখিয়া কোনোই ফল হইবে না। মোট কথা, আমাদের সংগতিপূর্ণ আচরণ করিতে হইবে। হয় সম্পূর্ণ বয়কটের পথ গ্রহণ করি, নতুবা কোনো বয়কটই করিব না। মহাশয়, আমি চরমপন্থী, আমার নীতি হইল: "হয় সবটা চাই, নতুবা কিছুই চাই না।" আমি যদি দখল করার নীতি অনুসরণ করিতে বলি, তবে আমি সবই দখল করিতে চাহিব। এখন আমি বয়কটের কথা বলিতেছি, তাই সম্পূর্ণ বয়কট চাই— এবং আসুন, আমাদের সকল সময় ও শক্তি দিয়া বয়কট সফল করি। এই সকল কারণেই আমি সম্পূর্ণ বয়কটের সপক্ষে আন্তরিক আবেদন জানাইব। এই প্রসঙ্গে আমি আরো একটি কারণের উল্লেখ করিব। আমার মনে হয় আমরা সকলেই এ কথা বুঝি যে নৈতিক দিক হইতে কঠোরভাবে বিচার করিলে স্বাধীনতার আদর্শ গ্রহণ করা ও সেইসঙ্গে যে-সব সংস্থার আনুগত্যের শপথ লইতে হয় সে-সব সংস্থায় প্রবেশ করা সংগতিপূর্ণ নয়। কিন্তু এইসঙ্গেই আমি বলিতে চাই যে আমার ব্যক্তিগত বিশ্বাস ঠিক অনুরূপ। আমি বিশ্বাস করি যে রাজনীতিতে সময়ের সঙ্গে খাপ খাওয়াইয়া চলা অনেক ক্ষেত্রে একান্ত প্রয়োজন হইয়া পড়ে। আপনারা জানেন যে একসময় আয়ার-ল্যান্ডের সিন্‌ফিন্‌ আন্দোলনের সদস্যরা আনুগত্যের শপথ লইয়া পার্লামেন্টে আসন গ্রহণ করিতে অসম্মত হইয়াছিলেন। আপনারা ইহাও জানেন যে পরে তাঁহারা তাঁহাদের কর্মসূচী সংশোধন করিয়া পার্লামেন্টের ভিতরের লড়াইকে সম্প্রসারিত করিয়াছিলেন। আপনারা ইহাও অবগত আছেন যে কমিউনিস্টরা আনুগত্যের শপথ লইয়াই হাউস অফ কমন্স-এ আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহারাও জানেন এবং প্রত্যেকেই জানেন যে তাঁহারা বর্তমান সংবিধানের প্রতি কোনো আনুগত্য অন্তরের অন্তস্তলে পোষণ করেন না। তবু তাঁহারা যে আনুগত্যের শপথ লইয়া পার্লামেন্টে প্রবেশ করিয়াছিলেন তাহার কারণ পরিস্থিতিকে স্বীকার করিয়া লইয়াই তাঁহাদের সংগ্রাম চালাইতে হইয়াছিল। তাই আমি বলিতেছি যে ব্যক্তিগতভাবে আমি মনে করি বাস্তব দৃষ্টিকোণ হইতে

স্বাধীনতার আদর্শে বিশ্বাস করা ও সেই সঙ্গে সরকারী সংস্থাগুলির ভিতরে সংগ্রাম চালাইয়া যাওয়া অসংগতিপূর্ণ কাজ নয়।

সেইসঙ্গে আমি এ কথাও স্বীকার করি যে এখন ভারতে জনমন এই-সব সংস্থার সম্পূর্ণ বয়কটের পক্ষে। তাই আমি বলিতেছি যে আমি এইমাত্র যে কর্মসূচীর কথা বলিলাম তাহা গ্রহণ করিতে হইলে আমাদের সম্পূর্ণ বয়কটের পথে যাওয়া একান্ত প্রয়োজন। মহাশয়, আমার বক্তৃতা শেষ করার আগে মহাত্মা গান্ধী যে প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছেন সে সম্পর্কে আমি কয়েকটি কথা বলিব। দিল্লী ইশ্‌তেহার সম্পর্কে ওয়ার্কিং কমিটি যে ব্যবস্থা লইতে চান তিনি তাঁহার প্রস্তাবের মুখবন্ধে তাহা সমর্থন করার জন্য আপনাদের বলিয়াছেন। আপনারাই ভাবিয়া দেখুন যে আজ ১৯২৯ সালের ৩১ ডিসেম্বর তারিখে ওয়ার্কিং কমিটি কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থা আপনারা মানিয়া লইতে প্রস্তুত আছেন কি না। আমি উহা সমর্থন করি নাই এবং কাহাকেও সমর্থন করিবার জন্য পরামর্শ দিতে প্রস্তুত নই। মহাশয়, তাঁহার প্রস্তাবের মুখ-বন্ধে আরো একটি অংশে বলা হইয়াছে— স্বরাজ লাভের জন্য জাতীয় আন্দোলনের মীমাংসা করিতে ভাইসরয় যে প্রচেষ্টা করিয়াছেন আমাদের তাহার প্রশংসা করিতে হইবে। আপনারাই ভাবিয়া দেখুন যে আজ ১৯২৯ সালের ৩১ ডিসেম্বর তারিখে আপনারা ভারতের ভাইসরয়ের প্রশংসা করিতে বসিবেন কিনা। প্রস্তাবের পরবর্তী অংশে আপনারা দেখিবেন ইহাও বলা হইয়াছে যে বর্তমান পরিস্থিতিতে গোল টেবিল বৈঠকে কংগ্রেসের যোগদানে কোনো ফল পাওয়া যাইবে না। ইহার অর্থ কি এই নয় যে মাত্র বর্তমান পরিস্থিতিতেই তথাকথিত গোল টেবিল বৈঠক বর্জন করা হইবে? মহাত্মা গান্ধী বিষয়-নির্বাচনী কমিটিতে অনুগ্রহ করিয়া এই আশ্বাস দিয়াছেন যে গোলটেবিল বৈঠকে যোগদানের কোনো অভিপ্রায় ও কল্পনাই তাঁহার নাই। এই সভাই স্থির করুক যে সে ক্ষেত্রে প্রস্তাবে "বর্তমান পরিস্থিতিতে" কথাটি আদৌ সন্নিবেশিত করার প্রয়োজন আছে কিনা। মহাশয়, আমি "গোলটেবিল বৈঠক" কথাটি সম্পর্কে কিছু বলিতে চাই। আমি বুঝিতেছি না আমাদের দেশবাসী কেন উহাকে গোলটেবিল বৈঠক বলিতে এত আগ্রহান্বিত। আমি ইহাকে গোল টেবিল বৈঠক নাম দিব না। গোল টেবিল বৈঠকের অর্থ আমি ইহাই জানি যে দুইটি যুদ্ধরত পক্ষের মিলন বা দুইটি প্রতিদ্বন্দ্বী পক্ষের উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন প্রতিনিধিদের

সম্মেলন। আমি আপনাদের কাছে জানিতে চাই, ভারতের জনসাধারণকে কি তাঁহাদের প্রতিনিধি ব্রিটিশ সরকারের প্রতিনিধিদের সংগে আলোচনা করার পূর্ণ ক্ষমতা দিয়া পাঠাইতে আমন্ত্রণ করা হইয়াছে? আমরা কি সুনিশ্চিত যে এই বৈঠকে যে-সব মীমাংসায় পেঁছানো সম্ভব হইবে তাহা উভয় পক্ষের দ্বারা অনুমোদিত হইবে? আমরা কি সুনিশ্চিত যে এই বৈঠকের সিদ্ধান্তগুলি ব্রিটিশ পার্লামেণ্টে পুনর্বিবেচনার জন্য উপস্থাপিত হইবে না? আপনারা সকলেই জানেন যে যখন দক্ষিণ আফ্রিকার জনসাধারণ ও ব্রিটিশ সরকারের মধ্যে চুক্তি সম্পাদিত হইয়া শান্তি স্থাপিত হইয়াছিল তখন উভয় পক্ষই সম্মেলনে গৃহীত সিদ্ধান্তগুলিকে পবিত্র বলিয়া মনে করিয়া লইয়াছিলেন। আমি জানি যে ঐ সম্মেলনে দক্ষিণ আফ্রিকার যে সংবিধান প্রণয়ন করা হইয়াছিল তাহাতে ব্যাকরণগত ভুল থাকা সত্ত্বেও ব্রিটিশ সরকারকে তাহা অনুমোদন করিতে হইয়াছিল। ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের সদস্যরা সেই সংবিধানে সংশ্লিষ্ট ব্যাকরণগত ভুলগুলির সংশোধন করিতে পারেন নাই। মহাশয়, ইহাকেই বলে গোল টেবিল বৈঠক। এই বৈঠকের স্বরূপ কী? সাইমন কমিশন ও উহার সদস্যরা সকলেই ঐ বৈঠকে থাকিবে না। বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্তগুলি ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের বিবেচনার জন্য উপস্থাপিত হইবে। এই বৈঠকে শুধু যে ভারতের জনসাধারণ তাহাদের প্রতিনিধি পাঠাইতে পারিবে তাহা নয়। আমি জানি ইয়োরোপীয়ান চেম্বার্স অফ কমার্স ও ভারতীয় রাজন্যবর্গদেরও প্রতিনিধি সেখানে থাকিবে। মহাশয়, একদিকে ব্রিটিশ সরকার, অন্যদিকে ইয়োরোপীয়ান চেম্বার্স অফ কমার্স ও ভারতীয় রাজন্যবর্গ— এই দুই পক্ষের মধ্যে কি সংগ্রাম চলিতেছে? মহাশয়, একদিকে ব্রিটিশ সরকার, অপরদিকে আমাদের ব্রিটিশ-অনুগত বন্ধুরা— এই দুই পক্ষের মধ্যে কি কোনো সংগ্রাম চলিতেছে? এ ধরনের কোনো সংগ্রামের কথা আমি জানি না। তবে কেন এই-সব পক্ষরা এই বৈঠকে তাঁহাদের প্রতিনিধি পাঠাইবেন? তাই আমি বলি যে এ বৈঠক গোল টেবিল বৈঠক নয়। দুর্ভাগ্যবশত আমাদের দেশের লোকেরা ইহাকে গোল টেবিল বৈঠক বলিতে চাহিতেছে এবং ব্রিটিশরা সমভাবেই ইহাকে গোল টেবিল বৈঠক আখ্যায়িত করিবার বিরোধী। ইংলণ্ডের দায়িত্বশীল রাষ্ট্রনায়কদের বক্তৃতা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে লক্ষ্য করিলে আপনারা দেখিবেন যে তাঁহারা "গোল টেবিল বৈঠক" আখ্যাটি সযত্নে এড়াইয়া যাইতেছেন। এবং উহা করার পক্ষে বহু সংগত যুক্তিও রহিয়াছে

আমিও আপনাদের অনুরোধ করিব ইহাকে যেন গোল টেবিল বৈঠক না বলা হয়।

আমি আর-একটি যুক্তি উত্থাপন করিয়া আমার বক্তব্য শেষ করিব। মহাত্মা গান্ধী যে প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছেন তাহাতে তিনি গঠনকর্মাত্মক কর্ম-সূচীর কথা উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে উহার দ্বারাই ভারতের রাজনৈতিক বন্ধনমুক্তি লাভ করা যাইবে। আমি এই সভাকে বিচার করিতে বলিব গত কয়েকবছর যাবৎ কংগ্রেস যে গঠনাত্মক কর্মসূচী অনুসরণ করিতেছে তাহাই কি পূর্ণ স্বাধীনতার লক্ষ্যে আমাদের পৌঁছিবার পক্ষে যথেষ্ট। অবশ্য, ঐ প্রস্তাবের শেষাংশে আইন অমান্য আন্দোলনের উল্লেখ রহিয়াছে। কিন্তু ইহার উত্তরে আমি বলিতে চাই যে নির্দিষ্ট সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিষয়ের ভিত্তিতে আমরা যদি শ্রমিক, কৃষক, অনুন্নত শ্রেণী ও তরুণ সম্প্রদায়কে সংগঠিত করিতে না পারি তবে আইন অমান্য আন্দোলন কখনোই সম্ভব হইবে না। সেজন্য আমি বলিতেছি যে যদি আমরা প্রস্তাবটিকে কার্যকর করিতে চাই, যদি আমরা স্বাধীনতার লক্ষ্যে উপনীত হইতে চাই তবে ইহা দেখা আমাদের কর্তব্য যে আমরা যেন এমন একটি কর্মসূচী গ্রহণ করি যাহা ফলপ্রসূ হইবে ও যাহা আমাদের সম্মুখে স্থাপিত লক্ষ্যে উপনীত হইতে আমাদের পক্ষে সহায়ক হইবে। আমি বলিব যে মূল প্রস্তাবে যে কর্মসূচীর কথা আছে তাহা পর্যাপ্ত নয় ও এমন আর-একটি কর্মসূচী গ্রহণ করা দরকার যাহা হইবে সময়োপযোগী ও দেশের তরুণ সম্প্রদায়, শ্রমিক, কৃষক ও অনুন্নত শ্রেণী যাহাকে স্বাগত জানাইবে। গত বৎসর কলিকাতা কংগ্রেসে আমরা পূর্ণ স্বাধীনতার আদর্শ গ্রহণ করিতে চাহিয়াছিলাম। কিন্তু তখন তাহা করিতে দেওয়া হয় নাই। এক বৎসরের জন্য উহা পিছাইয়া দিয়া আমরা কী লাভ করিয়াছি তাহা আপনারা ভাবিয়া দেখুন। এক বৎসর আগেই উহা গ্রহণ করা উচিত ছিল কিনা তাহাও ভাবিয়া দেখিতে আমি আপনাদের অনুরোধ করিব। আমি জানি না এই সভায় আমার সংশোধনী গৃহীত হইবে কিনা। কিন্তু আমার মনে সন্দেহ নাই যে আমার সংশোধনী এই কংগ্রেসে গৃহীত যদি নাও হয় তবু ঈশ্বরেচ্ছায় অদূর-ভবিষ্যতে, সম্ভবত আগামী কংগ্রেসেই উহা গৃহীত হইবে। (হিয়ার, হিয়ার)। আমি মনে করি মূল প্রস্তাবে যে কর্মসূচীর কথা আছে উহা ফলপ্রসূ কর্মসূচী নয়। আমি ইহাও মনে করি যে মূল প্রস্তাবে যে কর্মসূচীটির কথা বলা হইয়াছে তাহা এ দেশের তরুণ সম্প্রদায় পছন্দ করিবে না। তাই আমি মহাত্মা

গান্ধীর কাছে ও এই প্রস্তাবের সমর্থকদের কাছে এই আবেদন করিব যে তাঁহারা যেন যুগের মনোভাব বিবেচনা করিয়া দেখেন ও এ দেশের তরুণদের মন ও হৃদয় যে ভাব, অনুভূতি ও কল্পনায় আন্দোলিত হইতেছে উহাও যেন তাঁহারা ভাবিয়া দেখেন। আমি আশা করি, এখনো এ-সব কথা ভাবিবার সময় আছে। আমি ইহাও আশা করি যে এই সকল তথ্য বিবেচনা করার পর সংশোধনীটি গ্রহণ করা আপনাদের পক্ষে সম্ভব হইবে এবং মহাত্মা গান্ধী আপনাদের সম্মুখে যে লক্ষ্য উপস্থিত করিয়াছেন— পূর্ণস্বাধীনতার লক্ষ্য— তাহা লাভ করাও তখন সম্ভবপর হইবে। মহাত্মা গান্ধী আপনাদের সম্মুখে এই যে লক্ষ্য উপস্থিত করিয়াছেন সেজন্য আমি আবার তাঁহাকে ধন্যবাদ জানাইতেছি। সংশোধনীটি উপস্থাপনের আমার একমাত্র উদ্দেশ্য হইল যত দ্রুত সম্ভব লক্ষ্যবস্তু লাভ করা।

প্র তি লি পি

1 Woodburn Park
Calcutta
13 11 29

My dear Braja Chandra Deb.

I am sorry to hear that you are ill. Your presence in Calcutta would have been a great help to us in the present crisis.

In Bengal a determined effort is being made for the Presidentship of the BPCC. We will also draw up a list of office bearers and members of the Executive Council. Their idea is to make a clean sweep of the present executive.

In Bengal at present the Mayor as well as the Leader of the Municipal Party in 1927 and 1928 I also offered him the Presidentship of the BPCC which he did not accept. Now he is trying to forcibly oust us from the BPCC executive. I can say with a clear conscience that I have not only offered him back the triple crown, but I have also tried my very best to accommodate him in every possible manner. In fact I have given in to him in every matter till quite recently

I have failed to attract his sympathy and
affection. At a time when I have been isolated
from all the other leaders and am fasting on
the threshold of the prison house, the suspicion
of hounding me out of the Bose will only
be helping the Government by discrediting and
disgracing me. I am surprised that the appeal
of the question does not concern him in the least.
All attempts at compromise, including
the attempt of Pandit Motilal Nehru, have
failed and a straight fight is inevitable.

The Khaksar part I have for a long
long time been carrying on a systematic
propaganda against Sir Kiran Sankar Roy,
Nalini Ranjan Sarkar, Surendra Mohan Ghosh and
myself. Dr Nalinaksha Sanyal will have a
great influence on the Murshidabad voters
but he tells me that he is prepared to vote
for me but not for the present executive.
Both Kiran Sarkar and I are sure to be convicted
before the end of December — do you think

3

in the present circumstances it is wise for us to go and offer battle without the assurance of a vital vote of no-confidence in us?

Please consider the situation carefully and do what you think best. The parties are sharply divided but we hope to win if we get the support of the 16th inst. that you are now expecting.

Do not know the state of your health. I wish you could come to Calcutta once about the 15th of the Calcutta Municipal Election, should be completed from Murshidabad District?

With regards.

Yours sincerely,
Subhas C. Bose

সংযোজন

বরস্টাল স্কুল বিল

ভারতে কারা-সংস্কার শুরু হয় ১৮৩৬ সালে। ঐ বছর বিখ্যাত জেল কমিটি গঠিত হইয়াছিল। মেকলে ছিলেন উহার একজন সদস্য। কমিটির রিপোর্ট হইয়াছিল একখানি শক্তিশালী দলিল। কতগুলি প্রধান নীতি কমিটি স্থির করিয়াছিলেন কিন্তু নীতি শিক্ষা, ধর্মশিক্ষা, লেখাপড়া শেখানো, সদাচরণের পুরস্কার ইত্যাদি সংশোধন-ধর্মী ব্যবস্থা তাঁহারা ইচ্ছা করিয়াই নাকচ করিয়া দিয়াছিলেন। তাঁহারা কয়েকটি কেন্দ্রীয় জেল গড়িয়া তোলার পক্ষে বলিয়াছিলেন। সেখানে দন্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের নীরস, একঘেয়ে, ক্লান্তিকর ও আকর্ষণহীন কাজে নিয়োগ করিতে হইবে। আবার ঐ-সব কাজে কিছুদিন বেশি করিয়া খাটিলে শীঘ্র মুক্তি পাওয়া যাইবে ভাবিয়াও যাহাতে ঐ ব্যক্তিরা আনন্দ না পাইতে পারে সে ব্যবস্থা থাকিবে। অর্থাৎ জেল-জীবন এমনই কঠোর হইবে যে যেন উহা প্রতিহিংসাপরায়ণ বলিয়া মনে হয় ও ব্যক্তি ও সমাজ যেন ভয়ে অপরাধপ্রবৃত্তি হইতে নিবৃত্ত হয়। সমগ্র ঊনবিংশ শতাব্দী ধরিয়া, বিংশ শতাব্দীরও গোড়া পর্যন্ত শাস্তিদানের এই বর্বরোচিত তত্ত্ব ভারতের সরকারী মহলে প্রচলিত ছিল। কিন্তু পাশ্চত্য জগতে, বিশেষ করিয়া যুক্তরাষ্ট্রে, এই সময়ে শাস্তিবিজ্ঞান পুনর্লিখিত হইতেছিল ও অপরাধীদের সংশোধনের উপর জোর দেওয়া হইতেছিল। সকল প্রগতিশীল দেশে এখন যে মত প্রচলিত হইয়াছে ও কার্যকর করা হইতেছে তাহা এই যে শাস্তিদানের লক্ষ্য হইবে প্রতিহিংসাও নয়, ভয় দেখাইয়া অপরাধ হইতে নিবৃত্ত করাও নয়। সংশোধন করাই শাস্তির লক্ষ্য। এই মত অনুসারে, শাস্তি যদি এমন হয় যে উহা অপরাধীর চরিত্র সংশোধনে সহায়তা না করে তবে উহার উদ্দেশ্যই পন্ড হয়।

স্বাগত

বংগীয় বোরস্টাল স্কুল বিল ভারতে কারাশাসনের প্রচলিত আমলাতান্ত্রিক প্রকল্পগুলি হইতে একটি আলাদা ধরনের ব্যবস্থা আনিতে চায়। আমি ইহাকে স্বাগত জানাই। এরূপ একটি বিল আরো আগেই আসা উচিত ছিল। ১৮৯৪ সালে গ্রেট ব্রিটেনে একটি বিভাগীয় কমিটি বসিয়াছিল। ঐ কমিটি কারা-সংস্কারে সুপারিশ করে, তেইশ বছরের কম বয়স্ক অপরাধীদের সুযোগ-সুবিধা দেওয়ারও প্রস্তাব করে। ১৮৯৯-১৯০০ সালের আগে কিন্তু এই

সুপারিশ কার্যকর করা যায় নাই। ঐ বছর বেফোর্ড জেলে অল্প আকারে কাজ শুরু করা হইয়াছিল ১৯০২ সালের অক্টোবর মাসে বিখ্যাত বোরস্টাল প্রতিষ্ঠান শুরু হয়। অতএব দেখা যাইতেছে যে সদাশয় আমলাতান্ত্রিক শাসনে ভারত এই কারা-সংস্কারের বিষয়ে ইংলন্ড হইতে তেইশ বছর পিছাইয়া আছে, যদিও ইংলন্ড নিজেও এ ক্ষেত্রে প্রগতিশীল দেশগুলির মধ্যে অগ্রণী এ কথা কোনোমতেই বলা চলে না

কার্যকর করার অসুবিধা

এখন এই বিপ্লবের প্রতিকারকল্পে তাড়াতাড়ি করিয়া বিলটির খসড়া প্রস্তুত করা হইয়াছে। বিলটি এক নজরে দেখিলেও ধরা পড়ে যে ইহা ধীরভাবে চিন্তা করিয়া প্রস্তুত করা হয় নাই। ইহার খসড়াতে ব্যস্ততার ছাপ। বিলের প্রতিটি ধারাতেই পরিণত বিচার-বিবেচনার অভাবের ছাপ রহিয়াছে। কয়েকটি ধারা তো ইংলন্ডের অপরাধ নিবারণ আইন, ভারতীয় জেল কমিটির রিপোর্ট ও অনুরূপ দলিল হইতেই আংশিকভাবে নকল করা হইয়াছে। তাহার ফল এই যে বিলটির বর্তমান আকার থাকিলে ইহা কার্যকর কর যাইবে না। কার্যকর করার চেষ্টা করা হইলে অল্পদিনের মধ্যেই বঙ্গীয় বিধান পরিষদে ইহার একটি সংশোধনী বিল আনার প্রয়োজন ঘটিবে। তাই সিলেক্ট কমিটি যাহাতে বিলটি যত্ন করিয়া বিচার-বিবেচনা করেন তাহা দেখা আবশ্যক।

আমি এখন বিলটির এক-একটি ধারা ধরিয়া বিচার করিব।

ভিজিটিং কমিটি

৩ (২) ধারায় যে "ভিজিটিং কমিটি" নামটি দেওয়া হইয়াছে তাহা উপযোগী নয়। উহার পরিবর্তে "স্কুল কমিটি" আমি পছন্দ করি। প্রত্যেক জেলের সঙ্গে ভিজিটররা (পরিদর্শক) যুক্ত থাকেন। ঐ 'ভিজিটিং' কথাটি থাকিলে এই অনুষঙ্গে বোরস্টাল স্কুলেও জেলের আবহাওয়া আসিয়া পড়িবে — উহা বাঞ্ছনীয় নয়। প্রস্তাবিত কমিটিরও সাধারণ স্কুল কমিটির মতো একই রীতিতে কাজ করা উচিত। স্কুলের অধ্যক্ষকে অবশ্যই যথেষ্ট ক্ষমতা দিতে হইবে, কিন্তু কমিটিও যেন নিছক উপদেষ্টা কমিটি মাত্র হইয়া না দাঁড়ায়। কমিটিকেও যেন যথেষ্ট বাড়তি ক্ষমতা দেওয়া হয়। গুরুতর শৃঙ্খলা ভঙ্গ,

এক বোরস্টাল বিদ্যালয় হইতে আর-এক বোরস্টাল বিদ্যালয়ে স্থানান্তরিত করা বা বোরস্টাল বিদ্যালয় হইতে সংশোধিত বোরস্টাল প্রতিষ্ঠানে স্থানান্তরিত করার বিষয়গুলি কমিটির সুপারিশের জন্য তাঁহাদের নিকট পাঠাইতে হইবে। কোন্ পাঠক্রম অনুসরণ করা হইবে, বিদ্যালয়ের 'ছাত্রদের' শারীরিক ও টেকনিক্যাল শিক্ষা সহ আর কী কী শিক্ষা দেওয়া হইবে তাহাও কমিটি সুপারিশ করিবেন। বোরস্টাল স্কুল কমিটিতে ও পরে যে বোরস্টাল বোর্ডের কথা বলা হইয়াছে তাহাতে পরিবেশতত্ত্ববিদ, মনস্তত্ত্ববিদ, শিক্ষাবিদ, শিল্পপতি, শ্রমিক-নিয়োগকর্তা— প্রভৃতি ব্যক্তিদের যোগদান করিতে আমন্ত্রণ জানাইতে হইবে।

বিচারের ক্ষমতা

এই আইনের আওতায় যে-সকল বয়ঃসন্ধিকালীন অপরাধী পড়িবে তাহাদের সংখ্যা অনেক হইবে বলিয়া মনে হয়। তাই ভারতীয় জেল কমিটির সুপারিশ-মতো বোরস্টাল বিদ্যালয়ে কাহাকেও পাঠাইবার ক্ষমতা বহুসংখ্যক ম্যাজিস্ট্রেটকে দিতে হইবে। সকল প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেটেরই এই ক্ষমতা থাকা উচিত। যে-সব দ্বিতীয় শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেটকে এই ক্ষমতা এতৎপক্ষে দেওয়া হয় তাঁহারাও উহা প্রয়োগ করিতে পারিবেন।

বিনাশ্রমে কিংবা সশ্রম কোন্ কারাদণ্ডে দণ্ডিত ব্যক্তিকে বোরস্টাল বিদ্যালয়ে পাঠানো হইবে এই বিলে তাহার সুনির্দিষ্ট উল্লেখ থাকা উচিত।

বয়ঃসন্ধিকালীন যে-কোনো ব্যক্তি যদি বোরস্টাল বিদ্যালয় হইতে বাহির হইয়া আসিবার পর দ্বিতীয়বার অপরাধ করে তবে তাহাকে আবার বোরস্টাল বিদ্যালয়ে পাঠানো উচিত কিনা তাহারও উল্লেখ থাকা উচিত। আমার মতে এরূপ বয়ঃসন্ধিকালীন অপরাধীকে বোরস্টাল বিদ্যালয়ে আবার ভর্তি করিয়া লইবার পক্ষে বাধা থাকা উচিত নয়। কিন্তু যাহারা দুই বা ততোধিক বার সাজা পাইয়াছে তাহাদের না লওয়াই বাঞ্ছনীয়।

ম্যাজিস্ট্রেটরা সাধারণ আইন অনুসারে অপরাধীদের যে মেয়াদ পর্যন্ত দণ্ড দিতে পারেন তাহার চেয়ে বেশি মেয়াদের জন্য বোরস্টাল বিদ্যালয়ে বয়ঃসন্ধি-কালীন ব্যক্তিদের পাঠাইবার অধিকার তাঁহাদের থাকা উচিত নয়। কিন্তু এই ধরনের অপরাধ বিচার করার জন্যই যে ম্যাজিস্ট্রেটদের বিশেষভাবে নিয়োগ করা হয় তাঁহাদের ক্ষেত্রে এই নিয়মের ব্যতিক্রম করা যাইবে। আমার এই মত গৃহীত হইলে, সেশন কোর্ট ও হাইকোর্ট ছাড়াও ঐ বিশেষ ম্যাজিস্ট্রেটরা বোরস্টাল

বিদ্যালয়ে দুই বছরেরও বেশি মেয়াদের জন্য আটক রাখার আদেশ দিতে পারিবেন।

বয়ঃসীমা

বয়সের প্রশ্নটি বিশেষ জরুরী। উহা সতর্কতার সহিত বিবেচনা করিতে হইবে। উষ্ণ দেশে পরিণতি শীঘ্র আসে। স্বরভঙ্গ ও অন্যান্য যে-সব শারীরিক ও মানসিক লক্ষণ বয়ঃসন্ধির সূচনা করে ভারতে তাহা ১৬ বছরে নয়, ১৪ বছরেই দেখা দেয়। বালিকাদের ক্ষেত্রে ইহা বিশেষভাবে সত্য। বোরস্টাল বিদ্যালয়ে ভর্তি করিবার ন্যূনতম বয়স ১৪ বছর বলিয়া আইনেই লিখিত থাকা উচিত। আইনে লেখা সম্ভব না হইলে, স্থানীয় সরকার উপযুক্ত মনে করিলে যাহাতে ১৪ বছর পর্যন্ত ঐ বয়স নামাইতে পারেন তাহার ব্যবস্থা থাকা উচিত। অনুরূপভাবে, বয়সের ঊর্ধ্বসীমাও নমনীয় করা উচিত। আমেরিকায় ১৬ হইতে ৩০ বছর বয়স পর্যন্ত বয়ঃসন্ধিকালীন ব্যক্তিকে বোরস্টাল প্রতিষ্ঠানে ভর্তি করানো হয়। ইংলন্ডে বয়ঃসন্ধির কাল ধরা হয় ১৬ হইতে ২১ বছর। ভারতে এই বয়সের ঊর্ধ্বসীমা আইনে ২৩ বছর লিখিয়া দেওয়া উচিত; স্থানীয় সরকার ইচ্ছা করিলে ঐ বয়স ২৫ বছর পর্যন্ত বাড়াইতে পারিবেন। ভারতীয় জেল কমিটি সুপারিশ করিয়াছেন যে ঊর্ধ্বতম বয়ঃসীমা ২৩ বছর পর্যন্ত বাড়ানো যাইবে। যেমন ইংলন্ডে অপরাধ নিবারণ আইন (১৯৩৮)-এর ১ (২) ধারা মতে সেক্রেটারি অফ স্টেট-দের ঐ ঊর্ধ্বতম বয়সীমা ২১ হইতে ২৩ পর্যন্ত বাড়াইবার ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে, ইহাও তদনুরূপ। কিন্তু এই সুপারিশ যথেষ্ট নয়। একটি ১৪ বছরে বালককে একজন ২৫ বছরের মানুষের সঙ্গে থাকিতে দেওয়া অসংগত মনে হইতে পারে। কেননা ঐ ব্যক্তি বালকটিকে অসদাচরণে বাধ্য করিতে পারে। কিন্তু ভাবিবার বিষয় এই যে ১৪ বছরের কিশোরের কি ৮ বছরের বালকের মিল বেশি, না, ২০ হইতে ২৫ বছরের যুবকের মিল বেশি?

আটক থাকার মেয়াদ

এই বিলের একটি বিশেষ ত্রুটি এই যে অপ্রাপ্তবয়স্ক অপরাধীকে বোরস্টাল বিদ্যালয়ে পাঠানো হইবে কিনা তাহা সরকারের বিবেচনার উপর ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। আমার মতে, বয়ঃসন্ধিকালীন যে ব্যক্তিকেই অন্যূন দুই বৎসর পর্যন্ত

কারাদন্ড দেওয়া হইয়াছে তাহাকেই বোরস্টাল বিদ্যালয়ে পাঠানো উচিত। এই ব্যবস্থা না করা হইলে এই বিলের উদ্দেশ্য, যথা, বয়ঃসন্ধিকালীন অপরাধীদের চরিত্র সংশোধন— তাহা ব্যর্থ হইয়া যাইবে। বোরস্টাল বিদ্যালয়ে অপরাধীকে পাঠাইবার জন্য বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ সযত্ন পর্যবেক্ষণের পর স্থির করিবেন যে ঐ কিশোর এখানে আটক থাকার উপযুক্ত কিনা। যদি না হয় তবে তাহাকে "সংশোধিত বোরস্টাল" প্রতিষ্ঠানে পাঠাইতে হইবে।

যে-সব বয়ঃসন্ধিকালীন ব্যক্তি পাঁচ বৎসরের অধিক কাল কারাদন্ডে দন্ডিত হইবে তাহাদের সম্পর্কে কী ব্যবস্থা করা হইবে এই বিলে সে কথার উল্লেখ নাই। যেমন, মনে করা যাক, একটি বালক এমন গুরুতর অপরাধ করিয়াছে যে তাহার দশ বৎসর সশ্রম কারাদন্ড হওয়া উচিত। কিন্তু সযত্ন অনুসন্ধানের পর ইহা নির্ণয় করা গেল যে তাহার চরিত্র সংশোধন করা সম্ভব! তাহাকে কি বোরস্টাল বিদ্যালয়ে পাঠানো হইবে? আমার মতে তাহাকে বোরস্টাল বিদ্যালয়ে পাঠানো উচিত ও সে ঊর্ধ্বতম বয়ঃসীমায় পেঁছানো পর্যন্ত তাহাকে সেখানেই আটক রাখা উচিত। তারপর তাহাকে "সংশোধিত বোরস্টাল" প্রতিষ্ঠানে পাঠাইতে হইবে। পাঁচ বছরের অধিক কারাদন্ড তাহার প্রাপ্য বলিয়াই তাহাকে বোরস্টাল বিদ্যালয়ে যাইবার সুযোগ হইতে বঞ্চিত করা উচিত নয়। তাহা ছাড়া সুযোগ-সুবিধা দানের ব্যবস্থানুসারে, সু-আচরণের দরুণ তাহার দন্ডের মেয়াদ কমিয়া যাইবার পথ তো খোলাই আছে।

আর-একটি বিষয় যাহা সম্বন্ধে এই বিলে কোনোরূপ বিবেচনা করা হয় নাই তাহা এই: মনে করুন, ২০ বছর বয়সের একটি যুবককে পাঁচ বছরের কারাদন্ড দেওয়া হইল। ঊর্ধ্বতম বয়ঃসীমা ২৩ বছর স্থির করা হইলে সে কতদিন বোরস্টাল বিদ্যালয়ে আটক থাকিবে? আমার মতে ঊর্ধ্বতম বয়ঃসীমায় পেঁছানো পর্যন্ত তাহাকে বোরস্টাল বিদ্যালয়ে আটক রাখা উচিত। তারপর তাহাকে "সংশোধিত বোরস্টাল" প্রতিষ্ঠানে পাঠাইতে হইবে। তাহার দন্ডের মেয়াদের অবশিষ্টভাগ সে সেখানেই আটক থাকিবে, অবশ্য যদি না সদাচরণের জন্য সে আগেই ছাড়া পায়।

সংশোধিত বোরস্টাল প্রতিষ্ঠান

বোরস্টাল বিদ্যালয়ে কেহ ভর্তি হইলে তাহার উপর ছাপ ফেলিতে গেলে তাহাকে সেখানে অন্তত পক্ষে দুই বৎসর আটক রাখা আবশ্যক। সেই দিক

হইতে বিবেচনা করিলে যে অপরাধীরা অল্পমেয়াদী কারাদন্ড পাইয়াছে বোরস্টাল বিদ্যালয় তাহাদের পক্ষে অনুপযুক্ত। ঊর্ধ্বতম বয়ঃসীমায় পেঁাছাইয়া গিয়াছে অথচ যাহাদের দন্ডের মেয়াদ শেষ হয় নাই, বোরস্টাল বিদ্যালয় তাহাদের পক্ষেও অনুপযুক্ত। ইহাদের জন্য এই উদ্দেশ্যে পৃথকীকৃত বিশেষ জেলে সংশোধিত বোরস্টাল ব্যবস্থা রাখিতে হইবে। এই জেলাগুলিকে "অপ্রাপ্তবয়স্কদের জেল" বলা যায়, কিন্তু ঐরকম নামকরণ এড়াইয়া যাওয়াই বাঞ্ছনীয়। সংশোধিত বোরস্টাল ব্যবস্থার উদ্দেশ্য হইবে : ১. প্রাপ্তবয়স্কদের হইতে বয়ঃসন্ধিকালীন ব্যক্তিদের পৃথক রাখা, ২ : ক. শৃংখলার সাহায্যে খ. ধারাবাহিক কাজের সাহায্যে, গ. দৈহিক, মানসিক, নৈতিক ও কারিগরী প্রশিক্ষণের সাহায্যে, ঘ. ছাড়িয়া দিবার পর কর্মসংস্থাপনের ব্যবস্থা করিয়া তাহাদের অপরাধমূলক মনোবৃত্তি যাহাতে রোধ করা যায় সেই উদ্দেশ্যে ঘনিষ্ঠ-ভাবে মনোযোগ দেওয়া।

সাধারণ বোরস্টাল বিদ্যালয় হইতে সংশোধিত বোরস্টালের পার্থক্য

বোরস্টাল ও সংশোধিত বোরস্টাল ব্যবস্থার মধ্যে পার্থক্য বোরস্টালকে কোনো-মতেই জেল বলা যায় না, কিন্তু সংশোধিত বোরস্টাল সংশোধনধর্মী জেল। প্রগতিশীল দেশগুলির প্রথা অনুকরণ করিয়া ভারতীয় জেল কমিটি বলিয়াছেন যে বোরস্টাল বিদ্যালয়ে জেলের পরিবেশ বা জেলের ছাপ থাকিবে না। এজন্য বোরস্টাল বিদ্যালয়ে কোনো প্রাচীর থাকিবে না। অফিসারদের নাম জেলের অফিসারদের মতো হইবে না। যেমন "সুপারিণ্টেন্ডেণ্ট" ও "জেলার" না বলিয়া "অধ্যক্ষ" ও "উপাধ্যক্ষ" বলিতে হইবে। বয়ঃসন্ধিকালীন অপরাধী-দের "কয়েদী" না বলিয়া "বাসিন্দা" বা "ছাত্র" বলিতে হইবে। তাহাদের ইউনিফর্মের মতো পোষাক দিতে হইবে, কিন্তু সে পোষাক সাধারণ জেল-পোষাকের মতো হইবে না। কিন্তু সংশোধিত বোরস্টাল বিদ্যালয় সব দিক দিয়াই দেখিতে শুনিতে জেলের মতোই হইবে। জেলে যেমন শৃংখলা রক্ষার ব্যবস্থা থাকে সেখানেও তাহাই থাকিবে। কিন্তু সাধারণ জেলে যাহা থাকে না, সংশোধিত বোরস্টাল প্রতিষ্ঠানে সাহিত্য ও কারিগরী উভয় প্রকার শিক্ষার উপরই জোর দেওয়া হইবে। সদাচারকে উৎসাহ দিবার জন্য পুরস্কার ও ছাড় দিবার উৎকৃষ্টতর ব্যবস্থা থাকিবে। যাহারা ভালো আচরণ করে

তাহাদের ঘরের মধ্যে খেলিতে দিতে হইবে ও তামাক সেবনও করিতে দিতে হইবে। সংক্ষেপে বলিতে গেলে, পরিবেশটি শাস্তিমূলক না হইয়া হইবে সংশোধনাত্মক।

তিন ধরনের বাসিন্দা

আগেই বলিয়াছি, সংশোধিত বোরস্টাল প্রতিষ্ঠানে তিন ধরনের বাসিন্দা থাকিবে : ১. নিম্ন ও সর্বোচ্চ বয়ঃসীমার মধ্যে যে কিশোর-যুবক অপরাধীরা দুই বছরের কম মেয়াদের কারাদণ্ড পায় তাহারা ; ২. উচ্চতম বয়ঃসীমার ঊর্ধ্বে বয়ঃসন্ধিকালীন অপরাধীদের কারাদণ্ডের মেয়াদ বাকি আছে তাহারা (এরূপ বাসিন্দাদের বয়স অবশ্য ৩০ বছরের বেশি হওয়া উচিত নয়, কেননা তদূর্ধ্ব বয়সী লোকদের অধিকাংশ ক্ষেত্রে আর সংশোধন করা সম্ভব নয়) ; ৩. বোরস্টাল বিশ্ববিদ্যালয়ের যে বাসিন্দদের সংশোধন করা কঠিন বা অধিক দোষগ্রস্ত বলিয়া যাহাদের ঐখানে আর রাখা চলে না তাঁহারা।

আদর্শ ব্যবস্থা হইবে এই তিন শ্রেণীর বয়ঃসন্ধিকালীন অপরাধীর জন্য তিন রকম আলাদা প্রতিষ্ঠান রাখা। স্পষ্টতই ১৭ বছরের যে কিশোর ৩ বা ৬ মাসের সাজা পাইয়াছে তাহাকে ২০ বছরের যুবক বা ২৬ বা ২৮ বছরের লোকের সঙ্গে রাখা বাঞ্ছনীয় নয়! কিন্তু পৃথক পৃথক জেলের ব্যবস্থা যদি না করা যায় তবে একই জেলের বিভিন্ন অংশে তাহাদের আলাদা আলাদা রাখার ব্যবস্থা করিলেও চলিবে। বায়বৃদ্ধির প্রশ্ন ইহার পক্ষে বাধাস্বরূপ হওয়া উচিত নয়। বলা বাহুল্য, বোরস্টাল ব্যবস্থা ঠিকভাবে না চলিলে বোরস্টাল বিদ্যালয়ের সার্থকতা থাকিবে না। উভয় প্রতিষ্ঠানই পরস্পরের পরিপূরক। কোনো ক্ষেত্রেই সাধারণ জেলে প্রাপ্তবয়স্ক ও বয়ঃসন্ধিকালীন ব্যক্তিদের একত্রে রাখা চলিবে না। ফলে যে বয়ঃসন্ধিকালীন ব্যক্তিদের কোনো কারণবশত বোরস্টাল বিদ্যালয়ে রাখা সম্ভব নয় তাহাদের সংশোধিত বোরস্টাল প্রতিষ্ঠানেই পাঠাইতে হইবে।

প্রাদেশিক বোরস্টাল পর্ষৎ

১০ ও ১১ ধারায় উল্লিখিত ক্ষমতা ইন্সপেক্টর জেনারেল অফ প্রিজন্‌স-এর হাতে তুলিয়া দেওয়া আদৌ বাঞ্ছনীয় নয়। ভারতীয় জেল কমিটি সুপারিশ করিয়াছেন যে ঐ ক্ষমতা জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের উপর বর্তাইবে, বোরস্টাল

বিদ্যালয়ের অধীক্ষক (কিংবা স্থলবিশেষে জেল-অধীক্ষক) উদ্যোগী হইয়া তাঁহার নিকট ব্যাপারগুলি সম্পর্কে রিপোর্ট দিবেন। এই বিল আই. জি. কে ক্ষমতা দিয়াছে। এ কথাও বলে নাই যে কে উদ্যোগী হইবে। আমার মতে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বা ইন্সপেক্টর জেনারেল কাহারও উপর সব কাজ করিবার ভার থাকা উচিত নয়। তাঁহারা অন্যান্য কাজে এত ব্যস্ত থাকেন যে এই কাজে তাঁহারা সময় বা চিন্তা ব্যয় করিতে পারিবেন না। কেহ কেহ বলিতেছেন, এই ক্ষমতা স্থানীয় সরকারের উপর ন্যস্ত থাকা উচিত। ভিজিটিং কমিটি ও কারা-বিভাগের আই.জি.র যৌথ সুপারিশের ভিত্তিতে স্থানীয় সরকার এই বিষয়-গুলি সম্পর্কে সিদ্ধান্ত লইবেন। আমরা সবাই জানি যে স্থানীয় সরকার বলিতে কার্যত একটি বিশেষ বিভাগের সচিবকেই বোঝায়। এই বিষয়ে বিশেষজ্ঞ, এই সব বিষয়ে সময় ও শক্তি ব্যয় করিতে পারে এমন সচিব পাওয়া নিশ্চয়ই সহজ নয়। ফলে, স্থানীয় সরকারের উপর দায়িত্ব হস্তান্তর করিলে অবস্থার কোনো উন্নতি ঘটিবে না। সবচেয়ে ভালো উপায়, প্রাদেশিক বোরস্টাল পর্ষদ গঠন করা। বোরস্টাল ব্যবস্থা (বোরস্টাল বিদ্যালয় ও সংশোধিত বোরস্টাল প্রতিষ্ঠান উভয়ই) সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয় সম্পর্কে এই পর্ষৎই হইবে চূড়ান্ত ক্ষমতার অধিকারী। এই পর্ষদে থাকিবেন কারা-বিভাগের আই. জি,, কারা বা রাজস্ব-বিভাগের সচিব, শাস্তিবিজ্ঞানী, মনস্তত্ত্ববিৎ শিক্ষাবিৎ, কারা-সংস্কারে আগ্রহশীল জন-প্রতিনিধি এবং দন্ডকালের পর দন্ডিত ব্যক্তিদের কর্ম-সংস্থান যাঁহারা করিতে পারেন তেমন শিল্পপতি ও ব্যবসায়ী।

লাইসেন্সিং

১২ (১) ধারায় বলা হইয়াছে যে লাইসেন্সধারীদের ক. সরকারী অফিসার, খ. ধর্মনিরপেক্ষ প্রতিষ্ঠান, গ. ধর্মীয় সংস্থা, দায়িত্বশীল ব্যক্তির অধীনে অবশ্যই বাস করিতে হইবে। এরকম বাধ্যতামূলক ব্যবস্থা বাঞ্ছনীয় নয়। এমন ঘটনা তো ঘটতে পারে (বিশেষত অনাথদের ক্ষেত্রে) যে বোরস্টাল বিদ্যালয়ের কোনো বাসিন্দার উপর বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের পূর্ণ আস্থা থাকা সত্ত্বেও যে পরিবেশে সে জন্মিয়াছে ও বড়ো হইয়াছে তদ্দরুণ সে উপরোক্ত কোনো শর্তই পূরণ করিতে পারিল না। প্রশ্ন হইল, তাহাকে কি সুযোগ-সুবিধা (লাইসেন্স) দেওয়া হইবে ? জেল কমিটি সুপারিশ করিয়াছেন যে এরূপ বাসিন্দার কর্ম-সংস্থান হইলে তাহাকে ছাড়িয়া দিতে হইবে। কিন্তু মনে করুন, কিছুদিন

পর বিনা অপরাধে তাহার চাকরি গেল ; তখন কি তাহাকে আবার বোরস্টাল স্কুলে ফেরত পাঠানো হইবে ? এ-সব কথা বিবেচনা করিলে দেখা যাইবে যে এই নিয়মটি অতিশয় কঠোর হইয়াছে। সবচেয়ে ভালো হইবে এই বিষয়ে বাঁধা-বাঁধি না রাখা— যাহাতে উপযুক্ত অবস্থামতে অনুজ্ঞাপত্র দেওয়া সম্ভব হয়।

এতক্ষণ যাহা বলিলাম তদনুসারে ১৩ (১) ধারার পরিবর্তন করিতে হইবে। যে প্রতিষ্ঠান, সমিতি বা ব্যক্তির অবেক্ষণাধীনে বয়ঃসন্ধিকালীন অপরাধীকে থাকিতে দেওয়া হয় তাহারা অনুরোধ করিলেই কারাবিভাগের আই. জি. (কিংবা, আমি যাহা সুপারিশ করিয়াছি সেই প্রাদেশিক বোরস্টাল পর্ষৎ) লাইসেন্স প্রত্যাহার করিয়া লইতে বাধ্য থাকিবেন এমন বিধান করা উচিত নয়। অবশ্য এরকম সুপারিশ পাইলে কারাবিভাগের আই. জি. তাহা বিবেচনা করিয়া দেখিবেন। কিন্তু তিনি খোলা মনে নিজের বিবেচনা মতো সিদ্ধান্ত লইবেন। বিশেষত প্রাদেশিক বোরস্টাল পর্ষৎ তো বিশেষজ্ঞদের লইয়া গঠিত একটি সংস্থা হইবে। এ সম্পর্কে সুপারিশ করার ক্ষমতা তাঁহার থাকিবে। ১৩ (২) ধারারও সংশোধন দরকার। এমন পরিস্থিতিও দেখা দিতে পারে যখন কোনো বয়ঃসন্ধিকালীন অপরাধীকে যাঁহার অবেক্ষণাধীনে রাখা হইয়াছে তাহার নিকট হইতে তাহার মুক্ত হইয়া আসা উচিত। যেমন, প্রতি-ষ্ঠান বা সমিতি অবাঞ্ছনীয় চরিত্রের দেখা গেলে বয়ঃসন্ধিকালীন অপরাধীর উচিত তাহার আওতা হইতে নিজেকে মুক্ত করা। সে যদি এইভাবে নিজেকে মুক্ত করিয়া লয় তবে সেজন্য তাহাকে দণ্ড দেওয়া অন্যায় ও অসংগত হইবে।

১৫ ধারা

এই বিলের ১৫ ধারা মতে স্থানীয় সরকারকে যে ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে তাহা ইংরেজি আইন অনুসারে সেক্রেটারি অফ স্টেটকে প্রদত্ত ক্ষমতার অনুরূপ। ভারতীয় জেল কমিটি সুপারিশ করিয়াছেন যে এই ক্ষমতা জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের উপর ন্যস্ত করিতে হইবে। সবচেয়ে ভালো আমি যে প্রাদেশিক বোরস্টাল পর্ষদের কথা বলিয়াছি তাহার উপরই ক্ষমতা অর্পণ করা। বিলের এতৎ-সংক্রান্ত ধারায় বক্তব্য ও বয়ান দুই-ই পালটানো দরকার। 'উভয় প্রকার বর্ণিত' এই শব্দগুলির আরো স্পষ্ট ব্যাখ্যা চাই। শেষ অনুচ্ছেদটিতে অস্পষ্টতার ছাপ রহিয়া গিয়াছে, উহার পুনর্লিখন দরকার। প্রয়োজন হইলে, নজির বা ব্যাখ্যাযুক্ত একটি প্রকরণ জুড়িয়া দিতে হইবে।

অন্যান্য বিষয়

এই বিলটি যাহাতে সাফল্যের সংগে কার্যকর করা যায় ও যে উদ্দেশ্যে বোরস্টাল বিদ্যালয় আরম্ভ করা হইবে সেই উদ্দেশ্য যাহাতে সফল হয় সেজন্য নিম্নলিখিত বিষয়গুলির প্রতি বিশেষ মনোযোগ দেওয়া দরকার।

১. বয়ঃসন্ধিকালীন মেয়েদের জন্য পৃথক ব্যবস্থা করিতে হইবে;

২. যে অফিসারদের উপর বোরস্টাল বিদ্যালয়ের ভার থাকিবে সতর্কতার সংগে তাহাদের বাছিয়া লইতে হইবে। এই সমগ্র প্রকল্পটির সাফল্য সঠিক প্রকৃতির অফিসার নির্বাচনের উপর নির্ভর করিতেছে। তাঁহারা হইবেন উদার, ব্যাপক শিক্ষার অধিকারী, অপরাধমূলক ও অস্বাভাবিক মনস্তত্ত্ব সম্পর্কে ওয়াকিবহাল, কারাসংস্কারের অধুনাতম রীতি-পদ্ধতি সম্পর্কে সচেতন, সর্বোপরি শৃংখলা রক্ষায় সমর্থ।

৩. বোরস্টাল বিদ্যালয়ের যে-সব বাসিন্দা ভালোভাবে চলে তাহাদের মাঝে মাঝে বিদ্যালয় প্রাঙ্গণ হইতে বিশেষ ছুটি লইয়া বাহিরে যাইতে দিতে হইবে। মাসিক গ্র্যাচুইটি হিসাবে তাহাদের কিছু টাকা দিতে হইবে, ঐ টাকা কিভাবে সদ্ব্যয় করিতে হয় তাহাও শিখাইতে হইবে।

৪. বিচারাধীন থাকাকালে বয়ঃসন্ধিকালীন ব্যক্তিদের প্রাপ্তবয়স্কদের নিকট হইতে পৃথক্ রাখিতে হইবে। অন্যথায় তাহাদের কলুষিত হইবার সম্ভাবনা।

৫. আইনে ইহা লিখিত থাকা উচিত যে কোনো বয়ঃসন্ধিকালীন অপরাধীকে বোরস্টাল বিদ্যালয়ে পাঠাইবার আগে তাহাকে ভালো করিয়া পরীক্ষা করিতে হইবে। পরীক্ষায় তাহার দৈহিক বা মানসিক ত্রুটি ধরা পড়িলে সেই ত্রুটির বিশেষ চিকিৎসা করিতে হইবে। অপরাধ-তত্ত্বের বিশদ বিতর্কে প্রবেশ না করিয়াও নিরাপদে বলা যায় যে অনেক ক্ষেত্রেই "অপরাধী" আসলে ত্রুটিযুক্ত মানুষ; একজন স্বাভাবিক মানুষ হইতে গেলে যে জটিল চরিত্র অর্জন করা দরকার তাহা সে অর্জন করিতে পারে নাই; তাই সে সবচেয়ে কম প্রতিরোধের পথ লইয়াছে। যাহারা দৈহিক বা মানসিক গঠনে ত্রুটিযুক্ত, কোনো শিক্ষার সাহায্যেই যাহাদের সংশোধন

করা সম্ভব নয়, তেমন অপরাধীদের জন্য এক বা একাধিক আবাস (হোম) থাকা উচিত। এমন ত্রুটিযুক্ত লোকদের বোরস্টাল বিদ্যালয়ে পাঠাইয়া কোনো লাভ হইবে না, বরং সে জায়গা তাহারা কলুষিত করিয়া তুলিবে। যদি কোনো বয়ঃসন্ধিকালীন অপরাধী সহজাত ত্রুটির অপরাধী বলিয়া দেখা যায় তবে তাহাকে সরাসরি কোনো আবাসে পাঠাইয়া দেওয়া উচিত।

৬. বয়ঃসন্ধিকালীন অপরাধীরা ছাড়া পাইবার পর তাহাদের পরিচর্যার জন্য সরকারকে বিশেষ অফিসার নিয়োগ করিতে হইবে। যে দেশে স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানসমূহ এই কাজের ভার লইতে এখনো সমর্থ হয় নাই সেখানে একরকম অফিসার নিয়োগ করা হয়। তাঁহাদের বলা হয় প্যারোল অফিসার। বয়ঃসন্ধিকালীন অপরাধীরা মুক্তি পাইবার পর যাহাতে জীবিকা অর্জন করিয়া ভদ্রজীবন যাপন করিতে পারে তাহা দেখাই তাঁহাদের কাজ। লাইসেন্স পাইয়া যাহারা ছাড়া পাইয়াছে তাহাদের দেখাশোনা করাও তাঁহাদের কাজ। যদি তাঁহারা দেখেন যে এই বয়ঃসন্ধি-কালীন ব্যক্তিরা ভালোভাবে চলিতেছে না তবে তাঁহারা সঙ্গে সঙ্গে বোরস্টাল বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছে রিপোর্ট দেন। ঐ কর্তৃপক্ষ তখন প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। কোনো আদালতে বয়ঃসন্ধিকালীন অপরাধীদের দণ্ড দিবার আগে তাহাদের সম্পর্কে রিপোর্ট দিবার জন্য এই অফিসারদের অধিকার দেওয়া হয়। প্যারোল অফিসারদের তিন রকম কাজ থাকিবে। বোরস্টাল ব্যবস্থাকে সার্থকভাবে কার্যকরী করিয়া তুলিতে তাঁহারা প্রভূত সাহায্য করিবেন। বয়ঃসন্ধিকালীন ব্যক্তিদের অপরাধের পথ হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিতেও তাঁহারা সাহায্য করিবেন। বলা বাহুল্য, এই অফিসারদের সযত্নে নির্বাচন করিতে হইবে এবং তাঁহাদের যোগ্যতা, দায়িত্ব ও চাকুরির শর্ত পরিষ্কারভাবে বলিয়া দিতে হইবে।

৭. বোরস্টাল বিদ্যালয়ের ভিজিটিং কমিটি (বা স্কুল কমিটি) ও প্রাদেশিক বোরস্টাল পর্ষদের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করিয়া দেওয়া প্রয়োজন। বোরস্টাল বিদ্যালয় সম্পর্কিত যাবতীয় বিষয়ে চূড়ান্ত অধিকার থাকিবে পর্ষদের। ভিজিটিং কমিটি একটি বিশেষ বিদ্যালয়ের ভার লইবেন।

ঐ বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত অফিসারের সঙ্গে ঐ কমিটির সম্পর্ক হইবে একটি সাধারণ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের সঙ্গে বিদ্যালয়-কমিটির যে সম্পর্ক থাকে, তদনুরূপ।

শেষ কথা

কেহ বলিতে পারেন যে আমি বিলটি সম্পর্কে স্মারকপত্রে অতিশয় কঠোর মনোভাব দেখাইয়াছি। কিন্তু এ কথা ভুলিলে চলিবে না যে ভিত্তি ঠিকভাবে স্থাপন না করা হইলে নিছক বোরস্টাল বিদ্যালয় নাম দিলেই তরুণ অপরাধী-দের সংশোধন করা কিংবা বয়ঃসন্ধিকালীন অপরাধ হ্রাস করা যাইবে।

২২ আগস্ট ১৯২৭ বঙ্গীয় বিধান পরিষদে প্রদত্ত ভাষণ।

তথ্য ও উল্লেখ-পঞ্জী

পৃ. ১ ॥ নিখিল বঙ্গীয় যুব-সম্মেলন

ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট হল। ১৮৯৩ খ্রীস্টাব্দে স্থাপিত। স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ইহার প্রতিষ্ঠাতা-সদস্য ও প্রথম সভাপতি। কলিকাতা কলেজ স্কোয়ার অঞ্চলে গোলদীঘির পূর্ব-উত্তর কোণে অবস্থিত। জ্ঞানানুশীলন, শরীরচর্চা ও দেশাত্মবোধক কর্মে জনসাধারণ, যুবক ও ছাত্রদের প্রেরণ দেওয়ার উদ্দেশ্য নিয়ে এই প্রতিষ্ঠানটি স্থাপিত হয়। তদানীন্তন কলিকাতার বুধ-মণ্ডলী এই প্রতিষ্ঠান স্থাপনের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন ও ইহার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ইনস্টিটিউটের প্রশস্ত হলটিতে জনসভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানাদি হত। কলকাতার রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে এই প্রতিষ্ঠানের বিশিষ্ট স্থান ছিল। ইহা এখনো বর্তমান।

পৃ. ৯। ছাত্রসমাজের কর্তব্য

প্রমোদকুমার ঘোষালের সভাপতিত্বে এই সভা অনুষ্ঠিত হয়। পণ্ডিত জহওরলাল নেহরু, মি. কে. এফ. নরিম্যান ও সুভাষচন্দ্র বসু ছাত্রদের কর্তব্য সম্বন্ধে ভাষণ দেন।

পৃ. ১১ ॥ স্বরাজের জন্য আত্মত্যাগ করুন

লেনিন। ভ্লাদিমির ইলীচ উলিয়ানভ (১৮৭০-১৯২৪) ১৯১৭ সালের নভেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত রুশ-বিপ্লবের প্রধান নায়ক, সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা এবং আন্তর্জাতিক শ্রমিক আন্দোলনের বিখ্যাত বিপ্লবী নেতা। মার্ক্সবাদী চিন্তাধারা প্রতিষ্ঠানকল্পে তিনি বহু গ্রন্থ রচনা করেছেন।

পৃ. ১৬ ॥ দণ্ডিত সম্পাদকের সম্বর্ধনা

সত্যরঞ্জন বক্সী। সুভাষচন্দ্রের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সহযোগী ও সহকর্মী। ১৪ জুলাই ১৮৯৭ (বাংলা ৩১ আষাঢ় ১৩০৪) অবিভক্ত বাংলার বরিশাল জেলার বারথি গ্রামে জন্ম। ১৯১৩ বরিশাল জেলার গাভা হাইস্কুল থেকে ম্যাট্রিকুলেশন, ১৯১৫ ঢাকা জগন্নাথ কলেজ থেকে আই. এ., কলিকাতার সিটি কলেজ থেকে বি.এ., এবং ১৯১৯ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম.এ., ১৯২০ বি. এল. পাস করেন। ১৯২৩ গোড়ায় দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন ও সুভাষচন্দ্র বসুর সহিত পরিচয়। সে-বছর দৈনিক ইংরাজী 'Forward'এ

যোগদান ; ১৯২৫-এ দেশবন্ধুর মৃত্যুর পর 'Forward'-এর সম্পাদক। ১৯২৯-এ 'Forward' বন্ধ হয়ে গেলে দৈনিক 'Liberty'-র আত্মপ্রকাশ এবং তার সম্পাদক। ১৯৩৮-এ বন্দীশালা থেকে মুক্তির পর 'Advance'-এর সম্পাদক। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর 'Nation' এবং 'Nationalist' দৈনিকের ক্রমান্বয়ে সম্পাদক। 'Socialist Republic' পত্রিকার সম্পাদক।

১৯১১ বৈপ্লবিক গুপ্ত আন্দোলনে যোগদান। পরবর্তীকালে 'বি. ভি' গঠিত হ'লে তার অন্যতম নেতা। সংবাদপত্রের সম্পাদকরূপে রাজদ্রোহের অপরাধে কয়েকবার কারাবরণ এবং কলিকাতার প্রেসিডেন্সি ও আলিপুর জেলে অবস্থান। ১৯৩২ থেকে ১৯৩৮ পর্যন্ত রাজবন্দীরূপে বক্সা ও দেউলীশিবিরে বন্দী। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় দিল্লীর লাল কেল্লায়, বেরিলী, নৈনী, আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে বন্দী। ১৯৪৬-এ মুক্ত।

১৯২৩ থেকেই বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি এবং নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সদস্য। সর্বভারতীয় 'ফরওয়ার্ড ব্লক' দল গঠনের পর থেকে এর সম্পাদক। সোশ্যালিস্ট রিপাবলিক দলের সম্পাদক। Constituent Assembly-র সদস্য থাকাকালীন দেশবিভাগের বিরোধিতা করেন।

ফরওয়ার্ড। ১৯২৩ সালে দেশবন্ধু কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়। তিনি ছিলেন সম্পাদক-মন্ডলীর সভাপতি। দেশবন্ধুর কারাবাসের সময় এই পত্রিকার পরিকল্পনা করা হয়েছিল। তাঁর ও সুভাষচন্দ্রের প্রথমবারের কারামুক্তির পর এই পত্রিকা প্রকাশ ও পরিচালনার দায়িত্ব প্রধানত পড়েছিল সুভাষচন্দ্রের উপর। তিনি কলিকাতা কর্পোরেশনে চীফ এক্সিকিউটিভ অফিসার রূপে যোগ দেবার আগে পর্যন্ত এই পত্রিকা পরিচালনায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন। এটি সেযুগে ভারতবর্ষের সর্বাধিক প্রভাবশালী ইংরেজি দৈনিক সংবাদপত্রে পরিণত হয়েছিল। ১৯২৯ সালে সরকার এর বিরুদ্ধে একটি মামলা দায়ের করলে এর প্রকাশ বন্ধ করতে হয় কিন্তু 'লিবার্টি' নাম গ্রহণ করে এর তৎক্ষণাৎ আত্মপ্রকাশ হয়। সেসময়ও সুভাষচন্দ্র এর প্রকাশনা ও পরিচালনার সংগে যুক্ত ছিলেন। ফরওয়ার্ড পাবলিশিং কোম্পানি নামে একটি রেজিস্টার্ড কোম্পানি এই পত্রিকাটি প্রকাশের দায়ভার বহন করত।

বাংলার কথা। ইংরেজি 'ফরওয়ার্ড' পত্রিকার মতোই দেশবন্ধু-প্রতিষ্ঠিত দৈনিক সংবাদপত্র। সুভাষচন্দ্র বহু শ্রম স্বীকার করে অতি ক্ষুদ্র আকার থেকে একে গড়ে তোলেন ও ক্রমে এটি বাংলার একটি প্রধান দৈনিকে পরিণত হয়।

১৯২৯ সালে সরকারী মামলার কোপে এরও প্রকাশ বন্ধ হয়ে যায় কিন্তু অবিলম্বে 'বঙ্গবাণী' নাম গ্রহণ করে আত্মপ্রকাশ করে। সে যুগে এই দৈনিক পত্রিকা স্বরাজ-আন্দোলনের প্রধান মুখপত্র ছিল।

পৃ. ১৭ ॥ কংগ্রেসের কার্যপদ্ধতি

জানাঞ্জন নিয়োগী। (১৮৯৮-১৯৫৬) ছাত্রাবস্থায় ১৯০৫ খ্রীস্টাব্দে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে আকৃষ্ট হন। শিক্ষিত যুবকদের নিয়ে 'ব্যান্ড অফ হোপ' গঠন করেন। 'পল্লীশ্রী সঙ্ঘ' ও 'দেশবন্ধু পল্লীসংস্কার সমিতি' গ্রামোন্নয়ন সংগঠন-কল্পে দুটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন। এই দুই প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে তিনি নিরক্ষর ও দেশের সর্বসাধারণের মধ্যে চেতনা-সঞ্চার ও শিক্ষা-প্রসারের জন্য ম্যাজিক লণ্ঠন সহযোগে বক্তৃতা দিতেন। দেশের ডাক, বিপ্লবী বাংলা, ভারতে তুলার চাষ, ভারতে কাপড়ের ইতিহাস, বিলাতী বস্ত্র বর্জন করিব কেন প্রভৃতি প্রসঙ্গ ম্যাজিক লণ্ঠন সহযোগে বক্তৃতাবলীর অন্যতম। 'শ্রমজীবী বিদ্যালয়' নামে নৈশ বিদ্যালয় স্থাপন করেন, উদ্দেশ্য-প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার সঙ্গে পুস্তক-বাঁধাই, দর্জির কাজ, খাতা ও চামড়ার দ্রব্যাদি তৈরির কাজ, সাইনবোর্ড আঁকা প্রভৃতি কারিগরী শিক্ষা প্রদান। তিনি আমৃত্যু এর পরিচালনা করেছেন।

নৃপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। (১৮৮৫-১৯৪৯) দেশবন্ধুর আহ্বানে সরকারী চাকরি ত্যাগ করে স্বরাজ্যদলে যোগ দেন ও অসহযোগ আন্দোলনে কারারুদ্ধ হন। 'রেঙ্গুন মেল' পত্রিকার সম্পাদনা করেন। হুগলী জেলা কংগ্রেসের বিশিষ্ট কর্মী ছিলেন।

রাষ্ট্রীয় মহিলা সংঘ। বিভাবতী বসুর নেতৃত্বে সংগঠিত একটি মহিলা সংস্থা। দেশের মুক্তি আন্দোলনে অংশ গ্রহণের উদ্দেশ্যে গঠিত হয়েছিল। পরবর্তীকালে লুপ্ত হয়ে যায়।

ছাত্রী সংঘ। ১৯২৮ সালে কল্যাণী দাস তাঁর সহপাঠী ও বন্ধু সুরমা মিত্র, কমলা দাশগুপ্ত প্রভৃতির সহযোগিতায় 'ছাত্রী সংঘ' সংগঠন করেন। এর সভানেত্রী ছিলেন সুরমা মিত্র ও সম্পাদিকা কল্যাণী দাস। বিশিষ্ট বিপ্লবী দীনেশ মজুমদার এই 'ছাত্রী সংঘ'-র মেয়েদের লাঠি ও ছোরা খেলা শিক্ষা দিতেন।

অভয় আশ্রম। গান্ধীবাদে বিশ্বাসী ও গঠনমূলক কর্মে আস্থাশীল এই

প্রতিষ্ঠানটি বিশের দশকে কুমিল্লায় প্রতিষ্ঠিত হয়। ড. সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ড. প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ ও ড. নৃপেন্দ্রচন্দ্র বসু এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে এই সংস্থা কার্যরত আছে।

পৃ. ৩৭ ॥ ছাত্র ও রাজনীতি

ড. আকুহার্ট (Rev. U. S. Urquhart) অধ্যক্ষ স্কটিশ চার্চ কলেজ ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য (১৯৩০)।

পৃ. ৪৬ ॥ বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন ও বিদেশী বস্ত্রের বহ্নুৎসব

সিমলা ব্যায়াম সমিতি। যুগান্তর বিপ্লবীদলের অতীন্দ্রনাথ বসু ১৯০৫ সালে যুবকদের শরীর গঠনের উদ্দেশ্যে এই ব্যায়াম সমিতি প্রতিষ্ঠা করেন ; প্রথম ভারতীয় প্রথায় কুস্তি-প্রতিযোগিতার আয়োজন করেন। এই ব্যায়াম সমিতির প্রাঙ্গণে ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে শক্তি-আরাধনার উদ্দেশ্যে সর্বজনীন দুর্গোৎসবের ও স্বদেশী মেলার আয়োজন করা হত। সমিতিটি আজও বর্তমান।

পৃ. ৭৭ ॥ অভিভাষণ

বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলন রংপুর ইশান নগরে অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনের সভাপতি সুভাষচন্দ্র বসু। সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে রংপুর যুব-সম্মেলনের সভাপতি কথা-সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ও উপস্থিত ছিলেন। এ ছাড়া যাঁরা যোগ দিয়েছিলেন— অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি নলিনীমোহন রায় চৌধুরী, ড. প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যার, ললিতমোহন দাস, তারকনাথ মুখার্জী, কিরণশঙ্কর রায়, নলিনীরঞ্জন সরকার, জে. এন. মৈত্র, রণজিৎ পাল চৌধুরী, অধ্যাপক নৃপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীমতী লতিকা বসু, জ্যোতির্ময়ী গাঙ্গুলী, ড. ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত ও আরো অনেকে।

রাজেন্দ্রলাল আচার্য। শিশু সাহিত্যে তাঁর উল্লেখযোগ্য অবদান রয়েছে। ফরাসী শিশু সাহিত্যিক জুল ভার্নের গ্রন্থের অনুবাদকরূপে তাঁর বিশেষ পরিচিত।

পৃ. ১০৪ ॥ জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের স্মৃতি

জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ড ১০ এপ্রিল ১৯১৯।

পৃ. ১০৫ ॥ বীর পূজা

বীর যুবক খড়্গবাহাদুর। একজন বিপন্না নারীর সম্মান রক্ষার্থে নরহত্যার অভিযোগে এই নেপালী যুবক অভিযুক্ত ও বিচারে দণ্ডিত হয়েছিলেন। কিন্তু বাংলায় তাঁর বিচারে আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছিল। তাঁকে বহু উচ্চ প্রশংসায় ভূষিত করে সভা-সমিতিতে প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল। তিনি কারামুক্ত হ'লে তাঁকে প্রকাশ্য সম্বর্ধনা জানানো হয়।

পৃ. ১০৬ ॥ নর্বানর্বাচিত মেয়র

যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত। জন্ম ১৮৮৫, মৃত্যু ১৯০৩। চট্টগ্রাম জেলার বরমা গ্রামে জন্ম। পিতা যাত্রামোহন সেনগুপ্ত। কলিকাতা হেয়ার স্কুল থেকে প্রবেশিকা পাস করে ইংলন্ড যান; কেম্ব্রিজ থেকে বি. এ. পাস করেন ও ব্যারিস্টার হয়ে দেশে ফেরেন। তিনি ছিলেন স্বরাজ্য দলের একজন স্তম্ভ, বঙ্গীয় আইন পরিষদের স্বরাজ্যদলের নেতা, বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসের সভাপতি ও কলিকাতা কর্পোরেশনের মেয়র। দেশবন্ধুর অন্যতম সহকারী যতীন্দ্রমোহন পরবর্তী কালে সুভাষচন্দ্রের বিরোধিতা করেন। তিনি ছিলেন বাগ্মী ও আদর্শবাদী নেতা। নেলী সেনগুপ্তা তার সহধর্মিণী ছিলেন।

পৃ. ১০৯ ॥ কাজের কৈফিয়ত

জামালপুরে অনুষ্ঠিত যুব-সম্মেলন, ছাত্র-সম্মেলন ও প্রাদেশিক সম্মেলনে যোগদানের জন্য সুভাষচন্দ্রের সংগে ছিলেন শ্রীঅমরচন্দ্র চক্রবর্তী, সৈয়দ জালালুদ্দিন হাসেমি, যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত, নলিনীরঞ্জন সরকার, শ্রীমতী লতিকা বসু, শ্রীমতী জ্যোতির্ময়ী গাঙ্গুলী, ড. ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত।

'বন্দেমাতরম' পত্রিকা। ১৯০৬ সালের ৬ আগস্ট বিপিনচন্দ্র পালের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়। সম্পাদকমণ্ডলীর মধ্যে অরবিন্দ ঘোষ, শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী, হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ প্রভৃতি ছিলেন। এই পত্রিকার ওজস্বী রচনা ভারতে জাতীয়তাবাদের বিকাশে প্রভূত সাহায্য করেছিল। অরবিন্দ ঘোষের এক স্বাক্ষর-বিহীন প্রবন্ধ প্রকাশের দায় আপন প্রবন্ধে স্বীকার করে নিয়ে বিপিনচন্দ্র ছয় মাসের কারাদণ্ড ভোগ করেন। এই পত্রিকার প্রভাব সারা ভারতে বিস্তৃত হ'লেও দীর্ঘায়ু হয় নি।

পৃ. ১২৩ ॥ শ্রীহট্ট জেলা ছাত্র-সম্মিলনী

সুর্মা ভ্যালি ছাত্র-সম্মেলনের চতুর্থ বার্ষিক সভায় অনিবার্যকারণবশত সুভাষচন্দ্র উপস্থিত হতে পারেন নি। বসন্তকুমার দাস সম্মেলনের সভাপতিত্ব করেন এবং তিনিই সুভাষচন্দ্রের মুদ্রিত ভাষণটি পাঠ করেন।

পৃ. ১৩৮ ॥ আদর্শবাদই যুব-আন্দোলনের প্রাণ

যশোর-খুলনা যুব-সম্মেলন যশোরের কালিয়ায় অনুষ্ঠিত হয়। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি শ্রীভূপেশচন্দ্র দাশগুপ্ত। কলকাতা থেকে সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে গিয়েছিলেন শ্রীমতী মোহিনী দেবী, শ্রীমতী জ্যোতির্ময়ী গাঙ্গুলী, শ্রীপ্রতুলচন্দ্র গাঙ্গুলী। এই সম্মেলনের সঙ্গে আয়োজিত শিল্প-মেলার উদ্বোধন করেন শ্রীমতী মোহিনী দেবী।

পৃ. ১৪৫ ॥ শ্রমিক-ধর্মঘট

টিনপ্লেট শ্রমিকদের ধর্মঘট। জামশেদপুর ইস্পাত কারখানার কাছে এই টিনপ্লেট কোম্পানিটি অবস্থিত ছিল। দীর্ঘকাল এই কারখানায় শ্রমিক-ধর্মঘট চলেছিল। সুভাষচন্দ্র এই কারখানার শ্রমিক-আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন।

পৃ. ১৪৬ ॥ সতীন সেনের অনশনব্রত ভঙ্গের জন্য অনুরোধ

সতীন সেন। [১৮৯৪-১৯৫৫] দশবছর বয়সে চারণকবি মুকুন্দ দাসের স্বদেশী গানে উদ্বুদ্ধ হয়ে গৃহত্যাগ করে পথনির্দেশের জন্য বরিশালের বরেণ্য মহাত্মা অশ্বিনীকুমার দত্তের নিকট উপস্থিত হন। অশ্বিনীকুমার বালক সতীন্দ্রনাথকে বাড়ি পাঠিয়ে দেন। পরে বরিশাল শঙ্করমঠে প্রজ্ঞানন্দের সংস্পর্শে এসে 'যুগান্তর' বৈপ্লবিক দলের সঙ্গে যুক্ত হন। ১৯১৫ খ্রীস্টাব্দে অসহযোগ আন্দোলনের সময় কৃষ্ণনগরে নিকটবর্তী রাজনৈতিক ডাকাতিতে অংশগ্রহণ করেন এবং মামলায় চার বছর কারারুদ্ধ হন। অসহযোগ আন্দোলনের সময় একটি যুব-বাহিনী গড়ে তোলেন এবং বিদেশী বস্ত্র বর্জন আন্দোলনে গ্রেপ্তার হন। ১৯২৪ সালে পিরোজপুর সম্মেলনে বরিশাল জেলা কংগ্রেসের ভার তাঁকে দেওয়া হয়। ১৯২৬-এর ইউনিয়ন বোর্ড করবন্ধ আন্দোলন এবং পটুয়াখালি সত্যাগ্রহ আন্দোলন তাঁরই নেতৃত্বে পরিচালিত হয়। ১১২৯ সালে পুনরায় তিনি গ্রেপ্তার হন। এই সময় একদিকে লাহোরে যতীন্দ্রনাথ অন্যদিকে বরিশালে সতীন্দ্রনাথ অনশন আরম্ভ করেন। ১০৮ দিন অনশনের পর সতীন

সেন সুভাষচন্দ্রের অনুরোধে অনশন ভঙ্গ করলেন। ১৯৩১-এ মুক্তিলাভ এবং পুনরায় ১৯৩২-৩৭ ও ১৯৪২-৪৫ কারান্তরালে কাটান। দেশবিভাগ-বিরোধী সতীন সেন পূর্ববাংলায়ই থেকে যান এবং নানা আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন এবং বার বার কারান্তরালে কাটান, অবশেষে জেলেই রহস্যজনকভাবে তাঁর মৃত্যু ঘটে।

পৃ. ১৫৫ ॥ বরিশাল জেলা রাষ্ট্রীয় সম্মেলন

রসুল, আবদুর (মৌলভী)। (১৮৭২-১৯১৭) কলিকাতা হাইকোর্টের একজন প্রতিষ্ঠিত আইনজীবী ছিলেন। ১৯১৩-১৬ জাতীয় শিক্ষা পরিষদের সম্পাদক ছিলেন। ১৯০৬ সালে প্রাদেশিক সম্মেলনের সভাপতি নির্বাচিত হন। **মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা**। (১৮৫৮-১৯১৯) বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর শিষ্য ছিলেন। ১৯০৪ সালে গিরিডিতে অভ্র ব্যবসা শুরু করেন এবং ক্রমে প্রতিষ্ঠালাভ করেন। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে যোগ দেন। তিনি ছিলেন সুবক্তা। 'নবশক্তি' নামে বিপিন পালের সঙ্গে যুগ্ম-সম্পাদনায় পত্রিকা বের করেন। পরে প্রেস ও পত্রিকাটি বাজেয়াপ্ত হয়। ১৯০৮ সালে দু' বছরের জন্য ইনসিন জেলে বন্দী ছিলেন। তাঁর 'মনোরমার জীবনচিত্র' একটি উল্লেখযোগ্য বই।

বিপিনচন্দ্র পাল। (১৮৫৮-১৯৩২)। ১৯৭৩ সালে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে কলকাতায় প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হন। শিবনাথ শাস্ত্রীর প্রভাবে ব্রাহ্ম হন। কিন্তু বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর নিকট পরে দীক্ষিত হয়ে হিন্দু ধর্মে ফিরে আসেন। ১৮৮৫ সাল থেকে তিনি কংগ্রেস ও জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হন। ১৯০১ সালে ইংরেজি সাপ্তাহিক 'নিউ ইন্ডিয়া' প্রকাশ ও সম্পাদনা করেন। ১৯০৬ সালের ৬ আগস্ট তাঁর সম্পাদনায় ইংরেজি দৈনিক 'বন্দেমাতরম' প্রকাশিত হয়। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন ও পরবর্তীকালে তিনি ভারতের একজন শ্রেষ্ঠ বাগ্মী, রাজনৈতিক নেতা ও যশস্বী লেখকরূপে পরিচিত হন। তিনি বহু গ্রন্থাদি লিখেছেন ও সুবিখ্যাত "লাল-বাল-পাল"-এর অন্যতম ছিলেন।

পৃ. ২১৭ ॥ বাংলায় অশান্তি

ড. আলম। ইনি পাঞ্জাববাসী মুসলমান। কংগ্রেসের উৎসাহী নেতা ও বামপন্থী। লাহোর থেকে যতীন দাসের শবদেহ সঙ্গে করে কলকাতায়

এসেছিলেন। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ছিলেন সুভাষচন্দ্রের সমর্থক। বাংলায় ছাত্র সম্মেলনে যোগ দিতে এসেছিলেন।

তুলসীচন্দ্র গোস্বামী। (১৮৯৮-১৯৫৭) ১৯২১ বিলাত থেকে ব্যারিস্টারি পাস করে এসে কলকাতায় আইন ব্যবসা শুরু করেন এবং অল্পদিনের পর দেশবন্ধুর ডাকে স্বরাজ্য দলে যোগদান করেন। 'ফরওয়ার্ড' পত্রিকার একজন ডিরেকটর ছিলেন এবং কখনো কখনো সম্পাদকীয়ও লিখতেন। সুবক্তা, গ্রীক লাটিন ও জার্মান ভাষায় দক্ষ ছিলেন। ইংরাজী ও সংস্কৃত সাহিত্যের অনুরাগী ছিলেন। বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় কংগ্রেসদলের সহকারী নেতা নির্বাচিত হন, নাজিমুদ্দিন মন্ত্রীসভায় অর্থমন্ত্রী হিসেবে যোগ দেন।

যতীন দাস। (১৯০৪-১৯২৯) পিতা— বঙ্কিমচন্দ্র দাস। ১৯২১ সালে বঙ্গবাসী কলেজে আই.এ. পড়ার সময় ১৭ বছর বয়সে অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেন। ১৯২৩ সালে বিপ্লবী শচীন সান্যালের সংস্পর্শে বিপ্লবী দলে যোগ দেন। দক্ষিণেশ্বর বিপ্লবী গোষ্ঠীর সহায়তায় দেওঘরে গিয়ে তিনি বোমা তৈরী শিক্ষা করেন। এই গোষ্ঠীর নেতৃবৃন্দ গ্রেপ্তার হলে যতীন দাসও গ্রেপ্তার হন এবং তিন বছর কারাভোগ করেন। ১৯২৮ সালে কলকাতা কংগ্রেসে সুভাষচন্দ্র-পরিচালিত আধা-সামরিক স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীতে যতীন দাস মেজর হন। ভগৎ সিং প্রমুখ গ্রেপ্তারের সূত্রে কলকাতায় যতীন দাসও গ্রেপ্তার হন। জেলে রাজনৈতিক বন্দীদের প্রাপ্য মর্যাদা ও অধিকারের দাবিতে অন্যদের সঙ্গে যতীন দাসও অনশন করেন। লাহোর জেলে ৬৩ দিন অনশনের পর যতীন দাস দেহত্যাগ করেন। তাঁর আত্মদানে সারা ভারত আলোড়িত হয়েছিল।

পৃ. ২৫৪ ॥ পূর্ণ স্বাধীনতা

সৈফুদ্দিন কিচলু। (১৮৮৮-১৯৬৩) পাঞ্জাব-ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসে তাঁর অবদান উল্লেখযোগ্য। ১৯১৯ সালে রাওলাট আইন বিরোধী বিক্ষোভ সংগঠিত করেন এবং ১৯২১ সালে ভারতীয় সেনাবাহিনীকে বিদ্রোহের উদ্দেশ্যে উদ্দীপিত করার অভিযোগে আলীভ্রাতৃদ্বয়, জগৎগুরু শংকরাচার্য, মৌলানা হুসেন আহমদ মাদানী প্রভৃতির সঙ্গে কারারুদ্ধ হন। বাগ্মিতার জন্য তিনি বিখ্যাত ছিলেন। ১৯২৯ এর জাতীয় কংগ্রেসের লাহোর-অধিবেশনে তিনি ছিলেন অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি। জাতীয়তাবাদী চিন্তাধারায়

বিশ্বাসী ড. কিচলু শেষ জীবনে কংগ্রেসের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক নীতিতে সহমত হতে পারেন নি এবং কম্যুনিস্ট মতাদর্শে অধিক আস্থাশীল হয়ে ভারতীয় কম্যুনিস্ট পার্টির সঙ্গে যুক্ত হন।

আব্দুল বারি। (?—১৯৪৭) রাজনৈতিক জীবনের শুরু খিলাফৎ আন্দোলনের সময়। ১৯২৩ সালে বিহার স্বরাজ্য দলে যোগ দেন। জওহরলাল নেহরু ও সুভাষচন্দ্র প্রতিষ্ঠিত ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্স লীগের সদস্য ছিলেন। বিহার ব্যবস্থাপক সভার সদস্য হন এবং ১৯৩০ সালে কংগ্রেসের ডাকে পদত্যাগ করেন। ১৯৩৭ সালে পুনর্নির্বাচিত হয়ে ডেপুটি স্পিকার হন। বিহারে সমাজবাদী আন্দোলনের তিনি পুরোধা ছিলেন, ১৯৪৬ বিহার প্রাদেশিক কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হন। একটি আকস্মিক দুর্ঘটনায় তাঁর মৃত্যু ঘটে।

পৃ. ৩০১। লাহোর-কংগ্রেসে ভাষণ : প্রতি-সরকার গঠনের প্রস্তাব

২৯ ডিসেম্বর ১৯২০, রবিবার বিকাল ৫টায় লাহোর লাজপত নগরে জাতীয় কংগ্রেসের ৪৪তম অধিবেশন শুরু হল। এই অধিবেশনে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ছিলেন ড. সৈফুদ্দিন কিচলু। মূল সভাপতি পন্ডিত জওহরলাল নেহরু হিন্দীতে তাঁর দীর্ঘ ভাষণ পাঠ করলেন।

দ্বিতীয় দিনে প্রধান সম্পাদক ড. আনসারী, বিদেশ থেকে প্রাপ্ত বাণীসকল পাঠ করে শোনালেন ; তারপর প্রথম প্রস্তাব উত্থাপন করলেন মহাত্মা গান্ধী। ভাইসরয়ের ট্রেনে বোমা নিক্ষেপ কংগ্রেসের আদর্শ বিরোধী এবং এজন্য নিন্দাসূচক এই প্রস্তাবের সমর্থনে মহাত্মাগান্ধী ইংরাজী ও হিন্দীতে ভাষণ দিলেন। স্বামী গোবিন্দানন্দ, ড. আলম প্রস্তাবের বিরুদ্ধে বক্তব্য রাখলেন।

মহাত্মা গান্ধীর দ্বিতীয় প্রস্তাব স্বাধীনতার প্রস্তাব। পূর্ণ স্বাধীনতা এবং সেই উদ্দেশ্যে আইন পরিষদের সকল কাজে বয়কট ; পন্ডিত মতিলাল নেহরু প্রস্তাবের সমর্থনে আবেদন রাখলেন। পন্ডিত মদনমোহন মালব্য ও মি. কেলকার, সংশোধনী প্রস্তাব উত্থাপন করলেন।

সুভাষচন্দ্র আনলেন পাল্টা প্রস্তাব। পরিশেষে মহাত্মাগান্ধীর প্রস্তাবই গৃহীত হল, সাত ঘন্টা ব্যাপী বিতর্কের জবাব দিতে গিয়ে মহাত্মা গান্ধী বলেন :

...'Let it not be said in that world that divided counsaels pr e

vailed on the question of independence. Let it go forth to the world that we rose to a man to vindicate our freedom and pledged ourselves to attain that absolute freedom, in the quickest manner possible. Therefore, I ask you to reject the motion of Mr. Subhas Bose. I know he is a great worker in Bengal. He was the General Officer Commanding of our force in Calcutta. But his proposition, though it is no doubt a good one, suggests parallel government. Do you think you can establish a parallel government when the Congress flag does not fly even in a thousand villages ? It is not bravery or wisdom and you cannot establish freedom by merely passing resolutions. We are not declaring independence, mind you'...

পৃ. ৩১০ ॥ প্রতিলিপি

এই চিঠিটি লিখেছিলেন তৎকালীন মুর্শিদাবাদ জেলা কংগ্রেসের সভাপতি ব্রজভূষণ গুপ্ত (অ্যাডভোকেট) মহাশয়ের নিকট। চিঠিতে উল্লিখিত মি. সেনগুপ্ত, দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত। একদিকে বিপজ্জনক ব্যক্তি সুভাষচন্দ্রকে সর্বদিকে পর্যুদস্ত করার জন্য ব্রিটিশ সরকারের সজাগ দৃষ্টি অন্যদিকে তৎকালীন-কংগ্রেস সাংগঠনিক নিয়ামকের পদ ও নেতৃত্ব থেকে সুভাষচন্দ্রকে দূরে রাখতে তৎপর।

নির্দেশিকা

অখিল চন্দ্র দত্ত ২২৩, ২২৪
অখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস ১৮৬
অংগদেশ ৭৯
অদুনা-পদুনা ৭৮
অমরাবতী ২৬৬, ২৭৬
'অমৃতবাজার পত্রিকা' ২২৪
অমৃতসর ২৪১, ২৪৪, ২৪৫, ২৪৮
অমৃতসর কংগ্রেস ২৪১, ২৪৮
অরবিন্দ ঘোষ ১১০, ১৬৯
অর্জুন ২৮, ৫৬, ১২৬
অখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস ১৮৭
অশ্বিনীকুমার দত্ত ১৫৫
অসবর্ণ বিবাহ ১৭৩
অসহযোগ আন্দোলন ৩৮, ৯৩ ১৪৭, ১৫৫, ১৬১, ১৬২, ১৬৩, ১৬৯

অহল্যাবাঈ ১২১
আইন অমান্য ১৬৪, ১৬৫
আইনসভা ১৮৬, ১৮৭
আকবর ৮৬
আকবর শাহ আলি ৮৬
'আনন্দমঠ' ৬৯, ৭৮
আন্তর্জাতিক শ্রম সম্মেলন ২৭৮
আন্দামান ২১৮, ২৩১
আমেরিকা ৪৩, ৭২
আলম, ড. ২১৭, ২১৮, ২৩০ ২৮৩, ২৮৪
আয়ারল্যান্ড ৪৩, ৯৫, ১১১ ২৪৭, ২৬১
আর্কহার্ট, ড. ৩৭
আমস্টার্ডাম ১৮৭
আমানুল্লা ১৯৭
আলাওল ৮৭
অ্যারিস্টটল ১৮২
অ্যালবার্ট হল ৬৩, ১৪৪
অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস ১০
ইংলন্ড ৭১, ৭২, ৯৪, ১৩৮, ২৫৬
ইউয়ান চোয়াং ৮২
ইউরোপ ১১৭, ২৩৫, ২৩৬
ইটালী ১৩৮
ইনসিন জেল ২১৮
ইন্দ্রায়ুধ ৮৪
ইন্ডিয়ান চেম্বার অফ কমার্স ১৮৭
ইন্দো-বর্মা কোম্পানি ২৪৯
ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ৮৭
ইস্ট ইন্ডিয়া রেল ইউনিয়ন ১৬৮
ইস্পাত শিল্প ইউনিয়ন, ইংল্যান্ড ১৮১
উইলসন ৯৯, ১১৭
উড়িষ্যা ১০২, ১৮৬
উমিচাঁদ ৩৫, ৪০, ৪৫, ৪৯, ৫০, ১১২, ১৩৭
এলান ভাইটাল ২৭০

এলিস, মিস্ ১২৪
এস. কে. প্রামাণিক ১৯১
এশিয়া ৯৪, ২৩৬
এশিয়াটিক পেট্রোলিয়াম কোম্পানি ২৪৯
ওয়েলস প্লেট ও সীট ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যাসোসিয়েশন ১৮৭
ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন ২৫৫
কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি ২২১
কতন ৮৬
কপিলমুনি মন্দির ১৫১
কবীর ৮৬
কমরালি ৮৬
কম্যুনিস্ট আন্দোলন ৯৪
কর্ণাট ৭৯
কলিকাতা ২১৮, ২৪৩
কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট ১
কলিকাতা-কংগ্রেস ১৭, ২১, ৫৪ ১৩২, ১৫৩, ১৬৪, ২১৩, ২১৪, ২৪৪, ২৪৬, ২৫৫, ২৫৬
কলিকাতা কর্পোরেশন ২৩, ৯৭, ১০৬, ২২৩
কলিকাতা টাউন হল ২৫৭
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ৩৭, ১৩১-৩২
কাইজার ৩০, ৬৩
কাউন্সিল বর্জন ১৬২
কান্যকুব্জ ৮৩
কামরূপ ৭৮
কার্ল মার্কস ৩৪, ৯০
কাশীরাম ৮৬
কিরণশঙ্কর রায় ৪১, ৫২, ২২২
কিরীটেশ্বরী ৮৭
কিশোরগঞ্জ ১১৩
কুয়োমিনটাং ৯৫
কৃত্তিবাস ৮৬
কৃষক-আন্দোলন ২৪০
কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ ৮৫
কেশবচন্দ্র সেন ১৬৮, ১৮৩
কোটাচাঁদপুর ১৪৯
খড়্গবাহাদুর সিং ১০৫, ১১৬ ১২৪, ১২৭, ১৩১, ১৮৪
খদ্দর ও স্বদেশী প্রচার ১৬৫
খুলনা ১৩৮, ১৪২
ক্ষণা (খনা) ১২৫
ক্ষেমানন্দ ৮৬
গয়া-কংগ্রেস ১৬২
গান্ধার ৮৪
গার্গী ৬৮, ১২৫
গিরনি কামগার ইউনিয়ন ২৭৭, ২৭৮
গুরদিৎ সিং ১৯, ১৭৫, ১৮৭
গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ৫১
গোপালদেব ৭৯, ৮৪
গোপীচন্দ্র ৭৮
গোলমুড়ি ১৭৯, ১৮৬, ১৮৯
গোল টেবিল বৈঠক ২৪৬, ২৫৫
গৌড় ৮৬
গৌতম বুদ্ধ ২৯, ৫৬, ৭৫
গৌরাঙ্গ ৮৫, ৮৬

চট্টগ্রাম জেলা সম্মেলন ১৩৫
চট্টগ্রাম বিরোধ ২২৪
চন্ডিদাস ৮৬, ১১৩
চিত্তরঞ্জন দাস, দেশবন্ধু ১৪, ১৬ ২২, ২৬, ৪৭, ৮০, ৮৯, ৯০, ৯৪, ১০২, ১০৭, ১১২, ১৩৪, ১৪৪, ১৪৫, ১৪৬, ১৫৬, ১৬৯, ১৬৯, ১৭০, ২২৫, ২৩২, ২৮১
চীন ৩০, ৮২, ৯৬, ১১৮, ১৩৮, ১৮২, ১৯৯, ২৪০
চীনা ইতিহাস ২৪০
ছাত্র-আন্দোলন ৯৭, ২৪০
ছুটি খাঁ ৮৬
জওহরলাল নেহরু ১৮৭, ২৭৬ ২৭৭, ২৮৩
জগদীশচন্দ্র ৭০, ৮৮
জাতীয় পতাকা ২১৭
জাতীয় সপ্তাহ ১০৪
জাপান ১১২, ২৩৬
জামশেদপুর ২৭, ১৪৫, ১৭৫ ১৭৬, ১৮৬, ১৮৭, ১৮৮, ১৮৯
জামালপুর ১০৯
জার্মানী ৩০, ৬৩, ৭২, ১০৪, ১১৯
জালিয়ানওয়ালাবাগ ১০৪, ১০৮, ২০৯
'জালিয়ানওয়ালাবাগ দিবস, ১০৮
জীমূতবাহন ৮৫
জেনেভা ২৭৮
জেলা ছাত্র-সম্মেলন : রাজশাহী ১৮২
জ্ঞানাঞ্জন নিয়োগী ১৮, ১৯, ১০০, ১১৮
ঝান্সীর রাণী ১২৫
টমাস মুর ১৮২
টাউনসেন্ড ৬১
টাউন হল ১০৫
টাটা আয়রন অ্যান্ড স্টীল কোম্পানি ১৪৫-৪৬, ১৭৫-৭৬, ১৮৬, ১৮৭
টেরিফ বোর্ড ১৮৭
টিনপ্লেট কোম্পানি ১৪৫-৪৬, ১৭৫-৭৬, ১৮৫-৮৯
ট্রট্স্কি ৯১
ট্রেড ইউনিয়ন আইন ১৭৯
ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস ২৭৬
ডোনাভান, মি. ১৯৩
ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাস ১৬৩
ঢাকা ৬৬
'তন্ত্রসার' ৮৫
তরুণ সমিতি ১৫১
তুরস্ক ২৩৬
তুর্কী ১৩৮
তুলসীচন্দ্র গোস্বামী ২২৭
ত্রিপুরা ১৩৫
দধীচি ২০২, ২০৫
'দায়ভাগ' ৮৫
দিনাজপুর ৭৪
দিব্বোক ৭৯
দিল্লী ১৪৬, ২৫৪
দীনবন্ধু মিত্র ১৪৮

দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান ৮২, ৮৩
দেবপাল ৭৯
দেবী চৌধুরাণী ৭৮, ১২৫
দেশবন্ধু স্মৃতিমন্দির ২২, ৯৭
'দেশের ডাক' ১৯
দ্বৈতাদ্বৈতবাদ ৮৫, ১৬৮
ধর্মপাল ৭৮, ৮৩
ধীমান ৮৩
নদীয়া ১৯৫
নন-কোঅপারেশন ১১৬, ১৬১
নবীন সেন ১৩৫
নবন্যায় ৮৫
নাসীর মামুদ ৮৬
নাগপুর ২৮, ২৫৮, ২৭৬
নারী-আন্দোলন ২৪০
নালন্দা ৮২
নিউ ইয়র্ক ২৪৯
নিখিল বঙ্গ ছাত্র অ্যাসোসিয়েশন ২৮৩, ২৮৪
নিখিলবঙ্গ সতীন সেন দিবস ২২০-২১
নিখিল বঙ্গীয় যুবক সমিতি ৭
নিখিল বঙ্গীয় যুব-সম্মেলন ১
নিখিল ভারত কংগ্রেস ১৮৭
নিখিল ভারত যুব-কংগ্রেস ২০, ২৫২
নিখিল ভারতীয় কংগ্রেস কমিটি ১৬২, ২৫৪
নীট্‌শে ১৮২
নীলকণ্ঠ দাস ১৮৭
নীলকর ১৪৭, ১৬৯
'নীলদর্পণ' ১৪৮
নৃপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ১৯
নেহেরু রিপোর্ট ১৫৩
পটুয়াখালি ১৯৩, ১৯৪
পটুয়াখালি মীমাংসা ২২৬
পটুয়াখালি সত্যাগ্রহ আন্দোলন ১৯৪
'পদ্মাবতী' ৮৭
পরাগল ৮৬
পল্লী সংগঠন ১৩৭
পাবনা জেলা যুব-সম্মিলনী ২৮
পাঞ্জাব ২১৮, ২৪১, ২৪৩-২৪৫, ২৪৭, ২৪৮, ২৫১
পাঞ্জাব ছাত্র-সম্মেলন ২২৯
পিটার্সন, মি. ১৭৫
প্রতাপাদিত্য ১৪৭
প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ ৩৯
প্রফুল্লচন্দ্র রায় ৮, ৮৮
প্রাগ্‌জ্যোতিষ ৭৮
প্রাদেশিক ছাত্র সম্মেলন ২৭৬
প্রামাণিক, এস. কে ১৯১
প্যান-প্যাসিফিক ট্রেড ইউনিয়ন ২৭৭ ২৭৮
প্লেটো ২৯, ১৮২
ফকির হবিব ৮৬
'ফরওয়ার্ড' ১৬, ১৯, ২৬,
ফরাসী ১০৪
ফরাসী বিদ্রোহ ৬১
ফ্রান্স ১০৪
ফ্রী প্রেস ২৬, ১০৩, ২২২
ফ্ল্যান্ডার্স পেত্রী, স্যার ২৩৭

বক্‌তিয়ার খিলজি ৮৪, ৮৭
বগলকোট ২৪৩
বজবজ
অয়েল ও পেট্রোল কোম্পানি ২৪৮, ২৫৬
শ্রমিক সভা ১৯০, ২৪৮, ২৫৬
বঙ্কিমচন্দ্র ৬৯, ৭৮, ৯১৮
বঙ্গ ৮১
বঙ্গ ভঙ্গ ৫৪, ১১০, ১৩৬, ১৬১ ২০৮
'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' ৮৬, ৮৭
বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি ১৭, ২১, ৪২, ৫৫, ৯৬, ৯৭, ১৯২, ২২২, ২২৪, ২২৫, ২২৬, ২৮৪
বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতি ৪০, ১০১
বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলন ৭৭
বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভা ২৩, ৯৭, ১০০, ১৩৪, ১৭৭, ১৭৯
বলশেভিক ২১১
বয়কট ৩৯, ৫৩, ৬০, ১১৭
বরিশাল ১৯৩, ১৯৪, ২২৬
বরিশাল টাউন হল ১৯৩, ২২৮
বরিশাল জেলা রাষ্ট্রীয় সম্মেলন ১১৫
বর্মা ২৫১
বর্মা অয়েল কোম্পানি ১৪৫, ১৭৫-৭৬, ১৮৬-৮৯, ২৪৯
বর্মাশেল কোম্পানি ২৪৯
'বন্দেমাতরম্‌' ১১০, ১৬৯
'বসুমতী' ২২৩, ২২৪
'বাংলার কথা' ১৬, ১৯, ২৬
বাচ্চাই সাঁকো ১৯৭, ১৯৮
বারাণসী ১০২
বালগঙ্গাধর তিলক ১৫৭
বিজয়কৃষ্ণ বসু ১০৬, ২২৩, ২২৪
বিদ্যাপতি ৮৬
বিপিনচন্দ্র পাল ১৫৫, ১৫৬, ১৯৭
বিবেকানন্দ, স্বামী ৩১, ৩৫, ৫৯, ৭০, ৮৮, ৮৯, ৯০, ১১৩, ১৬৭, ১৬৮, ১৬৯, ১৭০, ২০১, ২০৩
বিহার ১৮৬
বিহার প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি ১৮১
ব্রহ্মদেশ ২১৮, ২৩১
বিশিষ্টদ্বৈতবাদ ১৬৮
বীতপাল ৮৩
বীরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত ২৮০
বুকানন, ড. ৯৯
বেঙ্গল ভলান্টিয়ার কোর ২৫৩
বেদ ৮১, ৮২
বেদান্ততত্ত্ব ৮৮
বের্গসঁ ২৭০
বেলজিয়ম ১১৭
বেহালা সেবাসমিতি ৬৫
বৈদ্যশাস্ত্রপীঠ ১৪৫
ব্যোমকেশ চক্রবর্তী ১৬১
ব্রাহ্মসমাজ ৮৭, ১৬৮, ১৮৩
ব্রিটিশ পার্লামেন্ট ১৫৩
ব্রিটিশ ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস ১৮৭
ব্রিটেন ১৪৭
ব্ল্যাকোয়ার স্কোয়ার ৬১

ভবানী পাঠক ৭৮
ভবানীপুর ২৫১
ভলাণ্টিয়ার অর্গেনিজেশন ১১৯, ১২০
ভারতবর্ষ ২৩৬, ২৩৮, ২৩৯, ২৪৭, ২৫৫-৫৬, ২৭০
ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস ২৩৩, ২৪০, ২৫৫
ভারতচন্দ্র ৮৬
ভি. ভি. গিরি ১৮৬-৮৭
মগধ ৮১, ৯৩
মতিলাল ঘোষ ২৮১
মতিলাল নেহেরু ১০, ২৫৪
মধ্যপ্রদেশ ২৬৫
মধ্যপ্রদেশ ও বেরার ছাত্র-সম্মেলন ২৬৬
মধ্যপ্রদেশ যুব-সম্মেলন ২৫৮
মডারেট সম্প্রদায় ২০৯
মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী ২৫৭
মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা ১৫৫
মণ্টেগু ২০৯
ময়নামতী ৭৮
ময়মনসিংহ ২১, ১০৯, ১১৫, ১২২, ২৮৩
ময়মনসিংহ সম্মেলন ২৮৪
মহাত্মা গান্ধী ১০, ১২, ৩৮, ৪০, ৪১, ৪২, ৪৩, ৪৫, ৪৬, ৪৭, ৪৯, ৫১, ৫২, ৫৪, ৬০, ৯৪, ৯৯, ১০৯ ১১১, ১২০, ১৩৬, ১৬৯, ১৯৭, ২৫৪
মহাদেব ৭৮
মহাভারত ৭৮, ৮১, ৮৬
মহিমবাবু ১৩৫
মহীপাল ৭৯
মহীশূর পার্ক ১১
মাইকেল মধুসূদন ১৪৭
'মাগধী শিক্ষা' ৮১, ৮৩
মাণ্ডুরাজ বংশ ৩০
মাদ্রাজ-কংগ্রেস ১০, ১৯৮
মানব-বিজ্ঞান ১৭৩
মানিকচন্দ্র ৭৮
মানেক হোমি ১৪৬, ১৭৫
মান্দালয় জেল ২১৮
মালিকান্দা ৩৭, ৩৯
'মাসিক বসুমতী' ২৬
মিথিলা ৮৪
মিন্‌স্কি ৯১
মিণ্টো-মর্লি রিফর্ম ১১০, ১৩৬, ২০৮
'মিশন' ২৩৯, ২৪৬
মীরজাফর ৩৫, ৪০, ৪৫, ৪৯ ৮৭, ১১২, ১৩৭
মুকুন্দরাম ৮৬
মুসলিম লীগ ১৯৮
মুজা হুসেন আলি ৮৭
মৃণালিনী দেবী ১৯৫
মেকলে ৭০
মেরিডিথ ৬১
মৈত্রেয়ী ৬৯, ১২৫
মৌলানা অব্দুল বারি ২৫৪

ম্যাকডোনাল্ড, র‍্যামজে ১৩৮
ম্যাঞ্চেস্টার ৪৭
ম্যার্টসিনি ১৩
যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত ৪২, ১০৬, ১০৭, ১০৯, ১৩৫, ২২১-২৬
যতীন্দ্রনাথ দাস ১৯২, ২০২, ২০৫, ২০৬, ২১৭, ২১৯, ২২১, ২৩০, ২৪০, ২৪৭, ২৫১-৫৩
যবদ্বীপ ৭৯, ৮৩
যশোহর ১৩৮, ১৪২, ১৪৭, ১৬৯
যশোহর জেলা সম্মেলন ১৪৭
যশোহর-খুলনা যুব-সম্মেলন ১৩৮
যাত্রামোহন সেন ১৩৫
যুব-আন্দোলন ৯৭, ১৩৮, ১৩৯, ২৪০
যোগীন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্তী ২২৩, ২২৪
রংপুর ৭৭, ১০৩, ১৫১
রঘুনন্দন ৮৪, ৮৫
রঘুনাথ শিরোমণি ৮৫
রবার্ট ক্লাইভ ১২৯
রবীন্দ্রনাথ ৬৬, ৭০, ৮৮, ১৩৮, ২৩০, ২৩১
রসুল ১৫৫
রাজশাহী ১৮১
রাজেন্দ্রপ্রসাদ ১৮৭
রাজেন্দ্রলাল আচার্য ৮৩
রাণী ভবানী ১২৫
রামকৃষ্ণ পরমহংস ৮৮, ১৬৭, ১৬৮, ১৭০
রামন ৮৮
রামপ্রসাদ ৭৬
রামমোহন রায় ৮৭, ৮৮, ১৬৭, ১৭৮, ১৮৩
রামানুজম ৮৮
রামায়ণ ৮৬
রাশিয়া ৯০, ৯২, ৯৪, ১১১, ১১৭ ১১৮, ১৯৯, ২৪৭
রাশিয়ান রিভলিউশান ১১৭
রাষ্ট্রীয় ছাত্রী সংঘ ২০
রাষ্ট্রীয় ভাষা ২৫
রাষ্ট্রীয় মহিলা সংঘ ২০
রেলবোর্ড ৩৭, ১৭৮, ১৭৯
লঙ্‌সাহেব ১৪৮
লয়েড জর্জ ৬৩
লাহোর ১০৮, ২০২, ২০৫, ২৪১, ২৪২-৪৩, ২৪৬
লাহোর-কংগ্রেস ১২০, ১২২, ১৬৪, ২১৩, ২১৮, ২৪১, ২৪৭, ২৫৫, ২৫৬
লাহোর ষড়যন্ত্র মামলা ২১৯
লাহোর ছাত্র-সম্মেলন ২৫৩
লিলুয়া ২৭, ১৭৮, ১৮০
লীলাবতী ১২৫
লুধিয়ানা ২৪৮
লুধিয়ানা টাউন হল ২৪৮
লেনিন ১২, ১১১, ১৫৬, ১৯৯, ২০৩
লেবার কমিশন ৯৫
ল্যাঙ্কাশায়ার ৫২, ৬০
শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ২৬, ১১২, ১৯৬

শীলভদ্র ৮২, ৮৩
শুল্কের রক্ষাকবচ ১৭৫-৭৬
শেখ জালান ৮৬
শেখ ভিখ ৮৬
শেখলাল ৮৬
শ্যামাসুন্দর চক্রবর্তী ১৫৬
শ্যামাদাস বাচস্পতি ১৪৫
শ্রদ্ধানন্দ পার্ক ২১৭, ২২০
শ্রমবিরোধ আইন ১৭৯, ২৫০
শ্রমিক-আন্দোলন ২৭, ৬৩, ৬৪, ৯৫, ৯৭, ১০০, ১৩৪, ১৩৬, ১৭৮, ২৪০, ২৫০, ২৫৬
শ্রমিক-ধর্মঘট ১৪৫
শ্রীকৃষ্ণ ২৮, ৫৬
শ্রীচৈতন্য ১০২
শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা ২৯, ৫৬
শ্রীহট্টজেলা ছাত্র-সম্মিলনী ১২৩
সংরক্ষণ শুল্ক ১৭৫-৭৬
সক্রেটিস ২৯, ১৮২
সতীন্দ্রনাথ সেন ১৪৬, ১৫৭, ১৬৫, ১৯৩-৯৫, ২১৯, ২২০-২১, ২২৬, ২২৮
সত্যরঞ্জন বক্সী ১৬, ১৯
সবুজ সংঘ ৫৬
সমাজ-সংস্কার আন্দোলন ১৫২, ১৬৮
সমুদ্রগুপ্ত ৮৩
সাইমন কমিশন ১১, ১৪, ১৭, ১৮, ২১, ২৩, ৩৮, ৪৮, ৬৩, ৯৫, ৯৭, ৯৮, ১২৩, ১৩৪, ১৫৩, ২৫৫
সাইবেরিয়া ২৩৬
সাকলাতওয়ালো ১২, ১১১
সান-ইয়াৎ-সেন ১১৯
সাধারণ নির্বাচন ১৩৪
সার্দা বিল ২০৭
সালু-বেগ ৮৬
সিংহল ৭৯, ১০২, ২৩৬
সিন্‌ফিন্‌ ৯৩, ৯৫
সিমলা ব্যায়াম সমিতি ৪৬
সিলি ৬৩
সীতারাম রায় ১৪৭
সুইজারল্যান্ড ৬৬
সুমাত্রা ৭৯, ৮৩
সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ১১৫, ১৬১
সৈফুদ্দীন কিচলু ২৫৪
সৈয়দ জাফর খাঁ ৮৭
সৈয়দ মর্তুজা ৮৭
স্বদেশী মিউজিয়ম ৯৭
স্বরাজ্যদল ১৯৮
স্বরাজ্যনীতি ১৬২
স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী ১৩২
'স্মৃতি' ৮৪, ৮৫
স্ট্যান্ডার্ড অয়েল কোম্পানি ২৪৯
হাউস অফ কমন্স ১৮৭
হাওড়া ১৯২, ২০০, ২০১, ২০৫
হাওড়া জেলা যুব সম্মেলন ১৯৬
হাওড়া জেলা রাজনৈতিক সম্মেলন ২০৫
হিন্দুমহাসভা ১৯৮

হিন্দুস্থানী সেবাদল ২৪২, ২৪৩
হুইট্‌লি ৯৫
হুইট্‌লি কমিশন ৬৩, ৯৫ ১৭৮, ২৭৯
হুগলি জেলা ছাত্র সম্মেলন ১৬৬
হুসেন শাহ ৭৮, ৮৬
হৃষিকেশ পার্ক ১৪
হেমচন্দ্র সেন ২২৬, ২২৭
হোমরুল ১৯৭
All India Trade Union Congress ৯৫
Centralised State ১৭০
Class patriotism ১৩৩
Faderal State ১৭০
Federation of cultures ১৭০
Health Exhibition ৬৭
Health Propaganda ৬৭
Hinders Petric Sir ২১০
Karl Marx ৪
Lantern Lecture ৬৭
League of Young Intellectuals ৬
Minto-Morley Reforms ২০৮
Night School ৬৯
Oath of allegiance ৯৩
Primary Education Bill ৭৩
Problems of Life ৯১
Public Safety Bill ৬৩
Seely Meredhh Townshend ২১২
"the idea of the age" ১৬৬
Trade Dispute Bill ৬৩
Trotsky ৯১
Volunteer Organisation ১৩২